READING ROOM
P. Adhikary.
Nawabgang.

615.53201
নীল. ঘ (হোমিও)

হোমিওপ্যাথিক

দর্শন গবেষণা

READING ROO
P. Adhikary.
Nawabgang.

স্বর্গীয় ডাক্তার নীলমণি ঘটক
কর্ত্তৃক

বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে লিখিত ও "হোমিওপ্যাথিক
পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ক্ল্যাশে" প্রচারিত বক্তৃতাসমূহ হইতে

এম, ভট্টাচার্জ্জী, এম-এইচ-এস ; পি-আর-এস-এম।
কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

প্রকাশক—
ডাঃ এম, ভট্টাচার্জ্জী, এম-এইচ-এস, পি-আর-এস-এম।
৭১নং বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

CALCUTTA HOMOEOPATHIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL
LIBRARY

মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র।

READING ROOM
P. Adhikary
Nawabganj

Accession No. 5200
Date 18.05.2016

All Rights reserved by the Publisher.

4.06.2016

১৮নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ, 'দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল
প্রিণ্টিং ওয়ার্কস লিঃ' হইতে
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে, বি-এস-সি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

615.53201
GHA
HOMEO

THE CALCUTTA HOMOEOPATHIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL
LIBRARY

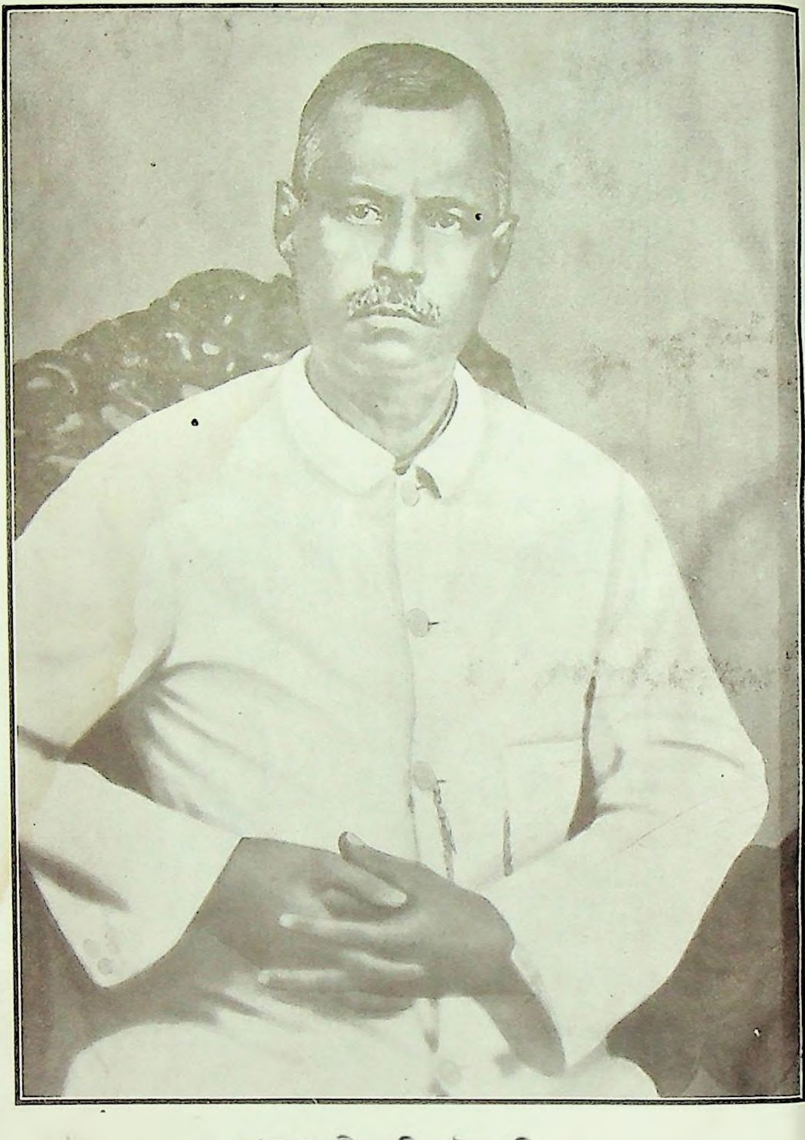

ডাক্তার নীলমণি ঘটক, বি. এ.

জন্ম—১৮৭২ মৃত্যু—১৯৪০

উৎসর্গ।

যাঁহার পূণ্যছায়ায় বসিয়া আমি হোমিওপ্যাথি বিজ্ঞানের অমৃত উৎসের সন্ধান পাইয়াছি,—যাঁহার আশীর্ব্বাদ আমার চিকিৎসা জীবনের একমাত্র পাথেয় এবং যাঁহার স্বভাব সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাবধারায়

দর্শন-গবেষণার

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা,—সেই প্রাচ্যের পবিত্র প্রাণ

হোমিও-দর্শন বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক

স্বর্গীয় ডাক্তার নীলমণি ঘটক

মহাশয়ের অমর আত্মার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থখানি

অন্তরের ভক্তি-অর্ঘ্যরূপে উৎসর্গ করিয়া

ধন্য হইলাম। ইতি—

প্রণতঃ :—

শ্রীমহিমমোহন ভট্টাচার্য্য

THE CALCUTTA HOMOEOPATHIC COLLEGE & HOSPITAL
LIBRARY

ভূমিকা।

আমার পরমারাধ্য পরমপূজনীয় স্বর্গগত শ্বশুর ডাক্তার ৺নীলমণি ঘটক মহাশয় তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত হোমিও দর্শন বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সকল জটীল গবেষণা করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিবার সৌভাগ্য যে এক দিন আমিই লাভ করিব,—একথা মুহূর্ত্তের জন্য কল্পনাও করিতে সাহসী হই নাই। ফলতঃ মঙ্গলময় ভগবান্ কি উদ্দেশ্যে কবে কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে এই সৌভাগ্যের জয়টীকা আমারই ললাটে লেপন করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা কে জানে? যাহা হউক, উদ্দেশ্য যেখানে মহৎ সে স্থানে এ প্রকার কার্য্যভার গ্রহণ একান্ত সমীচীন বলিয়াই আমি "দর্শন গবেষণা" প্রকাশ কার্য্যে প্রোৎসাহিত হইয়া পড়ি এবং গত দুই বৎসর যাবৎ অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে ইহার উপকরণ সংগ্রহ করিতে থাকি। এই কার্য্যে আমি গত দশ পনর বৎসরের "হ্যানিম্যান ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা" নামক মাসিক পত্রিকাদ্বয় হইতে বহু সাহায্য পাইয়াছি; কেননা, ডাঃ ঘটক মহাশয় তাঁহার গবেষণামূলক বহু প্রবন্ধ উপরোক্ত পত্রিকাদ্বয়েই প্রকাশ করিয়াছিলেন। উপরন্তু, আমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে চিকিৎসক প্রবরের সহিত ছাত্র-শিক্ষক হিসাবে দীর্ঘদিন অবস্থান করিয়া তাঁহার নিকট হইতে যে সকল জ্ঞানগর্ভ উপদেশাবলী প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহাও যাহাতে বর্ত্তমান গ্রন্থ খানিতে সংযোজিত হয়, তাহার প্রতি তীক্ষ্নদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে কোনও প্রকার কার্পণ্য প্রদর্শন করি নাই,—এমন কি, তাঁহার সহিত জটীলতত্ত্ব সমূহের আলাপ আলোচনা কালে তিনি যে প্রকার "ভাষা" প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাই অবিকল সন্নিবেশিত করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছি, উদাহরণ স্বরূপ চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত "ঔষধের মাত্রা বিচার" বিষয়ক আলোচনাটাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, যেসকল

পাঠক ধৈর্য্যের সহিত গ্রন্থখানি শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিবেন, তাঁহারাই লক্ষ্য করিবেন যে, ইহার বহু অংশে পুনরুক্তি দোষ রহিয়া গিয়াছে ; ফলতঃ গ্রন্থখানির উৎপত্তির বিবরণ স্মরণ করিলে ইহা আদৌ বিসদৃশ বোধ হইবে না, কেননা খণ্ডাকারে প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করিবার সময় প্রবন্ধকার মাত্রেই চেষ্টা করেন, যাহাতে সেগুলি সাঙ্গ ও পূর্ণাঙ্গ হয়। মোট কথা, হোমিওপ্যাথি বিজ্ঞানের মূল মন্ত্র সমূহের পুনরুক্তি যতবার পাঠ করা যায়, ততই শ্রেয়ঃ।

হোমিওপ্যাথি বিজ্ঞানের প্রসারকল্পে এ প্রকার গ্রন্থ প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে সর্ব্বপ্রথমে ইহাই বলিতে হয় যে, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রকৃত জ্ঞানের অধিকার জন্মাইতে হইলে, কি ছাত্র, কি চিকিৎসক, প্রত্যেককেই মনে প্রাণে দর্শন ভাবাপন্ন হইতে হয়, কেননা দর্শনই ইহার প্রাণ স্বরূপ। সুতরাং ইহার সূক্ষ্ম দর্শনাংশে প্রবেশ লাভ না করিয়া শুধু কতকগুলি মেটিরিয়া মেডিকা ও চিকিৎসা পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া হ্যানিম্যানের পথে চিকিৎসা করিবার প্রয়াস নিতান্তই নিরর্থক ও ভ্রান্তিমূলক। ফলতঃ প্রকৃত হোমিওপ্যাথি মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার অভিলাষ থাকিলে হিন্দুর শ্রীমৎভগবৎগীতা ও মহম্মদীয়দিগের কোরাণ গ্রন্থের ন্যায় অর্গ্যানন ও তাহার দর্শনাংশ পাঠ করিতেই হইবে,—এমন কি, চিকিৎসকের প্রতি আচরণে, প্রতি কর্ম্মে অর্গ্যাননের ছন্দ ছন্দিত হওয়া চাই, জীবন তন্ত্রীতে সর্ব্বদাই দর্শনের সুর ধ্বনিত হওয়া চাই, নতুবা অবিশুদ্ধ মনে, অহংকার প্রমত্ত চিত্তে এবং জড়মস্তিষ্ক সহায়ে হোমিওপ্যাথি বিষয়ে অধিকার জন্মে না এবং ইহার চরম সার্থকতা কোথায় তাহা আদৌ উপলব্ধি হইতেই পারে না। তাই জগতপূজ্য মনীষী ডাক্তার কেণ্ট কহিয়াছেন "যাহারা পরিমাপ ও পরিমাণ ব্যতীত চিন্তা করিতে পারেন না হোমিওপ্যাথি তাহাদের জন্য নহে।"

বিজ্ঞান মাত্রেই প্রকৃতি সম্ভূত প্রকৃষ্ট জ্ঞান, তাই জগতের ইতিহাসে যাহা কিছু স্বাভাবিক ও শাশ্বত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তাহাই মানব প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে আহরণ করিয়াছে। আমাদের মহাগুরু সত্যদ্রষ্টা ঋষি হানিম্যানও তাই আরোগ্য কল্পে যাহা কিছু অভ্রান্ত সত্য ও অচঞ্চল তাহা সমস্তই প্রকৃতির চিরন্তন নীতি হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, প্রকৃতির সপক্ষে নিয়মানুবর্ত্তিতা ভিন্ন কথায় ভগবানের বিধান অবলম্বনের ফল যে কি প্রকার ফলপ্রসূ ও কল্যাণ জনক তাহা আমরা স্বতঃই উপেক্ষা করিতেছি। অধিকন্তু প্রকৃতির সহিত পরিচয়, প্রকৃতির ভাষা উপলব্ধি করিবার অনুসন্ধিৎসা, স্থাবর জঙ্গমাত্মিক প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থের উপর তাহার প্রভাব এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের সহিত তাহার সামঞ্জস্য ইত্যাদি বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা, নিষ্ঠা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় প্রয়োজন তাহার প্রতিও আমরা পূর্ণমাত্রায় উদাসীন হইতে বসিয়াছি এবং তাহার ফলে হোমিওপ্যাথির ক্রমবর্দ্ধিত উন্নতির গতি পথটী ক্রমশঃই বন্ধুর হইতেছে, তাহা না হইলে কি আজিও আমাদের দেশে হোমিওপ্যাথিক স্কুল, কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গুলিতে বহু আড়ম্বরের সহিত এলোপ্যাথিক ভাবধারাতেই শিক্ষা কার্য্য চলিতে পারিত!

উপরোক্ত প্রকার কার্য্যানুষ্ঠানে অনুপ্রাণিত হইবার ও প্রকৃত হোমিওপ্যাথি বিজ্ঞানের উচ্চমার্গে উঠিবার পথে এই গ্রন্থখানি বিশেষ সহায়তা করিবে, উপরন্তু প্রকৃত আরোগ্য তত্ত্বের উপর প্রকৃতির নিয়মের অবশ্যম্ভাবী প্রভাব কতটুকু তাহাও ইহাতে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। অন্যদিকে, জগতের অন্যান্য তথাকথিত চিকিৎসা প্রথাগুলি কিপ্রকারে প্রকৃতির বিরুদ্ধে নির্ম্মম অভিযান চালাইয়া মানবকুলের ধ্বংশের পথটী ক্রমশঃই সুগম করিয়া দিতেছে, তাহাও প্রতিফলিত হইয়াছে। যাহা হউক, আমাদের ভ্রাতৃ সদৃশ পরমপ্রিয় চিকিৎসক ও ছাত্রমণ্ডলী যদি ইহা দ্বারা

কথঞ্চিৎ উপকৃত হন তবেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিব। এই প্রসঙ্গে আর একটী বিষয়ে সুধী পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, ইহাতে বড় বড় অক্ষরে যে সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে তাহাদের উপর যেন অধিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, স্বর্গগত ডাঃ ঘটক মহাশয়ের পত্নী আমার শাশুড়ী মাতা শ্রীযুক্তা সরলাবালা দেবী হোমিওপ্যাথির উন্নতি কল্পে আমাকে তাঁহার স্বামীর লেখনী প্রসূত অপ্রকাশিত যাবতীয় সম্পদ সমূহ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ ও তৎসমূহের সর্ব্বস্বত্ব উপভোগ করিবার অধিকার প্রদান করায় আমি তাঁহার নিকট আজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। অলমিতি বিস্তারেণ।

৭১ নং, বৈঠকখানা রোড,
কলিকাতা।
শ্রীপঞ্চমী, ১৩৫১ সাল।

বিনীত—

ডাঃ শ্রীমহিমমোহন ভট্টাচার্য্য।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
নূতন নূতন পীড়া এবং জটিলতার প্রকৃত কারণ ...	১
প্রকৃতির নীতি লঙ্ঘনই যাবতীয় পীড়ার কারণ ...	৩-৫
যাবতীয় পীড়াই প্রকৃতির নীতি বশে আরোগ্য হইয়া থাকে অন্যথায় ঘোরতর অনিষ্টের সৃষ্টি হয়	৬-১২
উন্মাদ পীড়ার চিকিৎসা	১৩
মনস্তরের উপর ক্রিয়া করিতে একমাত্র সূক্ষ্ম শক্তিই প্রয়োজন ...	১৪
চাপাদেওয়া চিকিৎসার সহিত উন্মাদ পীড়ার সম্বন্ধ	১৫,১৮-২০
কিভাবে উন্মাদ রোগীর লিপি প্রস্তুত করিতে হয় ...	১৫-১৭
উন্মাদ পীড়া মাত্রেই টিউবারকুলার দোষজ অভিব্যক্তি ...	১৭
টিউবারকুলার দোষ শরীরস্থ বিভিন্ন যন্ত্র হিসাবে নূতন নূতন মূর্তিতে বিকাশ পায়	১৭-১৮
সোরাদুষ্ট দেহে বাহ্য পীড়া লক্ষণ চাপা দেওয়ার ফল ...	১৮
সাইকোসিস্ দুষ্ট দেহে বাহ্য পীড়া লক্ষণ চাপা দেওয়ার ফল ...	১৮
সিফিলিস্ দুষ্টদেহে বাহ্য পীড়া লক্ষণ চাপা দেওয়ার ফল ...	১৯
চাপা দেওয়া চিকিৎসা ও তাহার ফল	২১
কাহার চিকিৎসা করিতে হয়?	২২-২৩
রোগের ক্রিয়ান্তর, গতি ও তাহার সহিত জীবনীশক্তির সম্বন্ধ	২৩-৩০
মনের সহিত বাহ্য যন্ত্রাদির সম্বন্ধ	৩২

বিষয়	পৃষ্ঠা।
স্ত্রী ও পুরুষভেদে একই প্রকার লক্ষণ চাপা দেওয়ায় বিভিন্ন ফল	৩০-৩১
চিকিৎসক কি প্রথায় রোগীকে সুস্থ রাখিবেন ?	৩৩
ইঞ্জেক্সন্ কি হোমিওপ্যাথি অনুমোদিত ?	৩৪
হোমিওপ্যাথির মূল সূত্র	৩৬
ভেষজ পরীক্ষা	৩৭
ইঞ্জেক্সন হোমিওপ্যাথি রাজ্যের বহির্ভূত	৩৯
হোমিওপ্যাথির ব্যভিচার	৪১
হোমিওপ্যাথি সত্য প্রকৃত সত্য সুতরাং অপরিবর্ত্তনীয় ...	৪৬
প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের নিদর্শন	৪৭-৪৮
হোমিওপ্যাথির শিক্ষা ও প্রচার	৫৭
চিকিৎসার সততা	৬৪
প্রকৃত ঔষধ সাদৃশ্য কাহাকে বলে	৭১
হোমিওপ্যাথিতে প্যাথলজির স্থান	৭৫
জীবনীশক্তি	৮২
জীবনীশক্তি ও তাঁহার ক্রিয়াগতি	৯১

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রোগ ও রোগ লক্ষণ	১০৩
বিশেষ লক্ষণ কাহাকে কহে ?	১০৫-১০৭
রোগ কাহাকে কহে ? সর্ব্বপ্রথম ইহা কোথায় আবির্ভূত হয় ? রোগ ও রোগফল	১০৮
চৈতন্যময় জীব ও জড়ের মধ্যে পার্থক্য	১০৯

বিষয়	পৃষ্ঠা।
রোগ ও রোগফল	১১৪-১১৬
রোগী চিকিৎসা	১১৬
সত্য পদার্থের নিদর্শন	১১৮
প্রকৃত আরোগ্য নীতির নিদর্শন	১২১-১২৩
প্রকৃতিকে সাহায্য করাই চিকিৎসা	১২৩
চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিশেষত্বের স্থান	১২৪-১২৫
আরোগ্যের অন্তরায় বা রোগটী আরোগ্যের বাহিরে,— কিসে বুঝা যায় ?	১২৬-১২৮,২১৮-২১৯,২২১-২২২,২৫৫
এলোপ্যাথি চিকিৎসা কি প্রকৃতিকে সাহায্য করে ?	১২৯-১৩৩
পীড়া, স্বাভাবিক ও কৃত্রিম	১৩৪
কৃত্রিম পীড়ার একটী রোগীতত্ত্ব	১৩৫
রোগের গতি বাহির হইতে ভিতরে	১৪০
আরোগ্যের গতি ভিতর হইতে বাহিরে	১৪০,১৯২-১৯৪
পীড়ার কারণ, উত্তেজক ও সুপ্ত	১৪২
পীড়ার কারণ,—মূখ্য ও গৌণ, সুপ্ত ও উত্তেজক	১৪৭
রোগের সূচনা ও প্রবাহ,—সর্ব্বশেষ উহার ফল—	১৫২
রোগ কিভাবে নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচন করে ?	১৫৬-১৫৭,১৭১
বিভূতি ও প্রবণতা	১৫৯
বাহ্যদেহের উপর মনের প্রভাব	১৬৬
রোগ প্রবণতা	১৬৭
প্রবণতা ও বিকাশ প্রাপ্ত পীড়ার মধ্যে সম্বন্ধ	১৬৭
প্রবণতাবস্থাই আরোগ্যের উপযুক্ত সময়	১৬৯-১৭২
কর্কট, ক্ষয়, উন্মাদ, কুষ্ঠ ইত্যাদি পীড়া দুরারোগ্য কেন ?	১৭০

বিষয় | পৃষ্ঠা।

সোরা, সাইকোসিস, সিফিলিস্ ও টিউবারকুলার
দোষযুক্ত প্রবণতার নিদর্শন ১৭২-১৭৩

তৃতীয় অধ্যায়।

আরোগ্যের মূল উৎস কোথায়? ১৭৪
আরোগ্য কার্য্যে "দৈব" কিভাবে সাহায্য করে? ১৭৪-১৭৫, ১৭৮-১৭৯
কর্ম্মমাত্রেরই সিদ্ধি সম্বন্ধে ৫টী কারণ কি কি ... ১৭৮
লক্ষণ সমষ্টির প্রয়োজনীয়তা ১৮২
লক্ষণ সমষ্টি বর্ত্তমান থাকা বা না থাকার গুরুত্ব নির্দ্ধারণ ... ১৮৩-১৮৫
"আরোগ্য" কাহাকে বলে? ১৮৬
আরোগ্যের নিদর্শন ১৯০,২০৫-২০৭
রোগের গতি ও আরোগ্যের গতি ১৯১
দুইটি শূল পীড়ার রোগীতত্ত্ব ১৯৩,২৫২
রোগের গতি ও চিকিৎসার ধারাবাহিকতা ১৯৬
তরুণ ও পুরাতন পীড়াভেদে একই ঔষধ
বিভিন্ন গতিতে ক্রিয়া করে ২০১-২০২
পীড়া আরোগ্য কল্পে কতদিন সময় আবশ্যক হয় ... ২০১-২০২
রোগের তরুণতা ও পুরাতনত্ব হিসাবে ঔষধের
শক্তিরও তারতম্য হইয়া থাকে ২০২
প্রকৃত আরোগ্যের প্রকৃতি ও গতি ২০৩
আরোগ্য ও আরোগ্যের অনুকল্প ২০৭
প্রকৃত আরোগ্য কার্য্য কিভাবে সম্পাদিত হয়? ... ২১১-২১২

বিষয় পৃষ্ঠা।

অস্ত্রোপচার কোথায় আরোগ্য পথে বিঘ্ন ঘটায়
ও রোগটাকে জটিলতর করে ... ২১২-২১৪

অসাধ্য পীড়া ২১৬

পীড়ার সাধ্যতা বা অসাধ্যতা কিসের উপর
নির্ভর করে? ২১৭

লক্ষণসমষ্টি বর্ত্তমান থাকাই সাধ্যাবস্থার নিদর্শন ১২৮,২১৮-২১৯, ২২১-২২২

চিকিৎসা জনিত দোষও অতি ভয়ানক দোষ ... ২২০

দোষ অর্থে কি বুঝায়? ২২০-২২১

অসাধ্য অবস্থায় কি প্রথায় ঔষধ
প্রয়োগ করিতে হয়? ২২৪,২৮৮

স্তন্যপায়ী শিশুর আরোগ্য কল্পে জননীকে ঔষধ প্রয়োগ ... ২২৫

হোমিওপ্যাথির ৩টী প্রধান মৌলিক তত্ত্ব কি কি? ... ২২৭

বিধিনিষেধ ও পথ্যাপথ্য ২৩০

রোগীর ইচ্ছা ও অনিচ্ছা লক্ষ্য করিয়া অনেকক্ষেত্রে
পথ্যাপথ্য নির্ব্বাচন করিতে হয় ২৩২

নির্ব্বাচিত ঔষধের সহিত পথ্যাপথ্যের সম্বন্ধ ২৩২-২৩৫

রোগ আরোগ্য কল্পে পথ্য কিভাবে সাহায্য করে তাহার
দৃষ্টান্ত স্বরূপ ডাঃ ন্যাস ও ঘটকের ২টী রোগীতত্ত্ব ... ২৩৩-২৩৬

রোগীর বায়ু পরিবর্ত্তন ২৩৬

চতুর্থ অধ্যায়।

ব্যক্তিগত বিশেষত্ব ২৪১

ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা কি উপায়ে স্থির করিতে হয়? ... ২৪৪-২৪৫

বিষয়	পৃষ্ঠা।
ব্যক্তিগত বিশিষ্টতার সাহায্যে ঔষধ নির্ব্বাচন ও তাহার একটী উদাহরণ ...	... ২৪৭-২৪৯
লক্ষণ সমষ্টি ও নির্ব্বাচন প্রণালী ...	... ২৫০
তরুণ ও পুরাতন পীড়াভেদে নির্ব্বাচন পার্থক্য ...	... ২৫১
আরোগ্য কার্য্যে রোগের না রোগীর লক্ষণ সমষ্টি সাহায্য করে ?	... ২৫২-২৫৩
"লক্ষণ" অর্থে লোকে কি বুঝে ? ...	... ২৫৩
প্রকৃত লক্ষণ কাহাকে কহে ? ও তাহার নিদর্শন	... ২৫৪-২৫৬
পুরাতন পীড়ায় লক্ষণ সমষ্টি গ্রহণ প্রণালী ...	... ২৬৩-২৬৬
মানব সাধারণতঃ কয়টী স্তরে অবস্থান করে ? ...	... ২৬১-২৬৩
ত্রিদোষের মধ্যে কোন্ কোন্ দোষ শরীরে অবস্থান করিতেছে, তাহা বুঝিবার নিদর্শন ...	... ২৬৯
লক্ষণের শ্রেণী বিভাগ বা মূল্য নির্দ্ধারণ ...	... ২৬৭-২৬৮
কি উপায়ে অভ্রান্ত নির্ব্বাচন সম্ভব ও তাহার একটী উদাহরণ	২৭১-২৭৩, ২৭৭
পুরাতন পীড়া আরোগ্য কল্পে সাধারণতঃ কতদিন সময় আবশ্যক হয় ...	২৭৪, ২৮৫ ২০১-২০২
ঔষধ নির্ব্বাচন	... ২৭৫
চিকিৎসা কার্য্যে ব্যক্তিগত বিশেষত্বের স্থান ...	... ২৭৯-২৮০
ঔষধের শক্তি নির্ব্বাচন	... ২৮০
শক্তি নির্ব্বাচন কল্পে কি কি বিষয়ের প্রতি চিকিৎসকের লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য ?	... ২৮২-২৯৩
হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মাত্রা ...	... ২৯৩-৩০৯

বিষয়		পৃষ্ঠা।
মাত্রা সম্বন্ধে ডাঃ কেণ্ট, এলেন, হ্যাস, ডানহাম ইত্যাদি মহাপ্রাণ চিকিৎসকবৃন্দের মত	...	২৯৮, ৩০৬-৩০৯

পঞ্চম অধ্যায়।

অকাল মৃত্যুর কারণ ও তাহার প্রতিকার ...	...	৩১০
অকাল মৃত্যুর ক্রমগতি বন্ধ করিবার উপায় ...	...	৩১৯-৩২৪
ব্যাধি দুঃখ নিবারণের উপায়	...	৩২৯
পীড়া কেন হয়?	...	৩৩০
প্রিন্স অভওয়েলস্ অর্থাৎ যুবরাজেরও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাই হইয়া থাকে	...	৩৩৬
মনস্তরের মলিনতা সংশোধন,—বাহ্যাভ্যন্তর ব্যায়াম	...	৩৩৭
মনই দেহকে গঠন করে	...	৩৩৮
ব্যায়াম শরীর পুষ্ট করে কিন্তু সুন্দর করিতে পারে না	...	৩৩৮
মনকে বশে আনিবার উপায়	...	৩৪১
জন্মজন্মান্তরের কৃত পুণ্যের ফল রাশি ...	...	৩৪০
পীড়া বিকাশের ৩টী বিভিন্ন স্তর ...	...	৩৪২
বিভিন্ন স্তর হিসাবে বিভিন্ন শক্তিতে ঔষধ প্রয়োগ	...	৩৪২
তিনটী বিভিন্ন স্তর হিসাবে তিনটী রোগীতত্ত্ব ...	...	৩৪৩-৩৪৪
স্বভাব কাহাকে কহে?	...	৩৪৪
মানসিক ব্যায়ামের উপকারিতা ...	...	৩৪৬
মনের উপর আহার ও সঙ্গের প্রভাব ...	...	৩৪৭
আহার কয় শ্রেণীতে বিভক্ত	...	৩৪৮
জন্মান্তরীণ ব্যাধি প্রবাহ ও তৎপথে প্রতিকার ...	...	৩৪৯-৩৬৭

Presented by Kalicharan Halder,
Kausabganj.
1945.

হোমিওপ্যাথিক

দর্শন গবেষণা

প্রথম অধ্যায়।

নূতন নূতন পীড়া এবং জটিলতার প্রকৃত কারণ।

মানব যতদিন স্বভাবের উপর থাকিয়া জীবনযাপন করিত, ততদিন তাহাদের ব্যাধি, পীড়াদি বড় ছিল না। অতিরিক্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত ভোজনাদির কারণে মধ্যে মধ্যে পীড়াদি যে আদৌ দেখা দিত না,—একথা অবশ্য বলা যায় না, কিন্তু তাহাকে "পীড়া" বলা যায় না উহা সামান্য অসুখ, অর্থাৎ ইংরাজীতে মহাগুরু হ্যানিম্যান যাহাকে indisposition বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই বলা যায়। পীড়া না বলিবার কারণ এই যে বাহির হইতে ঔষধের সাহায্য বড় একটা প্রয়োজন হইত না, নিজ নিজ দেহের মধ্যে স্বাভাবিকী আরোগ্যকারিণী শক্তি (vis medicatrix naturæ) ঐ অসুখগুলি সারাইবার পক্ষে যথেষ্টই

হইত, কেবল দুই একদিন উপবাস, ২।১ দিন স্নানবন্ধ ইত্যাদি সংযম অবলম্বন করিলেই আবার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিত। আমাদের বাল্যজীবনেও আমরা দেখিয়াছি যে, দেশে এত নামের, এত প্রকারের ও এত জটীলতাপূর্ণ পীড়া ছিল না। তখনও যে ম্যালেরিয়া জ্বর হইত না, তাহা নয়, তবে দীর্ঘকাল ধরিয়া উপবাসাদি সংযম অবলম্বন এবং ক্ষেত্রবিশেষে তিক্তকটুকষায়াদি রসযুক্ত লতাপাতা,—বড় জোর, কবিরাজের ২।১টী বটীকা প্রয়োগ করিলেই লোকে নিরাময় হইত এবং সে বৎসর আর আক্রমণ হইত না। কথার ডাকে লোকে এবং কবিরাজেরা বলিতেন—"পিপুল, হিঙ্গুল, বিষ, দশ দিনের জরে দিস্," অর্থাৎ দশ দিন ধরিয়া জ্বরবেগ চলিতে থাকিলে, পিপুল, হিঙ্গুল ও মিঠাবিষ অর্থাৎ একোনাইট, এই কয়টীর বটী দিলেই আরোগ্য হইবে। বাস্তবিকই ব্যাধি পীড়া বড়ই কম ছিল, তবে বিগত ৫০ বৎসর হইতে পীড়ার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং গত ১৫।২০ বৎসর হইতে এত প্রকারের পীড়া সৃষ্টি এবং জটিলতার এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, এই স্রোতটী বন্ধ না হইলে, বোধ হয়, আমাদের বাঙ্গলাদেশ অতি শীঘ্রই শ্মশানে পরিণত হইবে।

সমাজে এই নূতন নূতন নামের এবং ভয়াবহ লক্ষণাদি সমন্বিত ব্যাধিনিচয়ের আবির্ভাব হইতেছে এবং হইয়াছে কেন? লোকে অতি সহজভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকেন—"আমাদের কর্ম্মফল,"—এবং নিজেদের কৃতকর্ম্মের ফল বা অদৃষ্টদোষ ইত্যাদি মনে করিয়াই তাঁহারা অকাতরে ব্যাধিজনিত কষ্ট ও দুঃখ ভোগ করিতে থাকেন। অবশ্যই আমাদের কর্ম্মের জন্যই যাবতীয় দুঃখের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই, ফলতঃ কেবল কর্ম্মফল বলিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া ব্যাধি দুঃখাদি বরণ করিয়া লওয়া নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য। কোন্ কর্ম্মের জন্য

এই ফল, সেই কর্ম্ম ত্যাগ করা যায় কিনা, অর্থাৎ ব্যাধি দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করা এবং কার্য্যে পরিণত করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য।

যাবতীয় ব্যাধি দুঃখের পশ্চাতে প্রকৃতির নীতি লঙ্ঘন বর্ত্তমান থাকে। যেখানে নীতি লঙ্ঘন নাই, সেখানে কোনও প্রকার দুঃখ আসিতে পারে না। আমরা নীতিলঙ্ঘনে ধীরে ধীরে এরূপভাবে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, আমরা আদৌ বুঝিতেই পারি না যে, আমরা উহা লঙ্ঘন করিতেছি। অমুক সময়ে আহার করিতে হইবে, এতখানি সময় নিদ্রা আবশ্যক ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নীতি হইতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক নীতি সকল নিত্য অজ্ঞাতভাবে কি প্রকার অবাধে লঙ্ঘন করিতেছি ও করিয়া থাকি, তাহা আমরা চিন্তায় আনি না। বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষার প্রারম্ভেই যে সকল নীতি আমরা পাঠ করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে একটীও প্রতিপালন করিতেছি,—একথা আমরা কেহই সাহস করিয়া বলিতে পারি না। নিত্য নৈমিত্তিক ব্যতীত, বিলাস ব্যসনে, আমোদ প্রমোদে, ক্রীড়া কৌতুকস্থলে, আমরা নানাভাবে কত নিয়মভঙ্গ করিতেছি, সত্য ত্যাগ করিয়া মিথ্যা পথে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, তাহার সংখ্যা করা যায় না। এম. এ, বি. এ, এবং আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন ব্যবসায়ী হইলাম এবং নিজ নিজ জীবনকে ধন্য মানিলাম, কিন্তু ঐ ব্যবসায়ে যে কি ভাবে সত্যভ্রষ্ট হইয়া জীবনপথে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া চলিতে হয়, তাহা প্রত্যেকেই অনুভব করিয়াও করি না। কেহ যেন মনে না করেন যে "শারীরিক নীতি লঙ্ঘনের ফলেই পীড়া হয়, অন্য নীতি ভঙ্গ করিলে পীড়া হয় না।" এ ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। সামান্য মিথ্যাভাষণে, সামান্য মন্দ অভিপ্রায় পোষণ মাত্রে, ক্রোধাদি রিপুর সামান্য উত্তেজনা মাত্রে, শরীরস্থ রসরক্তমাংসমেদঃ অস্থিমজ্জাশুক্র

এবং ওজঃ ধাতুর বিকৃতি ঘটে এবং মনুষ্যকে নানা পীড়ার অধীন করিয়া থাকে। মনটী বাদ দিয়া কোন কার্য্য বা চিন্তা হয় না এবং এই মনস্তরেই পীড়ার সর্ব্ব প্রথম ঝঙ্কার উত্থিত হয়। মন হইতে, ঠিক প্রবাহের বশে, ঐ ঝঙ্কারটি অর্থাৎ বিশৃঙ্খলাটী বাহ্য শরীরে নীত হয়। তখনই কেবল উহা রূপ প্রাপ্ত হয় ও লোকলোচনের অন্তর্ভূক্ত হয়। এজন্যই মহর্ষি চরক তাঁহার অমূল্য গ্রন্থে, জনপদধ্বংস অধ্যায়ে, ব্যাপক পীড়ার একমাত্র কারণ,—জল, দেশ, কাল ও বায়ুর যুগপৎ দূষিত হওয়া,—বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনুষ্যের পাপ বা নীতিভঙ্গ জন্য ঐগুলি দূষিত হয় এবং তাহারই ফলে ব্যাপকপীড়ার আবির্ভাব ঘটে। অতএব আসলে মনোযোগ না দিয়া, যতই মশা মারা হউক, যতই কেরোসিন তৈল পুরাতন পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করা হউক, হাজার হাজার মশা মারিবার Brigade প্রস্তুত হউক, উহাদের দ্বারা পীড়া নিবারণের একটী আড়ম্বর দেখান ব্যতীত প্রকৃত কাজ কিছুই হইবে না। প্রত্যেক বিষয়ে, ধর্ম্মে ও নিয়মানুবর্ত্তিতায় ফিরিতে হইবে,—ব্যক্তিগত, গার্হস্থ্য, সামাজিক, যাবতীয় বিভাগের প্রত্যেক নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে নতুবা দুঃখ যাইবে না। যে কোনও দুঃখের নিদান ত্যাগ আদৌ করিতেই হইবে, তাহাতে না হইলে, তখনই কেবল বাহ্য প্রতিকার অবলম্বন ফলদায়ক হইবে,—নতুবা নিয়ম ভঙ্গ বা অধর্ম্ম বন্ধ না করিয়া যতই বাহ্য প্রতিকার অবলম্বিত হউক না কেন, কোনও ফল ত হইবেই না, উপরন্তু নূতন নূতন দুঃখের আবির্ভাব হইবে। স্বতঃসিদ্ধ বিষয় প্রমাণ আবশ্যক করে না। যদি রাত্রি জাগরণ করার ফলে কোনও পীড়া দেখা দেয়, তবে সর্ব্বাগ্রে ঐ পীড়ার নিদান, রাত্রি জাগরণ, তাহা বন্ধ করিতে হইবে এবং যদি তাহাতেও পীড়াটী নিবারিত না হয়, তবেই চিকিৎসা অবলম্বনীয় ও সার্থক হয়, নতুবা রাত্রিজাগরণটী চলিতে থাকিলে শত চিকিৎসাতেও

ফল হইবে না, বরং ক্রমে পীড়াটা আরও জটিল, অর্থাৎ সামান্য সর্দ্দিকাশি হইতে প্লুরিসি, তাহা হইতে রাজযক্ষ্মা পর্য্যন্ত আসিয়া রোগীর জীবন দীপটী নির্ব্বাপিত করিয়া ফেলিবার আশঙ্কা থাকে।

যদি আমাদের প্রাণ-প্রিয় দেশবাসীগণ কেবল উপরোক্ত আলোচনাটী মনোযোগ সহকারে পাঠ ও তাহার পর মনে মনে অতি সামান্য চিন্তা ও গবেষণা করেন, তবেই বেশ বুঝিতে পারিবেন, কেন নূতন নূতন পীড়া ও নানা জটিলতার আবির্ভাব হইতেছে। যদি আরও কিছু বিস্তারের প্রয়োজন থাকে, তবে নিম্নে যাহা লিখিতেছি, তাহা বেশ অবহিত হইয়া পাঠ করিতে ও তদনুসারে কার্য্যানুবর্ত্তী হইতে সবিনয় প্রার্থনা করিতেছি। ভ্রাতৃগণ, যদি আমি একজন হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসা ব্যবসায়ী বলিয়া আমার এই উক্তিগুলি নিজের স্বার্থপ্রোণোদিত বলিয়া মনে করেন, তবে আমি হৃদয়ে নিরতিশয় বেদনা পাইব। আপনারা নানাভাবে দুঃখ কষ্টের অধীন হইয়া পড়িতেছেন বলিয়া আমি নিজের প্রাণে যে ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকি এবং আপনাদিগকে ঠিক পথে আনয়ন করিবার অভিপ্রায়ে আমার মধ্যে যে ব্যাকুলতা প্রতিনিয়ত বর্ত্তমান থাকে, তাহার শতাংশের একাংশও যদি আপনারা বুঝিতে পারেন, তবেই আমি কৃতার্থ হইব।

মানবমাত্রেই অল্পবিস্তর নিয়মভঙ্গ ও পাপের অধীন, একথা অতি-মাত্র সত্য। প্রত্যেক মানবেরই নিজের অর্জ্জিত অথবা পূর্ব্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত দোষাদি জন্য পীড়াদি হইয়া থাকে। কিন্তু একেবারে **নীরোগ থাকিবার জন্য** যেমন প্রাকৃতিক নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়, ঠিক তেমনই নিজের পদস্খলন জন্য অর্জ্জিত দোষে অথবা পূর্ব্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত দোষে, পীড়িত হইলেও প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই **আরোগ্য অন্বেষণ** করিতে হয়। পীড়িত হইবার পর আরোগ্য হইতে হইলে, এক

প্রকৃতির পথে ব্যতীত হয় না। সকল অবস্থাতেই **প্রকৃতিই একমাত্র আশ্রয়,**—একথা সকল অবস্থাতেই প্রত্যেকের স্মরণ রাখিতে হইবে।

মনুষ্যকে নীরোগ থাকিতে হইলে প্রকৃতির নিয়ম প্রতিপালন করিয়া চলিতে হইবে, একথা যেমন সত্য, **পীড়া হইলে প্রকৃতির নিয়মেই ঐ পীড়াকে আরোগ্য** করিতে হইবে, একথাও সেইরূপ সত্য। যদি আমরা এই দুইটী তত্ত্বানুসারে জীবন পথে চলিতে থাকি, তবে ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি। নীরোগ থাকিতে হইলে প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করা চলিবে না, এ কথা অনেকেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু পীড়া হইবার পর **ঐ প্রকৃতির নিয়মেই আরোগ্য** হইতে হইবে, এ কথাটী অনেকেই হয় ত বুঝিবেন না, এজন্য ইহা চিন্তা করা আবশ্যক। প্রকৃতির নিয়মে আরোগ্য কিরূপে হয়—প্রকৃতির আরোগ্য তত্ত্বটী কি, জানিতে হইবে। অর্ব্বাচীন হোমিওপ্যাথির কথা যদিও ত্যাগ করা যায়, তবুও আমাদের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেরও উপদেশ, যাহা আজি বিংশতি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সামগানের সহিত উচ্চকণ্ঠে নিনাদিত ও ঘোষিত হইয়াছে—"সমঃ সমং শময়তি।" এই আরোগ্য সূত্রটী আপনার বা আমার মত অপবিত্র বা অজ্ঞানী ব্যক্তির আবিষ্কার নয়, ইহা অতিমাত্র পবিত্র প্রাণ ত্রিকালজ্ঞ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদিগের দ্বারা প্রকৃতির দ্বার উদ্ঘাটন করিবার পর আবিষ্কৃত হইয়াছে, অতএব একেবারে নির্ম্মল ও ভ্রম প্রমাদাদি দোষলেশশূন্য। এই "সমঃ সমং শময়তি" মন্ত্রই প্রকৃতির আরোগ্যনীতি ; এই নীতিকেই ঋষিপ্রতিম হ্যানিম্যান তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি সাহায্যে পরিমার্জ্জনা, রূপদান এবং যথেষ্ট পরীক্ষাদির দ্বারা প্রমাণ করিয়া অভ্রান্ত সত্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং তাঁহার এই মতানুযায়ী চিকিৎসা শাস্ত্রই অর্ব্বাচীন হোমিওপ্যাথি ব্যতীত আর কিছুই নয়।

ফলতঃ প্রাচীনই হউক, অথবা অর্ব্বাচীনই হউক, সত্য চিরদিনই সত্য, সত্য চিরদিনই পুরাণ ও মান্য।

এক্ষণে আপনারা চিন্তা ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখুন যে, আপনারা ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইলে এই আরোগ্য নীতির সাহায্যে আরোগ্য অন্বেষণ করিয়া থাকেন কি? ঐ আরোগ্যনীতি যখন প্রকৃতির নির্দ্দিষ্ট আরোগ্য পথ, তখন যদি আপনারা ঐ পথ অবলম্বন না করিয়া অন্য পথে তথাকথিত আরোগ্য বা আরোগ্যের একটা ভাণ মাত্র পাইয়া সন্তুষ্ট হন, তবে একথা সত্য যে, **আপনারা প্রকৃতির বিরোধী পথে উহার অন্বেষণ করেন, সুতরাং প্রকৃত আরোগ্য কদাচই প্রাপ্ত হন না।** কেবল তাহাই নয়, প্রকৃতির বিরোধী পথে চলিবার ফলে আরও নানা জটিলতার আবির্ভাব হয়, এক কথায় নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধন নিজেরাই করিয়া থাকেন।

এই আরোগ্যতত্ত্বটী একটী অভ্রান্ত সত্য, আপনারা আরোগ্যকামী হইলে আপনাদিগকে এই পথে চলিতেই হইবে, কোনও গত্যন্তর নাই। আপনারা একথা, এই অভ্রান্ত সত্যটীকে নিজ নিজ ঘরের দেওয়ালে, চৌকাঠের উপর, রাস্তার মোড়ে মোড়ে, এমন কি, প্রত্যেক হাটে বাজারে পর্য্যন্ত লিখিয়া রাখিতে যত্নবান হইবেন,—নিজ নিজ হৃদয়পটে চিরাঙ্কিত করিয়া রাখিবেন।

অতঃপর, আমরা সাধারণতঃ কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া আরোগ্য অন্বেষণ করিয়া থাকি এবং কোন্ পথ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহাই সামান্যতঃ আলোচনা করিতে হইবে। এক ব্যক্তির উদরাময় হইল, নিত্য ৪।৫ বার করিয়া তরল মলভেদ হইতেছে, প্রাতঃকালে ভোর হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা ৮।৯টা পর্য্যন্ত মলভেদ হয়, তাহার পর স্নানাহার করিলে, বন্ধ হইয়া যায়। মলের পরিমাণ প্রতিবার খুবই প্রচুর, মলে অতিশয়

দুর্গন্ধ, বর্ণ সাদাটে ময়লা। রোগীর ক্ষুধা নাই, মধ্যে মধ্যে "গা বমি বমি" হয়; রোগীর চক্ষুতে, মুখে, হাতে এবং পায়ে জ্বালা বোধ আছে, এজন্য ঠাণ্ডাতে থাকাই তাহার একান্ত অভিলাষ। ঐ ব্যক্তি কোনও হোমিওপ্যাথ ব্যতীত অন্য পথের চিকিৎসকের নিকট উপনীত হইলে, চিকিৎসক **মলভেদটী বন্ধ করিবার জন্য** ঔষধ দিবেন, অর্থাৎ তাঁহার ঔষধের ক্রিয়া **মলনিঃসরণটী** রোধ করা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এক্ষণে, যদি কোনও হোমিওপ্যাথের নিকটে রোগী চিকিৎসাপ্রার্থী হয়, অর্থাৎ যে চিকিৎসক, প্রকৃতির পথে "সমঃ সমং শময়তি" নীতির অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকেন, এরূপ চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসার্থ উপস্থিত হয়, তবে এই চিকিৎসক ঔষধ দিবেন, যাহার ক্রিয়ায় **মল নিঃসরণ হইবেই**, [অর্থাৎ উহা সমলক্ষণের ক্রিয়া করিবে; কেবল উহা তাহাই নয়, এরূপ ঔষধ তিনি দিবেন, যাহার ক্রিয়ায়,—ঐ সময়ে, ঐ প্রকার গন্ধ বর্ণাদিযুক্ত মল নিঃসরণ হইয়া থাকে এবং রোগীর উপরোক্ত প্রকারের জ্বালাদি অস্বাভাবিক অনুভূতিগুলিও হইয়া থাকে। অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে সমলক্ষণ, মিল করিয়া, ৫০০।৭০০ ঔষধের মধ্যে পডোফাইলাম নামক ঔষধটী প্রয়োগ করিবেন। প্রকৃতি মলনিঃসরণ করাইতেছেন, ঔষধের ক্রিয়াও তাহাই, অর্থাৎ সকল প্রকারে সমলক্ষণ-যুক্ত ঔষধের দ্বারা মলনিঃসরণ করান,—এবং ইহার ফল দ্রুত আরোগ্য। প্রকৃতির বিরোধী পথে, মলরোধক ঔষধের সাহায্য গ্রহণে অল্প সময়ের জন্য অবশ্য মলটী রোধ হইবে, পরন্তু তাহার পর দুষ্ট লক্ষণযুক্ত উদরাময় দেখা দিবে অথবা মলরোধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর শোথাদি দুষ্ট লক্ষণসকল দেখা দিয়া ক্ষেত্রটীকে জটিল করিবে,—ইহা আপনারা নিত্যই দেখিতেছেন।

আবার মনে করুন, আপনার জ্বর হইয়াছে, নিত্য বেলা ৯।১০টায় শীত

হইয়া পিপাসা ও শিরঃপীড়া সহযোগে জ্বর আসিতে থাকে, ক্রমে পিপাসা ও শিরঃপীড়া বাড়িয়া উঠে, শেষে প্রচুর ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর ত্যাগ হয়। প্রকৃতির বিরোধী পথের চিকিৎসক আসিয়া কুইনাইন প্রয়োগ করিয়া জ্বরটীকে জোর করিয়া চাপা দিলেন। তাহার ফলে, হয়ত জ্বরটী ২।৪।৫ দিন বন্ধ থাকিবে, কিন্তু তাহার পর প্রতিক্রিয়া জন্য দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বেগে পুনরায় আসিবে, নতুবা উহা রুদ্ধ হইয়া শরীরস্থ যন্ত্রাদির বিবর্দ্ধন, শরীরের অস্বাচ্ছন্দ্য, কৃশতা ইত্যাদি লক্ষণ আনিয়া অবস্থাটী জটিল করিবে। যে চিকিৎসক প্রকৃতির নীতি অবলম্বন করিয়া এই রোগীর চিকিৎসা করিবেন, তিনি এরূপ ঔষধ নির্ব্বাচন করেন, যাহা সুস্থ দেহে কেহ সেবন করিলে ঠিক ঐ সকল লক্ষণযুক্ত জ্বরের আবির্ভাব হয় এবং এই প্রকার ঔষধের প্রয়োগে রোগী নির্ম্মল আরোগ্য হইয়া উঠে।

প্রকৃতির বিরোধী পথ অবলম্বন করিলে, অর্থাৎ জোর করিয়া চাপা দিলে কি ঘোরতর অনিষ্ট হয়, তাহার সামান্য আভাস অনেক সময় মল ও মুত্রের বেগ ধারণের পর পাওয়া যায়। অতিশয় কার্য্যের ব্যস্ততার জন্য যদি যথাসময়ে অর্থাৎ মলবেগ হইবামাত্রই মলত্যাগ করা না হয়, অর্থাৎ জোর করিয়া মলবেগটী রোধ করা হয়, তবে তাহার পর কি প্রকার অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব হয়, তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পীড়ার সময় যাবতীয় কষ্ট ও লক্ষণকে জোর করিয়া চাপা দিলে যে ভয়ানক অনিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা সামান্য মলবেগ চাপনে যে অস্বাচ্ছন্দ্য উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইতেই বুঝিবার বেশ সুবিধা হয়।

আমরা এতই জড়বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়াছি যে, নিত্য ব্যাপার সকল দেখিয়াও দেখি না, বুঝিয়াও বুঝি না। হাম, মিলমিলে বা বসন্তাদি উদ্ভেদ পীড়ায় আমরা নিত্যই দেখিতে পাই যে উদ্ভেদগুলি বাহির হইলেই রোগীর অবস্থা সর্ব্বাংশেই উন্নতির দিকে যায় এবং বিপরীত পক্ষে,

জোলাপাদি ব্যবহারের ফলে বা অন্য কোনও কারণে উদ্ভেদগুলি বাহির হইতে না পারিলে অথবা বাহির হইবার পর "ডুবি খাইলে" বা "লাট খাইয়া গেলে", রোগীর কি ভয়ানক অবস্থা হয়, এমন কি, ঐগুলিকে পুনরায় বাহির করিতে না পারিলে অনেক ক্ষেত্রে জীবন সংশয় হইয়া উঠে। ইহা আমরা প্রায় নিত্য দেখিয়াও এলোপ্যাথির মোহে, এমনই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি যে, শরীরের কোনও চর্ম্মপীড়া হইলে তৎক্ষণাৎ কোনও প্রকার বাহ্য মলম লাগাইয়া ঐ পীড়াটাকে অন্তর্প্রবিষ্ট করিয়া ফেলিতে আদৌ দ্বিধাবোধ করি না। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই ইহার কুফল পাই না, কেননা **তরুণের ন্যায় পুরাতন পীড়ার গতি দ্রুত নয়,** এজন্য কুফলটী আসিতে সামান্য দিন বিলম্ব হয়, এই পর্য্যন্ত। অথচ প্রাকৃতিক নীতি অবলম্বন করা যে বিশেষ কর্ত্তব্য, তাহা আমরা আদৌ বুঝিতেই চাই না। কত শত রোগীর অতি ভয়াবহ অবস্থাযুক্ত পীড়ায় সমলক্ষণ তত্ত্বে ঔষধ দেওয়ার পর **লুপ্ত চর্ম্মপীড়া পুনঃ প্রকাশিত হয়** ও উক্ত নীতির সত্যতা ঘোষণা করে, ইহা নিত্যই দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহা যাহা আলোচিত হইল, তাহা হইতে বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে যে **প্রকৃতির বিপরীতপথে অর্থাৎ চাপা দেওয়া চিকিৎসাতেই আমাদের নূতন নূতন পীড়াগমের এবং নানা জটিলভাবির্ভাবের প্রধান কারণ।** আজকাল জ্বর হইলে লোকে দুই একদিন উপবাস দিতেও নারাজ এবং প্রকৃতির পথে সমলক্ষণ-তত্ত্বানুসারে চিকিৎসা অবলম্বন ত দূরের কথা, জ্বরের ২য় বা ৩য় দিনেই জোর করিয়া মল বাহির করাইয়া, কুইনাইনের দ্বারা চাপা দিবার জন্য ব্যাকুল এবং তাহাই যেন কত কৃতিত্বের পরিচয় ও এলোপ্যাথির পক্ষে কতই গৌরব ও প্রশংসার বিষয় বলিয়া পরিচয় দিতেও ত্রুটী করেন না। আবার বলা হয়—"মহাশয়, আপনাদের হাগাইবার ঔষধ আছে কি? এলোপ্যাথির মত টপ্ করিয়া

বন্ধ করিবার মত আপনাদের ত কিছু নাই ইত্যাদি"। লোকে মনে করে, নিজের রোগটী চাপা দিয়া কি পুরুষত্বই প্রকাশ হইল! নিজের সর্ব্বনাশ করিয়া এই প্রকার বাহাদুরী নিতান্ত নির্ব্বোধ ব্যতীত আর কে করিতে পারে? নিজের সর্ব্বনাশ অহরহঃ করিতেছেন, আবার ঐ প্রকার বুদ্ধিতে অন্যকে পরামর্শ দিবার আকুল প্রয়াস। নির্ব্বোধের বিশিষ্টতা এই যে, তাহার ধারণা যে, সে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বোঝে। পাগলের প্রধান লক্ষণ এই যে, সে নিজেকেই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করে এবং তাহার ধারণা যে, সে নিজে ছাড়া জগতের অন্য সকলেই পাগল। এই প্রকার ভ্রান্তমতি এবং অন্যকেও ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিবার আকুল প্রয়াস না থাকিলে, কি দেশের এরূপ দুঃখ ও দুর্দ্দিন হয়? দেশের দুরদৃষ্ট ব্যতীত আর কি বলা যাইবে?

নিজেকে নীরোগ ও সুস্থ রাখিবার একমাত্র উপায় প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট নীতিগুলির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সংযত জীবন অবলম্বন করা এবং পীড়িত হইলে প্রকৃতির পথেই আরোগ্য অন্বেষণ করা,—এই দুইটী বিষয় মনে রাখিলেই আমরা নানা নামের পীড়া ও নানা জটিলতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব। বিগত দশ বৎসর পূর্ব্বে কে কবে "Blood Pressure" শুনিয়াছিলেন? বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে কয়টী রোগীর "Heart fail" করিয়া মারা যাইবার কথা শুনিতেন? ঘরে ঘরে, ক্ষয় ও রাজযক্ষার রোগী আপনারা বাল্যকালে বা আপনাদের পিতা বা পিতামহ কখনও দেখিয়াছিলেন বা শুনিয়াছিলেন কি? আজি ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে কয়টী লোক "cancer" পীড়ায় মারা পড়িত? "ফাইলেরিয়া" বলিয়া কোনও পীড়া, আপনারা ৮।১০ বৎসর পূর্ব্বে জানিতেন কি? স্ত্রীলোকদের জরায়ু নির্গমনের কথা আপনাদের বাল্য বয়সে কয়টী রোগিণীর শুনিয়াছিলেন? আপনাদের ভগিনীর বা স্ত্রীর জন্য আজকাল

যেমন পাশকরা ধাত্রী ব্যতীত প্রসব কার্য্য হয় না, পূর্ব্বে বা এখনও পল্লীগ্রামে কয়টি স্ত্রীলোকের প্রসব ধাত্রী সাহায্যে হইত? কয়টী কুক্কুরী বা কয়টী গাভীর প্রসবের সময় ধাত্রীর সাহায্য লইতে হয়? এবং কয়টীরই বা পেরিনিয়াল রাপচার অথবা প্রলেপসস্ হইতে দেখিয়া থাকেন? স্বাভাবিকতা বিদায় দিয়া আমরা কৃত্রিমতার যথেষ্ট প্রশ্রয় দিতেছি এবং তাই নাকি সভ্যতা বলিয়া পরিচয় দিয়া গৌরব অনুভব করি! বড়লোকের বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা যদি আপনিই প্রসব হয়, তবে অর্থের ব্যবহার হইল কই? আত্মীয় কুটুম্বদের নিকট অর্থ গৌরব দেখাইবার সুযোগ ঘটিবে কি প্রকারে? বড়লোক হাগা পাইলে আপনি হাগিবে! বড়লোকদের ডুস না হইলে কি চলে? রোগীর পথ্য খাওয়ান আজকাল মুখ দিয়া না হইয়া গুহ্যপথে পৌছিয়াছে! আরও কত কি হইবে! Birth control আসিয়াছে! **প্রকৃতির সকল পথই রোধ হইবার অবস্থা হইয়াছে ও হইতেছে,**—ইহার ফলাফল অতি ভীষণ, এমন কি, চিন্তা করিতেও শঙ্কা ও ভয় হয়!

প্রকৃতিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের অন্তরালে ভগবানের ক্রিয়াকারিণী শক্তি। প্রকৃতিকে অস্বীকার অর্থে ভগবান্‌কেই অস্বীকার! নিরীশ্বর শিক্ষার ইহাই শোচনীয় পরিণাম!

উন্মাদপীড়ার চিকিৎসা।

উন্মাদপীড়া একটী মনোপীড়া মাত্র। মনোরাজ্যের বিশৃঙ্খলা যখন এ প্রকার একটা অবস্থায় আসে, তখন রোগী কি বলে, কি করে, তাহার কোনও স্থিরতা নাই, অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির গোলযোগ ঘটে এবং অনেকটা আত্মবিস্মৃত হয়, অন্যের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ, তাহা ঠিক করিতে পারে না ইত্যাদি ইত্যাদি লক্ষণ ও অবস্থা দেখা দেয়, তখনই লোকে বলে, রোগিটী উন্মাদপীড়ায় পীড়িত হইয়াছে। ফলতঃ মনোবিশৃঙ্খলা নাই, এইরূপ লোক জগতে অতিমাত্র বিরল। যাহা হউক, এই প্রবন্ধে সে গভীরতত্ত্বের আলোচনা অভিপ্রেত নয়। এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় এই যে, উন্মাদ পীড়ার চিকিৎসাটী সাধারণতঃ যে ভাবে অবলম্বিত হইয়া থাকে এবং উহা যে ভাবে হওয়া উচিত, যাহাতে রোগীটী নির্ম্মলভাবে আরোগ্যলাভ করিতে পারে, সেই বিষয়েই আলোচনা করিতে হইবে।

সর্ব্ব প্রথম একটী কথা লিখিত হওয়া সঙ্গত যে, উচ্চাঙ্গের প্রকৃত আয়ুর্ব্বেদ এবং হ্যানিম্যানের প্রকৃত হোমিওপ্যাথি ব্যতীত উন্মাদপীড়ার কোনও প্রতীকার হয় না। কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন যে, আমরা হোমিওপ্যাথ বলিয়া এলোপ্যাথি-বিদ্বেষী, এজন্যই একথা কহিতেছি। আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, আমার কোনও প্রকার বিদ্বেষ নাই, একমাত্র সত্যের খাতিরে একথা লিখিতে বাধ্য হইতেছি, বলিয়াই লিখিতেছি। যদি সে ভাবে কেহ আমাকে ও আমার আলোচনাকে বিদ্বেষদোষদুষ্ট বলিয়া মনে করেন, তবে তিনিই অন্যায় করিবেন এবং সত্যের প্রতি প্রকৃত সমাদর প্রদর্শনে তিনিই বিচলিত হইবেন। অস্ত

কোনও প্যাথিতে উন্মাদপীড়া সারে না, একথা বলিবার প্রধান বা একমাত্র কারণ এই যে, আয়ুর্ব্বেদ ও হোমিওপ্যাথি ব্যতীত অন্য প্যাথির ঔষধ স্থূলভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সূক্ষ্মস্তরে আদৌ উন্নীত হয় না, সুতরাং ঐ সকল ঔষধের দ্বারা **মনস্তরটী** প্রভাবান্বিত হয় না, হইতে পারে না। আমাদের মনস্তরটী অতিমাত্র সূক্ষ্ম স্তর, এবং সূক্ষ্ম ঔষধ, যাহাকে ইংরাজীতে dynamic বলে, সেই প্রকার সূক্ষ্ম—অতি সূক্ষ্ম ঔষধ, এমন কি শক্তিমাত্র ব্যতীত মনোরাজ্যের বিশৃঙ্খলা দূরীকরণের সামর্থ্য স্থূল ঔষধের সম্ভব নয়। যাহা হউক এ বিষয়েরও পূর্ণ আলোচনা এখানে অভিপ্রেত নয়। সময়ান্তরে ইহার বিষয় যথাজ্ঞান আলোচনা করিব।

আমি নিজের চিকিৎসা কার্য্য ব্যপদেশে অনেক উন্মাদ রোগীর চিকিৎসাক্ষেত্রে তাহাদের ইতিহাস প্রাপ্ত হইয়াছি যে, অনেকদিন পূর্ব্বে রোগীর যখন পূর্ণমাত্রায় মানসিক বৈকল্য উপস্থিত হইয়াছিল, তখন চিকিৎসক ঔষধ সাহায্যে সে অবস্থা প্রশমিত করিয়াছিলেন এবং রোগীর উন্মাদলক্ষণ অপসারিত হইয়া গিয়া ঠিক সহজ মানুষের মত আহার বিহারাদি করিতেছিল এবং তাহার পর কিছুদিন বেশ ভাল থাকিবার পর পুনরায় আক্রান্ত হইয়াছে। অথবা ইহাই দেখিয়াছি যে, এইরূপ বার বার উন্মাদ-লক্ষণসকল আসে এবং সেই সময়ের জন্য চিকিৎসার দ্বারা আবার ভাল হয়। ফলতঃ উন্মাদ-লক্ষণগুলি চিরদিনের মত আরোগ্য হইতেছে না। উন্মাদ-রোগীর চিকিৎসায় যেখানে যেখানে সর্ব্বপ্রথমেই আহূত না হইয়াছি, সেখানে সেখানেই এই প্রকার ইতিহাস প্রাপ্ত হইয়া থাকি বলিয়াই মনে হয় যে, আমার চিকিৎসক ভ্রাতাদিগের বোধ হয় এই পীড়ার চিকিৎসা বিষয়ে অনেকেরই পূর্ণজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ হয় নাই। এক্ষণে সেজন্যই ইহার চিকিৎসা সম্পর্কে কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় আলোচনা করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছি।

এ বিষয়ে আমার বক্তব্যটা কেবল এক কথায় লিখিতে হইলে বলিতে হয় যে, মনস্তরের কোন পীড়ার পশ্চাতে বাহ্য দৈহিক পীড়া সকল চাপা থাকা, লোপ পাওয়া ইত্যাদি থাকেই থাকে, সুতরাং মনোলক্ষণগুলির তিরোভাব ঘটিলেও চিকিৎসার বিরাম হওয়া কখনও সঙ্গত নয়, কেননা যে চাপা পড়া পীড়ালক্ষণের জন্য মনোপীড়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার পুনঃপ্রকাশ এবং আরোগ্য ব্যতীত রোগীকে "আরোগ্যপ্রাপ্ত" বলিয়া মনে করা গৃহস্থ ও চিকিৎসক উভয়ের পক্ষেই ভ্রমাত্মক। যখনই কোন উন্মাদরোগী সর্ব্বপ্রথমে হাতে আসিবে, তখনই তাহার যাবতীয় পূর্ব্ব পীড়াগুলি এবং তাহাদের চিকিৎসার ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গ্রহণ ও রোগীলিপিখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে লিখিত হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। যাঁহারা উন্মাদ বলিলেই বেলেডোনা, হাইওসিয়েমাস বা ষ্ট্র্যামোনিয়াম অথবা এই প্রকার কোনও লঘুজাতীয় ঔষধকেই চরম আরোগ্যদায়ক বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের পক্ষে এ বিষয়ের অবতারণা নিরর্থক। যাঁহারা লিপি প্রস্তুত না করিয়াই কেবল মৌখিক বর্ণনা শুনিয়াই ঔষধ নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী, এ প্রবন্ধ তাঁহাদের জন্যও নয়। যাঁহারা মনে প্রাণে রোগীকে প্রকৃত আরোগ্য করিবার ইচ্ছা করেন এবং কি উপায়ে তাহা করিতে পারা যায়, তাহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের কার্য্য-সৌকার্য্যার্থে এ সকল বিষয়ের অবতারণা।

সর্ব্বপ্রথমেই জানিতে হইবে যে, উন্মাদরোগীর লিপি প্রস্তুতকরণ একেবারেই সমাধা করিবার আশা করা চলে না। সর্ব্বপ্রথমে, তাহার মনোলক্ষণগুলি এবং তাহাদেরই হ্রাস বৃদ্ধি ইত্যাদি লিখিয়া লইতে হয় এবং তাহাদেরই সমষ্টিগত সাদৃশ্যানুসারে কোনও লঘুজাতীয় ঔষধই নির্ব্বাচনযোগ্য হইতেছে, ইহাই দেখা যায়। তাহার পর মনোবিশৃঙ্খলাজ্ঞাপক লক্ষণনিচয় অপসারিত হইয়া যাইবার পর, রোগী যখন সাধারণ মনুষ্য স্তরে উপনীত

হইল, দেখিতে পাওয়া যায়, তখন পুনরায় লিপি প্রস্তুত করিবার অবশ্যকতা আসে এবং তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে রোগীলিপি প্রস্তুত করা সম্ভব হয়, তৎপূর্ব্বে হয় না, কেননা তৎপূর্ব্বে রোগী নিজে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি ও অনুভূতির বিশৃঙ্খলা জন্ত, তাহার ইচ্ছা, অনিচ্ছা প্রভৃতি ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা প্রকাশ করিতে কখনও সমর্থ হয় না, সুতরাং এ সময়েই তাহার ব্যক্তিগত ও ধাতুগত বিশিষ্টতাজ্ঞাপক লক্ষণগুলি প্রাপ্ত হইবার সুবিধা থাকে, তৎপূর্ব্বে থাকে না। সুতরাং এ অবস্থায় তাহার লিপিখানি দ্বিতীয়বার বিশেষ মনোযোগের সহিত প্রস্তুত করা যে একান্ত কর্ত্তব্য সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই দ্বিতীয়বার লিপি প্রস্তুত করিয়া রোগীর ব্যক্তিগত বিশিষ্টতার সমষ্টি হিসাবে ঔষধ নির্ব্বাচন সাহায্যে, নির্ম্মল আরোগ্য আনয়ন করিতে না পারিলে রোগী আরোগ্য হইল, একথা মনে করা সঙ্গত নয়। যদি তাহা না করা হয়, তবে রোগী অল্প কিছুদিন মাত্র ভাল থাকিবে এবং পুনরায় তাহার উন্মাদ লক্ষণগুলি ফিরিয়া আসিবে, তাহার কোনও সন্দেহ নাই।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, "কেন তাহা হয়? ইহার কারণ এই যে, উন্মাদপীড়া পূর্ণ বিকাশের অবস্থায় যে সকল ঔষধ স্থচিত ও নির্ব্বাচিত হয়, সেগুতি অতি লঘুজাতির, সেগুলির গভীরতা আদৌ থাকে না। সুতরাং তাহারা এরূপ গভীরভাবে ক্রিয়া করিতে পারে না, যাহার ফলে রোগীর বাহ্যদেহের লুপ্ত পীড়া-লক্ষণকে বাহির করিয়া আরোগ্য করিবে। যদি ঐ সময় কোনও গভীর ঔষধ স্থচিত হইত, তবে অবশ্যই তাহা হইতে পারিত, কিন্তু প্রায়ই অতি লঘুজাতির ঔষধই তখন প্রয়োজনে আসে বলিয়াই দ্বিতীয়বার লিপি প্রস্তুত এবং যথারীতি ব্যক্তিগত সমষ্টি অনুসারে নির্ব্বাচনের আবশ্যকতা আসিয়া পড়ে।

এরূপ অনেক ক্ষেত্রও দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে উন্মাদপীড়ার পূর্ণ

বিকাশের সময় কোনও ঔষধ না দেওয়া সত্ত্বেও কিছুদিন পরে উন্মাদ-লক্ষণগুলি আপনিই অপসারিত হইয়া যায় এবং তখন লঘুচেতা ব্যক্তিগণ মনে করে—"রোগী উন্মাদ হইয়াছিল"—এক্ষণে সারিয়া গিয়াছে, ফলতঃ এ ধারণা কখনও সঙ্গত নয়। উন্মাদপীড়ার ন্যায় এত গভীর জাতি পীড়া আপনিই সারিবে, ইহা মনে করাও বাতুলতা। অনেক সময় আবার জটাবটা, মাদুলী বা অমুকের "Insanity specific" ইত্যাদি ব্যবহারের পর এই ভাল থাকার অবস্থাটী আসিলে অতি অবশ্যই লোকে ধারণা করিয়া থাকে যে, রোগিটী ভাল হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ প্রত্যেক হোমিওপ্যাথি ভ্রাতৃগণকে আমি সসম্ভ্রমে সাবধান করিতেছি, তাহা কখনও যেন তাঁহারা মনে না করেন।

উন্মাদ **টিউবারকুলার দোষজ** অভিব্যক্তি, সে বিষয়ের সন্দেহ নাই। ঐ দোষের অভিব্যক্তি বা ক্রিয়াস্থান যদি মস্তিষ্কে নির্দ্দিষ্ট হয়, তবে তাহাকে উন্মাদ বলে, যদি ফুসফুসে হয়, তবে তাহাকে রাজযক্ষ্মা বলে, আবার যদি অন্ত্রে অভিব্যক্তি দেখা দেয়, তবে তাহার নাম গ্রহণী বা Abdominal T. B. বলা হয়, আবার যদি অস্থিতে দেখা দেয় তবে তাহাকে অস্থিক্ষয় বা Bone T. B. ইত্যাদি নানা নাম দেওয়া হইয়া থাকে ; ফলতঃ নাম যাহাই হউক, প্রত্যেক প্রকার অভিব্যক্তির প্রকৃতিটী একই প্রকার অর্থাৎ "ক্ষয়" লক্ষণসম্পন্ন, তাহার সন্দেহ নাই। সুতরাং এ প্রকার একটী পীড়া-লক্ষণকে অতি সহজ-সাধ্য মনে করা অন্যায় ও অসঙ্গত।

উন্মাদ পীড়াটী প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য হইলে, অতি অবশ্যই দেখা যাইবে যে, কোনও একটী বাহ্য দৈহিক পীড়া চাপা পড়িবার ফলে, মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইয়াছিল এবং সেই পীড়ালক্ষণটী পুনর্ব্বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া পড়ে। মৎপ্রণীত হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকায় ল্যাক-কেনিনাম নামক ঔষধের বর্ণনায় শ্রীমতী মেনকা দাসীর

উন্মাদ পীড়ার ইতিবৃত্ত এবং চিকিৎসার ফলে একদিকে মস্তিষ্কের গোলযোগ নিবৃত্তিপ্রাপ্ত, অন্যদিকে রোগিণীর বাহ্যদেহের "চাপা দেওয়া" লক্ষণের পুনর্ব্বিকাশপ্রাপ্তি পাঠ করিলেই, উপরোক্ত তত্ত্বটার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। এই রোগিণীর ডিম্বাধারের যাতনা "চাপা পড়িবার" ফলে, ধীরে ধীরে তাঁহার মস্তিষ্কটা আক্রান্ত হয় এবং তিনি পূর্ণ উন্মাদিনী হইয়া উঠেন এবং তাঁহার চিকিৎসা অর্থাৎ প্রকৃত চিকিৎসা বা সমলক্ষণসূত্রে চিকিৎসা হইলে, মস্তিষ্কলক্ষণ চলিয়া যায় এবং ডিম্বাধারের পীড়া ফিরিয়া আসে।

তবে কি দৈহিক লক্ষণ মাত্রই "চাপা পড়িলে" মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইয়া উন্মাদ পীড়ার সৃষ্টি করে? না, তাহা নয়। যেখানে যেখানে উন্মাদ-পীড়ার আবির্ভাব, সেখানে সেখানেই জানিতে হয় যে, নিশ্চয়ই কোনও বাহ্য দৈহিক পীড়া চাপা পড়িয়াছে,—কিন্তু তাই বলিয়া তাহার বিপরীত প্রতিজ্ঞাও যে সত্যই হইবে এরূপ কথা বলা যায় না; অর্থাৎ বাহ্য দৈহিক পীড়া যেখানে যেখানে চাপা পড়িবে, সেইখানে সেইখানেই উন্মাদের আবির্ভাব হইবে, এরূপ কথা বলা যায় না। যেমন বৃষ্টি হইলে নিশ্চয়ই মেঘ সঞ্চার হইয়াছে, বলিতেই হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া, উহার বিপরীত প্রতিজ্ঞা, যথা মেঘ সঞ্চার হইলেই বৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী, সত্য হইবেই, তাহা বলা যায় না। যাহা হউক, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, কোনও ক্ষেত্রে বাহ্য দৈহিক পীড়ালক্ষণ চাপা পড়িলে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়, আবার কোনও ক্ষেত্রে হয় না,—ইহার কারণ কি? ইহার এক মাত্র কারণ এই যে, **যেখানে দেহটী টিউবারকুলার দোষে দুষ্ট, সেইখানেই এই প্রকার হইয়া থাকে, অন্য ক্ষেত্রে যথা সোরা বা সাইকোসিস্ অথবা সিফিলিস্ দোষদুষ্ট দেহে তাহা হয় না।** সোরাদুষ্ট দেহে বাহ্য পীড়ালক্ষণ চাপা পড়িলে, ঐ দোষের উগ্রতা বৃদ্ধি করে, সাইকোসিস্ দুষ্ট দেহ হইলে, সেখানে বাতরোগ, স্নায়ুশূলাদি যাতনা প্রকাশ পায় এবং সিফিলিসদুষ্ট দেহ হইলে,

সেখানে গ্ল্যাণ্ডে বিবৃদ্ধি, দারুণ শিরঃপীড়া ইত্যাদির উদ্ভব হইতে পারে। সাইকোসিসদুষ্ট দেহে ঐ প্রকার "চাপা পড়া" হইতে অনেক ক্ষেত্রে রোগীকে বধীর ও ক্ষীণদৃষ্টি হইতেও দেখা গিয়াছে; ফলতঃ দেহটী টিউবারকুলার হইলে ক্ষয়পীড়া, উন্মাদপীড়া প্রভৃতির উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে। রোগীদেহে সুপ্ত দোষের অবস্থা ও প্রভাব অনুসারেই ফলাফল দেখা দিয়া থাকে, ইহা সুনিশ্চিত।

যেখানে উন্মাদলক্ষণগুলি অপসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যদেহের "চাপা পড়া" লক্ষণগুলির পুনর্ব্বিকাশ ঘটে, সেখানে রোগীকে তাহার উক্ত পুনর্ব্বিকাশ প্রাপ্ত পীড়ার জন্য কোনও ঔষধ প্রয়োগের প্রায় আদৌ আবশ্যক হয় না। তবে যেখানে নিতান্তই তাহা পূর্ব্বপ্রযুক্ত ঔষধের ক্রিয়ায় অর্থাৎ যে ঔষধের ক্রিয়াবশে, পুনর্ব্বিকাশ ঘটিয়াছে, সেই ঔষধের ক্রিয়াতেই নির্ম্মূলভাবে অপসারিত না হয়, তবে ঔষধ দিবার আবশ্যকতা আসিতে পারে, নতুবা নয়। কিন্তু একটি বিষয় এখানে মনে রাখিতে হইবে,—যদি লুপ্ত লক্ষণের পুনর্ব্বিকাশ ঘটে, তবেই ঐ নিয়ম এবং রীতিমত লক্ষণ-সমষ্টি প্রাপ্ত হইলে এবং পূর্ব্বপ্রদত্ত ঔষধের ক্রিয়াতেই আরোগ্য না হইলে ঔষধ দিতে হইবে। ফলতঃ আরও একটি বিষয় আছে, তাহার উপর মনোযোগ না করিলে, অনেক সময় রোগীর ভয়ানক ক্ষতি করা হইয়া থাকে। এ বিষয় যদিও নানাস্থানে নানা ভাবে লিখিয়াছি, তবুও প্রসঙ্গক্রমে এখানেও লেখা সঙ্গত বলিয়া লিখিলাম।

যেখানে উন্মাদ বা অন্য কোনও সুগভীর পীড়ায় পীড়িত ব্যক্তির চিকিৎসা চলিবার পর, রোগীর পীড়া আরোগ্য হইল এবং সেই গভীর পীড়াটী যে আভ্যন্তর স্তরে দেখা দিয়াছিল, তাহারই **সমসূত্রের** (corresponding) **বাহ্য যন্ত্রাদিতে** কোনও পীড়া লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ঔষধ প্রয়োগ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইহার কারণ এই যে, আভ্যন্তর

প্রদেশে ঔষধের ক্রিয়া ফলে, উক্ত সমসূত্রযুক্ত বাহ্যযন্ত্রের ক্রিয়াটী অর্থাৎ উহাতে রোগলক্ষণের আবির্ভাবটী "পীড়া" নয়, উহা আরোগ্য পথেরই চমৎকার নিদর্শন; ফলতঃ উহা আপনিই সারে এবং রোগীও নির্ম্মল আরোগ্য হয়, বিপরীত পক্ষে, উহার প্রতিকারকল্পে ঔষধ প্রয়োগের ফলে, রোগটী যেখানে ছিল, সেইখানেই পুনরুপনীত হয়, অর্থাৎ পূর্ব্ব পীড়া ফিরিয়া আসে। এ বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা, মৎলিখিত "হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকায়" ইগ্নেসিয়ার মধ্যে ১০৫ ও ১০৬ পৃষ্ঠা দেখিলেই তত্ত্বটী পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে। লক্ষণ সকলের পুনর্ব্বিকাশ হইলে, বিশেষ চিন্তা ও ধীর গবেষণার পর তবেই ঔষধ প্রয়োগ সঙ্গত বা অসঙ্গত, তাহা স্থির করিতে হয়। পুরাতন পীড়ার চিকিৎসা হঠকারীর বা ব্যস্তবাগীশের দ্বারা হয় না, অন্য পক্ষে, যে রোগীর ধৈর্য্য না থাকে, তাহাকে আরোগ্য করাও ঘটে না।

"চাপা দেওয়া" চিকিৎসা ও তাহার ফল।

"চিকিৎসা"র প্রকৃত অর্থ অনেকেই জানেন না এবং কোনও প্রকারে বিকাশপ্রাপ্ত লক্ষণগুলির কিছুদিনের জন্য তিরোভাব ঘটাইতে পারিলেই তাহাকে "চিকিৎসা" বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। যে সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণ এই প্রকার চিকিৎসাকেই প্রকৃত চিকিৎসা বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন এবং সাধারণ জনগণের মনেও সেই বিশ্বাস আনয়ন করিবার জন্য যত্নবান, তাঁহারা সম্প্রতি অনেকদিন হইতে, যে উপায়ে উক্ত তিরোভাবটী কিছুদিনের জন্য না হইয়া, প্রকাশিত লক্ষণগুলিকে চিরতরে লোপ করিতে পারা যায়, তদুদ্দেশ্যে নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া, নানা জাতির এরূপ কতকগুলি ইঞ্জেক্‌সন, বিশেষতঃ রেডিয়াম্ ইত্যাদির অভিনব আবিষ্কার দ্বারা লোকের মনে একটী চমক উৎপাদন করিয়াছেন যে, সাধারণ জনগণকে প্রকৃত আরোগ্য কাহাকে বলে তাহা বুঝান ও তৎপথে পরিচালিত করা অনেক সময় অতিশয় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশে যে সকল পীড়া-লক্ষণ ইতিপূর্ব্বে কখনও ছিল না, এমন কি, ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বেও কেহ কখনও যে সকল পীড়ার নামও জানিত না, সেই সকল পীড়া আজি প্রতি ঘরে ঘরে দেখা দিয়াছে,—কেবল তাহাই নয়, পরন্তু নিত্যই নূতন নূতন নামের পীড়ার আবির্ভাব হইতেছে। এ বিষয়ে কেহ চিন্তাও করেন না, অনুসন্ধান ত দূরের কথা। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণের মধ্যে এরূপ কৃতবিদ্য, সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং উচ্চাঙ্গের শিক্ষিত ব্যক্তি রহিয়াছেন, যাঁহারা সামান্যমাত্র চিন্তা করিলেই নিজেদের পথের ভ্রান্তি-প্রমাদ অতি অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের অধঃপতিত দেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য জন্য, তাঁহারাও নিজের দেশের হিত-

Accession No....5200
Date. 18.05.2016

চিন্তা করা যে আদৌ আবশ্যক, তাহা মনেও করেন না। তাঁহারাও নিজেদিগকে একেবারেই অভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন। আমাদের মত ব্যক্তি যাঁহাদের নিকট বহুদিন ধরিয়া শিক্ষা করিবার প্রয়াসী, এরূপ ব্যক্তিও যে অতি সামান্ত চিন্তা করিয়া দেখেন না, ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? এক মুহূর্ত্ত জন্ম যদি চিন্তা করেন যে "যদি আমাদের প্রথা অভ্রান্ত, তবে প্রতি বৎসর এত পরিবর্ত্তন কেন? আজি যেটাকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া স্থির করিতেছি, আগামী বৎসরেই সেটীকে নিতান্ত ভ্রান্ত বলিয়া স্থির করিতেছি, এ প্রকার হয় কেন? সত্যের কি পরিবর্ত্তন আছে?",—ইত্যাদি চিন্তাস্রোত যদি এক মুহূর্ত্তের জন্ম তাঁহাদের মনে উদয় হয়, তবে তাঁহারা বলিতে বাধ্য হইবেন যে, তাঁহারা নিজেরাও ভ্রান্ত, তাঁহাদের শাস্ত্রটীও ভ্রান্ত, তাঁহাদের পথটা নিতান্ত কুপথ এবং "অন্ধেন নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ" মত দেশের লোককে তাঁহারা উদ্‌ভ্রান্ত ধ্বংসপথেই পরিচালিত করিতেছেন! তাঁহারা আমাদের নমস্য, সুতরাং তাঁহাদিগকে আমরা আর কি বলিতে পারি? পরন্তু দেশের লোকের মোহ ও চাকচিক্যজনিত ভ্রান্তি যাহাতে অপনোদন হইতে পারে, তাহারই উপায় অন্বেষণ আমাদের অতি অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া চেষ্টা করিতে হইবে। তাঁহারা আমাদের দেশবাসী, অতএব প্রিয়তম।

"চিকিৎসা" বা "প্রকৃত চিকিৎসা" কাহার করিতে হয় এবং কাহাকে বলে,—ইহা অনেকেই জানেন না। বড়ই দুঃখের বিষয়,—উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণও ঐ একই মোহে মোহগ্রস্ত, ঐ একই ভ্রান্তিতে ভ্রান্ত! কি পরিতাপের কথা! যে মহামনীষী বিচারপতি, জটিলতম ব্যাপারের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়া তন্ন তন্ন যুক্তি, বিচার ইত্যাদির সাহায্যে, বহু গবেষণার পর, নিষ্পত্তি করিতে সমর্থ হইয়া বিচারকের পদে অভিষিক্ত, তিনিও নিজের সামান্ত অসুস্থতার আবির্ভাব হইলে, সেই গতানুগতিকভাবে

ভাবিত হইবা "একটী ইনজেকসেন" প্রার্থী হইবেন? তিনিও বুঝিবেন না যে, তাঁহার অসুস্থতাটী কোথায়? চিকিৎসা প্রথা নির্ব্বাচন ও অবলম্বন বিষয়ে তিনিও সম্পূর্ণ বিচারহীন?"

চিকিৎসা কাহার? পীড়াটী যাহার, চিকিৎসাও তাহারই হইবে,—ইহাপেক্ষা সরল উত্তর বোধ হয় আর নাই। পীড়াটী **মনুষ্যের**, পীড়াটী দেহধারী মনুষ্যের অথবা **দেহীর**, সুতরাং চিকিৎসাটী তাহারই করিতে হইবে, ফলতঃ সাধারণতঃ চিকিৎসা হয়,—**দেহের**। একথা বুঝিবার কি কেহই নাই? দেহী পীড়িত হইয়াছে বলিয়াই তাহার দেহটী বিকল হইয়াছে, দেহস্থ যন্ত্রাদি স্বাভাবিকভাবে কার্য্য করিতেছে না, যকৃত পিত্ত নিঃসরণ করিতেছে না, অন্ত্র মল নিঃসরণ করিতে পারিতেছে না ইত্যাদি। এ অবস্থায় যকৃতকে চাবুক মারিলে কি হইবে? এ অবস্থায় অন্ত্রগুলিতে জোর করিয়া, মল নিঃসরণ করাইলে কি হইবে? দেহীকে সুস্থ কর, **স্বচ্ছন্দ** কর, তবেই ভিতর হইতে স্বাভাবিক প্রেরণা আসিবে অতএব যকৃত ঠিক কার্য্য করিবে এবং অন্ত্রগুলিও ঠিক কার্য্য করিবে। তাহা নয়, চিকিৎসা হইল তাহাদের,—যাহারা ভিতর হইতে প্রেরণা না পাওয়ায় কাজ করিতে অসমর্থ—আর চিকিৎসা হইল না তাহার, যে প্রকৃত রোগী? কি সুন্দর যুক্তি, চমৎকার বুদ্ধি! পরন্তু, অহংকার বা মদান্ধতার বশে যে ব্যক্তি বুঝিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাহাকে বুঝাইতে পারিবে কে? গৃহস্থের কর্ত্তার আদেশ না পাওয়ায়, অনুচর বা দাস কোনও একটী কার্য্য সম্পাদন করিতে না পারিলে ঐ অনুচর বা দাসকে নির্য্যাতন করিলে কি হইবে? এই সরল যুক্তি বোধগম্য না হইবার কারণ কিছুই দেখা যায় না।

রোগটী কোথায় বা কোন্ স্তরে? রোগটী শক্তিস্তরে, অতিমাত্র সূক্ষস্তরে, উহা জীবনীশক্তির মধ্যে বিশৃঙ্খলামাত্র এবং তাহার ফলস্বরূপে,

শরীরস্থ নানা যন্ত্রে নানা গোলোযোগ দেখা দিয়া থাকে,—ঐ ঐ গোলো-যোগের এক একটী 'নাম' আবিষ্কার করিয়া, সেই সেই নামের গোলোযোগ অর্থাং প্রকৃত রোগের ফলটীর নিরাকরণ করিবার অর্থাৎ জোর করিয়া চাপা দিবার চেষ্টা করা চিকিৎসা হইবে, কি প্রকার? ঐ রোগের তিরোধান করিতে পারাই প্রকৃত চিকিৎসা এবং তাহা করিবার নীতি আছে। সেই নীতি অনুসারে ঐ রোগটীর অর্থাৎ শক্তিস্তরের বিশৃঙ্খলাটীর নিরাকরণ হইতে পারে, অন্য কোনও প্ররারেই পারে না। শক্তিস্তরে আমাদের পৌছিবার কোনও সম্ভাবনা বা সামর্থ নাই। ফলতঃ প্রকৃতির এমনই সুব্যবস্থা যে, যখনই শক্তিস্তরে বিশৃঙ্খলা অর্থাৎ রোগের আবির্ভাব হয়, তখন রোগীদেহে কতকগুলি কষ্টকর লক্ষণ ও অনুভূতি প্রকাশ পায়। এগুলির সমষ্টির সাদৃশ্যে যে ঔষধ নির্ব্বাচিত হইতে পারে, সেই ঔষধই যথেষ্ট সূক্ষ্মমাত্রায় প্রযুক্ত হইলে ঐ বিশৃঙ্খলা তিরোভাব ঘটিবে, সুতরাং রোগীর মনে বা দেহের কোনও যন্ত্রমাত্রেই গোলোযোগ বা অস্বস্তি থাকিবে না,—ইহাই চিকিৎসা। এ সম্বন্ধে বহুবার অতি বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে অতএব এস্থলে কেবলমাত্র আভাস দেওয়া হইল।

এক্ষণে, ঐ ভাবে প্রকৃত চিকিৎসা না করিয়া যেখানে অসদৃশ-বিধানে বিকাশপ্রাপ্ত পীড়ালক্ষণকে অপসারিত করিবার চেষ্টা করা হয়, সেখানে যে কি প্রকার অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা বুঝিবার পূর্ব্বে, ব্যাপারটী কি ঘটে, তাহার একটী জড়-দৃষ্টান্ত দিবার চেষ্টা করিতেছি এবং সেটীকে মানস-নয়নে পর্য্যবেক্ষণ করিবার অনুরোধ করি। ইহাতে সাধারণের পক্ষে বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া আশা করি।

একটী প্রবহমানা স্রোতস্বতী (তরুণী পীড়ায় খরস্রোতা, কিন্তু পুরাতন পীড়ায় উহা মন্দাকিনী, বলিয়া ধারণা করিতে হইবে) কোনও পর্ব্বতগুহা

হইতে বাহির হইয়া নানা দিগ্‌দেশ অতিক্রম করিয়া (পীড়া ক্ষেত্রে, শরীরস্থ নানা যন্ত্রপথে, বলিয়া বুঝিতে হইবে) অনন্তসাগরে লয়প্রাপ্তির জন্য (মানবজীবনের যাবতীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনের পর, ব্রহ্মসাগরে বিলীন হইবার জন্য) চলিয়াছে। এই স্রোতস্বতীটী স্বাভাবিক ক্রমনিম্নপথে বাহিত হইয়া উভয় পার্শ্বস্থ ভূমিকে উর্ব্বরতা প্রদান, বারিসিঞ্চনাদি সাহায্যের দ্বারা, নানা দিকে নানা ভাবে, উপকার করিতে থাকে। এক্ষণে যদি কেহ উহার ক্রমগতিতে বাধা প্রদান করিবার জন্য উহার সম্মুখে একটী বাঁধ প্রস্তুত করে, তবে তাহার ফলে, অর্থাৎ প্রবাহপথে বাধাপ্রদান জন্য, উভয় পার্শ্বস্থ ভূমি সমুদায়ের উপর, নদীর জল অতিশয় বেগের সহিত পতিত হইয়া, শস্যযুক্ত স্থানগুলির শস্যহানি, কোথাও বা বালুকাস্তূপ-সঞ্চয়, কোথাও জনাকীর্ণ গ্রামসমূহের ধ্বংস ইত্যাদির দ্বারা একটী ধ্বংসকার্য্যের অবতারণা ও অভিনয় করিতে থাকিবে, ইহার বিচিত্রতা কি আছে? স্বাভাবিক ক্রমগতিতে গঠন ও মঙ্গলকার্য্য এবং ক্রমগতির প্রতিরোধফলে অস্বাভাবিক ও বিশৃঙ্খল গতিতে, ভাঙ্গন ও অমঙ্গল বা ধ্বংসকার্য্য,—এই দুইটী বিষয় মনে রাখিতে হইবে।

অতঃপর, মানবদেহস্থ জীবনীশক্তির প্রবাহটীর বিষয় একবার মানস-লোচনে অবলোকন করিলেই উপরের দৃষ্টান্ত হইতে অতি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মাণ হইবে যে, ঐ স্বাভাবিক ক্রম-প্রবাহটী, যাহা ভিতর হইতে বাহিরের দিকে ক্রমগতিতে চলিতে থাকে, সেই প্রবাহটী ঐ স্বাভাবিক ভাবে চলিয়া মানবদেহের যাবতীয় কার্য্য অতি সুন্দর শৃঙ্খলার সহিত সম্পাদন করিতেছে। সেটীকে জোর করিয়া বিপরীত পথে, বিপরীত দিকে, পরিচালিত করিলে, কি প্রকার ভীষণ গোলোযোগ ও অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া থাকে ও করিতে পারে? ইহার ফলে, একটী ধ্বংসকার্য্যের অবতারণা এবং ধ্বংসেরই অভিনয় চলিতে থাকে। মূর্খ চিকিৎসক তখন

ঐ "চাপা" দেওয়ার ফল স্বরূপে ঐ সকল গোলোযোগ ও বিশৃঙ্খলার আবির্ভাব হইয়াছে ও হইতেছে, একথা না বুঝিয়া, শরীরস্থ যন্ত্রগুলিতে বিকাশপ্রাপ্ত বিশৃঙ্খলাগুলির এক একটী নামকরণ করিয়া বিরাট পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া থাকে এবং সরল ব্যক্তিদিগের বিস্ময় ও চমক উৎপাদন করিয়া চিকিৎসার একটী "ঘটা" দেখায় ও নানাভাবে অর্থশোষণ করিতে সমর্থ হয়। ঐ তথাকথিত চিকিৎসক ভুলিয়াও অবধান করিতে পারে না যে, তাহারই অর্ব্বাচীন ও অনিষ্টজনক এবং নীতিবিগর্হিত প্রথায় তথা-কথিত চিকিৎসার ফলে, এই প্রকার সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে ও নিত্যই হইয়া থাকে। আবার সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুকের কথা যে, এই সকল অধম শ্রেণীর চিকিৎসক ২।১টী সরকারী উপাধি সাহায্যে নিজেকে গুণী (qualified) মনে করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হয় ;—কি অদ্ভুত রহস্য !

আজকালের সমাজে মানবদেহে যে সকল তথাকথিত ও "নামওয়ালা" পীড়া দেখা যায়, তাহার মধ্যে শতকরা ৯০টী ঐ প্রকার "চাপা দেওয়া" চিকিৎসার দ্বারা আনীত,—শতকরা ১০টী বা তদপেক্ষাও কম, স্বাভাবিক প্রকৃত পীড়া বলিয়া জানিতে হইবে। যে সকল পরিবার মধ্যে এখনও "চাপা দেওয়া" চিকিৎসা প্রবেশলাভ করে নাই, সেখানে "নামজাদা" কোন পীড়ার আবির্ভাব হয় নাই, কেবল অতিরিক্ত ভোজন জন্য সামান্য উদরাময় অথবা অতিরিক্ত ঠাণ্ডা লাগার ফলে ২।১ দিনের জন্য সর্দ্দি, বা এই প্রকার যৎসামান্য অসুবিধা ব্যতীত অন্য কিছু দেখা যায় নাই।

স্বাস্থ্য বা অস্বাস্থ্য, এই দু'টীই এক এক প্রকার জীবন ব্যতীত আর কিছুই নয়। স্বাস্থ্যটীও জীবন এবং অস্বাস্থ্য বা পীড়াবস্থাটীও জীবন, —অর্থাৎ প্রত্যেকটীই জীবনী-শক্তির দ্বারা সম্পাদিত এক একটী অবস্থা। এক্ষণে, কি প্রকার জীবন বা অবস্থাকে স্বাস্থ্য এবং কি প্রকার জীবন বা অবস্থাকে পীড়া বলা হইবে, তাহা প্রত্যেক চিকিৎসকের নিজ নিজ

মনোমধ্যে অতি সুন্দরভাবে অনুভব করা আবশ্যক, নতুবা নানা জাতির তথাকথিত চিকিৎসকের সঙ্গে "সোলেনামা" করিয়া তাহাদের কথায় "সায় দিয়া" চাপা দিবার পথেই রোগীকে চিকিৎসা করা ঠিক যেন অবশভাবেই ঘটিয়া উঠে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে অনেক ক্ষেত্রেই এ প্রকার করিতে দেখা যায়। অনেক বড় লোকের বাড়ীতে এ প্রকার ঘটিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। বড় লোকের বাড়ীতে গৃহ-চিকিৎসক প্রায়ই এলোপ্যাথিক চিকিৎসক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন, এ অবস্থায় তাঁহাদের পরিবারস্থ কেহ পীড়িত হইলে, যেখানে ঐ এলোপ্যাথিক চিকিৎসক কোনও হোমিওপ্যাথকে ডাকিবার আবশ্যক বোধ করেন, সেখানে উভয়ে পরামর্শ করিয়া বাহিরে প্রলেপাদি ব্যবহার এবং আভ্যন্তর ঔষধটা হোমিওপ্যাথিক মতেই সাব্যস্ত করিয়া, উভয় প্রথাই চালাইবার ব্যবস্থা করেন এবং সে ক্ষেত্রে, অনেকটা চক্ষুলজ্জার খাতিরেও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বাহ্য প্রলেপাদি যেন অনুমোদন না করিয়া পারেন না। ফলতঃ ইহাতে রোগীরই অনিষ্ট হয় এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ভগবানের নিকট দায়ী থাকেন। এরূপ "খাতিরে পড়িয়া" অনুমোদন অতিশয় গর্হিত ও পাপজনক। সত্য বলিয়া যাহা বুঝা হইবে, তাহা সরল নির্ভীক ভাবে প্রকাশ করা ও তদনুযায়ী কার্য্য করা অতীব প্রয়োজনীয়। অনেকে, পাছে কেহ "গোঁড়া" বলে, এই ভয়ে, ঐ সকল প্রথার অনুমোদন করিয়া থাকেন। আমি বহুক্ষেত্রে স্বচক্ষে দেখিয়াছি বলিয়া এখানে প্রকাশ করা সঙ্গত বলিয়া মনে করিলাম।

যেরূপ ভগবদারাধনায় আমরা মনঃসংযমপূর্ব্বক ধ্যানস্থ হইয়া থাকি, ঠিক তদ্রূপ ভাবে, কাহাকে স্বাস্থ্য বলে, কাহাকে অস্বাস্থ্য বা পীড়া বলে, তাহা ধ্যাননেত্রে চিন্তা করিয়া স্থির করিয়া, মনোমধ্যে হৃদয়ক্ষেত্রে

...OEOPATHIC M...

তাহাদের একটী প্রকৃষ্ট রূপ বা চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিতে হয়। নতুবা অনেক সময় অনবধানতা বশতঃও অন্যায় সম্ভব হইতে পারে,—এজন্য ঐ নির্ম্মল চিত্রটী হৃদয়পটে চিরাঙ্কিত করিবার প্রয়োজন, বিশেষ প্রয়োজন। এ জগতে অতি উৎকট ভণ্ডও অতি তীক্ষ্ণমস্তিষ্ক চিকিৎসক বলিয়া অনেক সময় জনসমাজে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, ফলতঃ আমাদিগকে সদাসর্ব্বদাই সত্য, খাঁটি সত্য পথ ধরিয়া চলিতে হইবে। প্রত্যেকের উপরই ভগবান্ আছেন এবং বিচার একমাত্র তাঁহারই নিকট,—সুতরাং একমাত্র সত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, চিকিৎসাকার্য্যানুবর্ত্তী হইতে হইবে,—নিন্দা, সুখ্যাতি বা অন্যায় মতামতের অপেক্ষা আদৌ না রাখিয়া চলিতে হইবে।

একবার ধ্যানস্থ হইয়া চিন্তা করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করি, তাহা হইলেই উভয়ের প্রকৃষ্টরূপ প্রত্যেক চিকিৎসকের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিবে। স্বাস্থ্য বা অস্বাস্থ্য এই উভয়টীই **জীবনস্রোত** তবে স্বাস্থ্যটী নির্ম্মল স্রোত এবং অস্বাস্থ্য বা পীড়াটী বিশৃঙ্খল অর্থাৎ পঙ্কিল স্রোত, ফলতঃ দুইটীই জীবনস্রোত।

এক্ষণে যদি একবার হৃদয়ে সুন্দররূপে অনুভূত হয় যে, স্বাস্থ্যও একটী জীবন প্রবাহ এবং পীড়াও একটী জীবন প্রবাহ—তবে পীড়াটী বিশৃঙ্খল প্রবাহ, এই পর্য্যন্ত, তাহা হইলেই বেশ বুঝা যাইবে যে, **আরোগ্য কার্য্যটীও একটী প্রবাহ ভাবেই** সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং ভিতরের অর্থাৎ আভ্যন্তর রাজ্যের বিশৃঙ্খলাগুলি, ঔষধের ক্রিয়াবশে, বাহ্যদেহে প্রবাহিত হইয়া আসিয়া চিকিৎসকের মনে একটী সন্দেহ উপস্থিত করে, ঠিক যেন ঐগুলি বাহ্যদেহের বা বাহ্যযন্ত্র নিচয়েরই রোগ বা পীড়া,—ফলতঃ তাহা কি প্রকারে হইবে? রোগটী দেহীর, রোগটী দেহের কখনও নয়। দেহীর পীড়াটী ঔষধের প্রভাবে আভ্যন্তর প্রদেশ

হইতে জীবনীশক্তির দ্বারা, ভিতর হইতে বাহিরের দিকে (Influx) গতিবশে, বাহ্য প্রদেশে নীত হয় মাত্র, পরন্তু যে যে যন্ত্রের উপর উহাদের বিকাশ হয়, সেই সেই যন্ত্রের পীড়া মনে করিলে, ভয়ানক ভুল হইবে। কেননা উহা প্রবাহ বশে পরিচালিত হইবার সময় শরীরস্থ যন্ত্র বিশেষে সাময়িক বিকাশ ও অবস্থান ব্যতীত আর কিছুই নয়,—ঐ ঐ যন্ত্রের সহিত কোনও প্রকার কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নাই ও থাকে না। নিজের গভীর ও পুরাতন পীড়ায় রোগীদিগের চিকিৎসাকালে, পর্য্যবেক্ষণ করিলে, প্রত্যেক সুধী চিকিৎসকের হৃদয়ে একথা প্রতিভাত হইবে। প্রকৃত পীড়াটী বিলয় বা আরোগ্য হইবার সময়, ঔষধের ক্রিয়া সাহায্যে একটী গতি ও স্থূলরূপ প্রাপ্ত হয় এবং যেমন দূরদেশে যাইতে হইলে লোক নানা পান্থনিবাসে, ক্ষণকালের জন্য বা ২।৪ দিনের জন্য, বিশ্রাম লাভ করে, ঠিক সেই ভাবেই আভ্যন্তর পীড়াটী ক্রমগতিতে, ভিতর হইতে বাহিরের দিকে, জীবন-প্রবাহ বশে নানা যন্ত্রে বিকাশ ও অবস্থান পূর্ব্বক, অবশেষে বিলীন হইয়া যায় এবং রোগীও নির্ম্মল আরোগ্য হয়, অর্থাৎ জীবনপ্রবাহটী আর বিশৃঙ্খল না থাকিয়া স্বাভাবিক ও সুশৃঙ্খল হইয়া উঠে। আমার চিকিৎসাব্যপদেশে একটী বিংশতি বর্ষীয়া রোগিণী মাতার ক্ষেত্রটী অতি স্বল্প কথায় বর্ণনা দিলে, এই নীতিটী পরিস্ফুট হইবে। নদীয়া জেলার দাত্তপুর গ্রামের একটী রোগিণী অতিশয় হিংসাপরায়ণা এবং সন্দিগ্ধচিত্তা ছিলেন, তাঁহার মানসিক ও সার্ব্বদৈহিক লক্ষণসমষ্টি অনুসারে ট্যারেন্টিউলা হিস্ ৫০ এম, শক্তিতে প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল, তাহার ফলে মানসিক অবস্থার উন্নতি আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, তাঁহার জরায়ুপ্রদেশে লক্ষণ আবির্ভূত হয় এবং কিছু দিনের পর পুনরায়, জরায়ুদেশের স্রাবাদিলক্ষণ আপনিই অপসারিত হইয়া, তাঁহার সর্ব্বদেহে

(কেবল শিরোদেশ ব্যতীরেকে) এক প্রকার দদ্রু উপস্থিত হইল। অবশ্য কোনও ঔষধ প্রযুক্ত হইল না। প্রায় এক বৎসর পরে তিনি নির্ম্মল আরোগ্য হইলেন। ইহার পর, তাঁহার স্বামীর নিকট হইতে জানা গিয়াছিল, ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার শ্বেতপ্রদর হইয়াছিল এবং সেজন্য অনেকগুলি ইঞ্জেক্সেন প্রয়োগ হইয়াছিল এবং তাহার পর হইতে তাঁহার মনোবৈলক্ষণ্য প্রকাশ পাইয়াছিল। যাহা হউক, চাপা দেওয়ার কি বিষময় ফল, তাহা বাস্তবিকই অনুভব করা অতি কঠিন। ফলতঃ আরোগ্য হইবার পূর্ব্বে, প্রথমে জরায়ুতে, পরে বাহ্য দেহে, ক্রমগতিতে বিকাশপ্রাপ্তির এটী একটী চমৎকার উদাহরণ।

আরও এক কথা, একই প্রকার রোগলক্ষণ চাপা পড়িয়া তাহার ফলে প্রত্যেকেরই যে একই প্রকার জটীলতা বা বিষক্রিয়ার আবির্ভাব হইবে, তাহা বলা যায় না। মনে করুন, কাহারও শরীরে নানা প্রকার চর্ম্মরোগ উপস্থিত হইয়াছে। অপর একটী স্ত্রী রোগীরও বাহ্য দেহে ঠিক ঐ প্রকারেরই চর্ম্ম পীড়ার আবির্ভাব হইয়াছে। যদিও উভয়েরই চর্ম্মপীড়া একই প্রকারের এবং এক ভাবেই চাপা দেওয়া হইল, পরন্তু ইহার বিষময় ফলটী উভয়ের পক্ষে, কেবল মাত্র স্ত্রী পুরুষের বিভিন্নতায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়া থাকে, ইহা বহুবার লক্ষিত হইয়াছে, এমন কি, একই ঔরসগর্ভজাত পুত্র কন্যার মধ্যে চাপা দেওয়ার ফল সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়া থাকে। দেখা যায় পুরুষের চর্ম্মপীড়া চাপা পড়িলে সাধারণতঃ যকৃতের কার্য্যবিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, আবার সেটীকেও চাপা দিবার চেষ্টা করিলে, হৃদ্‌পিণ্ডটী বৈকল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং শেষে হৃদ্‌রোগে মৃত্যু হয়। অন্যপক্ষে, স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে, বাহ্যলক্ষণ চাপা পড়িলে, জরায়ু ও প্রজনন যন্ত্র দূষিত ও পীড়িত হয়। আবার যদি সে অবস্থাতেও চাপা দেওয়া চিকিৎসা অবলম্বিত হয়, তবে রোগিণী উন্মাদগ্রস্তা হইয়া

পড়েন, ইহার কারণ অর্থাৎ এই প্রকার বিবক্রিয়ায় বিভিন্নতার কারণ এই যে স্ত্রীলোকের জননীত্বই স্ত্রীত্ব, অর্থাৎ জননীভাবটীই তাঁহাদের জীবনের কেন্দ্র বা মর্ম্মকথা, পক্ষান্তরে চাঞ্চল্য বা বাহিরের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাই, পুরুষের মর্ম্মবাণী।

ইহা ব্যতীত, যে সকল রোগলক্ষণ চাপা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার ফলস্বরূপে, পুরুষদিগের মধ্যেও বা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও, অন্য কারণে ঐ প্রকার বিভিন্নতার আবির্ভাব হয়। সুতরাং স্ত্রীপুরুষভেদে বিভিন্নতা আশা করিতে হইবেই, তাহা ব্যতীত, প্রত্যেক দেহের সোরা সাইকোসিস্ ও সিফিলিস্ নামক দোষের সংখ্যা, অবস্থা এবং সংমিশ্রণের প্রকৃতির উপর ঐ বিভিন্নতা নির্ভর করে। একজন সোরাদুষ্ট ব্যক্তির বাহ্যদেহে বিকশিত লক্ষণসকল চাপা পড়িলে, হয়ত লঘুজাতির উদরাময় দেখা দিতে পারে এবং ঐ বাহ্য লক্ষণই যদি কোনও সাইকোসিস্ দোষদুষ্ট ব্যক্তির চাপা দেওয়া হয়, তবে হয়ত স্নায়ুশূল অথবা দ্রুত হৃদ্স্পন্দন দেখা দিতে পারে, আবার একজন টিউবারকুলার দোষদুষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঐ চাপা দেওয়ার ফলস্বরূপে, একেবারেই রক্তনিষ্ঠীবন, মৃদু অথচ বলক্ষয়কারী দারুণ জ্বর এবং নিশি ঘর্ম্মাদি ক্ষয়লক্ষণ সকল উপস্থিত হইয়া ত্বরিত-মৃত্যু-গতি-সহ (Gallopping phthisis) দারুণ রাজযক্ষ্মার সৃষ্টি করে। সুতরাং, চাপা দেওয়ার ফল যে কত ভীষণ, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব, অথচ, আমার দেশবাসীগণ অগ্নিমুখে পতঙ্গের ন্যায় চাপা দেওয়া চিকিৎসাপক্ষেই প্রধাবিত। ইহার ফল যে কত বিষময় এবং সেই ফল ব্যক্তিগতভাবে, সমাজগতভাবে, জাতিগত হিসাবে যে কত ব্যাপক, তাহা অনুমান করা যায় না। এক কথায় বলিতে গেলে, চাপা দেওয়া চিকিৎসা প্রথাটী করালকালস্বরূপিনী ধ্বংসকারিণী শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়। আমার কথা কেহ হয়ত অতিরঞ্জন বলিয়া মনে করিতে

পারেন, কিন্তু আমার সবিনয় নিবেদন তাঁহারা যেন স্থিরচিত্তে, এমন কি ধ্যানস্তিমিত লোচনে এ সকল কথার সারমর্ম্মগ্রহণ করিবার চেষ্টা করেন, ফলতঃ তাহা না করিয়াই যদি এ সকল কেবল অর্ব্বাচীন প্রলাপোক্তি বলিয়াই দূরে প্রত্যাখ্যান করেন, তবে তাঁহারাই ইহার ফলভাগী হইবেন। আমি কেবল চাপা দেওয়া প্রথার চিকিৎসার মোহগ্রস্ত ভ্রাতা ও জননীদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছি। ইহাতে আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ কিছুই নাই, সমাজের কল্যাণই একমাত্র অভিপ্রেত।

আরও একটী কথা আছে, এ প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা না করিলে বিষয়টী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আমাদের আভ্যন্তর প্রদেশের সহিত, বাহ্য যন্ত্রাদির একটী চিরন্তন সম্বন্ধ আছে। তাহাকে একসূত্রতাই বলুন বা সামঞ্জস্যই বলুন—সে সম্বন্ধটী এই যে, আমাদের মনের যাবতীয় ভাবনা, ইচ্ছা, অনুভূতি ইত্যাদির অনুসারে কার্য্য করিবার জন্যই স্থূল যন্ত্রগুলি একসূত্রে গ্রথিত, এ বিষয় নানা স্থানে বিশদভাবে লিখিয়াছি (মৎলিখিত মেটেরিয়া মেডিকা ৭০৫, ৭০৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য), তাহা হইলেও এখানে সামান্য উদাহরণের দ্বারা উহা স্পষ্টকৃত না করিয়া পারি না। দেখা যায়, মনের উল্লাসে যকৃৎ যন্ত্রের ক্রিয়া নির্ম্মল চলিতে থাকে, আবার যকৃতের ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য ঘটিলে মনুষ্য অতিমাত্র বিষণ্ণ হইয়া পড়ে। আরও দেখা যায় স্থিরপ্রাণ ব্যক্তির হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সুস্থ এবং যদি কোনও কারণে হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হয়, তবে ঐ মনুষ্য নিরতিশয় ব্যাকুল ও অস্থিরভাবাপন্ন হইয়া পড়ে, এমন কি, মৃত্যুভয়ে শঙ্কিতও হইয়া উঠে, সুতরাং, ভিতর ও বাহিরের মধ্যে একটী একসূত্রতা আছে, একটী সামঞ্জস্য আছে, যেন একের বিশৃঙ্খলায় অন্যটী বিশৃঙ্খলাপ্রাপ্ত হইবেই। এক্ষণে, মনে করুন, কোনও ঘোরতর বিষণ্ণ, ভীতচিত্ত, মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত এরূপ একটী মনোবিকৃত ব্যক্তিকে প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক সূত্রে ঔষধ প্রয়োগ করা হইল এবং ইহার ফলে,

মনোলক্ষণের উন্নতি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই উপরোক্ত ঐ একসূত্রতা সম্বন্ধ নিবন্ধন যকৃত যন্ত্রের বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। যিনি সুধী চিকিৎসক, যাঁহার হোমিওদর্শন শাস্ত্রে তীক্ষ্ণ মেধা, ব্যুৎপত্তি এবং প্রজ্ঞা আছে, তিনি বুঝিবেন যে, যকৃৎ যন্ত্রের এই নবপ্রকাশিত লক্ষণাবলি বা বিশৃঙ্খলা কখনও "রোগ" নয়, বরং আরোগ্য পথেরই নিদর্শন; আবার হয় ত, যকৃৎবিশৃঙ্খলার পরে পরেই বা তৎসঙ্গেই, রোগীর উদরাময় দেখা দিতে পারে,—সেখানেও তিনি অতি অবশ্যই বুঝিবেন যে, উদরাময়টীও উহারই নিদর্শন এবং বিশৃঙ্খলাটী আরোগ্য পথ ধরিয়াছে বলিয়াই, মন অপেক্ষা স্থূলতর অথচ একসূত্রসংবদ্ধ যকৃতে, তাহার পর আবার ক্রমগতিতে তদপেক্ষা স্থূলতম যন্ত্রে অর্থাৎ অন্ত্র-প্রদেশে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া উহা চিরতরে বিলীন ও নির্ম্মল আরোগ্য হইতেছে। আবার কাহারও বা আরও স্থূল প্রদেশে অর্থাৎ স্থূলতম বা একেবারেই বাহ্যদেহে চর্ম্মপীড়ারূপে প্রবাহিত হইবার পর চিরতরে বিলোপপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহা হউক, এই প্রকারে বিকাশপ্রাপ্ত, অর্থাৎ জীবনীশক্তির দ্বারা প্রবাহাকারে, ক্রমগতিতে, ভিতর হইতে বাহিরে এবং একসূত্রতা প্রভাবে, লোকলোচনের অন্তর্ভুক্ত লক্ষণগুলিকে যদি চাপা দেওয়া হয়, তবে রোগীদেহে কি ভীষণ অনিষ্ট হয়, তাহা পর্য্যালোচনা করিলেই প্রত্যেক হৃদয়ে স্ফুরিত ও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। কেবলই যে রোগীর চিকিৎসিত মনোলক্ষণগুলির পুনরাবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠাই আশা করিতে হইবে, তাহা নয়,—পরন্তু রোগীদেহের দোষের অবস্থা, প্রকৃতি, সংখ্যা ও সংমিলনের উপর নির্ভর করিয়া বিষময় ফলটীর উদ্ভব হইতে পারে। এমন কি, অনেক ক্ষেত্রেই আর চিকিৎসার সময় ও সুযোগ পাওয়াই যায় না,—আমি ইহা শত শত ক্ষেত্রে স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াছি।

উপসংহারে, "সুস্থ" কাহাকে বলে, অথবা চিকিৎসক কি প্রথায় তাঁহার রোগীকে সুস্থ রাখিবেন, সে বিষয়ের মাত্র একটী কথায় আভাষ দিবার ইচ্ছা

করি। যে ব্যক্তির শরীরে স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহটী ভিতর হইতে বাহিরের দিকে, একতানে সুশৃঙ্খলার সহিত বজায় থাকে, সেই ব্যক্তিই সুস্থ এবং যে ক্রিয়ার দ্বারা ঐ প্রবাহটীকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারা যায়, তাহাই চিকিৎসকের চিকিৎসাপ্রথা ও কর্ত্তব্য। মানব শরীর অন্ততঃ সোরাদোষদুষ্ট থাকেই থাকে। আজকালের দিনে একাধিক দোষদুষ্ট শরীরই অধিক, ফলতঃ শরীরের অবস্থা যাহাই হউক না কেন, যে কোনও দোষের দ্বারা দুষ্ট হউক না কেন এবং তৎপ্রভাবে, যে ভাবেই রোগলক্ষণাবিষ্ট হউক না কেন, যদি একমাত্র সমলক্ষণপ্রথায় চিকিৎসা করা হয় এবং জীবনীশক্তির ভিতর হইতে বাহিরের দিকে ক্রিয়াগতিটী সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিবার জন্য বরং রোগীকে কিছুদিন রোগভোগ করাইয়াও যিনি চিকিৎসা করেন, তাঁহার চিকিৎসাই চিকিৎসা, নতুবা অন্য কোনও বন্ধু চিকিৎসকের অনুরোধে ঐ ক্রিয়াগতি (Influx) বিরোধী পথ অবলম্বন করিলে, তিনি হীন ব্যবসাদার ব্যতীত আর কিছুই নহেন এবং হোমিওপ্যাথি তাঁহার এই হীন ব্যবসার যন্ত্রস্বরূপ মাত্র।

ইঞ্জেক্সন্ কি হোমিওপ্যাথি অনুমোদিত ?

প্রায় অনেকের নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছি যে, ইঞ্জেক্সন্ নাকি হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রানুমোদিত অর্থাৎ হোমিওপ্যাথিক মতে ইঞ্জেক্সন দেওয়া একটী প্রথা মাত্র; যেমন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কখনও বা জলের সহিত, কখনও বা দুগ্ধশর্করার সহিত, কখনও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বটীকাকারে দেওয়া

যাইতে পারে, ইঞ্জেক্‌সনও না কি ঔষধ দিবার একটী প্রথা, অর্থাৎ ঐ ঐ ভাবে না দিয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নাকি ইঞ্জেক্‌সন আকারেও দেওয়া যায় এবং ইঞ্জেক্‌সন আকারে দিলে তাহাকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাই বলা যাইতে পারিবে। যাহার যাহার নিকট এই কথা শুনিয়াছি, তখনই ব্যক্তিগত হিসাবে প্রতিবাদ করিয়া যুক্তি তর্ক ও শাস্ত্রবাণী সহায়ে প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভ্রমাপনোদনের চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে, এ বিষয়ে প্রকাশ্যে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। সে দিন আরও জানিলাম যে, কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী কোনও একটী স্থানে, দুইটী অল্প শিক্ষিত যুবক সামান্য কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্যে দুইটী উপাধি ক্রয় করিয়া কতকগুলি ইঞ্জেক্‌সন দিবার যন্ত্রপাতি ক্রয় করিয়া সরলভাবে নিজেদিগকে হোমিওপ্যাথ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন এবং অবাধে ইঞ্জেক্‌সন দিয়া লোককে বুঝাইতেছেন যে, তাঁহারা প্রকৃতই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাই করিতেছেন এবং হোমিওপ্যাথির ক্রমোন্নতি হইয়া ইঞ্জেক্‌সন প্রথাটী অতি সমাদরের সহিত হোমিওপ্যাথিতে গৃহীত হইয়াছে। তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন—"সাবধান, যেন কেহ এ্যালোপ্যাথিক ইঞ্জেক্‌সন লইয়া মনে করিবেন না যে, হোমিওপ্যাথিক ইঞ্জেক্‌সন লইতেছেন, কেন না হোমিওপ্যাথিক ইঞ্জেক্‌সন কেবলমাত্র আমাদের নিকটেই প্রাপ্তব্য, অতএব যেন কদাচই প্রতারিত হইবেন না, ইত্যাদি।" যাঁহারা জ্ঞানপাপী, অর্থাৎ ইহা একান্তই হোমিওপ্যাথি-বিরুদ্ধ,—একথা মনেপ্রাণে জানিয়াও ইঞ্জেক্‌সন দিয়া বলিয়া থাকেন যে, ইহা হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রেরই প্রথাবিশেষ, তাঁহাদিগকে সংশোধন করিবার স্পর্দ্ধা আমাদের নাই—তাঁহাদের সংশোধন তাঁহাদের নিজেদের উপর, অর্থাৎ যদি কোন দিন তাঁহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মবোধ জাগরিত হয় তবেই নিজে নিজেই উহা ত্যাগ করিয়া সত্য পথ অবলম্বন করিবেন, নতুবা কোনও আশা নাই। তবে আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য এই যে, যে সকল অল্প শিক্ষিত

চিকিৎসক বা সাধারণ লোক সরলভাবে মনে করিয়া থাকেন যে, বাস্তবিকই ইহা হোমিওপ্যাথির অনুমোদিত, কেবলমাত্র তাঁহাদের ভ্রম সংশোধন করিতে পারিলেও অনেকভাবে সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে। এই আশায় এই প্রবন্ধের অবতারণা।

আসল বিষয়ের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একটী বিষয় সর্ব্বাগ্রে মুখবন্ধ স্বরূপ লিখিত হইতেছে। অনেকেই নিজের নিজের গর্হিত কার্য্যের "সাফাই" দিবার জন্য অবাধে কহিয়া থাকেন যে, হোমিওপ্যাথির ক্রমোন্নতির দ্বারা ইহা সম্পূর্ণ অনুমোদিত হইয়াছে। পাছে তাঁহাদের কার্য্য অন্যায় ও হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্র বিরোধী, ইহা দেখান হয়, এজন্য তাহার উত্তরে ঐ কথা কহিয়া নিজেদের অন্যায় কার্য্যটা সমর্থন করিবার প্রয়াস পান। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, সত্য বস্তুর কখনও ক্রমোন্নতি সম্ভব নয়, ইহার মূলনীতির কোনও পরিবর্ত্তন কোনও কালেই হইতে পারে না। সত্যের ইহাই মহিমা যে, উহা অপরিবর্ত্তনীয়, উহার উন্নতি বা অবনতি কখনও সম্ভব নহে। জলে অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া থাকে, এই সত্যের আর ক্রমোন্নতি কি হইবে ? সেইরূপ সদৃশ বিধানে আরোগ্য কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে, এই সত্যের কোনও ক্রমোন্নতি বা পরিবর্ত্তন কিরূপে হইতে পারে ? হোমিওপ্যাথির ক্রমোন্নতি বা প্রসার করিতে হইলে ১০।৫টী নূতন ঔষধের পরীক্ষা এবং তদনুসারে প্রয়োগ অবশ্যই সম্ভব বটে, কিন্তু মূলনীতির অর্থাৎ হোমিওপ্যাথির অন্তর্নিহিত আসল তত্ত্বগুলির ক্রমোন্নতি কখনই সম্ভব নহে। হোমিওপ্যাথির মূল সূত্র সাধারণতঃ ৩টী বলা যাইতে পারে, এবং এই ৩টী ব্যতীত আরও কয়েকটী আছে, তবে এই ৩টীই সর্ব্বপ্রধান।

এই ৩টী সর্ব্বপ্রধান মূলসূত্র,—(১) সমলক্ষণে ঔষধ প্রয়োগ, (২) এক সময় একটী মাত্র ঔষধ প্রয়োগ, (৩) যতদূর সম্ভব অল্পমাত্রায় প্রয়োগ। ৩টী ব্যতীত আরও অনেক সূত্র আছে, তাহা হ্যানিম্যান কৃত অর্গানন নামক

গ্রন্থপাঠে জানিতে পারা যায়। এই গ্রন্থে হোমিওপ্যাথির সম্বন্ধে যাবতীয় তত্ত্ব এবং সূত্র ধারাবাহিক ভাবে লিখিত আছে। কি নিয়মে এবং কি প্রকারে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে, সে বিষয় বিশেষভাবে এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। রোগীকে কোনও প্রকার যাতনা দিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা অন্যায়, অসঙ্গত এবং নিতান্ত অনাবশ্যক। হ্যানিম্যান তাঁহার অর্গ্যাননের ২য় ধারাতে "in the most harmless way" অর্থাৎ যে ভাবে ঔষধ প্রয়োগে কোনও ক্ষতি না হয়, এই ভাবে ঔষধ প্রয়োগের ইঙ্গিত দিয়াছেন।

এক্ষণে, প্রধান কথা,—সমলক্ষণানুসারে ঔষধ প্রয়োগ যাহা হোমিওপ্যাথির মূলসূত্র, তাহার জন্য প্রত্যেক ঔষধটী ঔষধরূপে ব্যবহারযোগ্য নিরূপণ করিবার পূর্ব্বে, উহা সুস্থ শরীরে প্রয়োগ করিয়া যে যে লক্ষণ ও অবস্থা প্রকাশিত হয়, তাহা যথারীতি লিপিবদ্ধ করিতে হয়,—যে পুস্তকে নানা ভেষজের ঐ প্রকার পরীক্ষা (provings) লিপিবদ্ধ করা থাকে, তাহাকে Meteria Medica অর্থাৎ ভৈষজ্য-কোষ কহে। যাহা হউক, যে ভেষজ ইঞ্জেক্‌সনের দ্বারা প্রয়োগ করা হয়, তাহার সুস্থ শরীরে প্রয়োগের দ্বারা পরীক্ষা করিবার কোনও সুযোগ দেওয়া হয় না,—সুতরাং সেটি সমলক্ষণ হইল কিনা, জানিবার কোনও উপায় নাই। অতএব ইঞ্জেক্‌সন হোমিওপ্যাথি অনুমোদিত কি প্রকারে হইতে পারে ? যাহা হোমিওপ্যাথির মেরুদণ্ডস্বরূপ, তাহারই অভাব, সুতরাং ইঞ্জেক্‌সন হোমিওপ্যাথির অন্তর্ভূক্ত কদাচই হইতে পারে না।

আরও এক কথা, রোগীকে কোনও প্রকারে যন্ত্রণা দিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবার কোনও ব্যবস্থা হোমিওপ্যাথি অনুমোদিত নয়। হ্যানিম্যান তাঁহার অর্গ্যাননের ২য় ধারাতেই স্পষ্ট কহিয়া গিয়াছেন। সময়ে সময়ে— অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেখানে ইঞ্জেক্‌সন দেওয়া হয়, সে স্থানটী অতি প্রবল

প্রদাহান্বিত হইয়া শোথ ও বেদনাযুক্ত হইয়া পড়ে, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে সেজন্য প্রবল জ্বর হইতেও দেখা গিয়াছে। কোনও কোনও রোগীর ঐ প্রদাহযুক্ত স্থানগুলি আরোগ্য হইতে ২।৩ মাস সময় অতিবাহিত হইতেও দেখা যায়। সুতরাং এই যন্ত্রণাদায়ক ঔষধ প্রয়োগের বিধান কখনই হোমিওপ্যাথির অন্তর্গত হইতে পারে না।

এ অবস্থায়, ইঞ্জেক্সন প্রথা যে, হোমিওপ্যাথির অন্তর্গত, এ প্রকার ধারণা দুই শ্রেণীর ব্যক্তির মনে উদয় হওয়ার সম্ভাবনা। ১ম শ্রেণী,—যাঁহাদের শিক্ষা অতি অল্প এবং হোমিওপ্যাথির মূলসূত্র বা হোমিওপ্যাথির কোনও তত্ত্বই আদৌ জানেন না অথচ তথাকথিত চিকিৎসক সাজিবারও প্রয়াস আছে, আবার স্থূল মস্তিষ্ক বলিয়া অনুসন্ধান ও জ্ঞানার্জ্জন করিতেও অপারক, তাঁহারাই বিনা আয়াসে "বাঁধা গৎ"এ ইঞ্জেক্সন দিবার পথে প্রলোভিত হয়েন এবং সাধারণকে তাঁহাদের প্রথায় আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে, অথবা সত্য সত্যই নিজেদের সরল ভ্রান্তবিশ্বাসের বশে প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, ইঞ্জেক্সন প্রথাটি হোমিওপ্যাথিরই শাখা বিশেষ। ২য় শ্রেণী,—যাঁহারা মনে প্রাণে জানেন যে, ইহা কদাচই হোমিওপ্যাথির অন্তর্গত নয় অথচ "ভাবের ঘরে চুরি" করিয়া অনায়াসে, বিনা পরিশ্রমে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির আশায় প্রলুব্ধ হইয়া এই প্রথা অবলম্বন করেন ও জনসমাজে "হোমিওপ্যাথিক ইঞ্জেক্সন" বলিয়া প্রচার করেন। ১ম শ্রেণীর লোককে সংশোধন করা কখনও বা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু ২য় শ্রেণীর লোককে সত্য পথে আনা অসম্ভব, অবশ্য ভগবান কৃপা করিয়া যদি এই সকল ব্যক্তির মনে ধর্ম্মবোধ জাগরিত করিয়া দেন, তবেই কল্যাণ নতুবা তাঁহাদের সংশোধন অসম্ভব।

এই ২য় শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের প্রতি আমাদের সানুনয় প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা ইঞ্জেকসন দিতে থাকুন, তাহাতে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিবার

কিছু নাই, যেহেতু এই প্রথা ভয়ানক অনিষ্টকারী হইলেও যখন মহামান্য সরকার বাহাদুরের প্রবর্ত্তিত এলোপ্যাথিক চিকিৎসা প্রথার অনুমোদিত, তখন আমাদের নিষেধ করার কোনও শক্তি নাই, তবে ইঞ্জেক্‌সন প্রথাটি হোমিওপ্যাথির অন্তর্গত, এরূপ প্রচার না করাই তাঁহাদের পক্ষে শোভনীয় এবং সঙ্গত, যেহেতু তাহাতে তাঁহাদের কার্য্যেরও কোনও বাধা হইবে না অথচ হোমিওপ্যাথিরও কোনও অনিষ্ট হইবে না।

সর্ব্বশেষ কথা,—ইঞ্জেক্‌সন চিকিৎসা যে সম্পূর্ণভাবে হোমিওপ্যাথি রাজ্যের বহির্ভূত, তাহার প্রধান কারণ এই যে, হোমিওপ্যাথি-রাজ্যে স্থূল বলিয়া কোনও জিনিস নাই। হোমিওপ্যাথির প্রত্যেক ঔষধটী এক একটী শক্তি। সকলেই জানেন, শক্তিরাজ্যের বিশৃঙ্খলার ধ্বংস সাধন হইতে হইলে অর্থাৎ শক্তিন্তরকে প্রভাবান্বিত করিতে হইলে,—শক্তিই প্রয়োজনীয়, স্থূলের দ্বারা তাহা কখনও সম্ভবপর নয়। যে ঔষধ ইঞ্জেক্‌সনের দ্বারা শরীরের মধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট করা হয়, তাহার পরিমাণ দেখিতে অতি অল্প হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা স্থূল, যেহেতু শক্তীকরণরূপ একটী পৃথক বিধান অবলম্বন করিলে, তবেই স্থূল দ্রব্য শক্তিরাজ্যে উন্নীত হইতে পারে, নতুবা মাত্রা যতই কম হউক না কেন, উহা স্থূল ব্যতীত আর কিছুই নয় এবং শক্তিকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ যেরূপ অতীন্দ্রিয় রাজ্যের জিনিষ, ইঞ্জেক্‌সনের ঔষধ কখনই তাহা হইতে পারে না। ইঞ্জেকসনের ঔষধ একেই ত স্থূল, তাহার উপর প্রয়োগ প্রণালী কখনও সমলক্ষণ সূত্রানুসারে নয়, পরন্তু, ইহা এক একটী পেটেণ্ট ঔষধের মত ব্যবহার হইয়া থাকে সুতরাং হোমিওপ্যাথির সহিত ইহার যে কি পার্থিব সম্বন্ধ আছে, তাহা আমরা নিরাকরণ করিতে অক্ষম। অমুক দেশের অমুক ডাক্তার ইহা বাহির করিয়াছেন বা অমুক খ্যাতনামা ডাক্তার ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন অথবা কেবলই হয়ত কোনও বিদেশী কোম্পানী এই ইঞ্জেকসনটী

বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত রাখিয়া নানাপ্রকার বিজ্ঞাপনের সাহায্যে ইহার প্রশংসার দুন্দুভিনাদে দশদিক মুখরিত করিয়া থাকে, এই প্রকার একটা কিছু ব্যতীত ইহার ব্যবহারের জন্য অন্য কোনও সার্টিফিকেট নাই এবং ইহার ব্যবহার প্রণালীরও কোন ধারা নাই অথবা ইহার প্রয়োগ কোনও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, কোনও একটী নামের পীড়াক্ষেত্রে দশজন চিকিৎসক দশ প্রকার ঔষধের ইঞ্জেকসন অনায়াসেই ব্যবহার করিতে পারেন, সে পক্ষে কোনও বাধা থাকে না কেবলমাত্র এক একটী বিদেশীয় ডাক্তারের দোহাই দিতে পারিলেই যথেষ্ট। একমাত্র বহুমূত্র পীড়ার ইঞ্জেক্সন এ পর্য্যন্ত কত প্রকারের যে বাহির হইল এবং প্রত্যেকটী দুই তিন চারি বৎসরকাল প্রশংসিত হইয়া পরে দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। এই ভাবে প্রত্যেক পীড়ার জন্য কত নূতন নূতন ইঞ্জেক্সন নিত্যই বাহির হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না সুতরাং ইঞ্জেকসন জিনিষটী যে কোন প্যাথির অন্তর্গত তাহা আমরা বলিতে সক্ষম নই, তবে এটী যে মরণপথের সহায় হইয়া লোকের সুস্থ শরীরকে বিষাক্ত করিতে এবং যৎসামান্য পীড়াকেও জটিল ও দুরারোগ্য করিতে বড়ই ক্ষমবান্ সে বিষয়ে আমাদের কোনও সন্দেহ নাই এবং যাঁহাদের সন্দেহ আছে, তাঁহারাও ক্রমে জানিতে পারিবেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, যতই শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হইবে, হোমিওপ্যাথি ততই বিস্তারলাভ করিবে, কিন্তু ইহার মূল সত্য সকল একেবারে চিরন্তন সুতরাং অপরিবর্ত্তনীয়। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, আমাদের দেশে এরূপ একটী সময় আসিবে, যখন একমাত্র হোমিওপ্যাথি ও অস্ত্রচিকিৎসা ব্যতীত বাকি তথাকথিত চিকিৎসা-পন্থাগুলি কোথায় বিলীন হইয়া যাইবে, তাহার স্থিরতা নাই। ব্যবসার খাতিরে বা অনায়াসে প্রচুর অর্থাগমের উদ্দেশ্যে যিনি যে ভাবেই অসত্য প্রচার ও

ইঞ্জেক্‌সনাদির মিথ্যা দ্রব্যের প্রচলন করিবার প্রয়াস পান না কেন, মানবাত্মার চিরন্তন ধর্ম্মই এই যে, সে সত্যই চায় এবং সত্যেরও এমনই মহিমা যে, প্রত্যেক মানবহৃদয়ের নিভৃততম অন্তস্থল হইতে উঁকি মারিয়া কহে—"এই যে আমি আছি!" সত্যকে লোপ করিবার কোনও উপায় নাই, তবে যিনি বা যাঁহারা ইঞ্জেক্‌সনাদি মিথ্যা প্রথার সাহায্যে জগতকে প্রতারিত করিয়া থাকেন, প্রকৃত প্রস্তাবে পরিশেষে তিনি বা তাঁহারাই প্রতারিত হন, এমন কি, তাঁহাদের জীবন পর্য্যন্ত মিথ্যাময় হইয়া উঠে। পরন্তু, সত্যকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান স্বয়ং কহিয়াছেন,—"সম্ভবামি যুগে যুগে।"

হোমিওপ্যাথির ব্যভিচার।

মহর্ষি হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথি অমৃতোপম ও যথার্থ বৈজ্ঞানিক। যে সকল তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সত্যান্বেষী ব্যক্তি এই পরম রমণীয় হোমিওপ্যাথির তত্ত্বের ভিতর প্রবেশলাভ করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই ইহার গুণে মুগ্ধ। জগতের প্রত্যেক উৎকৃষ্ট জিনিষের একটি অপরিহার্য্য দোষ আছে, তাহা এই যে, ইহা অতি কঠিন আবরণের মধ্যে নিজেকে লুকাইয়া রাখে এবং যে ব্যক্তি ইহার স্বাদ গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করে, তাহাকে বিশেষ পরিশ্রমের দ্বারা, এই কঠিন ত্বক ভেদ করিতে হয়, তবেই ইহার মধুরতা আস্বাদ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। হোমিও-প্যাথি একটী ঐ জাতীয় জিনিষ, ইহাকে আয়ত্ত করিতে হইলে অনেকটুকু পরিশ্রম ও ত্যাগ প্রয়োজন। তাহা না করিয়াই যে ব্যক্তি আশা করে

যে, লোকে তাহাকে একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বলুক, তাহার সে আশা সফল ত হয়ই না, উপরন্তু হোমিওপ্যাথির যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া থাকে, অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের দুর্দ্দশা ত হইয়াই থাকে, তাহার উপর পথটীরও দুর্নাম ও কলঙ্ক রটনা হওয়া স্বাভাবিক।

নানা দেশে, বিশেষতঃ আমাদের দেশে এবং আবার সর্ব্বাপেক্ষা কলিকাতা সহরে, হোমিওপ্যাথির এত ব্যভিচার হইতেছে যে, মনে করিলেও দারুণ কষ্ট হয়। কলিকাতাতে যে সকল ধীর ও মনস্বী হোমিওপ্যাথ আছেন, তাঁহারা অবশ্য সকলেরই নমস্য ও পথ-প্রদর্শক, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। অধিকাংশ হোমিওপ্যাথই কেবলমাত্র নামে হোমিওপ্যাথ, কাজে কর্ত্তব্যে হোমিওপ্যাথির নামে ব্যবসাদারী করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করাই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, হোমিওপ্যাথির নির্ম্মলত্ব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিয়া নিজের অর্থাগমের ও লোকসমাজের কল্যাণ-সাধন তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয়। কলিকাতার বিশিষ্ট ও খ্যাতনামা চিকিৎসকদিগের মধ্যেও এই শ্রেণীর লোক আছেন, ইহাই অতিশয় পরিতাপের কথা। মাসিক পত্রিকাও কয়েকখানি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে ঐ সকল চিকিৎসক "হোমিও-প্যাথিক ইন্‌জেক্‌সন" সমর্থন ও প্রচার করিতেছেন। আশ্চর্য্য কথা! 'হোমিওপ্যাথিক ইন্‌জেক্‌সন'! আরও আশ্চর্য্যতর কথা এই যে, এই সকল ব্যক্তিদের দ্বারা ইহার একান্ত সমর্থন! কেহ লিখিতেছেন—"অভিনব আবিষ্কার", কেহ লিখিতেছেন—"হোমিওপ্যাথির উপর বৈজ্ঞানিক উন্নতি", আবার কেহ বা লিখিতেছেন—"স্থলবিশেষে যখন অতিশয় দ্রুত ক্রিয়া প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ যেখানে রোগীর জীবনী-শক্তি শীঘ্র শীঘ্র লোপ পাইতেছে, সেই বিপজ্জনক অবস্থার জন্য আমরা বহু গবেষণা করিয়া আজকাল বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই হোমিওপ্যাথিক ইঞ্জেক্‌সন বাহির করিয়াছি, ইহাতে চিকিৎসা-জগতে প্রকৃতই যুগান্তর আনিয়াছে", ইত্যাদি ইত্যাদি। কি মোহন কথা,

সাধারণ লোকেও এই মনোহর কথায় বেশ মুগ্ধ হইয়া "হোমিওপ্যাথিক ইন্‌জেকসন্‌" লইবার জন্ত ব্যগ্র হইয়া থাকে। ঐ মাত্র নামধারী হোমিও-প্যাথগণ প্রকাশ করেন যে, হোমিওপ্যাথি ঔষধ অপেক্ষা ইন্‌জেক্‌সনের কার্য্য আরও দ্রুততর, কাজেই রোগীর কঠিন অবস্থায় লোকে ইন্‌জেক্‌সনের জন্ত ব্যগ্র না হইবে কেন? প্রকৃত হোমিওপ্যাথ হইলে অবশ্য জানিতে বাকি থাকে না যে, হোমিওপ্যাথির ক্রিয়া একবারে স্নায়ুকেন্দ্রের উপরে, কাজেই বিদ্যুতের স্থায়। যে কোনও ইন্‌জেক্‌সনের ক্রিয়া ইহাপেক্ষা অধিক হওয়া ত অতি দূরের কথা, ইহার সমান হইতেই পারে না। মনে করুন, কোনও ঔষধ ইন্‌জেক্‌সন করা হইল, ইহার অর্থ এই যে, ঐ ঔষধটী একেবারে রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত করা হইল, অতএব হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়াপেক্ষা ইহার ক্রিয়া অধিক দ্রুত বা সমান কিরূপে হইতে পারে? অবশ্য এলোপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়াপেক্ষা ইঞ্জেক্‌সনের ক্রিয়া দ্রুত হওয়ার সম্ভাবনা বটে। তবে যে ইঞ্জেক্‌সনের সমর্থনকারী হোমিওপ্যাথগণ ঐরূপ প্রচার করিতেছেন, ইহার কারণ কি? কারণ অবশ্য আছে। লোকে জানে যে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মূল্য বড় বেশী নয় এবং ইহাও জানে যে, এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা যে সকল ইঞ্জেক্‌সন দেন, তাহার মূল্য তাঁহারা অতিশয় বেশী বেশী আদায় করিয়া থাকেন, এমন কি, এক একটী ইঞ্জেক্‌সন যাহা উপদংশ বা গনোরিয়া রোগের জন্ত ব্যবহৃত হয়, তাহার দাম ১০৲ হইতে ৫০।৬০৲, এমন কি, ১০০৲ পর্য্যন্তও হইতে পারে। প্রকৃত মূল্য ইহার যাহাই হউক না কেন, রোগীর নিকট কেবল ইঞ্জেক্‌সন নামটীর মাত্র দোহাই দিয়া অনেক টাকা লইবার সুবিধা আছে। এক্ষণে যদি কেবল হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিয়া প্রতি ডোজে ৵০ কি ৶০, জোর ।০ লওয়া হয়, তবে কিরূপে চলিতে পারে? এজন্তই ইঞ্জেক্‌সন। "হোমিওপ্যাথিক ইঞ্জেক্‌সন" নামটী বাহির করিয়া অর্থশোষণ কার্য্যটী বেশ চলিতে পারে। আমাদের মনে হয়, ইহাই একমাত্র

কারণ, নতুবা যে ব্যক্তি আমাদের শাস্ত্র বৎসামান্তও পড়িয়াছেন, তিনিই জানেন যে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ন্যায় দ্রুতগতিতে কাজ করিবার মত অন্য কোনও ঔষধ জগতে নাই। ইহা জানিয়াও তাঁহারা ইঞ্জেক্‌সনের পক্ষপাতী হইবেন কেন। দোহন কার্য্যের স্থবিধার জন্তই তাঁহারা হোমিওপ্যাথিক ইঞ্জেক্‌সন বাহির করিয়াছেন, ইহার সন্দেহ নাই।

ইহা ছাড়া আরও কথা আছে। ইঞ্জেক্‌সন নামটী দ্বারা নিকটস্থ এলোপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের সহিতও "সোলেনামা" করিবার স্থবিধা পাওয়া যায়। এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় আজকাল যে প্রকার কথায় কথায় ইঞ্জেক্‌সন চলিয়াছে, তখন হোমিওপ্যাথ হইয়া ইঞ্জেক্‌সনের পক্ষপাতী হইলে এলোপ্যাথ ও হোমিওপ্যাথ উভয়ে মিলিয়া কোনও রোগীর বাটীতে চিকিৎসা করা চলিতে পারে, পূর্ব্বে সে স্থবিধা আদৌ ছিল না। এক্ষণে লোকে ইঞ্জেক্‌সনের কৃপায় উভয়দলের চিকিৎসকের সাহায্য একত্রেই পাইয়া থাকে, ইহা কি কম স্থবিধার কথা !

প্রকৃত হোমিওপ্যাথ হইতে হইলে অনেক পরিশ্রম করিতে হয়, ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হয়। স্থতরাং এত হাঙ্গামা না করিয়া ইঞ্জেক্‌সনের দ্বারা অর্থাগমের বিশেষ স্থবিধা হয়। তাহার উপর এলোপ্যাথদিগের সহিতও অনেকটা মিল থাকে, অতএব পথটী মনোজ্ঞ ও রোচক, ইহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা জিজ্ঞাসা করি, ঐ ইঞ্জেক্‌সন চিকিৎসার সঙ্গে "হোমিওপ্যাথিক" শব্দটী যোজনা না করিলে ভাল হয় না কি ? হোমিওপ্যাথি অতি পবিত্র জিনিষ, হোমিওপ্যাথি জনকল্যাণকারী, এমন কি, হোমিওপ্যাথি স্বর্গীয় পথ। ইহার সর্ব্বনাশ সাধনটী কি না করিলেই নয় ? জীবিকা নির্ব্বাহের পথ ত অনেক আছে, তবে পবিত্র জিনিষটীকে নষ্ট করিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করা এবং পাপের পথ প্রশস্ত কি না করিলেই নয় ? হোমিওপ্যাথি করিবেন, করুন, ইন্‌জেকসন করিবেন, করুন, কাহারও কোন আপত্তি নাই, কিন্তু

হোমিওপ্যাথিক ইন্‌জেকসন অর্থাৎ হস্তিনীর অশ্বডিম্ব, সোনার পাথরবাটী, কাঁঠালের আমসত্ত্ব,—কোথায় পাইলেন? যাহার দোহাই দিয়া অন্নসংস্থান তাহারই সর্ব্বনাশ করা কখনও উচিত নয়!

প্রকৃত হোমিওপ্যাথের একটী মাত্র খাঁটী লক্ষণ আছে, যে লক্ষণটীর দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, এই ব্যক্তি প্রকৃত হোমিওপ্যাথ, কি একজন নামধারী ব্যবসাদার মাত্র। যিনি প্রকৃত হোমিওপ্যাথির মন্ত্রে দীক্ষিত ও প্রকৃত হোমিওপ্যাথ, তিনি অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিবেন, তাহাও স্বীকার, কিন্তু তিনি কদাচই ব্যভিচার করিবেন না। সৎ বা সতী একেরই ভজনা করে, প্রাণে একেরই পূজা করে, সে কখনই পাত্রান্তর অন্বেষণ করে না। প্রকৃত হোমিওপ্যাথেরও তাহাই লক্ষণ, কেননা হোমিওপ্যাথি সত্য পদার্থ, ইহার তত্ত্ব আত্যন্তিক সত্য, সুতরাং হোমিওপ্যাথির অনুসরণ যাহারা মনে প্রাণে করিয়া থাকেন, তাঁহারা কখনই ব্যভিচার করিবেন না,—একথা ধ্রুব সত্য।

কিন্তু যাঁহারা হোমিওপ্যাথিক ইন্‌জেকসনের পক্ষপাতী, তাঁহারা অনেকে হয়ত বলিবেন—"আপনাদের এ সকল গোঁড়ামি। আপনারা পুরাতনকেই দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিতে চান, আজকালকার বৈজ্ঞানিক হিসাবে নিত্য নূতন তত্ত্ব, সকল বিভাগেই বাহির হইতেছে, সেই প্রকার হোমিওপ্যাথিতেও কোনও নূতন তত্ত্বের অবতারণা করিলে, কোথায় আমরা বিশেষ শ্লাঘার পাত্র হইব, না আপনারা আমাদের কার্য্যের জন্য নিন্দা করিতেছেন।" কথাগুলি সাধারণের নিকট বিশেষ মুখরোচক বটে, কেননা সকল বিষয়েই ক্রমিক উন্নতি কে না চায়? এদিকে এলোপ্যাথিক জগতে ইন্‌জেক্‌সন লইয়া অতিশয় হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে, নিত্য নূতন বিধি ব্যবস্থা বাহির হইতেছে, সুতরাং উহার সহিত সামঞ্জস্য না রাখিলে চলিবে কেন? সেই পুরাতন কথা ও সেই পুরাতন নিয়মগুলি লইয়া আজকাল কি আর এই সমাজে বিকান যায়? শুনিতে অতি মধুর। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সত্যের আবার ক্রমোন্নতি কি?

যাহা সত্য, তাহা চিরন্তন সত্য, তাহা দেশ, কাল, পাত্র হিসাবে পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। যদি হোমিওপ্যাথিক তত্ত্বের ভিতর প্রকৃত পক্ষে প্রবেশ লাভ হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে বাকি থাকে না যে, হোমিওপ্যাথিক তত্ত্বের কোনও পরিবর্ত্তন আদৌ অসম্ভব। যেমন মাধ্যাকর্ষণ একটী সত্য, তেমনই হোমিওপ্যাথির তত্ত্ব একান্ত সত্য। দেশ, কাল, পাত্র হিসাবে যদি কখনও স্বাভাবিক নিয়মের পরিবর্ত্তন সম্ভব হয়, তবে ইহারও হইবে। এলোপ্যাথিতে কোনও সত্য পদার্থ নাই। তাহার ক্রমোন্নতি হওয়া এবং ক্রমে ক্রমে প্রকৃত সত্যে পৌছান সম্ভব, কিন্তু যে জিনিষ সত্য, তাহার আর ক্রমোন্নতি কি হইবে? কাজেই এ সকল ওজর বাজে ওজর মাত্র। আসল কথা, লোককে মিষ্ট কথায় ও চাকচিক্য দেখাইয়া প্রলোভিত করা এবং অর্থ শোষণ করা। তাহাতেও আমাদের আপত্তি নাই, তবে সবিনয় এবং কৃতাঞ্জলিপুটে অনুরোধ যে, দয়া করিয়া ইন্‌জেকসনের সহিত হোমিওপ্যাথির সংযোগ না করিয়া কেবল ইন্‌জেক্‌সন বলিলেই আমরা কৃতার্থ হইব। "হোমিওপ্যাথিক ইঞ্জেক্‌সন" শুনিতেও যেন কেমন বোধ হয়, ইহার পরিবর্ত্তে ইঞ্জেক্‌সন নাম দিয়া ইঞ্জেক্‌সনের দোকান খুলিয়া ইঞ্জেক্‌সন চিকিৎসা করিয়া নিজেরা অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন, তাহাতে আমাদের বা হোমিওপ্যাথির কোনও আপত্তি নাই।

প্রায় অনেকেই নানাভাবে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার মধ্যে নানা ব্যভিচার প্রবেশ করিয়াছে ও করিতেছে বলিয়া আক্ষেপাদি করিয়া থাকেন, কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা যে, ইহার প্রতীকার হওয়া ত দূরের কথা, নিত্যই ব্যভিচার বৃদ্ধির পথেই চলিয়াছে। প্রতীকার কে করিবে? হোমিওপ্যাথি সম্পূর্ণভাবে অরাজক ক্ষেত্র,—যাহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতেছ ও করিবে, সে বিষয়ে আক্ষেপ করা বৃথা। ফলতঃ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছি যে, ইহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জ্ঞান-পাপ, কাজেই ইহার সংশোধন সুদূরপরাহত। যেখানে

ব্যভিচার সকল অজ্ঞতাজন্য হইয়া থাকে, সেখানেই সংশোধনের উপায় থাকে, আর যেখানে জ্ঞানতঃ ব্যভিচার অবলম্বিত হয়, সেখানে উপায় কি ?

মনুষ্যের কার্য্যে, অন্যায় পথ হইতে ন্যায় পথে আনিবার ও ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, দুইটী প্রবল শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ১মতঃ, "ধর্ম্মজ্ঞান",—তাহা ত আজকাল লোপ পাইয়াছে, বলিলেই হয়। যাঁহারা উচ্চতর স্তরের ব্যক্তি, তাঁহাদের অন্তরে ধর্ম্ম প্রবৃত্তিই একমাত্র ন্যায়পথে চলিবার জন্য তাড়না দেয়, তাহার ফলে, তাঁহারা সকল বিষয়েই ন্যায় পথে বিচরণ করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ,—সাধারণ ব্যক্তিদের পক্ষে "লোকমত" একটী প্রবল শক্তি,—তাঁহারা লোকমতের ভয়েও অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত হন, তাঁহাদের অন্তরে ধর্ম্মজ্ঞান ততটা পরিস্ফুট না হইলেও তাঁহারা "লোকমত" অপেক্ষা করিয়া প্রত্যেক কার্য্য করিয়া থাকেন। এই দুইটী শক্তিই আজকালকার সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে,—ইহা সকলেই জানেন। সুতরাং এই অবস্থা।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কার্য্যটী যাঁহারাই অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই প্রাণে প্রাণে হোমিওপ্যাথ নহেন, অর্থাৎ প্রত্যেকেই যে ইহার সত্যে ও পবিত্রতায় একান্ত মুগ্ধ হইয়া এই প্রথায় চিকিৎসা অবলম্বন করিয়াছেন, এরূপ ধারণা করা চলে না। যাঁহারা মনে প্রাণে প্রকৃত হোমিওপ্যাথ, তাঁহারা কখনই প্রাণান্তেও ব্যভিচার অবলম্বন করিবেন না, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা হাজারে দুই একটী মাত্র। তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে হ্যানিমান্‌কে অনুসরণ করিয়া চিকিৎসা করেন। হ্যানিমানের হোমিও-প্যাথিতে হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রজ্ঞান ব্যতীত আরও অনেক বিষয় আছে এবং কেবলমাত্র শাস্ত্রজ্ঞানের অধিকারী হইলেই হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথি আয়ত্ব হয় না। **হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথির প্রাণ,—পবিত্রতা এবং ভগবৎ প্রমুখতা।** যিনি যত বড় হোমিওপ্যাথ হউন না কেন, শাস্ত্রজ্ঞান

তাঁহার যতই থাকুক না কেন, তিনি যদি মনে প্রাণে পবিত্র না হন এবং প্রত্যেক রোগীর চিকিৎসাটী ভগবানের দাসভাবে অবলম্বন না করেন, তিনি বড় "নামজাদা" হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হইতে পারেন বা যথেষ্ট অর্থও উপার্জ্জন করিতে পারেন, কিন্তু হ্যানিমানের পথে না থাকায় তাঁহাকে প্রকৃত হোমিওপ্যাথ বলা যায় না। ফলতঃ সেরূপ প্রকৃত হোমিওপ্যাথ অতি বিরল।

প্রকৃত হোমিওপ্যাথিতে অহঙ্কারের স্থান নাই। যে ব্যক্তি প্রকৃত জ্ঞানী, তিনি বিনয়ী না হইয়া পারেন না, তাহার উপর চিকিৎসক, তাহার উপর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক,—অনেক উচ্চস্তরের ব্যক্তি, বিনয়ী, নিরহঙ্কারী এবং ভগবৎপ্রাণ না হইলে প্রকৃত হোমিওপ্যাথ হওয়া যায় না। দাম্ভিকের হৃদয়ে কোনও তত্ত্ব বা সত্য কখনও স্ফুরিত হয় না, হইতে পারে না। ভগবানের নিকট, সাহায্যের জন্য, সে চিকিৎসক সর্ব্বদাই বিনীতভাবে প্রার্থনা করেন, যেহেতু তিনি বরাবরই মনে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন যে, ভগবান্ যাহাকে আরোগ্য করেন, সেই আরোগ্য হয়, চিকিৎসক একান্তই শক্তিহীন, প্রতিপদে ভগবৎকরুণা ব্যতীত অগ্রসর হইবার উপায় নাই। এরূপ ব্যক্তি সর্ব্বদাই সত্য তত্ত্ব ও প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করেন, পাছে নিজের ভ্রান্তি থাকে, এজন্য সর্ব্বদাই অবহিত চিত্তে কার্য্য করেন,—সত্যই তাঁহার জ্ঞান, সত্যই তাঁহার ধ্যান, যেহেতু সত্যই ভগবানের বাণী। এরূপ চিকিৎসকের ব্যভিচারী হওয়া অসম্ভব।

বড় বড় সহরে আজকাল এক শ্রেণীর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক আছেন, তাঁহারা অনেকেই দেশ বিদেশের উপাধিমণ্ডিত; শিক্ষা হিসাবে, এই শ্রেণীর মধ্যে অবশ্য অনেকেই বেশ উচ্চ শিক্ষিত ও সুপণ্ডিত,—কিন্তু তাঁহাদের একটী বিষয়ের বড়ই অভাব থাকে,—সেটী বিনয়ের, পক্ষান্তরে তাঁহারা অতিমাত্র দাম্ভিক। আবার এলোপ্যাথিক উপাধির এমনই গুণ

যে, তাঁহারা নিজেদিকে খুবই উচ্চস্তরের চিকিৎসক মনে করেন, যেন তাঁহারা হোমিওপ্যাথি অবলম্বন করায় হোমিওপ্যাথিই ধন্য হইয়াছে, এরূপ ধারণা পোষণ করেন,—তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়াই যেন এলোপ্যাথির স্থলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিয়া থাকেন। সাধারণ লোকেও মনে করে যে, এই সকল চিকিৎসক এলোপ্যাথিক উপাধির মালীক, সুতরাং চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিয়া মনুষ্যের জীবন মরণের কর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছেন। ফলতঃ এ সকল চিকিৎসক আসলে এলোপ্যাথ,—জমীনটা এলোপ্যাথির, উপরে হোমিওপ্যাথির একটি গিল্টি থাকে মাত্র। তাঁহারা এলো-হোমিও চিকিৎসাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে করিয়া থাকেন, তবে লোকে জানে যে, তাঁহারা চিকিৎসাশাস্ত্রের একেবারে চরম দেখিয়াছেন, কাজেই তাঁহাদের কার্য্য সমালোচনার বহির্ভূত। তাঁহারা নিউমোনিয়াতে রোগীর বুকে এন্টিফ্লজিষ্টিনও দেন, স্বেদ মালিশেরও ব্যবস্থা করেন, আবার ব্রাইওনিয়া, নাক্সভমিকা প্রভৃতি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অতি নিম্নশক্তিতে খাইতে দেন এবং যেখানে নিজের অজ্ঞতার দোষে নির্ব্বাচনের ভ্রান্তি ঘটে বা মিশ্রিত ভাবে চিকিৎসার সুফল না ফলে, সেখানে হোমিওপ্যাথির অসারতা বা অসম্পূর্ণতা কীর্ত্তন করিতে থাকেন এবং লোককে নানা কথার ছলে বুঝাইয়া দেন যে, এলোপ্যাথিতেও জ্ঞান থাকার জন্যই, যখন যেটী ব্যবহার করিলে রোগীর পক্ষে মঙ্গল হইবে, ইহা জানিতে তাঁহারা সক্ষম হইয়াছেন এবং যাঁহারা কেবলই হোমিওপ্যাথির চর্চ্চা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে এ ক্ষমতা কখনও সম্ভবপর নয়। এই সকল এলো-হোমিও শ্রেণীর চিকিৎসকদের হাতে প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক আরোগ্য কখনও সম্ভব হয় না, তাঁহাদের কুচিকিৎসার দোষে রোগী এক সপ্তাহের স্থলে ৫।৬ সপ্তাহকাল পীড়ায় জর্জ্জরিত হইয়া যদি কোনও প্রকারে বাঁচিল, তবে লোকে বলে, "একেবারে যমের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া রোগীটিকে ফিরাইয়া-

ছেন,—একি অন্য ডাক্তারের ক্ষমতা আছে?" ইত্যাদি। বর্ব্বর লোকে বুঝে না যে, প্রকৃত লোকের হাতে অতি অল্প দিনের মধ্যে রোগী আরাম হইয়া যাইত। এ সকল চিকিৎসকের নিকট ব্যভিচার বলিয়া কোনও কথা থাকিতে পারে না, কেন না ইহারা অতি মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিয়া বলিয়া বেড়ান যে, "আমাদের কোনও প্রকার গোঁড়ামি নাই,—রোগীর পক্ষে যখন যেটা ভাল, তাহা অবশ্যই করিয়া থাকি ও করিব, তাহাতে এলোপ্যাথিই বা কি, আর হোমিওপ্যাথিই বা কি!" বড়ই চমৎকার কথা এবং এরূপ উদার বাক্য শুনিলে প্রাণ মন মুগ্ধ হইয়া উঠে এবং সাধারণ লোকে তারস্বরে ঘোষণা করিয়া বেড়ায় যে, "এরূপ ডাক্তারই ডাক্তার, কেননা, রোগীর প্রতি কত যত্ন ও নজর, যখন যেটা প্রয়োজন তাহাই করা কি অন্য কোনও ডাক্তারের দ্বারা হইতে পারে,—ইঁহার সবদিকে অদ্ভুত জ্ঞান রহিয়াছে, তাই ইনি বুঝিতে পারেন, অন্যে কি বুঝিবে?" এ প্রকার চিকিৎসক এক শ্রেণীর উচ্চাঙ্গের ব্যভিচারী, কিন্তু সাধারণের নিকট অনেকটা পূজ্য হইলেও সমব্যবসায়ী সুধী চিকিৎসকদিগের সমাজে ঘৃণ্য এবং তাঁহাদের অন্তরাত্মার নিকট ও ভগবানের নিকট একান্ত অপরাধী।

আবার এই শ্রেণীর মধ্যেই একদল চিকিৎসক আছেন যাঁহাদের নাম প্রাতঃস্মরণীয়। তাঁহারা নানা উপাধিমণ্ডিত হইলেও, প্রথমেই এলোপ্যাথির অসারতা প্রাণে প্রাণে হৃদয়ঙ্গম করিয়া এলোপ্যাথিকে চিরদিনের মত ত্যাগ করিয়া হোমিওপ্যাথি অবলম্বন করেন ও করিয়া থাকেন এবং যদি কেহ প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, "আপনার এত আয় ও এত নাম থাকা সত্ত্বেও এলোপ্যাথি ত্যাগ করিলেন, ফলতঃ চলিবে কিসে?" তখন ইহারাই অম্লানবদনে উত্তর দিতে পারেন যে,—"বরং পান বিড়ির দোকান করিব, তবু ভ্রান্তপথে লোকের সর্ব্বনাশ করিতে পারিব না,"—এ সকল চিকিৎসক

জগৎবরেণ্য, সত্যের ও ভগবানের দাস, জগতের কল্যাণকামী, ব্যভিচার বলিয়া কোনও জিনিষ ইহাদের নিকট যাইতে পারে না। এ সকল চিকিৎসক প্রকৃতই হোমিওপ্যাথ নামের যোগ্য!

সহরে ও পল্লীগ্রামে এরূপ কতকগুলি লোক দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা হোমিওপ্যাথির সত্যে মুগ্ধ, কিন্তু সেরূপ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও ভাষাজ্ঞান না থাকায়, তাঁহারা বিশেষ কিছু উন্নতি করিতে না পারিলেও নিজ নিজ গৃহস্থে ও নিকটবাসীদিগের মধ্যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করেন, তাহাদিগকে যদিও চিকিৎসক বলা যায় না, তবুও তাহাদের দ্বারা অনেক কল্যাণ সাধন হইয়া থাকে, ইহা আমরা জানি ও নিত্যই দেখিতেছি। এই সকল ব্যক্তি সময়ে সময়ে আবশ্যক হইলেই সহরের খ্যাতনামা চিকিৎসকদিগের নিকটে আসিয়া উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন ও যে সকল ক্ষেত্রে তাহাদের জ্ঞানানুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছেন, সেই সকল ক্ষেত্র-সম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট আলোচনা করিয়া নিজের নিজের জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে সর্ব্বদাই ব্যগ্র থাকেন। আমি এ সকল গৃহস্থ চিকিৎসক মহাশয়গণকে প্রাণের সহিত সমাদর করিয়া থাকি ও তাঁহারা যখন আসেন, তখন নিজের সহস্র কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করি। তাঁহারা হোমিওপ্যাথিক সমাজের কল্যাণকামী এবং ভ্রমেও কখনও ব্যভিচারের নাম গ্রহণ পর্য্যন্ত করিতে পারেন,—এরূপ ব্যক্তি এই শ্রেণীর মধ্যে আমি কখনও দেখি নাই।

কি সহরে, কি পল্লীগ্রামে, আরও এক শ্রেণীর চিকিৎসক আছেন, যাঁহারা এলোপ্যাথিক কোনও স্কুল বা কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, অথবা মাত্র ২।১ বৎসর কাল পড়িয়া এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এক্ষণে, রোগী আরোগ্য করিবার মত ততটা জ্ঞান না থাকায়, তাহা ছাড়া,

নিকটবর্ত্তী কোনও কোনও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের দ্বারা অনেক রোগী আরোগ্য হইতেছে ও সেজন্য অনেক লোক ঐ সকল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের নিকটেই চিকিৎসার জন্য যায় ও যাইতেছে দেখিয়া, তাঁহারা একটী হোমিওপ্যাথিক বাক্স, ২৫।৩০টী ঔষধ ও একখানি অল্প মূল্যের "গৃহ-চিকিৎসা" রাখেন এবং যখনই কেহ হোমিওপ্যাথির গুণকীর্ত্তন করেন বা অমুক হোমিওপ্যাথের নিকট অমুক রোগী আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া বর্ণনা করেন, তখনই নিজেরা যে এক এক জন হোমিওপ্যাথিতে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি, ইহাই প্রকাশ করেন এবং আবশ্যক হইলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ তাঁহাদের নিকটেই পাওয়া যাইবে, একথা ঘোষণা করেন। এ সকল চিকিৎসক,—না এলোপ্যাথ, না হোমিওপ্যাথ, কোনও প্যাথই নহেন, পাছে রোগী হাত-ছাড়া হয়, এজন্য হোমিওপ্যাথির একটি "ভান" রাখিয়া দেন ও হোমিও-প্যাথিক ঔষধ দিয়া প্রত্যেক পদেই বিফল মনোরথ হইবার পরেই হোমিওপ্যাথির অসারতা কীর্ত্তন করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন। ফলতঃ এ সকল চিকিৎসক-নামধারীদিগের নিকট সত্য বলিয়া কোনও দ্রব্য কখনও স্থান পায় না এবং এ সকল ব্যক্তি ব্যভিচার, অভিচার, দুষ্টাচার অনাচার প্রভৃতি নির্ব্বিচারে প্রয়োগ করিতে আদৌ কোনও দ্বিধা করেন না,—এ সকল ব্যক্তির পক্ষে ইঞ্জেক্সন প্রথা একটি শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, নতুবা নিজেদের সম্মান রক্ষা ও অন্নকষ্ট দূর করা অসম্ভব হয়। তাঁহাদের উপায়ান্তর নাই, তাঁহাদের কোনও জ্ঞান না থাকায়, ইঞ্জেক্সনের বাঁধা ব্যবস্থায় চিকিৎসা করা বিশেষ সুবিধাজনক হইয়া উঠিয়াছে,—ইহাতে লোককে মুগ্ধ করিবার এবং অর্থ শোষন করিবার উভয় দিকেই পথ প্রশস্ত, কাজেই ইঞ্জেক্সনই ইহাদের প্রধান অবলম্বন। তাহার উপর কলিকাতার ও বড় বড় সহরের বড় বড় এলোপ্যাথগণ সর্ব্বদাই ইঞ্জেক্সন ব্যবহার করায় নজীরের কোনও অভাব থাকে না, লোকেও বিশ্বাস করিতে বাধ্য হয়। এ সকল ব্যক্তি

চিকিৎসক পদবাচ্য নহেন, কেবল সমাজকে ঠকাইয়া নিজেদের উদর পূরণ করিয়া থাকেন,—সুচিকিৎসকগণ যতই শিক্ষাদান ও দোষারোপ করুন না কেন, ইহারা জ্ঞানপাপী এবং উপায়ান্তর না থাকায় নিজেদের অভ্যাস কখনও পরিত্যাগ করিবেন না, আশাও করিতে নাই।

যাঁহাদের সামান্যমাত্রও ধর্ম্মজ্ঞান থাকে, তাঁহাদিগকে ইঞ্জেক্সন ত্যাগ করিতে উপদেশ দিতে হয় না, একেই ত তাঁহারা এ প্রথা অবলম্বনই করেন না, ফলতঃ যদিই বা কাহাকেও অনুসরণ করিয়া প্রথম অবলম্বন করিয়া ফেলেন, তাহা হইলেও শীঘ্রই ইহার কুফল পরিদর্শন করিয়া অবিলম্বেই ত্যাগ করিয়া থাকেন। যাঁহাদের ধর্ম্মজ্ঞান ও সত্যনিষ্ঠা নাই, তাঁহাদিগকে যতই উপদেশ দেওয়া হউক না কেন, তাঁহারা উহা কদাচই ত্যাগ করিবেন না। কলিকাতায় যে সকল উচ্চ উপাধিধারী বড় বড় চিকিৎসক আছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বহুদিন হইতে ইঞ্জেক্সন প্রথা অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিতেছেন, তাঁহারা কি ইহার কুফল বুঝেন না? তাঁহারা অনেকেই উচ্চস্তরের সুপণ্ডিত ও তীক্ষ্ণ মেধাবীযুক্ত, অথচ ঐ কুপ্রথার ফল আজ পর্য্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, একথা আমাদের প্রতীতি হয় না, তাঁহারা জানিয়া শুনিয়া এই ঘোর তামসিক কার্য্য করিতেছেন ও করিবেন, কদাচই নিরস্ত হইবেন না। কেন? তাঁহাদের ধর্ম্মজ্ঞানের অভাব এবং ইহাতে অনায়াস-লব্ধ অর্থাগমের সুবিধা যথেষ্ট, এই সুবিধা ত্যাগ করিয়া তাঁহারা কিরূপে চলিবেন? তাহা ছাড়া ঐ সকল চিকিৎসক মহাশয়গণ জানেন যে, তাঁহাদের চিকিৎসা প্রথায় রোগীর কোনও উপকার হয় না, বরং রোগ বৃদ্ধি হয়, এক্ষণে ঐ প্রকার আশু উপশমকারী ও ভবিষ্যতে মারাত্মক প্রথা ত্যাগ করিয়া কিরূপে সংসার চালাইবেন। ইহাই ইহার আসল কথা, ইহাই সারতত্ত্ব। ধর্ম্মবোধ থাকিলে এ সকল বহু পূর্ব্বে লোপ পাইত, ধর্ম্মজ্ঞান নাই, আমরা ইহা অনেকদিন হইতে হারাইতে আরম্ভ

করিয়াছি, পাশ্চাত্য অনুকরণে অর্থই একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছে, যেন তেন প্রকারেণ অর্থোপার্জ্জনই পরম পুরুষার্থ হইয়াছে।

তবে কি উপায় নাই? এ সকল কুপ্রথা নিবারণের উপায় থাকিলেও কেবল আপনার বা কেবল আমার হাতে নাই। সুদৃঢ় লোকমত গঠিত না হইলে এই মারাত্মক প্রথার উপায় হইতে পারে না। কিন্তু সে প্রকার লোকমত গঠন হইবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। আমি নিজে জানি, কলিকাতা ও বড় বড় সহরে উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগের গৃহস্থেও এলোপ্যাথি ও ইঞ্জেক্সনের তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে, এমন কি, কোন কোন স্থলে আহুত হইয়া তাঁহাদিগকে সত্য বিষয়ে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ, এমন কি হাস্যাস্পদ হইতে হয়। তাঁহারা উচ্চাঙ্গের শিক্ষিত হইয়াও চিকিৎসা বিষয়ের কোনও সংবাদই রাখেন না, রাখাটী যেন অপমান-সূচক বলিয়া মনে করেন। কেই বা কাহাকে বুঝায়, স্থিরতা নাই, গাম্ভীর্য্য নাই, অনুসন্ধিৎসা নাই,—আছে দাম্ভিকতা, আছে বিলাস, আছে ধনের চাঞ্চল্য,—কে কাহার কথা শোনে? তাঁহারা জানেন যে Captain ......I. M. S, Dr......M. D., যাহা বলেন, তাহাই চিকিৎসা বিষয়ের শেষ কথা, অন্যে আবার কে কি জানে? তাহা ছাড়া ইঞ্জেক্সন আর ডাক্তারকে আসিয়া দিতে হয় না, আজকাল বাড়ীর স্ত্রীলোকগণই যথেষ্ট "enlightened" হইয়াছেন, তাঁহারা নিজে নিজেই, সামান্য মাথা ধরিলেই বা হাত পা কামড়াইলেই ইঞ্জেকসন লইয়া থাকেন। কয়েক মাস অতীত হইল, কোনও ধনী গৃহস্থের স্ত্রীলোকেরা আমাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়া আমার কন্যা ও স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন—"আমরা, ভাই যখন তখন আর ডাক্তার ডাকি না, ঘরে নানারকমের ইঞ্জেক্সন ও নিড্‌ল রাখিয়াছি, সামান্য কিছু হইলেই এক আধটা ইঞ্জেক্সন লই।" উন্নতির চরম সীমা, আর চিন্তা কি?

যাহাই হউক, লোকমত গঠিত না হইলে ইহার কোনও প্রতীকার হইবে বলিয়া মনে হয় না। লোকে যখন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিবে যে, ইহার ফলে সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে, তখন আপনিই এ প্রথা নিবারণ হইবে। গ্রামে গ্রামে ইহার কুফল প্রচার, সংবাদপত্রে ইহার আলোচনা ইত্যাদি যথেষ্ট সাহায্য করিবে, সন্দেহ নাই। অবশ্য আজকাল অনেক লোকই ইহার কুফল বুঝিতেছেন, ক্রমেই বুঝিবেন, তবে বড় লোকেরা বুঝেন না, বুঝিবেনও না, কারণ বুঝিবার সময় নাই।

অতিশয় দুঃখের কথা এই যে, হোমিওপ্যাথ হইয়া যাঁহারা ব্যভিচার ও ইঞ্জেক্‌সন্ করিয়া থাকেন, লোকে তাঁহাদিগকে ডাকেই বা কেন এবং তাঁহাদের হাতে ইঞ্জেক্‌সনই বা লয় কেন? এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা ঐ প্রথা আজ কয়েক বৎসর অবলম্বন করিয়াছেন এবং তাহার হেতুও আছে,—প্রধান হেতু এই যে, তাঁহাদের ঔষধে কোনও উপকার হয় না বরং অপকার হয়, এই সব দেখিয়া একটী নূতন প্রথা বাহির করিয়া তাঁহারা পরীক্ষা করিতেছেন, কিন্তু হোমিওপ্যাথিরূপ অমিয়পথের যাত্রী হইয়া যাঁহারা ইঞ্জেক্‌সন্ অবলম্বন করেন, তাঁহারা না এলোপ্যাথ, না হোমিওপ্যাথ,—কোনওটার ভিতরেই প্রবেশ করেন নাই, করিবার শক্তি নাই, ইচ্ছাও নাই, কেবল কোনও প্রকারে লোককে চমক লাগাইয়া প্রবঞ্চনা করিয়া অল্প পরিশ্রমে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করাই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। লোকে জানিয়া শুনিয়া এ সকল ব্যক্তির নিকট যায় কেন? ঐ সকল প্রতারক চিকিৎসকগণ কৃপা ও ঘৃণার কার্য্য করিয়া থাকেন। হোমিওপ্যাথির ভিতর প্রবেশ করিবার মত মেধা নাই, জ্ঞান নাই,—এদিকে অন্য কার্য্য করিবার মত ক্ষমতাও নাই, এলোপ্যাথি চিকিৎসা করিতে হইলে পরীক্ষায় পাশ করিতে হয়, নতুবা দণ্ডনীয় হইবার ভয় থাকে, কাজেই হোমিওপ্যাথিক অরাজক রাজ্যে প্রবেশ করিয়া থাকেন কিন্তু "ঘটে বুদ্ধি নাই," কি করিবেন? ইঞ্জেক্‌সন

প্রভৃতি চাকচিক্যের সাহায্যে সমাজের অনিষ্ট করিয়া নিজের উদর পূরণ করাই সহজ মনে করেন। লোকে ঐ সকল ভণ্ডের নিকট না গিয়া, অধিকন্তু, উহারা যে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রবঞ্চক, একথা ক্রমাগত প্রকাশ করিতে থাকিলেই ঐ দলটী উপযুক্ত শিক্ষা পায় ও নিরস্ত হইতে পারে। নতুবা উপায় কি ?

হোমিওপ্যাথ হইয়া বাহ্য প্রলেপাদি প্রয়োগ করাকে আজকাল দোষ দিলে চলিবে না, কারণ কলিকাতার মহামহারথীগণও দেশ বিদেশের উপাধি মণ্ডিত হইয়াও ঐ প্রথা অবলম্বনে সুখ্যাতি ও দম্ভের সহিত চিকিৎসা করিতেছেন। ঢাকা বা অন্যান্য সহরের বা পল্লীগ্রামের চিকিৎসকের দোষ দিলে কি হইবে ? এ সকল ব্যক্তি আবার এতই স্ফীত, যে "হ্যানিম্যান সব জায়গায় ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই," "কেণ্ট আবার কি ডাক্তার, যে তাঁহার কথা শুনিতে হইবে," ইত্যাদি কথাও নির্লজ্জতার সহিত বলিয়া বেড়ান। অন্য পরে কা কথা ? এ জগতের ইতিহাসে চিরদিনই দেখা যায় যে, কোনও এক মহাপুরুষ আসিয়া একটী সত্য প্রচার করিয়া যাইবার পর কতকগুলি অসুর প্রকৃতির লোক সেই মহান্ সত্যটিকে কলঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে, কিন্তু দুই চারিজন খাঁটি লোক অতি যত্নে ঐ সত্যটিকে যেন বুকে করিয়া রক্ষা করে, আবার যখনই সে প্রকার আবশ্যক ঘটে, তখনই "ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" এই মহাবাক্য অনুসারে, কোনও মহাপুরুষ, কোনও অবতার পুরুষ, জন্মগ্রহণ করিয়া হোমিও সত্যকে সংরক্ষণ করিবেন,—ইহার সন্দেহ নাই। প্রলয়পয়োধি-জলে বেদও ঐ ভাবে রক্ষিত হইয়াছিল, হয় ও হইবে, আমাদের চিন্তার কোনও কারণ নাই,—যাঁহার সত্য, যাঁহার সৃষ্টি, তিনিই রক্ষা করিবেন। সত্য অক্ষয়, সত্য অমর। সুরাসুরের যুদ্ধ চিরদিনই আছে, থাকিবে,—ইহা সৃষ্টি স্থিতি লয়ের একটী তত্ত্ব বিশেষ, কিন্তু অসত্যেরই ধ্বংস হয়, সত্য বজায় থাকে, ভয়ের কোনও কারণ নাই।

হোমিওপ্যাথির শিক্ষা ও প্রচার।

আমাদের মধ্যে অনেকেই হোমিওপ্যাথির কল্যাণকল্পে এবং ইহার বিহিত ভাবে শিক্ষা ও বিস্তারোদ্দেশ্যে নানা ভাবে যত্নবান্ আছেন,—তাঁহারা অবশ্যই ভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্তির যোগ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফলতঃ তাঁহাদের কল্যাণময়ী চেষ্টা ফলবতী না হইবার অনেক কারণ বিদ্যমান থাকায় কার্য্যতঃ কিছুই হইতেছে না এবং ভবিষ্যতে হইবে বলিয়াও বেশ আশা হয় না। এই অমৃতময়ী চিকিৎসা-প্রথাই যে একমাত্র চিকিৎসা-প্রথা, এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন কয় জন? বোধ হয়, এক সহস্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মহাশয়দিগের মধ্যে একজনও প্রকৃত শ্রদ্ধাবান্ চিকিৎসক পাওয়া কঠিন। আমার একথায় হয়ত কেহ কিছু মনে করিতে পারেন, কিন্তু একথা অতিমাত্র সত্য,—তবে সত্য কথা কখনও মিষ্ট হয় না, এজন্য অনেকের বিরাগ-ভাজন হইতে হয়। আমি আজ ৪০ বৎসর কাল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি, তাহাই কহিতেছি। যদি সাধারণ চিকিৎসক ভ্রাতাদিগের নিকট একথার জন্য আমি বিরাগের পাত্র হই, তবে তাঁহারা নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করিবেন এবং নিজ নিজ হৃদয়ে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। প্রথম প্রথম যাঁহারা আমার সমক্ষে আসিয়া কহিতেন—"আমরা হোমিওপ্যাথিই একমাত্র চিকিৎসাপথ বলিয়া বিশ্বাস করি", তখন মনে করিতাম, ইহা বুঝি তাঁহাদের প্রাণের কথা, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই প্রমাণ পাইয়াছি,—এ কথা তাঁহাদের "কথার কথা"। বহু বহুবার দেখিয়াছি যাঁহারা বড় বড় হোমিওপ্যাথিক কলেজ বা স্কুলের

প্রতিষ্ঠাতা, স্বত্বাধিকারী, অধ্যক্ষ ইত্যাদি, তাঁহারাও নিজের নিজের নিতান্ত আপনার লোক, অর্থাৎ পুত্র, কন্যা, পত্নী, ইত্যাদির পীড়াতে অতি সমারোহযুক্ত এলোপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ সকল দেখিয়া আর বিশ্বাস আসে না এবং তাঁহারা মুখে যাহা বলেন, তাহার শতাংশের এক অংশও গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

কোনও দেশে, সত্য বা নীতি-বিশেষ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, দেশের সাধারণ জনগণের মনস্তরের অবস্থা নির্ম্মল ও গ্রহণেচ্ছু হওয়া আবশ্যক। হোমিওপ্যাথি বাহিরের নানা দ্রব্যের মত একটী ব্যবসায়ের জিনিষ নয়,—ইহা একটা সত্য তত্ত্ব, সুতরাং ইহা অনুভবের জিনিস। হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া মর্ম্মপ্রদেশে আঘাত না করিলে, ইহার দ্বারা উপকৃত হইবার আশা কোথায়? কেননা অন্তঃস্থলে প্রবেশ না করিলে, ইহার প্রকৃত মাহাত্ম্য, প্রকৃত পবিত্রতা আদৌ উপলব্ধি হইতে পারে না। ফলতঃ তাহা আশা করিতে হইলে, হৃদয় ক্ষেত্রটী অতিমাত্র পবিত্র হওয়া আবশ্যক। আমাদের মনস্তর পরীক্ষা করিলেই বেশ জানা যাইবে যে, আমাদের মন সদা-সর্ব্বদাই অর্থের জন্য ব্যাকুল। প্রকৃত যোগ্যতা যাহার থাকে, তাহাকে অর্থের জন্য ব্যাকুল হইতে হয় না, তাহার অর্থ আপনিই আসে। কিন্তু যাহার প্রকৃত যোগ্যতা নাই, তাহাকেই অর্থের জন্য লালায়িত ও ব্যাকুল হইতে হয়, ফলতঃ সে হৃদয়ে ইহার স্থান নাই, কেননা হৃদয়ক্ষেত্রটী পবিত্র ও ভগবৎমুখী না হইলে, হোমিওপ্যাথি অর্থাৎ প্রাকৃতিক আরোগ্য-নীতি, প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট আরোগ্যতত্ত্ব, সে হৃদয়ে স্ফুরিতই হয় না, হইতে পারে না। সৃষ্টিতত্ত্ব এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের অন্তরালে যে "প্রকৃতি" নাম্নী শক্তি ক্রিয়াশীলা, সেই শক্তিকে মনে প্রাণে অনুভব করিতে হয় নতুবা তাঁহার অনুকুল তত্ত্ব সকল অনুভব করা সুদূর পরাহত। যদি নিতান্ত বাহ্যস্তরের পদার্থনিচয়ের ন্যায়, একোনাইট, বেলেডনা ইত্যাদি ঔষধগুলি জড়ভাবে

ব্যবহার করিয়া ব্যবসা পথে পরিচালিত হইয়া নিজেকে হোমিওপ্যাথ বলিয়া মনে করা হয়, তবে খুবই পরিতাপের বিষয়। হোমিওপ্যাথি শক্তিরাজ্যের ব্যাপার, ইহার ঔষধগুলি জড় নয়, সেগুলিও এক একটী শক্তি, উহাদের ক্রিয়া ক্ষেত্রও শক্তিস্তরে সুতরাং চিকিৎসককে সদা-সর্ব্বদাই শক্তিস্তরে বিচরণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি শক্তিস্তরে বিচরণ করিবেন, তাঁহাকে কত মহান্, কত পবিত্র, কত সূক্ষ্মদর্শী হইতে হয়, তাহা অনুমান-সাপেক্ষ। এ বিষয় অনুমান করিতে হইলেও, যাহার তাহার দ্বারা অনুমান সম্ভব হইবে না, এমন কি, আমার এই সকল মন্তব্য পাঠ করিতে করিতে অনেকেই আমাকে বাতুল বা উন্মাদ পীড়াগ্রস্ত বলিয়া বিবেচনা করিবেন। ফলতঃ তাহাতে আমার ব্যক্তিগত ভাবে কোনও দুঃখ নাই, কেননা আমার উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত নয়। হোমিওপ্যাথ হইলে তাঁহাকে প্রায় divine planeএ বিচরণ করিতে হয়, নতুবা এ তত্ত্বটী তাঁহার হৃদয়ে স্ফুরিতই হয় না।

যাহারা আমার কথার যৌক্তিকতা এবং সত্যতার অনুমোদন করিবেন, তাঁহারাই বুঝিবেন যে, ব্যভিচারী হোমিওপ্যাথি-ব্যবসায়ীমাত্রকে গালাগালি বা উপদেশ বচনের সাহায্যে পবিত্র পথে আনয়ন করিবার প্রয়াস পাওয়া নিরর্থক। জোর করিয়া বা উপদেশ দিয়া কেহ কাহাকেও সাত্ত্বিক করিতে পারেন না। শত শত উপদেশের সাহায্যেও কেহ কাহারও প্রবৃত্তির ব্যত্যয় আনয়ন করিতে পারিবেন না। প্রত্যেকের হৃদয়স্থ অন্তর্য্যামী পুরুষ প্রত্যেকের কর্ম্মফল অনুসারে সে ব্যক্তিকে পরিচালিত করিয়া থাকেন। জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মপ্রবাহের ফলে, প্রত্যেকের স্বভাব বা প্রকৃতি গঠিত হইয়া থাকে এবং সে ব্যক্তি সেই স্বভাব বা প্রকৃতি অনুসারেই কর্ম্মানুবর্ত্তী হইয়া থাকে, শত সহস্র উপদেশও,—যেখানে ঐ স্বভাব বা প্রকৃতির প্রতিকূল হয়,—সেখানে কোনও ফলই প্রদর্শন করে না, তবে যেখানে অনুকূল হয়, সেখানেই উপদেশ কার্য্যকরী হইতে পারে। প্রবৃত্তির অনুকূল উপদেশ সে

স্থলে কেবল "উত্তেজক কারণের" কার্য্য করে,—প্রকৃত কারণ, অর্থাৎ সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি, তাহার মধ্যে অন্তর্নিহিতই ছিল, উপদেশ কেবল সাহায্য করিয়া থাকে মাত্র।

তবে কি উপদেশের কোনও সার্থকতা নাই? ইহার উত্তরে কহিতে হইবে যে, অনুকূল স্তরে উহা সার্থক, অন্য স্থলে নিরর্থক, অথবা তদপেক্ষাও অনিষ্টকারী, যেহেতু তামসিক স্তরের ব্যক্তিকে উপদেশ দিলে "প্রকোপায় ন শান্তয়ে" হইয়াই থাকে। এ অবস্থায় যাঁহারা হোমিওপ্যাথির হিতকামী, তাঁহারা কহিবেন, "তবে কি মহাশয়, অন্যকে অর্থাৎ বিপথগামী হোমিও-প্যাথদিগকে সুপথে আনয়ন করিবার কোনও উপায় নাই?" আমি বলিব, অবশ্যই আছে, তবে তাহা বড় কঠিন ও বন্ধুর পথ, এজন্য সকলে স্বীকার করিবেন কিনা, বলিতে পারি না। লোককে সুপথগামী করিবার, মিথ্যাশ্রয়ীকে বা বিপথগামীকে অথবা নামধারী ও ব্যবসায়ী হোমিওপ্যাথকে প্রকৃত পথে আনয়ন করিবার একটী মাত্র পথই আছে, একটী মাত্র উপায়ই আছে। ফলতঃ সে পথটী অবলম্বন না করিয়া নিত্য নিত্য শত সহস্র সাবধান-বাক্য, শত সহস্র উপদেশবাণী বা শত সহস্র গালিবর্ষণ করিলেও, কোনও, উপকার করিতে পারা যায় না। এক্ষণে, সেই মহামূল্যবান উপায়টী কি?

যে উপায়ে যথার্থ উপকার করিতে পারা যায়, সেই উপায়টী অন্য কিছুই নয়, কেবলমাত্র **নিজে আদর্শ-স্থানীয় হওয়া** এবং তাহা হইলেই প্রকৃত উপকার করিতে পারা যাইবে। মুখের একটী কথাও আবশ্যক হইবে না, একটী উপদেশও প্রয়োজন নাই, লেখনীর দ্বারা একটী কথাও প্রকাশ করিবার আবশ্যক হইবে না,—কেবল নিঃশব্দে, বিনা বাহাড়ম্বরে, বিনা প্রদর্শনীতে, নিজে নিজে নির্ম্মল পথাবলম্বী হইলেই যথেষ্ট সংশোধন, যথেষ্ট উপকার হইবে। অন্য কোনও চিন্তার আবশ্যক নাই, কেবল নিজে "খাঁটী"

হইলেই হইবে। নিজে বিপথগামী হইয়া শতকোটী উপদেশ দিলেও কাহারও দ্বারা সূচ্যগ্র মেদিনী পবিত্র হইবে না,—একমাত্র নিজে পবিত্র হইলেই, প্রাকৃতিক-নীতি (law) বশে, উহা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে এবং ঐ পবিত্রতার বিভূতি (aura) বলে প্রত্যেককেই পবিত্র করিবে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। উপকার করিবার, সংশোধন করিবার, অথবা জগতের কল্যাণ করিবার ইহাই একমাত্র পথ, "নান্ত পন্থা বিগুতে অয়নায়।"

এ জগতে উপদেশের অভাব নাই। অধমাধম দস্যু-শ্রেষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া আপামর সাধারণ লোক, সকলেই মনে করিয়া থাকে, উপদেশের দ্বারাই সব ঠিক করিয়া ফেলিবে। ফলতঃ তাহা হয় না, হইতে পারে না! যে উপদেশ আমরা সদাসর্ব্বদাই পাইয়া থাকি, তাহাই কোন মহাত্মার মুখ-নিঃসৃত হইলে, সেই উপদেশই প্রচণ্ড শক্তিশালী হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে বহুসংখ্যক ভ্রান্তব্যক্তির ভ্রান্তি অপনোদিত হইয়া যায়। "বোধোদয়" নামক শিশুপাঠ্য পুস্তকেও ভগবান্‌কে ভালবাসিবার উপদেশ লিখিত আছে, ফলতঃ তাহা পাঠ করিয়া কেহই ভগবান্‌কে ভালবাসিতে শিখিয়াছে বলিয়া জানি না,—কিন্তু যখন অবতারশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন,—"একমাত্র ভগবান্‌কে ভালবাসাই জীবনের উদ্দেশ্য", তখন শত সহস্র ব্যক্তি ভগবৎপথের পথিক হইতে আরম্ভ করিল এবং আমাদের দেশ পার হইয়া সুদূর ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের ব্যক্তিদিগকেও ঐ উপদেশমাত্র কত পবিত্র করিয়াছে, করিতেছে এবং চিরদিন ধরিয়া করিতে থাকিবে,—উপদেশের এমনই ক্ষমতা, এমনই মাহাত্ম্য ; ইহার একমাত্র কারণ, তিনি নিজে ভগবান্ ব্যতীত আর কিছুই জানিতেন না।

আমাদের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি শত শত রহিয়াছেন, যাঁহারা তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত হইয়াও নিত্য সংবাদ-পত্রের স্তম্ভে, তারস্বরে ঘোষণা করিয়া

বিজ্ঞাপন দিতেছেন যে, ৫৲ পাঠালেই হোমিওপ্যাথিক এম-বি, ১০৲ হইলেই এম-ডি, উপাধি প্রাপ্তব্য। এই রাজধানী কলিকাতায় বসিয়া কত কত ব্যক্তি কেবল উপাধি বিক্রয়ের ব্যবসা হইতে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা সঞ্চয় করিয়াছেন, এখনও অবাধে ঐ হীন ব্যবসা চালাইতে আদৌ কোনও দ্বিধা করিতেছেন না। এ সকল ব্যক্তির সংশোধন অসম্ভব, কেননা ইহা তাঁহাদের জ্ঞানকৃত মহাপাপ। এ সকল দুষ্কৃতকারীদিগের মনে, এ জন্মে বা পর জন্মে, চেতনার উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত, শত সহস্র উপদেশও কার্য্যকরী হইবে না। তাঁহাদের প্রবঞ্চনামূলক ব্যবসায়ে সাহায্য করিবার জন্য, দেশে শত সহস্র যুবকও রহিয়াছেন, যাঁহারা ঐ সকল ব্যক্তির নিকট "জাল" উপাধি ক্রয় করিয়া নিজেরা প্রকৃত হোমিওপ্যাথ সাজিয়া বসেন। কেবল এ দেশে নয়, অন্যদেশ হইতেও নানা উপাধি, নানা কৌশলে আনীত হইতেছে। কেবলই কি তাই ? কাল বৈকালে যাঁহাকে কলিকাতায় কোনও হোমিওপ্যাথিক কলেজ হইতে বাহির হইতে দেখিলাম, অদ্য বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া দেখি, তাঁহার সাইনবোর্ডে লিখিত রহিয়াছে, Dr......."M. D. (U.S.A.)" সুতরাং এ সকল ভণ্ডামি বা জুয়াচুরির কোনও প্রতিকার প্রয়াস না করিয়া, কেবল নিজে নিজে সৎপথচারী হওয়াই সঙ্গত। ভগবান সংশোধন না করিলে, কাহারও কি সাধ্য আছে যে, অন্যকে সংশোধন করিতে পারে।

মনুষ্যের মন একেই বহির্ম্মুখী, এজন্য আমাদের দেশে এক সময় "গুরুগৃহে শিক্ষা" ব্যবস্থা ছিল, যাহার ফলে জীবন-প্রভাতেই যথেষ্ট সংযম শিক্ষা এবং পবিত্রতা অর্জ্জন করিয়া মনুষ্যোচিত গুণের অধিকারী হইবার সুযোগ ছিল। আজি আর "সে রামও নাই এবং সে অযোধ্যাও নাই।" বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রথার গুণে, স্বাভাবিক বহির্ম্মুখী মন ইন্দ্রিয়মুখী হইয়া উঠিয়াছে এবং ইন্দ্রিয়তাড়নায় ঘৃণিত ও স্বকারজনক প্রবৃত্তিবশে চলিলেও নিজেকে "স্বাধীন" বলিয়া মনে করিবার ধারা চলিয়াছে। দেশের স্ত্রী পুরুষ সকলেই অল্পবিত্তর

উচ্ছৃঙ্খলমার্গী হইয়াছে ও ক্রমেই হইতেছে। এ অবস্থায় কে কাহার উপদেশ শ্রবণ ও গ্রহণ করিবে? এ অবস্থায়, নিজের নিজের পথ পবিত্র রাখা ও আদর্শ জীবন যাপন করিয়া চলিলেই দেশের প্রকৃত উপকার করা হইবে। উপদেশ গ্রহণ করিবার মত মতি ও প্রবৃত্তি না থাকিলে উহা সম্পূর্ণ নিরর্থক।

এক্ষণে, হোমিওপ্যাথি শিক্ষার সম্বন্ধে যৎসামান্য লিখিয়া প্রবন্ধটী শেষ করিব। হোমিওপ্যাথি শিক্ষা যে ভাবে দেওয়া হইতেছে, তাহাতে প্রকৃত হোমিওপ্যাথি বিস্তারের কোনও সাহায্য হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। ইহার জন্য দায়ী কেবলই যে হোমিও প্রতিষ্ঠানের মালীকগণ, তাহা নয়,—জনমতই প্রধান দায়ী। প্রথম কথা, প্রকৃত ভাবে হোমিওপ্যাথি শিক্ষা দিতে হইলে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান অধ্যক্ষ অর্থাৎ প্রধান পরিচালক মহাশয়কে খাঁটী হোমিওপ্যাথ হইতেই হয়। "বিদ্যালয়টী কেমন? পরিচালক মহাশয়টী যেমন।" যিনি নির্ম্মল এলোপ্যাথ, তবে বিশেষ কোনও কারণে হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিয়া নিজেকে হোমিওপ্যাথ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, সেরূপ ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীনে, প্রকৃত হোমিওপ্যাথি শিক্ষা কখনও বিস্তার লাভ করিতে পারে না। অতি উচ্চ ও নির্ম্মল এবং পবিত্র ব্যক্তিত্বের উপর বিশেষ নির্ভর করে। তৎবিপরীতে, যেখানে এলোপ্যাথিরই সুর প্রধান ভাবে ধ্বনিত হইয়া থাকে, সেখানে হোমিওপ্যাথি চাপা পড়িয়া যায়। **দর্শনই হোমিওপ্যাথির প্রাণ,**—কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই দর্শনাংশে বিশেষ কোনও মনোযোগ দেওয়া হয় না। দ্বিতীয় কথা, আজকালের যুবকবৃন্দ বাহিরের প্রদর্শনীতে অতিমাত্র মুগ্ধ হইয়া থাকেন এবং যে প্রতিষ্ঠানে এলোপ্যাথিক বিভাগের নানা যন্ত্রপাতি ও নানা ব্যবস্থা থাকে, সেখানেই সমধিক আকৃষ্ট হইয়া থাকেন, প্রকৃত হোমিওপ্যাথি শিক্ষার জন্য তাঁহাদের কোনও আগ্রহ দেখা যায় না। ইহার ফলে, ক্রমিক ৩।৪

বৎসর পাঠান্তে একটী উপাধি লাভ করিয়া যখন চিকিৎসা কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন তাঁহারা এলো-হোমিও ভাবে কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়া পড়েন। হোমিওপ্যাথি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটী ঋষিদিগের আশ্রমের ন্যায় হইবে এবং হ্যানিমানের অর্গ্যানন, হোমিও দর্শন ইত্যাদি বিশিষ্ট ভাবে আলোচিত হওয়া ও তদ্বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া অত্যাবশ্যক। তৃতীয় কথা, এলোপ্যাথিক প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কল্লে, আমাদের দেশের লোক লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান করেন, কিন্তু হোমিওপ্যাথির জন্য কিছু করিতে চাহেন না, অবশ্য তাহার প্রধান কারণ, আমাদের মধ্যে একতার অতিশয় অভাব। আসল কথা, আমাদের মধ্যে পবিত্রতা, সততা ও একতার আবির্ভাব না হইলে, ইহার প্রকৃত শিক্ষা ও বিস্তার আদৌ আশা করা যাইবে না। দেশের লোকের মধ্যে সত্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হওয়া আবশ্যক এবং তৎপূর্ব্বে দেশে বর্ত্তমান শিক্ষার পরিবর্ত্তে প্রকৃত শিক্ষা প্রচলন বিশেষ আবশ্যক।

চিকিৎসায় সততা।

অনেকেই হোমিও মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, এমন কি বহুদিন ধরিয়া, চিকিৎসকের কার্য্য করিতে থাকিবার পরেও, পূর্ব্বাভ্যাস ও গতানুগতিক ভাবের চিন্তাধারাটী ত্যাগ করিতে একান্ত অসমর্থ,—দেখিতে পাওয়া যায়। চিকিৎসক মহাশয়,—দীর্ঘকাল ব্যাপী অভিজ্ঞতার অধিকারী চিকিৎসক মহাশয় অনেক সময় মফঃস্বল হইতে একখানি পত্রে লিখিয়া পাঠান—"এই রোগীর লিভারটী ঠিক কাজ করিতেছে না, এজন্য আপনার নিকট পাঠান

হইল," ইহা ব্যতীত অপর কথা বড় থাকে না, যদি বা থাকে, তাহা কেবল তাঁহার ঐ রোগী কাহার নিকট কয়বার ইঞ্জেক্সন্ লইয়াছে বা কতদিন ধরিয়া ও কোথায় "চেঞ্জে" গিয়া বাস করিয়াছে,—এই পর্য্যন্ত। এই পত্রসহ যদি রোগী স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে কোনও অসুবিধা থাকে না, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগী নিজে আসে না, কেবল মনিঅর্ডারে একটা ফি ও কুপনে মাত্র ২।১টা ঐ প্রকার রোগীবিবরণ লিখিত থাকে। ইহার পর পত্রের উপর পত্র লিখিয়া তবে নির্ব্বাচন করিবার মত লক্ষণ পাওয়া যায়। এতদিন ধরিয়া উক্ত চিকিৎসক মহাশয় কি চিকিৎসা করিলেন ও করিয়া থাকেন, তাহা অনুমান করিলে প্রাণে বড় বেদনা হয়। অনেক রোগী আসিয়াও বলিয়া থাকে—"মহাশয়, রোগ আর কি, Liver functionটা খারাপ," অথবা "মহাশয় Brainটা বেশ function করিতেছে না" ও এই প্রকার ২।১টা কথার সঙ্গে বহুল সংখ্যায় "মানে" সংযোগ করিয়া বলিলেই যথেষ্ট বলা হইল, এই প্রকার ধারণা করিয়া থাকে, কিন্তু অসংখ্য "মানে" সংযোগ করিলেও আমরা যে মোটেই "মানে" বুঝিতে পারি না, ইহা তাহারা বুঝে না এবং বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও কিছু ফল হয় না। ফলতঃ রোগীর ক্ষেত্রে এরূপ বরং সহ্য করা যায়, কিন্তু যদি দীর্ঘকালের চিকিৎসক হইয়াও এই প্রকার ভাষা প্রয়োগ করেন, তবে হোমিওপ্যাথির বিশেষ ক্ষতিরই সম্ভাবনা।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে লিভারটা বা Brainটা যে ঠিকমত কাজ করে না, ইহা কি রোগ, না,—রোগের ফল? পেটে একটা গুল্ম-বায়ুর গোলা অনুভব হয়, এটা কি রোগ, বা রোগের ফল? রোগ কোন্‌টা, রোগের ফল কোন্‌টা এবং রোগ-লক্ষণ কোন্ কোন্‌টা আবার তাহাদের মধ্যে আরোগ্যকারী ঔষধ নির্ব্বাচন করিবার সাহায্য কাহার দ্বারা পাওয়া যায়, এ সকল বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান না থাকিলে চিকিৎসা করা যে একান্ত অসম্ভব একথা অনেকেরই জানা নাই। Organon, Materia Medica,

এমন কি, মোটামুটি সাধারণ ঔষধগুলির লক্ষণ পর্য্যন্ত জানা নাই অথচ হোমিওপ্যাথিক ঔষধের একটা প্রকাণ্ড বাক্স ও একটা অনায়াস-লব্ধ ডিগ্রি লইয়া হোমিওপ্যাথ হওয়া বড়ই সহজ,—কিন্তু ইহাতে যে হোমিওপ্যাথির অযশ ও দুর্ণাম হইতেছে, ইহাই বিশেষ পরিতাপের বিষয়। আমরা অনেক চিকিৎসককে কহিতে শুনিয়াছি—"Organon কি, আমি তাহা জানি না।" এ সকল চিকিৎসক যে অতি নিম্নস্তরের ও পল্লীগ্রামের নগন্য চিকিৎসক, তাহা নয়,—সহরের ও সহরতলীর অনেক শিক্ষিত চিকিৎসকেরও এই অবস্থা। এলোপ্যাথির উচ্চ উপাধিধারী এবং হোমিওপ্যাথিতে দীক্ষিত হইয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিতেছেন, এরূপ শিক্ষিত চিকিৎসকদিগের মধ্যে ঐ ভাবের লোক অনেক আছেন। তাঁহারা যেন Organonএর সূত্রানুসারে কার্য্য করাকে নিজেদের স্বাধীনতার হানিজনক মনে করেন। তাঁহাদের ধারণা,—তাঁহারা এত বড় বড় উপাধির মালিক হইয়া আবার কাকে মানিতে যাইবেন? তাঁহারা এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ইঞ্জেক্সন্ ইত্যাদি কোনওটাকেই বাদ দেন না,—বলেন, "রোগীর জীবন লইয়া খেলা কাজেই যখন যেটা দরকার, তাহাই করিতে হয়, গোঁড়ামি করা কর্ত্তব্য নয়!" এই শ্রেণীর হোমিওপ্যাথদিগের মনে একটা দম্ভ থাকে, কেননা তাঁহারা মনে করেন, সরকার বাহাদুরের প্রদত্ত উপাধি পাইয়া তাঁহারা জীবন মরণের মালীক ত আছেনই, তবে ঔষধের বেলায় যদি হোমিওপ্যাথি ঔষধের ব্যবহার করিতে হয়, তাহাতে আবার Organon কেন? ফলতঃ চিকিৎসক মাত্রই আমাদের ভাই, আমাদের আপন লোক,—এজন্য দোষগুণ আলোচনায় কোনও দোষ নাই।

মহাত্মা হ্যানিম্যান্ তাৎকালিন এলোপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের অগ্রণী ছিলেন। একেই ত সাধারণ সৎগুণ সকলের আধার, অদ্ভুত বুদ্ধিমান, অসীম মনোবলের অধিকারী, তাহার উপর চিকিৎসা-বিজ্ঞান, রসায়ন-শাস্ত্র, প্রভৃতি

[stamp]

চিকিৎসার সহকারী যাবতীয় শাস্ত্রে অসামান্য জ্ঞানের সঙ্গে অলৌকিক প্রতিভাশালী ছিলেন। কিন্তু এসকল সত্ত্বেও তিনি প্রাণে প্রাণে যখন অনুভব করিলেন যে, রোগীর রোগ আরোগ্য ত দূরের কথা, এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় রোগ বৃদ্ধি ও জটীলতার বৃদ্ধি হইয়া রোগীর অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে, তখন তিনি নিজের প্রতিভাবলে ও ভগবৎকরুণায় হোমিওপ্যাথি শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। Organon নামক গ্রন্থে সারৎসার নীতি, অকাট্য যুক্তি ও কি প্রথায় চিকিৎসা করিলে রোগী প্রকৃত আরোগ্য হয়, তাহার বিশদ ব্যাখ্যা লিখিয়া প্রকাশ করেন। যে জ্ঞানের যৎসামান্য ক্ষুদ্র অংশের অধিকারী হইয়া আধুনিক এলোপ্যাথি উপাধিধারী চিকিৎসকগণ নিজেদিকে বিশেষ কৃতী বলিয়া মনে মনে দম্ভ অনুভব করেন, সেই জ্ঞানের "ষোল কলায়" মালিক হইয়া তিনি রোগীর রোগ আরোগ্য কার্য্যে ঐ জ্ঞানের কোনও মূল্য নাই ইহা অনুভব করিয়া হোমিওপ্যাথরূপ অমৃতের খনি আবিষ্কার করিয়াও কত বিনীত, কত উদার ছিলেন, ইহা মনে ভাবিলেও বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। তিনি কখনও নিজের গৌরব প্রকাশ করেন নাই, তবে ভগবান্ যে তাঁহার ভিতর দিয়া অমৃতোপম হোমিওপ্যাথি প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে কতশত নির্য্যাতনের অধীন করিয়াছিলেন, এজন্য তিনি অতি অকাতরে ঐ সকল দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়া লইয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। তাঁহার হোমিওপ্যাথির মূল সূত্র এবং মূল তত্ত্ব তিনি Organonএ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। যদি সেই Organon কি তাহাই জানিলাম না, তাহাতে কি আছে, তাহাই শিখিলাম না, Organon এর তত্ত্বানুসারে কার্য্য করিলাম না, তবে আমি কি প্রকারে হোমিওপ্যাথ বলিয়া নিজেকে পরিচয় দিতে সাহস পাই ? Organon ব্যতীত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কি প্রকারে হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। Organon খানি কেবল পড়িলে হইবে না, উহার মূল নীতিগুলি কেবল কণ্ঠস্থ করিলে

হইবে না, পরন্তু প্রত্যেক হোমিওপ্যাথকে Organonএর সঙ্গে প্রকৃত ভাবে একীভূত হইতে হইবে। এমন কি, ব্যবহারিক ভাবে উহার নীতিগুলি এরূপ অভ্যস্ত হওয়া চাই যে ভুল করিয়াও জীবনে কখনও কোনও প্রকারেই উহা হইতে বিচ্যুতি ঘটা আদৌ সম্ভব হইবে না। যাঁহার যতই বয়স হউক না কেন, যাঁহার যতই সম্মান, প্রতিপত্তি ও যশঃসৌরভ থাকুক না কেন, যাঁহার যতই অর্থাগম হউক না কেন, Organon খানি প্রতিদিন হিন্দুর শ্রীমৎ ভগবৎ গীতার ন্যায়, মহম্মদীয়দিগের কোরাণ গ্রন্থের ন্যায় পাঠ করিতে হইবে ইহার কোনও সন্দেহ নাই। Organon অনুসারে পাঠ, চিন্তাধারা, ঔষধ নির্ব্বাচন এমন কি, প্রতি কর্ম্মে, প্রতি আচরণে Organonএর ছন্দ ছন্দিত হইবে, জীবন-তন্ত্রীতে সর্ব্বদাই Organonএর সুর ধ্বনিত হইবে,—নিজের হৃৎপিণ্ডটীও যেন Organon এর তালে স্পন্দিত হইবে। Organon এর ছাপ হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইলে তবে সেই প্রতিবিম্বখানি আবার কার্য্যে প্রতিফলিত হইতে পারে, নতুবা "ভাসা ভাসা" পড়ায় কোনও ফল হয় না। প্রতি শিরার প্রতি ধমনীতে "অনল্ হক্" এর মত Organon এর সুর ও তাল ছন্দিত ও প্রতিধ্বনিত হওয়া চাই। একথায় কোনও অতিরঞ্জন নাই, কোনও বাহুল্য নাই।—দেখা যায় যতই ইহা পাঠ করা যায় ততই ইহার সার গ্রহণ করিবার ক্ষমতা বাড়ে, কেননা ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে মনুষ্য কৃত নয়, যেন ভগবানের বাণী হ্যানিম্যানের ভিতর দিয়া প্রকাশ হইয়াছে, এজন্য ইহার প্রতি কথাটী, প্রতি বাক্যটী প্রত্যেক ভাবটী কত গভীর কত বিস্তৃত।

হোমিওপ্যাথির মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া Organon খানি ভাল করিয়া পাঠ করিলেই জানা যায় যে রোগীরই চিকিৎসা হয়, রোগের চিকিৎসা হয় না। যদি কাহারও Liverটী ভাল কাজ না করে, তবে Liverটীর চিকিৎসা করা বা করিবার চেষ্টা কেবল বাতুলতা ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না।

মানবদেহের কোনও অংশ বা কোনও যন্ত্রই স্বাধীন নয়। প্রত্যেকেই জীবনী-শক্তির দ্বারা পরিচালিত। যতক্ষণ জীবনী-শক্তি নিজের স্বাধীনভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হয়, ততক্ষণ আমাদের শরীরের যাবতীয় কার্য্য স্বাভাবিক ভাবে পরিচালিত হইতে থাকে, কেননা শরীরস্থ প্রত্যেক যন্ত্র ঐ জীবনী-শক্তির দ্বারা পূর্ণ মাত্রায় স্বাভাবিকভাবে প্রেরণা পাইতে থাকে। কিন্তু যখনই একটী রোগ শক্তি আসিয়া আমাদের জীবনী-শক্তিকে তাহার পূর্ণ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার পথে বাধা ঘটায়, তখনই যেন জীবনী-শক্তিটী তাহার স্বাধীনতাটী হারাইয়া ঐ রোগ-শক্তির অধীনে কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। অতএব, কি সুস্থাবস্থায়, কি পীড়িতাবস্থায়, সকল অবস্থাতেই জীবনীশক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়াই প্রত্যেক যন্ত্র নিজ নিজ কার্য্য করিয়া থাকে,—সুস্থাবস্থায় যন্ত্রগুলি নিজ নিজ কার্য্য স্বাভাবিক ছন্দমত করিবার প্রেরণা পায় ও করে, অসুস্থাবস্থায় উহারা অস্বাভাবিক ভাবে করিবার প্রেরণা পায় ও করিয়া থাকে, ইহাই প্রভেদ; ফলতঃ প্রত্যেক স্থলেই প্রত্যেক যন্ত্র জীবনীশক্তির বশেই চালিত হয় ও কার্য্য করে, এ বিষয় নিশ্চিত। অতএব এ অবস্থায় লিভারের রোগ, হৃৎপিণ্ডের রোগ, উদরযন্ত্রের রোগ, ইত্যাদি ধারণা বশে ঐ ঐ যন্ত্রের চিকিৎসায় কি ফল হইবে? জীবনী-শক্তির স্বাভাবিক ছন্দ ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং উহার স্বাভাবিক ছন্দ ও পূর্ণ স্বাধীনতা পুনঃ স্থাপন করিতে পারিলেই প্রত্যেক যন্ত্র ঠিক মত কার্য্য করিবে। জীবনী-শক্তির স্বাভাবিক ছন্দ ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থাই চিকিৎসা। কি উপায়ে তাহা আনা যায়? তাহার উপায় হানিম্যান অতি সুযুক্তির সহিত Organon গ্রন্থে দেখাইয়া দিয়াছেন ও অকাট্যভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে সদৃশ লক্ষণে ঔষধ নির্ব্বাচনে ও যথারীতি প্রয়োগেই প্রকৃত পক্ষে রোগী আরোগ্য হয়, অতএব রোগলক্ষণ সকল অন্তর্হিত হইয়া যায়। কেবল তাহাই নয়,—রোগী কাহাকে কহে,

রোগ কি, ঔষধ কি, কি প্রকারে ভেষজ সমূহ পরীক্ষা এবং লক্ষণ সংগ্রহ করিতে হয়, রোগীর রোগলক্ষণ সকল কি ভাবে সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। ঔষধ নির্ব্বাচনের প্রণালী, ঔষধ কি ভাবে, কোন্ সময় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, ঔষধ দিবার পর কি ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়, তরুণ ও পুরাতন পীড়া কাহাকে কহে, উহাদের মধ্যে পার্থক্য কি ইত্যাদি বিষয় অতিশয় সুন্দরভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। এরূপ গ্রন্থ আদৌ পাঠ না করিয়া ও তদনুসারে কার্য্য না করিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা যে কত অদ্ভুত ও গর্হিত তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না।

আবার অনেকে বলিয়া থাকেন, "আমরা উচ্চ শক্তি মানি না, ব্যবহারও করি না, একেই ত ঔষধ থাকে না, তাহার উপর আবার উচ্চশক্তি। উর্দ্ধ সংখ্যা ৬ষ্ঠ শক্তির উপরে আবার ঔষধ কোথায় যে তাহার দ্বারা কাজ হইবে?" ইত্যাদি। কেহ বা বলেন যে "উচ্চশক্তি ব্যতীত আমি ব্যবহারই করি না, ৬।১২।৩০ শক্তিতে কি হইবে?" এ সকল চিকিৎসকের কথায় মনে হয় যেন, ঔষধের শক্তি নির্ব্বাচন কার্য্যটী চিকিৎসকের ইচ্ছা বা খেয়ালের উপর নির্ভর করে। কিন্তু যিনি প্রকৃত হোমিওপ্যাথ, তিনি জানেন যে প্রত্যেক শক্তিই প্রয়োজনীয় ও নিজের ইচ্ছার উপর শক্তি নির্ব্বাচন আদৌ নির্ভর করে না। রোগীর পক্ষে কোন্ অবস্থায় কোন্ শক্তি কার্য্যকরী হইবে, তাহা বিশেষ প্রণিধান করিয়া স্থির করিতে হয়। **রোগের গতি, অবস্থা, জীবনী-শক্তির অবস্থা, রোগ তরুণ কি পুরাতন ইত্যাদি** নানা বিষয় চিন্তা করিয়া তবে শক্তি নির্ব্বাচন করা সঙ্গত,—নতুবা যখন যে শক্তি প্রয়োগ করিবার ইচ্ছা হইবে, তাহাই করা, অথবা কেবলই নিম্নতর, বা কেবলই উচ্চতর, অথবা দুই দিক বজায় রাখিবার অভিপ্রায়ে, কেবলই মধ্য শক্তির ঔষধ প্রয়োগ করিতে থাকা, হোমিওপ্যাথির নীতি বহির্ভূত ও একান্ত অন্যায়। চিকিৎসা ক্ষেত্রে

প্রত্যেক শক্তিরই স্থান আছে এবং রোগীর লক্ষণ সমষ্টির সহিত কেবল ঔষধের সাদৃশ্য থাকাই যথেষ্ট নয়, ঔষধের শক্তির সহিতও সাদৃশ্য থাকা চাই, নতুবা প্রকৃত সাদৃশ্য হয় না। আসল কথা, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সাদৃশ্য অন্বেষণ করিতে গেলে কেবলই লক্ষণসমষ্টিগত সাদৃশ্য দেখিলে চলে না। ঔষধের শক্তি-গত সাদৃশ্যও একান্তই প্রয়োজনীয়। যেমন যৎসামান্য ক্ষুদ্র ব্রণ ছেদ করিতে হইলে একটা তীক্ষ্ণধার ক্ষুর-যন্ত্রের সাহায্য লওয়া হাস্যোদ্দীপক, আবার একটা উরুস্তম্ভ অস্ত্রোপচার করিবার উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র সূচীর দ্বারা করিবার আশা ততোধিক মূঢ়তাজ্ঞাপক; তেমনই সামান্য তরুণ রোগে উচ্চশক্তির প্রয়োগ এবং দীর্ঘকালের প্রাচীন রোগে নিম্ন শক্তির প্রয়োগ অতিমাত্র অন্যায় ও ব্যর্থ। যেমন কোনও অস্ত্রচিকিৎসক একটা মাত্র ছুরিকা দ্বারা সকল প্রকার ছেদকার্য্য করিবার আশা করিতে পারেন না, তেমনই একমাত্র শক্তির সাহায্যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসা করিবার আশা করিতে পারা যায় না। ক্ষেত্রানুসারে শক্তির তারতম্য করিতেই হয় এবং কোথায় কোন্ শক্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, তাহারও বিধান ও উপদেশ মহাত্মা হ্যানিম্যান ও তাঁহার পরবর্ত্তী মহামনিষীগণ দিয়া গিয়াছেন। এ সকল বিষয় পাঠ না করিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক সাজিবার আশা সুদূর পরাহত। তাহাতে কেবলই যে রোগীর অনিষ্ট হয় তাহা নয়,—প্রকৃত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় যে একটা বিমল আনন্দ ও আত্মতৃপ্তি অনুভব করা যায়, সেই আনন্দ ও তৃপ্তি হইতে তাঁহাদিগকে চিরদিন বঞ্চিত হইতে হয়।

এলোপ্যাথিক উচ্চ উচ্চ উপাধিধারী ভ্রাতাদিগের ধারণা হওয়া একান্ত স্বাভাবিক যে তাঁহারা বিশেষ উচ্চশিক্ষিত ও পণ্ডিত। তাঁহারা প্রকৃতই খুবই উচ্চশিক্ষিত ও পণ্ডিত, সে বিষয় অস্বীকার করিবার কোনও উপায় নাই। রসায়নশাস্ত্র, শরীরের প্রত্যেক অংশে কোথায় কোন যন্ত্র কি ভাবে

কার্য্য করে, তৎবিষয়ক জ্ঞান, শরীরের গঠন, উপাদান, শরীরযন্ত্রের সুস্থ ও অসুস্থ অবস্থার লক্ষণ এবং পীড়িত অবস্থায় কি কি পরিবর্ত্তন,—মোট কথা, মানবদেহের যাবতীয় তথ্য বিষয়ে তাঁহারা পূর্ণমাত্রায় জ্ঞান লাভ করিয়া বিশেষ ব্যুৎপন্ন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আসলে, রোগীর রোগ আরোগ্য করিবার নীতি ও তত্ত্ব লইয়াই তাঁহাদের সহিত আমাদের পার্থক্য। ঐ সকল বিষয়ে তাঁহাদের যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান আমাদের অর্থাৎ হোমিওপ্যাথদিগের ত থাকাই চাই—অধিকন্তু আরোগ্য নীতি, অর্থাৎ কোন্ বিধানে আরোগ্য কার্য্য হয়, বিসদৃশ অথবা সদৃশ বিধানে আরোগ্য হওয়া সম্ভব, এই বিষয় বিচার করিয়া স্থির হইয়াছে যে সদৃশ-বিধানই আরোগ্য-বিধায়ক, তৎবিপরীত বিধান আরোগ্য না করিয়া রোগ-লক্ষণ সকলকে জোর করিয়া চাপা দেয় ও তাহার ফলে রোগীর অনিষ্টই ঘটে। অতএব এলোপ্যাথি-শাস্ত্র অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট উন্নত হইলেও রোগীর রোগ নিরাময় করিতে একান্ত অপারক, কাজেই ঐ সকল জ্ঞানের দ্বারা জগতের কল্যাণ হওয়া দূরে থাকুক, এ পর্য্যন্ত অনিষ্টই হইতেছে। কেবল শুষ্ক জ্ঞান লইয়া কি হইবে ? তাহার ফলে যদি লোককল্যাণ না হয়, তবে সে জ্ঞান লইয়া কি হইবে। যদি প্রকৃত কল্যাণ করিতে হয়, তবে উচ্চ উচ্চ উপাধিমণ্ডিত হইলেও, এক মাত্র আরোগ্যবিধায়ক অমৃতোপম হোমিও ঔষধ গ্রহণ করিতেই হইবে, নতুবা প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটিবে না ও জীবনের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইবে না। এবং যদি হোমিও-মন্ত্র গ্রহণ করিতেই হয়, তবে যথারীতি মূলসূত্রগুলি পরীক্ষা ও অধ্যয়ন করিয়া তদনুসারে চিকিৎসা করিতে থাকাই সুসঙ্গত, তাহা না করিয়া কতক এলোপ্যাথি, কতক হোমিওপ্যাথি, কতক কবিরাজী, অথবা কেবলই নিম্ন শক্তি, বা কেবলই উচ্চতর শক্তি,—প্রভৃতি নানা প্রকারের ব্যভিচার অতিশয় গর্হিত। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে নানাপ্যাথির একত্র সংমিশ্রণ কখনই

সঙ্গত নয়। কাহারও নিউমোনিয়া হইয়াছে, এলোপ্যাথিক চিকিৎসক বুকের উপর যে কোনও প্রকারের বাহ্য প্রলেপাদি উপদেশ দিবেন, হোমিওপ্যাথ তাঁহার শাস্ত্রানুশাসন অনুসারে কার্য্য করিলে তিনি তাহা কখনই অনুমোদন করিতে পারিবেন না। কাহারও চর্ম্মরোগ হইয়াছে, এলোপ্যাথিক মতে প্রলেপ অবশ্যই অনুমোদিত হোমিওপ্যাথিতে একান্ত গর্হিত। এ অবস্থায় মিলিত চিকিৎসা কি প্রকার চলিতে পারে? মূলতত্ত্বটী যে একেবারে বিপরীত, মিলিত চিকিৎসা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? একের পথ "**বাহির হইতে ভিতরে,**" অন্যের পথ "**ভিতর হইতে বাহিরে**" মিলিত চিকিৎসা কি প্রকারে হয়? অবশ্য এ স্থলে অস্ত্রোপচারের কথা বলা হইতেছে না,—যে কোনও চিকিৎসা অর্থাৎ যে কোনও প্যাথির সঙ্গে, আবশ্যক হইলে, অস্ত্রোপচার চলিতে পারে। অস্ত্রোপচারকে চিকিৎসা বলা চলিতে পারে না, কেন না অস্ত্রোপচারের সাহায্যে দূষিত ও স্থূল আবর্জ্জনা শরীর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয় মাত্র, ইহাকে চিকিৎসা বলা যাইতে পারে না। যেখানে প্রকৃত প্রস্তাবে চিকিৎসা করিতে হয়, সেখানে মিলিত চিকিৎসা একেবারে অসম্ভব।

আমাদের মধ্যে আবার আরও একটী শ্রেণী আছেন, যাঁহারা এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি—এই উভয় প্রকার চিকিৎসা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন—"যেখানে দেখি, এলোপ্যাথিক ঔষধে সেরূপ কাজ হইতেছে না, সেখানে হোমিওপ্যাথি দিয়া থাকি" অথবা, "যে ব্যক্তি এলোপ্যাথিক চিকিৎসা চায়, তাহাকে এলোপ্যাথিক ঔষধ দিই কিন্তু যাহারা হোমিওপ্যাথি খোঁজে, তাহাদিগকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাই করিয়া থাকি," ইত্যাদি। এই শ্রেণীর লোকের অনেকের সহিত কথা কহিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি যে তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে **চিকিৎসা-ব্যবসায়ী,** অর্থাৎ **চিকিৎসক** নহেন। তাঁহাদের কোনও একটী প্যাথির উপর বিশ্বাস নাই।

তবে পাছে রোগী "হাতছাড়া" হইয়া যায়, এজন্য তাঁহারা "ছুদিক" বজায় করিতে যান, তাঁহাদের মূলনীতি অর্থোপার্জ্জন, অর্গ্যাননের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে গেলে তাঁহাদের মূল-নীতির বিশেষ বাধা ঘটে। অবশ্য লোকের চক্ষে চমক লাগিতে পারে, অর্থোপার্জ্জনও যথেষ্টই হইবার সম্ভাবনা, মান যশেরও অভাব হয় না, কিন্তু প্রকৃত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিয়া যে কল্যাণ ঘটে তাহাও হয় না এবং জনকল্যাণের ফল-স্বরূপে যে আত্ম-তৃপ্তি পাওয়া যায়, তাহাও পাওয়া যায় না। অর্থোপার্জ্জনই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে সেই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য শতাধিক উপায় রহিয়াছে,—এরূপ "ভেজাল" চিকিৎসা ছাড়িয়া অন্য কোনও উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।

বিশেষ পরিতাপের কথা এই যে, অনেকেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাইবার প্রবল উদ্দেশ্য লইয়া ঐ প্রকার চিকিৎসকের হাতে পড়িয়া যখন বিফলমনোরথ হয়, তখন তাহারা ব্যক্তিগত ভাবে দোষগুণ আরোপ না করিয়া হোমিওপ্যাথিরই অযশঃ প্রচার করিয়া থাকে,—এবং যাহারা হোমিওপ্যাথিকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন, তাঁহাদের, ঐ সকল নিন্দাবাদ শুনিয়া, প্রাণে নিরতিশয় বেদনা হয়। লোকে অনেকেই জানে না যে প্রকৃত হোমিওপ্যাথি কাহাকে বলে, প্রকৃত হোমিওপ্যাথের নিদর্শন কি,—পরন্তু অনেকেরই ধারণা এই যে হোমিওপ্যাথিক বাক্স হইতে ঔষধ দিলেই হোমিওপ্যাথি হয়, আবার তাহা ছাড়া, অনেকেরই ধারণা এই যে এলোপ্যাথিক কলেজ হইতে পাশ করিয়া যদি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন, তবে নাকি সেই চিকিৎসক খুব "পাকা হোমিওপ্যাথ" হইয়া থাকে। এ স্থলে আমাদের একটী গল্প মনে পড়ে—আমরা বি-এ পড়িবার সময় একটীflute playerএর কথা পড়িয়াছিলাম, তিনি রোম নগরীর একজন বিখ্যাত ওস্তাদ্। যে যে ছাত্র তাঁহার নিকট শিক্ষার্থ আসিত, তাহাদিকে তিনি ২টী শ্রেণীতে ভাগ করিতেন, উঁহাদের মধ্যে যাহারা অন্য flute-player এর নিকট কিছু দিন শিক্ষা

করিয়া তাঁহার নিকট আসিত, তাহাদের নিকট তিনি দুই গুণ বেতন আদায় করিতেন, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—"উহারা যে ভুল শিক্ষা পাইয়াছে, তাহা ভোলাইবার জন্য অনেক পরিশ্রম করিতে হয়, এজন্য দুইগুণ বেতন না লইলে চলে না।" যাহারা প্রথম হইতেই তাঁহার নিকট আসিত, তিনি তাহাদের নিকট নির্দ্দিষ্ট বেতন লইয়া শিক্ষা দিতেন। যাঁহারা এলোপ্যাথি কলেজ হইতে উপাধিমণ্ডিত হইয়া আসেন, তাঁহারা যদি হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করিতে চান, তবে অন্যের অপেক্ষা বহুগুণ অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাতেও তাঁহাদের পূর্ব্বশিক্ষা ভোলা সম্ভব হয় কি না জানি না। যদি বা তাহাও কোন প্রকারে সম্ভব হয়, কিন্তু উপাধির দম্ভ থাকিতে প্রকৃত হোমিওপ্যাথ হইবার আশা করা একেবারেই অসম্ভব, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

হোমিওপ্যাথিতে প্যাথলজীর স্থান।

অনেক কৃতবিদ্য হোমিওপথাবলম্বী চিকিৎসকদের মুখেও শুনিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা "প্যাথলজী ধরিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকেন, যেহেতু লক্ষণ-সমষ্টি সর্ব্বদাই ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিয়া থাকে, প্যাথলজী ধরিলে আর ভুল হইবার কোনও উপায় নাই। সাধারণ হোমিওপ্যাথগণ প্যাথলজী জানেন না বলিয়া তাঁহারা লক্ষণ-সমষ্টির সাহায্য লইয়া থাকেন, ফলতঃ তাঁহাদের নির্ব্বাচন ও চিকিৎসার উপর বিশ্বাস করা যায় না। যে সকল হোমিওপ্যাথ প্যাথলজী জানেন না, বা তদনুসারে চিকিৎসা করেন না, তাঁহারা হাতুড়িয়া (quacks) তাঁহাদিগকে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক বলা যাইতে পারে না," ইত্যাদি, ইত্যাদি।

HOMOEOPATHIC MEDICAL LIBRARY

উপরোক্ত কথাগুলি শুনিতে বড়ই সুন্দর, মুখরোচক এবং সাধারণ লোকেরও মনোমুগ্ধকর। যাঁহারা এলোপ্যাথিক স্কুল বা কলেজ হইতে অথবা তথাকথিত হোমিওপ্যাথিক কলেজ হইতে পাশ করিয়া বাহির হইয়াছেন এবং হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই হোমিওপ্যাথির মর্ম্মবাণী বুঝিতে পারেন নাই; তাহার কারণ এই যে, প্রথম হইতে এলোপ্যাথিতে অভ্যস্ত হইয়া এবং তৎসঙ্গে যেন একটু অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া নিজেকে খুবই বৈজ্ঞানিক হিসাবে সুপণ্ডিত বলিয়া মনে করেন, এবং হোমিওপ্যাথির ভিতর শিখিবার আর কি আছে, ইহাই মনে করিয়া সদর্পে নিজেদের পূর্ব্বাভ্যস্ত এলোপ্যাথিক ধারণানুসারেই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা তথাকথিত হোমিওপ্যাথিক কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ৩।৪ বৎসর ধরিয়া মুখ্যতঃ এলোপ্যাথিরই সেবা করিয়া আসিয়া, এলোপ্যাথিরই ভাব ও ধারাগুলি লইয়া রোমন্থন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে দেখিলে ও তাঁহাদের মুখে এলোপ্যাথিরই ভাষা ও প্যাথলজী ব্যতীত চিকিৎসা চলে না, এই প্রকার বাঁধাবুলি শুনিয়া, বাস্তবিকই হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হয়। যাঁহারা হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করিবেন বলিয়া বাহ্যতঃ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন ও হোমিওপ্যাথিক কলেজে প্রবেশ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অবশ্য অনেকেই কেবল একটী উপাধীর প্রার্থী, তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, যাঁহারা বাস্তবিকই হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করিতে আসিয়া "ইতোনষ্টঃ ততোভ্রষ্টঃ" হইয়া যান, তাঁহাদের জন্যই আমাদের প্রাণে বেদনা হয়। দেখা যায়,—ইহারা না এলোপ্যাথের সুবিধা পান, না হোমিওপ্যাথের মত লোককল্যাণ কার্য্যে সমর্থ হন। যাহা হউক, যাঁহারা অহঙ্কারদৃপ্ত হইয়া নিজেদের মতটীকেই সত্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করা নিতান্ত বৃথা। যাঁহারা প্রকৃতই পথ পান নাই, যাঁহারা মনে প্রাণে বুঝিবার

উৎসুক ও প্রয়াসবান্, তাঁহারা আমাদের কয়টী কথা পাঠ করিলে, হয়ত সত্যের সন্ধান পাইতে পারেন, এজন্য যথাশক্তি বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি, আর যাঁহারা অহঙ্কারী, তাঁহাদের মনে জ্ঞান প্রবেশলাভ করিতে পারে না এবং তাঁহাদিগকে বুঝাইবার স্পর্দ্ধাও আমরা রাখি না।

কোনও একটী রোগীর **প্যাথলজী হিসাবে** অবস্থাটী জানিলে কি জানা হইল? তাহার কি **রোগ** হইয়াছে, কোন্ যন্ত্রটীর কি প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং সে প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিলে, তাহাকে কি নামের রোগ বলিয়া অভিহিত করা যাইবে, ইহাই জানা যায়। এই হিসাবে, কোনও একটী রোগীর চিকিৎসার্থ আহুত হইয়া, আপনি একটী রোগের নাম উল্লেখ করিতে পারিবেন। সেটী কি? সেটী, রোগীর ভাবিফল বিষয়ে একটী আন্দাজী মতামত। এই দুইটী বিষয় ব্যতীত, প্যাথলজী আপনাকে অন্য কোন প্রকারেই সাহায্য করিতে পারিবে না। যাহা হউক, আপনি জানিলেন যে, আপনার রোগীটীর নিউমোনিয়া হইয়াছে। এক্ষণে, রোগীর আরোগ্যকল্পে ঔষধ নির্ব্বাচন বিষয়ে আপনি প্যাথলজী হইতে কি প্রকারে সাহায্য পাইবার আশা করিতে পারেন?

প্যাথলজী ত আপনাকে কহিয়া দিয়াছে, প্যাথলজী ত আপনাকে জানাইয়া দিয়াছে যে, আপনার রোগীর **নিউমোনিয়া** হইয়াছে। এক্ষণে, নিউমোনিয়া জন্য অন্ততঃ ১৮।২০টী ঔষধের মধ্যে আপনি আপনার রোগীকে **কোন্‌টী** দিবেন, একথা কে বলিবে? ঐ ১৮।২০টী ঔষধেই নিউমোনিয়া নামক ব্যাধি হইয়া থাকে,—কিন্তু এইগুলির মধ্যে আপনার রোগীকে কোন্ ঔষধটী আরোগ্য করিবে, একথা কে বলিয়া দিবে? এই ঔষধ নির্ব্বাচন কার্য্যে আপনাকে প্যাথলজী আদৌ কোনও সাহায্য করিতে পারিবে না। অবশ্য আপনি যদি এলোপ্যাথ হইতেন, তবে ঐ ১৮।২০টী ঔষধের মধ্যে যে কোন ৩টী বা ৪টী বা ৫টী একত্র করিয়া প্রয়োগ করিতেন,

ফলতঃ, কোন্ কারণে ঐ ৩টী বা ৪টী বা ৫টী ঔষধকে বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া প্রয়োগ করিলেন, তাহার কোনও হেতু বা নিয়ম থাকিত না। আবার আপনার নিকট চিকিৎসা না করাইয়া রোগী যদি অন্য কোনও এলোপ্যাথের নিকট চিকিৎসা-ভার অর্পণ করে, তবে দ্বিতীয় এলোপ্যাথ হয়ত অন্য ৩টী, ৪টী বা ৫টী ঐ ভাবে প্রয়োগ করিবেন,—যেহেতু কেহই কোনও নীতির উপর নির্ব্বাচন কার্য্য করেন না। আপনি হোমিওপ্যাথ হইয়া বিনা নীতিতে নির্ব্বাচন করিতে পারেন না। ইচ্ছামত যে কোনও একটী ঔষধ দিলে আরোগ্য আসিবে না, আপনাকে নির্ম্মল সমলক্ষণ-তত্ত্বানুসারে রোগীর ব্যক্তিগত বিশেষত্বের উপর ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইবে, আপনি এলোপ্যাথদের মত আন্দাজী বা স্বকল্পিতভাবে বা নিজের ব্যক্তিগত খেয়াল অনুসারে বা কাহারও মতামতের উপর নির্ভর করিয়া নির্ব্বাচন করিতে পারেন না। আপনি জানেন যে, কোনও একটী রোগীকে ১৫ জন এলোপ্যাথ পৃথক পৃথক ভাবে দেখিলে, প্রত্যেকেই বিভিন্ন ভাবে ঔষধ মিশ্রন করিয়া থাকেন, যেহেতু নির্ব্বাচন বিষয়ে তাঁহাদের আন্দাজ ছাড়া, কোনও নীতির ধার ধারিতে হয় না। এ অবস্থায় আপনি হোমিওপ্যাথ হইয়া যদি বলেন যে, প্যাথলজী ব্যতীত চিকিৎসা হয় না, তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, আপনি বৃথা এতদিন ধরিয়া "হাবি-জাবি" পড়িলেন, "কুঞ্জের ধারে ধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইলেন, কুঞ্জের ভিতরে প্রবেশলাভ করিতে পারেন নাই," হোমিওপ্যাথির অমৃতত্ত্বের সন্ধান পান নাই, এলোপ্যাথির কোলাহলে আপনার মনটী অবান্তর বিষয়ে একান্ত নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিল, সত্যের মধুর গুঞ্জন আপনার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবার অবকাশ পায় নাই। এক্ষণে, আপনি চিকিৎসাকার্য্যরূপ অতিশয় দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার হস্তে গ্রহণ করিয়া অশাস্ত্রীয় কার্য্য করিলে প্রত্যবায়ের ভাগী আপনি ব্যতীত কে হইবেন?

এই ভাবে শিক্ষা করিয়া কেবলই যে আপনার শিক্ষাটা সার্থক হয় নাই, তাহা নয়, পরন্তু আপনার আরও অনেক ক্ষতি হইয়াছে। এলোপ্যাথির কোলাহলে থাকার ফলে আপনি নিজের নিজত্ব বা মনুষত্ব, বোধ হয় চিরকালের জন্য হারাইয়াছেন। আপনি যে এতদিনে, অর্থাৎ ঐ সকল স্কুল কলেজ হইতে বাহির হইবার পরেও শিক্ষা করিবেন, সে গতিটীও আপনার গিয়াছে। "যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি" প্রকৃতিটা, আপনার বিনীত ভাবটা, ভগবানের দাসানুদাস ভাবটা, চিরতরে নষ্ট হইয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে একটা ঘোর দাম্ভিকতা, অত্যন্ত অহমিকা বা "আমি যাহা জানি, তাহা যথেষ্ট" এই ভাব আপনার হৃদয়ে চিরাঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এক্ষণে যে আর অধিক শিক্ষা করিবেন, সে পথও চিরতরে রুদ্ধ হইয়াছে।

পাকা সোনার গঠন হয় না, একথা জানি, খাদ ব্যতীত অলঙ্কার গঠন সম্ভব নয়, ইহা জানি, কিন্তু চিকিৎসার ভিতর খাদ না মিশাইয়া, ব্যবহারিক ভাবে উহা ব্যবহার করিতে ক্ষতি নাই। শরীরতত্ত্ব, নির্ম্মাণবিধান, শরীরের যন্ত্রাদির ক্রিয়াবিষয়ক জ্ঞান, সুস্থ ও অসুস্থ অবস্থায় শরীরযন্ত্রে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটে, সে সকল বিষয়ে জ্ঞান, আপনি অনায়াসে অর্জ্জন করিতে পারেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে সেগুলির অবশ্যই প্রয়োজন আছে, ফলতঃ সেই সকল জ্ঞান এখনও বিজ্ঞানে পৌছিতে পারে নাই, কখনও যে পারিবে বা পারিবে না, তাহারও স্থিরতা নাই যেহেতু সেগুলির জ্ঞান অনেকটা আন্দাজীর উপর নির্ভর করে; সুতরাং সেই সেই তথাকথিত জ্ঞানের উপর রোগীর ঔষধ নির্ব্বাচন নির্ভর করিলেই সর্ব্বনাশ। রোগীর ব্যক্তিগত লক্ষণ-সমষ্টি ব্যতীত নির্ব্বাচন চলে না। আপনি ঐ সকল জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া রোগীর বাড়ীতে পীড়ার নাম, পীড়ার ভাবীফল, অথবা তৎসঙ্গে নিজের জ্ঞানের প্রদর্শন ইত্যাদি কার্য্যে ব্যবহার করিতে পারেন, নতুবা হয়ত এলোপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের সঙ্গে আপনি অনেক ক্ষেত্রে "পাল্লা" দিতে পরিবেন না,

যেহেতু অবোধ লোকে ঐ সকল "ভড়ং" এবং বড় বড় "বুলি" চায়, ইহা আমি জানি, কিন্তু তাই বলিয়া নির্ব্বাচন-কার্য্য করিবার সময় যদি ঐ সকল মিথ্যা জ্ঞানের সাহায্যে আপনি পরিচালিত হন, তবে হোমিওপ্যাথিরও সর্ব্বনাশ এবং রোগীরও বিপত্তি!

হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রটী পূর্ণমাত্রায় দার্শনিক যুক্তি ও বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং ইহার তত্ত্ব বা নীতি একেবারে সম্পূর্ণ সত্য, চিরসত্য এবং ইহার নীতির ব্যত্যয় কখনও কোন কালে, কোন ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। যদি প্রাকৃতিক নিয়ম পরিবর্ত্তিত হওয়া কোনও কালে সম্ভব হয়, অর্থাৎ যদি জলের নিম্নগতি না হইয়া ঊর্দ্ধগতি হইতে পারে, যদি মাধ্যাকর্ষণ রহিত হইয়া যাইতে পারে, তবে হয়ত তখন হোমিও-নীতিরও পরিবর্ত্তন সম্ভব হইতে পারে, নতুবা নয়। এ প্রকার বিষয়ে, অনিশ্চিত বা আংশিক সত্যের উপর নির্ভর করিয়া নির্ব্বাচনাদি আরোগ্যবিধান চলিতে পারে না। প্যাথলজী অনিশ্চিত ও অনুমানপ্রধান বিষয়, ইহাতে সত্যনির্দ্ধারণ এ পর্য্যন্ত হয় নাই এবং কখনও হইবে বলিয়া বিশ্বাসও করা যায় না, কেননা, যে সকল বিষয়ের উপর প্যাথলজীরূপ সৌধটী নিৰ্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত, সে সকল বিষয়ে সত্য বা নিশ্চয়তা বলিয়া কোনও জিনিষ নাই সুতরাং এই অনিশ্চিত ও অসত্য ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া কি কখনও ঔষধ নির্ব্বাচন চলিতে পারে? এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় কোনও তত্ত্ব নাই, কোনও নীতি নাই, ইহা সম্পূর্ণ অনুমানপ্রধান শাস্ত্র, সুতরাং প্যাথলজীর উপর নির্ভর করিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন, ইহার পক্ষে শোভনীয় হইতে পারে। তাহা ছাড়া, হোমিওপ্যাথিতে মিশ্রণ নাই, এলোপ্যাথিতে মিশ্রণ ব্যতীত চিকিৎসাই চলে না। হোমিওপ্যাথির প্রধান বিশেষত্ব,—একটী মাত্র ঔষধ প্রয়োগ, এক্ষণে, সেটী কোন্‌টী, তাহা সম্পূর্ণভাবে যুক্তি ও বিচারসাপেক্ষ অর্থাৎ রোগীর ব্যক্তিগত লক্ষণ-সমষ্টির উপর নির্ভর করে। প্যাথলজীর উপর নির্ভর করিয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

নির্ব্বাচন, কেবলই যে ভ্রান্তির পরিচায়ক, তাহা নয়, ইহা হাস্য ও করুণোদ্দীপক।

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিতাপের বিষয় এই যে, এত বড় দেশের মধ্যে যতগুলি হোমিওপ্যাথিক স্কুল বা কলেজ রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটীও এরূপ নাই, যাহাতে ছাত্রগণ ৩।৪ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া হোমিওপ্যাথিক তত্ত্বটী শিখিতে পারে অর্থাৎ ইহার প্রকৃত সত্যের সন্ধান পায়। প্রত্যেক কলেজের স্বত্বাধিকারী ও অধ্যাপকমণ্ডলী, সকলেই আমাদের বন্ধুস্থানীয় এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাদের সহিত আমাদের সৌহার্দ্দ্য ব্যতীত অন্য কোনও ভাব নাই, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, হোমিওপ্যাথির মূল বিষয়গুলির প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আদৌ আকৃষ্ট হইতেছে না। অনেকেই কহেন যে, "লোকে এলোপ্যাথিক বিষয়গুলিই সমধিক সমাদর করিয়া থাকে এবং সেগুলি না রাখিলে কলেজ বা স্কুল রক্ষিত হইতে পারে না।" ইহার উত্তরে আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে, লোকের রুচির পরিবর্ত্তন তো আপনারাই করিবেন, আপনারা যদি এরূপ ছাত্র উত্তীর্ণ করাইতে পারেন, যাহারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া এলোপ্যাথির অপকৃষ্টতা প্রমাণ করিয়া হোমিওপ্যাথির উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, তবে লোকের রুচির পরিবর্ত্তন ঘটিতে কয়দিন লাগে? তাহা ছাড়া আরও নিবেদন এই যে, এলোপ্যাথিক অনুষ্ঠান যত ইচ্ছা রাখিতে হয় রাখুন, কোনও আপত্তি নাই, কিন্তু বৃক্ষ দেখিবার গোলযোগে বনটী ভুলিলে চলিবে কেন? এলোপ্যাথির গোলমালে যদি আসলটী হারাইয়া যায়, তবে কত পরিতাপের কথা। লোকে কথায় বলে, "নাম ধর্ম্মদাস, পুণ্যের লেশ নাই।" নামটী হোমিওপ্যাথিক প্রতিষ্ঠান, কিন্তু অর্গ্যানন, হোমিও-দর্শন, প্রাচীন পীড়াতত্ত্বাদি শিখাইবার ব্যবস্থা নাই, মতিও নাই,—কি দুঃখের কথা! অথচ, খরচের কোন কৃপণতা নাই, কেবলমাত্র মতির অভাব। আশ্চর্য্য কথা,—সত্যের জন্য অনুরাগ, সত্যের জন্য চেষ্টা, অতি

অল্প ব্যক্তিরই দেখা যায়। সত্যের প্রতি প্রকৃত ভালবাসা না থাকিলে মতি আসে না এবং সত্যের প্রতি অনুরাগ থাকা একমাত্র ভগবৎ-কৃপাসাপেক্ষ,—পরিতাপ করিলে কি হইবে? আমাদের না হয় পরাধীন দেশ,—স্বাধীন দেশেরও এই অবস্থা, এমন কি, আরও অধিকতর নিকৃষ্ট অবস্থা।

জীবনীশক্তি।

বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যদিও জীবনীশক্তির সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ ও বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, এমন কি, আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা শাস্ত্র ঐ জীবনীশক্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত, তবুও পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রে এই শক্তির কোনও উল্লেখ দেখা যায় না,—অন্ততঃ পাশ্চাত্য চিকিৎসা ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ঋষিপ্রতিম হ্যানিম্যানই তাঁহার "অর্গ্যানন" নামক বিখ্যাত পুস্তকে জীবনীশক্তির প্রথম উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রটী ঐ শক্তির উপরেই সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত, বলিতে হইবে। ফলতঃ এই জীবনীশক্তির সম্বন্ধে অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা না থাকায় হোমিওপ্যাথির মূলতত্ত্বটী হৃদয়ঙ্গম করিবার পথে একটু অসুবিধা ঘটে, এজন্য ইহার বিষয়ে সম্যক্ আলোচনা অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে হয়।

জীবনীশক্তিটা কি, তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে হইলে সৃষ্টিতত্ত্বটী সামান্যতঃ আলোচনা প্রয়োজনীয়। ভগবানের "প্রকৃতি" নাম্নী শক্তি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্থাবর জঙ্গমাত্মক যাবতীয় দ্রব্যের "সৃষ্টি স্থিতি লয়াদি" কার্য্য সম্পাদন করিয়া

থাকেন। পৃথকভাবে চিন্তা করিলে আমাদের মনে হয় যেন, এক একটী শক্তি এক একটী কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, যেমন,—কোনও একটী নিরবলম্ব দ্রব্যকে পতিত হইতে দেখিলে আমরা কহিয়া থাকি, "মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি এখানে কার্য্য করিল", একটী চুম্বক প্রস্তর যখন একখণ্ড লৌহকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া টানিয়া লয়, তখন আমরা বলি "এখানে চৌম্বক-শক্তি কার্য্য করিল," আবার কোনও স্থলে বৈদ্যুতিক আলোক জ্বলিতে দেখিয়া আমরা কহিয়া থাকি যে "ইহা তড়িৎশক্তির কার্য্য।" এই ভাবে নানা ব্যাপারে নানাশক্তির কার্য্য দেখিয়া আমরা সাধারণতঃ মনে করি যে, এক একটী শক্তি পৃথকভাবে এক একটী কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। ফলতঃ ব্যষ্টিভাবে চিন্তা করিয়া আমরা যতই পৃথক শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করি না কেন, একথা অতিমাত্র সত্য যে, ঐ পূর্ব্বোল্লিখিত ভগবৎ-প্রকৃতিই সকল প্রকার আপাতপ্রতীয়মানা শক্তির মূল উৎস এবং সমষ্টিভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে ঐ সত্যটী আমাদের হৃদয়ে পূর্ণভাবে স্ফুরিত হইবে। বিজ্ঞান-শাস্ত্রও নিঃসংশয়রূপে প্রমাণ করিয়াছে যে, আলোক, বিদ্যুৎ, মাধ্যাকর্ষণ, চৌম্বক, ইত্যাদি যাবতীয় শক্তি, একটী মাত্র মূলশক্তিরই প্রকারভেদ মাত্র, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার শক্তিই একমাত্র পরাপ্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। ঐ পরাপ্রকৃতিই আমাদের শাস্ত্রোক্ত "আদ্যাশক্তি"।

এই পরাপ্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্যে ওতঃপ্রোতভাবে অবস্থিত থাকিয়া, যেখানে যেরূপ কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা থাকে, তাহা সম্পাদন করিয়া থাকেন। এই শক্তি, যেমন জড় দেহের মধ্যেও আছেন, উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদের মধ্যেও তেমনিই আছেন, তবে জড়দেহের মধ্যে ইন্দ্রিয় না থাকায় ঐ শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি হয় না,—উদ্ভিদে কথঞ্চিৎ হয়, প্রাণীদেহে যথেষ্ট হইয়া থাকে। ঐ শক্তিকেই **প্রাণ** নামে অভিহিত করা হয়। এই প্রাণই আমাদের **জীবনীশক্তি**। প্রাণ বা জীবনীশক্তির

কার্য্য,—চেষ্টন এবং ক্রমবিকাশ। একটী বটবৃক্ষের বীজ হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের উৎপাদন,—প্রাণের কার্য্য ; এবং জীবদেহে শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবনাদির ক্রমবিকাশ এবং নিত্য নৈমিত্তিক পোষণ ও বর্দ্ধন,—এ সকলই **প্রাণ বা জীবনীশক্তির কার্য্য।**

উদ্ভিদ্ বা জীবদেহের প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, জীবনী শক্তির কার্য্য, **ভিতর হইতে বাহিরের দিকে** এবং এই ভিতর হইতে বাহিরের দিকে গতিটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। **সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে পরিণতি বা বিকাশ,** ইহাই ঐ শক্তির মর্ম্মবাণী, কিন্তু **গতিটী সর্ব্বদাই ভিতর হইতে বাহিরে।** এই শক্তিটীর বিকাশ-পথে ঐ প্রকার **গতিটী** বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবার বিষয়, কেবলমাত্র উপরি উপরি শুনিয়া রাখিলে কোনও কার্য্য হয় না,—উহাকে নিজ নিজ হৃদয়ে **অনুভব** করিতে হইবে,—দুইটী বিষয়—(১) **ক্রমবিকাশ** এবং (২) **ভিতর হইতে বাহিরের দিকে গতি।**

প্রথমতঃ **ক্রমবিকাশ** সম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত। সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে পরিণতিই জগতের নিয়ম। বীজ হইতে অঙ্কুর, তাহার পর ক্রমগতিতে পুষ্পফল সমন্বিত বৃক্ষের উদ্ভব দেখিলে ক্রমবিকাশ ব্যাপারটী হৃদয়ঙ্গম হইবার পক্ষে সুবিধা হয়। অস্থ ভ্রূণাবস্থায় যে প্রাণীটী জননী-জঠরে শায়িত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মজনিত পুঞ্জীকৃত ফলরাশি নিরতিশয় সূক্ষ্ম বীজাকারে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে,—ঐ ফলরাশি বর্ত্তমানে বীজাকারে থাকিলেও তাহার ভিতর একটী সূক্ষ্ম শক্তি রহিয়াছে, যাহার ক্রিয়ায় ঐ বীজসকল বিকাশোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, কেবল কাল প্রতীক্ষা করিতেছে মাত্র। কালের সঙ্গে সঙ্গে **উত্তেজক কারণের** আবির্ভাব বা সংঘটন হইবামাত্রই উহারা বিকাশ প্রাপ্ত ও ফলপ্রসূ হইবে এবং হইয়া থাকে। অনেকেই মনে করেন যে, শিশুগণ নির্ম্মলচিত্ত লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহার

পর পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে তাহার মধ্যে ভাল বা মন্দ প্রবৃত্তি সমূহ জন্মিয়া থাকে, কিন্তু শাস্ত্রানুশীলনের দ্বারা যাঁহাদের দৃষ্টি খুলিয়াছে, তাঁহারাই জানেন যে, ঐ মত একেবারেই ভ্রান্ত। প্রত্যেক শিশু তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবন হইতে যাবতীয় কর্ম্মসঞ্জাত প্রবৃত্তি বা সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তবে সেগুলি বীজাকারে থাকে, এই পর্য্যন্ত এবং ঐ বীজের মধ্যে বিকাশোন্মুখী একটী শক্তি অন্তর্নিহিত থাকে, পারিপার্শ্বিক সাহায্য ও সুবিধা পাইলেই **বিকাশপ্রাপ্তি ঘটে,** এই পর্য্যন্ত।

উপরোক্ত বিকাশটী **কোন্ পথে** বা কিরূপ **গতিতে** ঘটিয়া থাকে? শক্তির বিকাশ হইবার জন্য জড় বাহিকা আবশ্যক, একথা সকলেই জানেন এবং তদনুসারে আমাদের শরীরস্থ স্নায়ুপথে ঐ শক্তি কার্য্য করিয়া থাকে। ফলতঃ এই পথটী জানা যতদূর প্রয়োজনীয় হউক আর না হউক, শক্তিবিকাশের **গতিটী কোন্ দিকে,** ইহা জানা এবং মনে প্রাণে অনুভব করা, চিকিৎসকের পক্ষে এবং চিকিৎসিতের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। ইহা সম্যক্‌রূপে না জানার জন্য এবং অনুভবের অভাবেই চিকিৎসক ও রোগী অনেক ক্ষেত্রে বাহ্য প্রলেপাদির সাহায্য, ঘৃত তৈলাদি মালিশের সাহায্য, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সঙ্গেই গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং তাহা ইষ্টজনক হইবে বলিয়া মনে করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে **বাহির হইতে** যে কোনও প্রকার সাহায্য যে অনিষ্টজনক, এমন কি, ক্ষেত্রবিশেষে ঘোরতর অনিষ্টজনক, তাহা অনুভব করিবার শক্তি লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে উপরোক্ত তত্ত্বটী হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। উদ্ভিদ্ দেহে বা প্রাণীদেহে, শক্তির বিকাশ-প্রাপ্তির গতিটী সর্ব্বদাই **ভিতর হইতে বাহিরে।** ইংরাজীতে ইহাকে প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে Vital Current অর্থাৎ জীবন-স্রোত বলা হইয়া থাকে। শরীরের নিত্য ক্ষয়, পূরণ, পুষ্টিকার্য্য বা বর্দ্ধনাদি যাবতীয় ব্যাপার, **ঐ জীবন-স্রোতের বশে ভিতর হইতে বাহিরে** সংঘটিত হইয়া থাকে।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ভগবানের সৃষ্টির অন্তরালে প্রকৃতি নাম্নী যে শক্তি সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য করিতেছেন, সেই শক্তিই আমাদের দেহের মধ্যে জীবনীশক্তি নাম ধারণ করিয়া ভিতর হইতে বাহিরের পথে কার্য্য করিয়া আমাদের দেহের যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। সুস্থদেহে এই জীবনীশক্তি অব্যাহতভাবে কার্য্য করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিবার ফলে জীবনীশক্তির স্বাভাবিক স্বাধীনতাটী অংশতঃ বা কিয়ৎপরিমাণে নষ্ট হয়, অর্থাৎ তাহাকে একটা বিরোধী শক্তির অধীনে কার্য্য করিতে বাধ্য হইতে হয়। প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে ঐ বিরোধী শক্তির উদ্ভব হইয়া থাকে এবং এইরূপ বিশৃঙ্খলাপ্রাপ্ত জীবনীশক্তির কার্য্যস্থলে আমাদের শরীরে ও মনে যে একটা অস্বস্থি অনুভূত হয়, তাহাই রোগ। এলোপ্যাথি প্রভৃতি চিকিৎসা-শাস্ত্রে রোগের ফলকে রোগ বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। যাহা হউক, জীবনীশক্তি কাহাকে বলে, তাহা উপরোক্ত আলোচনা হইতে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। মানবদেহস্থ পীড়া, পুষ্টি, বর্দ্ধন ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপার, জীবনীশক্তি দ্বারা ভিতর হইতে বাহিরের দিকে বিকশিত ক্রিয়া,—অতএব দেহের যে কোনও পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিবার ইচ্ছা করিলে **জীবনীশক্তির দ্বারাই** করাইতে হইবে, বাহিরের কোনও প্রকার সাহায্যের দ্বারা সে উদ্দেশ্য সাধন হইবার আশা নাই। সুতরাং বাহির হইতে যাবতীয় চেষ্টা,—চেষ্টা মাত্র, তাহার দ্বারা কোনও কার্য্য হয় না। প্রত্যেক পরিবর্ত্তনটী **জীবনীশক্তির ভিতর হইতে বাহিরের দিকে যে চিরন্তন স্রোত রহিয়াছে, সেই স্রোতের বশেই** হইয়া থাকে। অতএব জীবনীশক্তির উপর ক্রিয়া করিতে পারে এরূপ দ্রব্যের দ্বারাই অভিষ্ট পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে, অন্য কোনও প্রকারে হয় না, হইবার নয়। এই জীবনীশক্তির বিশৃঙ্খলাই

পীড়া এবং ঐ বিশৃঙ্খলা পরিহার করিবার উদ্দেশ্যে ঐ **জীবনীশক্তিকে যে সাহায্য** করা হয়, তাহাই **চিকিৎসা**।

এক্ষণে জীবনীশক্তিকে সাহায্য করিতেছি, একথা সকল শ্রেণীর চিকিৎসকগণই কহিয়া থাকেন, কিন্তু সাহায্যটী চিকিৎসকের খেয়ালের বশে করিলে হইবে না, এই সাহায্য করিবার একটী **নীতি** আছে, সেই নীতি অনুসারে সাহায্য না করিলে সাহায্যই হয় না, বরং প্রতিরোধ করা হইয়া থাকে। সাহায্যের নীতি এই যে, প্রকৃতি সাহায্য পাইবার জন্য রোগী-শরীরে যে ভাষা প্রকাশ করেন, সেই ভাষা অর্থাৎ রোগীর দেহে ও মনে প্রকাশিত যাবতীয় লক্ষণ, সমষ্টিকৃত করিয়া, তাহারই সাদৃশ্যে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। কেবল তাহাই নয়, যে ঔষধটী প্রযোজ্য হইবে, তাহা অতি সূক্ষ্মমাত্রায়, শক্তীকৃত অবস্থায় প্রয়োগ করিতে হইবে, নতুবা সূক্ষ্ম জীবনীশক্তির উপরে কোনও প্রকারেই ক্রিয়া ঝঙ্কার উৎপাদিত হইবে না। স্থূল দ্রব্যের দ্বারা স্থূলে আঘাত করা সম্ভব হয়, কিন্তু সূক্ষ্মে আঘাত করিতে হইলে সূক্ষ্ম আবশ্যক। শক্তিস্তরে ক্রিয়া করিবার আবশ্যক হইলে শক্তির দ্বারাই করিতে হইবে। সুতরাং ১ম কথা,—প্রকৃতির সাহায্য চাহিবার ভাষা, ২য় কথা,—সমলক্ষণসূত্রে ঔষধ প্রয়োগ এবং ৩য় কথা,—সূক্ষ্মমাত্রায়, শক্তীকৃতভাবে প্রয়োগ।

অসমলক্ষণসূত্রে যে সকল চিকিৎসা-পথ আছে, সে সকল পথে জীবনীশক্তির দ্বারা কোনও কার্য্য করান হয় না, সেই শক্তিকে সাহায্য করিয়া তাহার দ্বারাই আরোগ্য সম্পাদন করান তাহাদের আরোগ্যনীতি নয়। সে সকল পথে রোগের **নাম** হিসাবে এবং রোগের **ফল** হিসাবে চিকিৎসা করার প্রথাই দেখা যায়। কোনও একটী রোগের নাম যদি "জ্বর" বলিয়া জানা গেল, তবেই কুইনাইনাদি ভেষজ প্রদান সমীচীন বলিয়াই তৎপথের চিকিৎসকগণ সাব্যস্ত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের হিসাবে রোগের

ফলই চিকিৎসার বিষয়, সেই ফলটী অপসারিত করিতে পারিলেই তাঁহারা চিকিৎসা বলিয়া অভিহিত করেন। এজন্য কুরন্দ, গোদ, গলগণ্ড, অর্ব্বুদাদি অস্ত্রোপচার করিয়া লোপ করাই তাঁহাদের মতে চিকিৎসা। ফলতঃ আবার যদি অস্ত্রোপচারের পরেও ঐ ঐ জিনিষ পুনরায় দেখা দেয়, তবে তাঁহারা পুনরায় অস্ত্রোপচারই করিবেন। কিন্তু জীবনীশক্তি কি জন্য ঐগুলি তৈয়ার করিয়াছিলেন, পুনরায় অস্ত্রোপচার দ্বারা সেগুলি কাটিয়া দূর করিয়া ফেলার পরে আবার কেন তিনি গঠন করিলেন, এসকল বিষয় তাঁহারা চিন্তা করেন না, চিন্তা করা প্রয়োজনীয় বলিয়াও মনে করেন না। যাহা হউক, আরোগ্য কার্য্যটী তাঁহারা জীবনীশক্তির দ্বারা সম্পাদন করান না, নিজেদের খেয়ালের বশেই ঔষধ দিয়া থাকেন, এই কারণে কোনও একটী রোগী-ক্ষেত্রে দশজন চিকিৎসককে দেখাইলে দশ প্রকারের অভিমত এবং বিংশতি প্রকারের বিভিন্ন ঔষধ নির্ব্বাচন, সম্ভব হইয়া থাকে।

আমাদের জীবনীশক্তিই একমাত্র আশ্রয়। অন্য চিকিৎসক যদি তিনটী রোগীর নিউমোনিয়া হইয়াছে বলিয়া চিকিৎসা করেন, তবে নিউমোনিয়া নামক রোগের ঔষধ দিতে থাকিবেন এবং তিনজনেরই একই প্রকার ঔষধ, ব্যবস্থা ও চিকিৎসা হইবে। প্রত্যেকেরই বুকে এন্টিফ্লোজিষ্টিন প্রয়োগ করিবেন, অথবা তিনজনেরই বুকে স্বেদ মালিশ ইত্যাদি দিবার উপদেশ দিবেন। আমাদের জীবনীশক্তিই একমাত্র গতি ও আশ্রয়, আমরা চিকিৎসা করিতে গিয়া সর্ব্বদাই তিনজনার ক্ষেত্রেই জীবনীশক্তির সাহায্য ভিক্ষার ভাষাটী অন্বেষণ করিব, আমরা নিউমোনিয়া বলিয়া কোনও চিকিৎসাই করিব না, কারণ নিউমোনিয়াটী রোগের ফল মাত্র। যাহা হউক, জীবনীশক্তির সাহায্য চাহিবার ভাষা খুঁজিতে গিয়া জানিলাম,—১নং রোগীর শুষ্ক কাশি ও ডানদিকের বুকে বেদনা, কিন্তু ডানদিকে চাপিয়া শয়ন করিলেই ভাল বোধ করে, নড়াচড়ায় ভয়ানকভাবে সকল কষ্ট বাড়ে,

অতিশয় শিরঃপীড়া, টিপাইলে উপশম হয়, অতিশয় পিপাসা, কিন্তু অনেকক্ষণ পরে পরে অনেকখানি করিয়া জলপান করে, খোলা বাতাস, তদভাবে পাখার বাতাস অন্বেষণ করে, কোষ্ঠবদ্ধ, জিহ্বাটী শুষ্ক ও সাদা লেপযুক্ত, রোগী নড়াচড়ায় বৃদ্ধির ভয়ে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে,—এইগুলি প্রকৃতির ভাষা এবং ইহাদের সমষ্টিগত চিত্রটীর সাদৃশ্যে ব্রাইওনিয়া নামক ঔষধটী ৩০ বা ২০০ শক্তিতে প্রয়োগ করিব এবং তাহার ফলে রোগীও সারিবে। অতএব যদি রোগের নিউমোনিয়া-রূপ ফলটী সর্ব্বসম্পূর্ণ হইয়া না থাকে, তবে আর হইতেই পারিবে না, এথানে মুকুলেই বিনাশ হইবে, আর যদি ফলটী সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, তবে ধীরে ধীরে রোগী নিজে সুস্থ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ফলটী শ্লেষ্মারূপে নির্গত লইয়া যাইবে। ২ নং রোগীটীর চিকিৎসা করিতে গিয়াও আমরা প্রকৃতির সাহায্য চাহিবার ভাষা অন্বেষণ করিয়া পাইলাম,—সে ব্যক্তি বামদিকে ব্যতীত শয়ন করিতে একেবারেই অপারক। জিহ্বাটী ভয়ানক মোটা, পুরু, ক্লেদাবৃত, অতিশয় সরস, এমন কি, মুখ হইতে দুর্গন্ধ লালাও নিঃসরণ হইতেছে, কেবলই কি তাহাই, তাহার উপর আবার পিপাসাও যথেষ্ট, রোগীর সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম খুবই বেশী, কিন্তু জ্বরের বিরাম নাই, বরং ঘর্ম্ম জন্ম রোগীর নিরতিশয় কষ্ট হয়,—এই ভাষাগুলির সমষ্টি-হিসাবে মার্কসল নামক ঔষধটী শক্তীকৃত অবস্থায় প্রয়োগ করিব এবং তাহার ফলে রোগী সারিবে। অতএব ফলটী পূর্ণ-পরিণতি প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে হইলে আর পরিণত হইতে পারিবেই না, আর যদিই ফলটী পরিণত হইয়া গিয়া থাকে, তবে ফলটী শ্লেষ্মারূপে নির্গত হইয়া যায়। ঠিক এই ভাবে, ৩নং রোগীটীরও চিকিৎসার্থ গিয়া প্রকৃতির ভাষা, মনে করুন, পাওয়া গেল যে,—রোগীর অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধ, পেটটীও ফাঁপা ফাঁপা, আহারের ইচ্ছা যথেষ্ট থাকিলেও সামান্ত কিছু খাইলেই পেটটী যেন ভরিয়া আসে, জ্বর এবং শ্বাসকষ্ট, বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত খুবই বৃদ্ধি পায়, ঠাণ্ডা দ্রব্য

খাইতে বা পান করিতেই চাহে না, সকল জিনিষই গরম গরম চায়, আরও একটী অদ্ভুত ভাষা এই যে, রোগীর নাকের পাখাগুলি উঠা পড়া করিতেছে, —এই সকল ভাষার সমষ্টি হিসাবে লাইকোপোডিয়াম নামক ঔষধটী শক্তীকৃত অবস্থায় প্রয়োগ করিব। ফলাফল পূর্ব্ব রোগী দুইটার মতই হইবে। এই প্রকার চিকিৎসার বিষয়ে চিকিৎসকদিগের মধ্যে কোনও প্রকারেই মতদ্বৈধ হইবার উপায় নাই, থাকিতে পারে না, কেননা রোগটি কি হইয়াছে, তাহা এই নানা চিকিৎসকের মধ্যে মতদ্বৈধ হইতে পারে ও হওয়া সম্ভব, যেহেতু রোগ নির্ণয় ব্যাপারটী কোনও নিশ্চিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। সুতরাং কেহ বলিবেন নিউমোনিয়া, কেহ বলিবেন, ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া, কেহ বলিবেন, ব্রঙ্কাইটিস্, কেহ বলিবেন অন্য কিছু— কিন্তু আমাদের চিকিৎসায় "রোগ নির্দ্ধারণ" বিষয়ে কোনও প্রয়াস নাই, যেহেতু উহা কখনও নিশ্চিত বলা সম্ভব নয়। আমাদের রোগীর মধ্যে প্রকৃতির সাহায্য ভিক্ষার ভাষাগুলি অর্থাৎ লক্ষণ-সমষ্টি লক্ষ্য করিলেই হইল এবং বিকাশ-প্রাপ্ত লক্ষণ-সমষ্টি বিষয়ে কাহারও কোনও মতদ্বৈধ হইবার উপায় নাই। তাহা ছাড়া, ঐ ঐ সমষ্টি যে যে ঔষধের প্রুভিংএ বাহির হইয়াছে, তাহা আমাদের জানা আছে ও আমাদের মেটেরিয়া মেডিকায় লিপিবদ্ধ আছে। এক্ষণে, কেবল রোগীতে বিকাশপ্রাপ্ত লক্ষণ-সমষ্টির সমলক্ষণে এক একটী ঔষধ নির্ব্বাচন বিষয়েও কোনও মতদ্বৈধ সম্ভবই নয়। আমাদের চিকিৎসার নিশ্চিত নীতি আছে, নির্ব্বাচনের ভিত্তি আছে এবং রোগী আরোগ্য পথে যাইতেছে, তাহার নিদর্শনাদি আছে।

সুতরাং একমাত্র প্রকৃতি বা জীবনীশক্তিই কর্ত্রী, তিনিই একমাত্র আরোগ্য প্রদায়িনী, আমাদের কার্য্যদোষে জীবনীশক্তির মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে তাহাকেই রোগ কহে এবং সেই বিশৃঙ্খলা তিনি যেখানে অন্য কোনও শক্তির সাহায্য ব্যতীত দূর করিতে পারেন, সেখানে সাহায্যের

আবশ্যকই হয় না এবং যেখানে তিনি নিজেই তাহা দূর করিতে অপারক হয়েন, সেখানে তিনি নানাপ্রকার লক্ষণ বিকাশ করিয়া সাহায্য চাহেন এবং তদনুসারে সমলক্ষণসূত্রে ঔষধ নির্ব্বাচনের দ্বারা তাঁহাকে সাহায্য করিয়া তাঁহার দ্বারাই আরোগ্য আনয়নের চেষ্টাই চিকিৎসা।

প্রকৃতিদেবীর অর্থাৎ জীবনীশক্তির এই ভাষা, অর্থাৎ সাহায্য প্রাপ্তির জন্য লক্ষণসমষ্টির বিকাশ যেখানে না থাকে, সেখানে চিকিৎসক উপায়হীন, কেননা ঔষধ নির্ব্বাচনের ভিত্তিরই অভাব, তিনি কি করিবেন? সে অবস্থায় জানিতে হইবে যে, রোগীর পীড়াটী সাধ্যসীমা অতিক্রম করিয়াছে, আর চিকিৎসা সম্ভব নয়। কি প্রকারে এই অসাধ্য অবস্থায় আসে, তাহা স্থানান্তরে আলোচিত হইবে (তৃতীয় অধ্যায়ে "অসাধ্যপীড়া" দ্রষ্টব্য)।

জীবনীশক্তি ও তাঁহার ক্রিয়াগতি।

জীবনীশক্তি কি এবং তাঁহার ক্রিয়াগতি কি প্রকার, তাহা আমাদের পক্ষে জানা যে কত আবশ্যক, তাহা সকলেই বিদিত আছেন। প্রত্যেক হোমিওপথাবলম্বী চিকিৎসকের পক্ষে ঐ বিষয়গুলি জানা না থাকিলে বিশুদ্ধভাবে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হইতে পারে না। এ অবস্থায়, বিষয়টী পুনরায় আলোচিত হইলে, প্রকৃত তথ্যটীর সুনির্ম্মল প্রকাশ সম্ভব হইবে, এই আশায় ইহার পুনরালোচনা দূষণীয় হইবে না, মনে করি। **জীবনীশক্তির বিশৃঙ্খলাই রোগ বা পীড়া।** এক্ষণে, যদি এই শক্তির বিষয়েই কোনও জ্ঞান না থাকে, অথবা এই শক্তি কিভাবে কার্য্য করিয়া

থাকেন, সে বিষয়ে আমাদের পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি ও অনুভূতি না থাকে, তাহা হইলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাপথটি অবলম্বন করা নিতান্তই বিড়ম্বনা ব্যতীত কিছুই নয়। কেবল মাত্র কতকগুলি ঔষধের লক্ষণগুলি মনে রাখিলেই চিকিৎসা-কার্য্য হয় না। বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, শক্তিরাজ্যের জ্ঞান সঞ্চয় ও তদনুসারে কার্য্য করা ত নিতান্তই দুরাশা, অধিকন্তু হোমিওপ্যাথির রাজ্যে, যে প্রকার ব্যভিচার ও ব্যবসা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে এ সকল তত্ত্ব আলোচনা নিতান্তই অবান্তর বলিয়া বিবেচিত হইবে।

জীবনীশক্তি কি এবং তাঁহার সম্বন্ধে নানা আলোচনা আমাদের অত্যাবশ্যক এবং উহা মনে প্রাণে অনুভব না করিলে চিকিৎসাকার্য্যে সম্যক্ সাফল্যলাভ হয়ই না, বরং অনেক ক্ষেত্রে ঘোর অনিষ্ট-সংঘটনই হইয়া থাকে, এমন কি, চিকিৎসক আদৌ উপলব্ধি করিতেই পারেন না যে, তাঁহার দ্বারাই রোগীর অনিষ্ট হইল, আবার এরূপ অনিষ্টও হইয়া পড়ে যে, আর সংশোধনের কোনও উপায়ই থাকে না এবং দুর্ভাগা রোগীকে অতি অবশ্যই কালকবলে পতিত হইতে হয়। অবশ্য নিয়তি সকল অবস্থাতেই ক্রিয়াশীলা, কিন্তু তাহা হইলেও, নিজেদের কর্ত্তব্য বিষয়ে অবহেলা অতিমাত্র পাপজনক ও গর্হিত।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য্যের অন্তরালে যে শক্তি ক্রিয়াশীলা তাঁহাকে আমরা "প্রকৃতি দেবী" বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকি। এই প্রকৃতিদেবীকেই আমরা "জগজ্জননী", "বিশ্ব-প্রসবিনী", "দয়াময়ী মাতা", ইত্যাদি নামে পূজা করিয়া থাকি,—কেননা শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই,—"শক্তি-শক্তিম্‌-তোরভেদঃ"। এই শক্তি কাহার শক্তি? ইহা ভগবানেরই শক্তি, সুতরাং এই শক্তিও যিনি, ভগবানও তিনি। যখন সৃষ্টিস্থিতিলয়াদি কার্য্যে ব্যাপৃতা, তখন তাঁহাকে "শক্তি" বলিয়া

অভিহিত করি, পরন্তু যখন স্থির, অচল, অচঞ্চল এবং "শান্তং শিবং অদ্বৈতং" ভাবে তাঁহাকে চিন্তা করি, তখন তাঁহাকে "ভগবান্, পরমপুরুষ, পুরুষোত্তম," ইত্যাদি ভাষায় ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করি, ফলতঃ তিনি বাক্যমনের অতীত, "অবাঙমনসো গোচরম্"। যাহা হউক, আমাদের বুঝিবার সৌকর্য্যার্থ, ঐ "শক্তি"কে আমরা ভগবান হইতে পৃথক বলিয়াই চিন্তা করি। ফলতঃ এই অনন্ত জগতের, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থের অন্তরালে থাকিয়া, অনুস্যূতভাবে বা ওতঃপ্রোতঃভাবে অবস্থান করিয়া, তাহাদের সৃষ্টি, পুষ্টি, বর্দ্ধন, ক্ষয়, লয়াদি কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, এ বিষয়ের আদৌ কোনও সন্দেহ নাই। যখন প্রত্যেক প্রাণীদেহ বা মানবদেহ সম্বন্ধে আমরা চিন্তা করি, তখন বুঝিতে পারি যে, এই শক্তিই প্রাণশক্তিরূপে, "জীবনং সর্ব্বভূতেষু" হিসাবে, আমাদের শরীরের যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। সুতরাং ঐ **প্রকৃতিদেবীই** যখন মানবদেহে কার্য্য করেন, তখন তাঁহাকে আমরা **জীবনীশক্তি** নাম দিয়া থাকি, অর্থাৎ ভগবৎশক্তি প্রকৃতিই আমাদের শরীরের জীবনীশক্তি। ইহা সম্যক্‌রূপে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করা অবশ্য খুবই কঠিন, পরন্তু একথা খাঁটী সত্য, ইহার ব্যত্যয় নাই।

উপরোক্ত কথা আমার "মনগড়া", অতএব কেবল কল্পনাত্মক, বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ নাই। যদি আমার এ কথায় কাহারও প্রতীতি না হয়, তিনি আমাদের সর্ব্বশাস্ত্রময়ী শ্রীমৎ ভগবদ্গীতা গ্রন্থের পঞ্চদশ অধ্যায় পাঠ করিলেই স্বয়ং ভগবানের বাণীর মধ্যে এই মহাসত্যের সন্ধান পাইবেন। ঐ প্রকৃতি ব্যতীত শক্তি আর কেহ নাই, আর কাহারও নাই,—একমাত্র তিনিই নানা নামে, নানা বিভাগে, নানা কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন এবং আমাদের বহির্ম্মুখী মনকে "মোহন" করিয়া, জগন্মোহিনী" নাম সার্থক করিতেছেন।

উপরোক্ত প্রকৃতিনাম্নী ভগবৎশক্তি আমাদের শরীরের প্রত্যেক অণু

পরমাণুতে অবস্থিত থাকিয়া শরীরের যাবতীয় কার্য্য, যথা, পুষ্টি, বর্দ্ধন ইত্যাদি সম্পাদন করিতেছেন। যতদিন মনুষ্য প্রাকৃতিক নীতি সকল আদৌ কোনও প্রকারে ভঙ্গ ও অমান্য না করিয়া তাঁহারই নীতিবশে আপনাকে পরিচালিত করিতেছিল, ততদিন আমাদের শরীরের মধ্যে একটী শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজিত ছিল এবং ঐ শান্তি ও শৃঙ্খলার একটী উৎকৃষ্ট নিদর্শন ইহাই ছিল যে, আমরা সে সময়ে আমাদের শরীরের কোনও অংশই "আছে" বলিয়া অনুভব করিতে পারিতাম না, অর্থাৎ কেবলমাত্র "অহমস্মি" বা "আমি আছি", ইহাই অনুভব করিতাম, কিন্তু শরীরের কোনও স্থূল অংশের বা কোনও যন্ত্রবিশেষের অস্তিত্ব আদৌ অনুভব হইত না। প্রকৃত স্বাস্থ্যের ইহাই একমাত্র নিদর্শন। জীবনীশক্তি স্বাভাবিক ভাবে ক্রিয়া করিতে থাকায়, কোনও প্রকার স্থানীয় অনুভূতিও থাকে না,—যেহেতু কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত কোনও স্থলে কোনও বাধাপ্রাপ্তির আদৌ কারণ থাকে না। অভ্যন্তর হইতে বাহ্য স্তর পর্য্যন্ত ঐ ক্রিয়াটী সুষ্ঠুভাবে (smoothly) চলিতে থাকে।

এক্ষণে, জীবনীশক্তি কি ভাবে বিশৃঙ্খলা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ভগবৎনীতি অমান্য করিলে, জীবনীশক্তির মধ্যে তাহার ফলস্বরূপে বিশৃঙ্খলার আবির্ভাব হয়, এ বিষয়ে সামান্য কিছু আলোচনা না করিলে, আলোচ্য বিষয়টী যেন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় বলিয়া, অতি সংক্ষেপে উহা লিখিত হইতেছে। যখনই ঐ নীতির বিরুদ্ধে কার্য্য করা হয়, তখন স্বতঃই মানবমনে একটী কণ্ডুয়নবৎ অস্বস্থি আরম্ভ হয়। প্রকৃতির সর্ব্বপ্রথম নীতি,—যজ্ঞকার্য্য, অর্থাৎ জীবকুলের কল্যাণকল্পে নিজের স্বার্থত্যাগ করিয়া, জীবনপথে চলিতে থাকাই প্রকৃত প্রস্তাবে, মানবজীবন। এই নীতি বরাবরই প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছিল এবং যতদিন স্রষ্টার এই ইচ্ছা বা নীতি অক্ষুণ্ণ ছিল, ততদিন মানবমনে কোনওপ্রকার গ্লানি বা বিশৃঙ্খলা ছিল না। যদি বলেন,

"ইহা কি আপনার ধারণামাত্র ?" না, তাহা নয়, ভগবান্ স্বয়ং কহিয়াছেন "সহযজ্ঞাঃ প্রজাস্সৃষ্ট্বাঃ পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।" (গীতা ৩য় অধ্যায় ১০ম শ্লোক), অর্থাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞ প্রবৃত্তি সহ জীবকুলকে সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে ঐ যজ্ঞনীতির পরিবর্ত্তে যখন হিংসা ও দ্বেষভাব মনোমধ্যে মনুষ্য পোষণ করিল, তখনই তাহার মনে একটী কণ্ডুয়ণভাবের সৃষ্টি হইল। এই কণ্ডুয়ণ প্রাকৃতিক ক্রিয়াবশে মনস্তর হইতে বাহ্যস্তরে প্রেরিত হয়,—সুতরাং উহা দেহের উপরিভাগে চুলকানিরূপে আবির্ভূত হইল। এক্ষণে, চুলকানিগুলিকে চর্ম্মের "পীড়া" বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া, চিকিৎসক সম্প্রদায়, বাহ্য প্রয়োগের দ্বারা, অর্থাৎ **বাহির হইতে ভিতরের দিকে ক্রিয়ামুখী** ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা, **জীবনীশক্তির একটী বিরুদ্ধ শক্তির সৃষ্টি করিলেন, এই বিরোধ শক্তির নামই "সোরা"**। এই সোরা নামক শক্তিটী জীবনীশক্তির ক্রিয়াকে কলুষিত করিল, অর্থাৎ এক্ষণে জীবনীশক্তি আর নিজের স্বাধীনতার উপর ক্রিয়া করিতে অসমর্থ হইয়া ঐ বিরোধী শক্তিটার বশে কার্য্য করিতে বাধ্য হইলেন। এই বিশৃঙ্খল ভাবে কার্য্যই পীড়া বলিয়া বিকাশ পাইল এবং ক্রমগতিতে ঐ পীড়া কেন্দ্রদেশ হইতে পরিধিতে, ভিতর হইতে বাহিরে, প্রকাশ পাইতে লাগিল।

এক্ষণে উক্ত বিরোধী শক্তির বশে, জীবনীশক্তি কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে, সর্ব্বপ্রথমেই **মনোরাজ্যে** একটী অস্বস্থির উদ্ভব হয়, কিছুদিন পরে আমরা শরীরের কোনও যন্ত্র বশেবর্তী সর্ব্বপ্রথম অনুভব করিতে আরম্ভ করি, ক্রমে,—ঐ যন্ত্রে যাতনা, বেদনা এবং সর্ব্বশেষে কুগঠন বা পচন দেখা দিয়া থাকে। যে যন্ত্রে যাতনা বা বেদনা দেখা দেয়, সেই যন্ত্রের "ঐ তথাকথিত পীড়াটী" আরাম করিবার জন্য, যদি পুনরায় কেহ বাহির হইতে ভিতরের দিকে ক্রিয়াকারী কোনও ঔষধ প্রয়োগ করে, তাহা হইলে, আবার

ঐ যন্ত্র অপেক্ষা অধিক **মূল্যবান্** যন্ত্র আক্রান্ত হইয়া থাকে। বাহির হইতে ভিতরের দিকে ক্রিয়াকারী ঔষধ কাহাকে বলে? **সমলক্ষণ** ব্যতীত যাবতীয় ঔষধ ঐ পথে ক্রিয়া করিয়া থাকে,—ইহা মনে রাখিতে হইবে।

অতঃপর জীবনীশক্তির ক্রিয়াগতিটী কি প্রকার, তাহা বোধগম্য হইলেই উপরোক্ত তত্ত্ব আরও সুপরিস্ফুট হইবে। **যেমন সূক্ষ্ম হইতে স্থূলপথে, বীজ হইতে বৃক্ষে, শক্তিস্তর হইতে স্থূলরাজ্যের দিকে, আমরা অবিরাম গতিতে, স্থাবরজঙ্গমাত্মক সৃষ্ট পদার্থসমূহের সৃষ্টি, গঠন ও ধ্বংসকার্য্য প্রতিনিয়ত দেখিতে পাই, আমাদের শরীর-মধ্যস্থ জীবনীশক্তিও কেন্দ্র হইতে পরিধির দিকে, সূক্ষ্মরাজ্য হইতে বাহ্যদেহে, ক্রিয়া সঞ্চার করিয়া থাকেন, ইহা আমরা সর্ব্বদাই অনুভব করি।** "পীড়া" বা "আরোগ্য" এই পথেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। পীড়াও যেমন জীবনীশক্তির মধ্যে একটী বিরোধীশক্তির আনীত বিশৃঙ্খলা এবং উহা ভিতর হইতে বাহিরের দিকে, ঠিক যেন একটী প্রবাহের বশে বিকাশ পায়, সেইরূপ ঐ বিশৃঙ্খলার তিরোভাব সাধন করিতে পারিলে, অর্থাৎ **সদৃশ বিধানে নির্ব্বাচিত ঔষধের ক্রিয়ায় ঐ বিশৃঙ্খলাটী নষ্ট** হইলে, **সুশৃঙ্খল** অর্থাৎ স্বাভাবিক জীবনীশক্তির দ্বারা **ভিতর** হইতে **বাহিরের** দিকে, ঠিক যেন প্রবাহবশেই, পীড়াটীরও ধ্বংসসাধন হইয়া থাকে। গতিটী উভয় ক্ষেত্রেই একই দিকে, ইহা মনে রাখিবার কথা। **পীড়ার গতি বাহির হইতে ভিতরে এবং আরোগ্যের গতিও ভিতর হইতে বাহিরে,**—অর্থাৎ কোনও পীড়ালক্ষণকে "চাপা দিলে" জীবনীশক্তির বহির্ম্মুখী গতিটী (Influx) বিপরীতমুখী হইয়া নব নব পীড়ার সৃষ্টি করে, কিন্তু জীবনীশক্তির বিশৃঙ্খলা জনিত যে পীড়া, তাহা ঐ ভিতর হইতে বাহিরের দিকে আসিয়া বিকাশপ্রাপ্ত

হয়,—এই তত্ত্বটী বেশ করিয়া অনুভব করিতে হইবে। ফলতঃ একটী উদাহরণ প্রদত্ত না হইলে, বিষয়টী অনুভব হওয়া সুকঠিন।

মনে করুন, একটী শিশুর প্রবল জ্বর হইয়াছে, স্তিমিতলোচনে নির্ব্বাক্ নিষ্পন্দভাবে পড়িয়া আছে, মলবেগ নাই, মূত্রও অতি সামান্য, পিপাসা, অনেকক্ষণ পরে পরে অনেকখানি করিয়া জলপান করে, সামান্য নড়াচড়া করিলেই বড় কষ্ট হয় ইত্যাদি। আপনি হয়ত এ সকল লক্ষণ দৃষ্টে, **ব্রাইওনিয়া** ২০০ একমাত্রা দিলেন। আপনি কি করিলেন? আপনি **প্রকৃতিকে** সাহায্য করিলেন। প্রকৃতি কয়েকদিন হইতেই কতকগুলি হাম নামক উদ্ভেদ বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু সক্ষম হন নাই, আপনার ঔষধটী পড়িবামাত্র তিনি সাহায্য পাইলেন, যেহেতু ঐ ঐ লক্ষণ প্রকাশ করিয়া তিনি আপনার নিকট সাহায্যই চাহিতেছিলেন। যাহা হউক, যেমনই সেই দিন ভোরের সময় শিশুটার দেহে কতকগুলি উদ্ভেদ বাহির হইল, এদিকে তৎ সঙ্গে সঙ্গেই জ্বরটীও মন্দীভূত হইতে লাগিল এবং ক্রমেই কমিয়া কমিয়া পরদিন যখন সমস্ত উদ্ভেদ বাহির হইয়া গেল, তৎসঙ্গেই জ্বরপীড়াটীও আরোগ্য হইল। আবার দেখিবেন, যদি বাহিরের বায়ুপ্রবাহ সংস্পর্শে অথবা অন্য কোনও অত্যাচারে, **বাহির হইতে ভিতরের দিকে** একটী গতি সৃষ্ট হয়, অর্থাৎ হামগুলি "লাট খাইয়া" বা "ডুবি খাইয়া যায়, তবে আরও গুরুতর লক্ষণ সহ জ্বরটী বৃদ্ধি পাইয়া হয়ত বিকারে পরিণত হয়, ইহা আমরা নিত্যই দেখিতে পাই। সুতরাং উপরে বর্ণিত ক্রিয়াগতিটী যে একটী নির্ম্মল সত্য তত্ত্ব, তাহা প্রমাণ হইতেছে। যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের মধ্যেও ঐ শক্তির ক্রিয়াপ্রবাহটী, ভিতর হইতে বাহিরে, নিরন্তর গতিতে প্রবহমান, ইহা সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

জীবনীশক্তির ক্রিয়াগতিটীর বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান না থাকিলে, চিকিৎসক

অনেকস্থলেই রোগীর চিকিৎসাক্ষেত্রে সদৃশ ও অসদৃশ বিধানের ব্যবস্থা, একত্রেই একই সময়ে অবলম্বন করিয়া থাকেন। আমি অনেক নিউমোনিয়া ক্ষেত্রে দেখিয়াছি যে, বাহিরে আক্রান্ত পার্শ্বে এন্টিফ্লজিষ্টিন অথবা স্বেদ মালিশাদির ব্যবহারও চলিতেছে, ফস্ফোরাস্ বা অন্য কোনও ঔষধের আভ্যন্তর প্রয়োগও হইতেছে। বাতের পীড়ার চিকিৎসাকালে প্রায়ই দেখিয়া থাকি যে, বাহিরে মর্দ্দন, মালিশ ও তাপ প্রয়োগও চলিতে থাকে, আবার তৎসঙ্গে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের আভ্যন্তর প্রয়োগও চলিতে থাকে। কয়েক দিন ধরিয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, আবার কয়েক দিন ধরিয়া এলোপ্যাথিক ঔষধ, আবার কয়েক দিন ধরিয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধের প্রয়োগ,—এলো-হোমিওদিগের দ্বারা সর্ব্বদাই অনুমোদিত ও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। আজ ৬।৭ মাস পূর্ব্বে হাইকোর্টের একজন এড্‌ভোকেট্ মহাশয় তাঁহার পত্নীর দুরারোগ্য জরায়ু-পীড়ার চিকিৎসা এলোপ্যাথিক মতে চলিতে থাকা কালে, আমায় সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন, "নিত্য বৈকালে ও রাত্রে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দেওয়ায় কি ক্ষতি হইতে পারে ? তাহার পর ভোরের দিক হইতে বৈকাল পর্য্যন্ত এলোপ্যাথিক ঔষধ যেমন চলিতেছে তেমনই চলুক না কেন ? ইত্যাদি।" তৎব্যতীত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা চলিতে চলিতে বাহ্যপ্রয়োগ বা জোলাপাদি রহিত করিয়া চিকিৎসা করিলে, লোকে ইহাকে "গোঁড়ামি" বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। এ সকলের কারণ অন্য কিছুই নয়, কেবল জীবনীশক্তির ক্রিয়াগতি সম্বন্ধে আদৌ কোনও জ্ঞান না থাকাই একমাত্র কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

জীবনীশক্তির অবস্থা না বুঝিবার ফলে, কতই যে অনিষ্টজনক চিকিৎসা প্রতিনিয়ত অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহার বর্ণনা করা প্রায় অসম্ভব। কতদিন হইতে পীড়াটী আরম্ভ হইয়াছে, কি গতিতে চলিতেছে, কি ভাবে এতাবৎকাল চিকিৎসা হইয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে জীবনীশক্তি বিশেষভাবে

ক্রিয়াশীলা অথবা ক্লান্তভাবযুক্তা,—এ সকল চিন্তা না করিয়াই, কোনও কোনও ক্ষেত্রে অজ্ঞানতা নিবন্ধন, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে ঘোর দাম্ভিকতার বশবর্ত্তী হইয়া, যথেষ্ট উচ্চতর শক্তির ঔষধ প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসক মহাশয়গণ রোগীদিগের ঘোর অনিষ্টসাধন করিয়া থাকেন, এমন কি, করিয়াই চলিতেছেন। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা ঘোর দম্ভভাবের সহিত এ প্রকার মূর্খতা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগকে কে শিক্ষা দিবেন, কেই-বা শিক্ষা করিবেন? সেদিনে একটী **টিউবারকুলোসিস্** রোগিণী, যাঁহাকে আমরা তিন মাস সময় মধ্যে সাল্ফার ৩০ শক্তিও একমাত্রা দিতে সাহস করি নাই, সেই রোগিণীকে এই সহরের একজন এলো-হোমিও চিকিৎসক **সালফার** ১০০০ একমাত্রা প্রয়োগ করিয়া দুই দিনের মধ্যেই কালকবলে প্রেরণ করেন এবং ঔষধ প্রয়োগ করিবার সময় নাকি অতিমাত্র দম্ভের সহিত বলিয়াছিলেন যে, "পূর্ব্ব চিকিৎসক রোগিণীর আরোগ্যটা অনর্থক বিলম্বিত করিতেছিলেন, আমার এই উচ্চতর শক্তি তিন দিনে আরোগ্য করিবে" ইত্যাদি। এ সকল চিকিৎসকের মনোবৃত্তি যে প্রকার, তাহাতে সংশোধন কখনও সম্ভব নয়, কেননা হৃদয়ে অহঙ্কার থাকিলে সত্য আদৌ প্রবেশ লাভ করিতেই পারে না। এরূপ অনেকেই আছেন, যাঁহারা অজ্ঞানতা জন্য ভ্রান্তি করেন বা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অনায়াসেই সংশোধন করিতে পারা যায়। তাঁহারা অজ্ঞান হইলেও শিখিবার জন্য প্রস্তুত।

আরও এক প্রকার অনিষ্ট করিয়া ফেলা, এই অজ্ঞানতা হইতে খুবই সম্ভব এবং অনেক ক্ষেত্রে হইতেও দেখিয়াছি, তবে উপরোক্ত ব্যাপার অপেক্ষা ইহার ক্ষেত্র বিরলতর,—ফলতঃ যেখানে ঘটে, সেখানে রোগী পক্ষে ভীষণ সর্ব্বনাশ হয় এবং প্রায়ই প্রতিকারের অবসর থাকে না। এইটী বুঝাইতে হইলে অনেকখানি আলোচনা আবশ্যক। **মনুষ্যদেহের মধ্যে, ভিতরে ও বাহিরে একটী সমসূত্রতা বা একটী সামঞ্জস্য**

(correspondence) আছে, উহা নিত্য ও চিরন্তন। এই সম্বন্ধটীর বিষয় মৎলিখিত মেটিরিয়া মেডিকার ৭০৫, ৭০৬, ৭০০ পৃষ্ঠায় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। এস্থলে কেবল আভাস ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না। বাহিরের কোন ব্যাধি লক্ষণ জোর করিয়া চাপা দিলে, আরও আভ্যন্তরপ্রদেশস্থ অধিক মূল্যবান যন্ত্রনিচয়ে পীড়ালক্ষণ বিকাশ পায়,—একথাটী যেমন সত্য, ঠিক সেই প্রকারই কোনও মানসিক পীড়া অর্থাৎ উন্মাদাদি মস্তিষ্ক গোলযোগ, চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য পথে আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই, মস্তিকের যে অংশটী বিশৃঙ্খলাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারই সমসূত্রে বাহ্যদেহে পীড়া লক্ষণ বিকাশ পায়,—একথাও তেমনই সত্য। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির সহিত উদর ও পরিপাক যন্ত্র ঐ ভাবে সংশ্লিষ্ট ও সম্বন্ধযুক্ত,—সুতরাং যদি কোনও একটী উন্মাদরোগী, যাহার বুদ্ধি-বিপর্যায় ঘটিয়াছে, তাহার প্রকৃত সদৃশবিধানে চিকিৎসা হইলে, উদরযন্ত্রে অতি নিশ্চয়ই পীড়া লক্ষণ প্রকাশ পাইবে, এদিকে উন্মাদ লক্ষণেরও অবসান হইবে। এক্ষণে, চিকিৎসক যদি ঐ সম্বন্ধের বিষয় অবগত না থাকার জন্য, ঐ নব বিকশিত উদরাময়ের প্রতিকার বিষয়ে উৎসুক হইয়া ঔষধ প্রয়োগ করেন, তবে রোগীর ভীষণ অনিষ্ট হয়, অর্থাৎ উন্মাদ লক্ষণ পুনরায় ফিরিয়া আসে। অথচ চিকিৎসক তাহার ভ্রান্তি ধরিতেও সক্ষম হন না এবং পুনঃ পুনঃ এই ভুলই করিতে থাকেন। সুতরাং ঐ প্রকার একসূত্রতার সম্বন্ধটী এবং জীবনীশক্তির ঐ প্রকার ক্রিয়াগতি, বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান থাকা যে কত আবশ্যক, তাহা অবশ্যই সকলে অনুভব করিতে পারিবেন। ১৯২৯ সালের জুন মাসে, আমি উড়িষ্যার অন্তর্গত কোনও রাজষ্টেটের একটী রাজপুত্রীর চিকিৎসা ব্যাপারে জানিতে পারি যে,—ডাঃ……হালদার এম্. বি. রোগিণীর উন্মাদলক্ষণের বার বার আসা ও যাওয়ার কারণ স্থির করিতে না পারিয়া আমার ডাক দেওয়ান এবং ইহার তথ্য কি, নিরাকরণ করিবার

জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহাকে একদিন আমার ডিস্‌পেন্সারীতে সঙ্গে করিয়া আনিয়া প্রকৃত তথ্যটী বুঝাইয়া দিই, তখন ডাঃ হালদার একেবারে মুগ্ধ হইয়া, সেই দিন হইতেই আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং সুদীর্ঘ দুই বৎসর ধরিয়া আমার পোষ্টগ্রাজুয়েট কলেজে অধ্যয়ন করেন। এক্ষণে তিনি ঐ রাজষ্টেটে বিশেষ উন্নতির সহিত চিকিৎসা করিতেছেন।

উপরে যাহা যাহা লিখিত হইল, তাহার ফলে জীবনীশক্তির সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান এবং তাঁহার ক্রিয়াগতি অনুভব না করিতে পারিলে, কুশলী চিকিৎসক হওয়া যায় না, এই সত্যটী প্রত্যেক সুধী-হৃদয়ে পূর্ণভাবে প্রতীয়মান হইবে। একেই এটী ব্যভিচারীর যুগ, তাহার উপর অধিকাংশ ব্যক্তিই অল্পমাত্র সাধনা অথচ প্রচুর অর্থাগম যাহাতে হয়, সেই চেষ্টাই করিয়া থাকেন। সুতরাং এ সকল তত্ত্ব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন, এ আশা অধিকাংশ স্থলেই করিতে পারা যায় না। তবুও সত্যের প্রকাশ যত হয়, ততই কল্যাণ।

এ সম্পর্কে কেবলমাত্র একটী বিষয় লিখিয়া বর্ত্তমান আলোচনা শেষ করিতে ইচ্ছা করি। আজকালের দিনে রোগী চিকিৎসাপ্রার্থী হইয়া চিকিৎসকের সমীপবর্ত্তী হইলেই, আমাদের মধ্যেও অনেক চিকিৎসক মহাশয়, মূত্র, নিষ্ঠীবন, মল ইত্যাদির পরীক্ষার ফল এবং আভ্যন্তর টিউমার বা ক্ষতাদি হইলে, তাহাদের এক্স-রে পরীক্ষার ফল চাহিয়া বসেন। প্রত্যেক "বড় লোকের" বাড়ীর রোগী হইলে, অবশ্যই তাঁহারাই এই "ভড়ং" বা প্রদর্শনী আবশ্যক বোধ করিয়া থাকেন, সে কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু চিকিৎসক হইয়া কোন্ নীতিবশে এই অনর্থক খরচ করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাহা বুঝিবার নয়। একটী গতানুগতিক এলোপ্যাথিক ধারা ব্যতীত, রোগীর পক্ষেও কোনও সাহায্য হয় না এবং চিকিৎসকের পক্ষেও প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচনের কোনও সাহায্য হয় না। যাহা হউক, যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানেচ্ছু, তাঁহারা

এই গতানুগতিক অভ্যাস অনুসারে এ প্রকার গর্হিত ও অনর্থক ব্যয় ব্যবস্থা না করিয়া, যাহাতে রোগীর কল্যাণ হয়, সেই পথে চেষ্টা করিবেন।

যে "পীড়াটী", যেমন নিউমোনিয়া, অন্ত্রক্ষত, অর্শ, অতিসার, জ্বর, ইত্যাদি এক একটী নামযুক্ত পীড়া, যাহা বাহ্যদেশে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, সেগুলির কোনওটাই "পীড়া" নয়, পরন্তু সেগুলি পীড়ার ফল মাত্র। অথচ সেগুলিকেই লইয়া বিব্রত হওয়া এলোপ্যাথিক চিকিৎসক মহাশয়দিগের আবশ্যক, কেননা তাঁহারা "চাপা দিবার" জন্যই চিকিৎসা করেন, পরন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণও যদি তাহাই করেন, তবে তাঁহারা জীবনীশক্তি কাহাকে বলে, তাহাও জানেন না, অথবা পীড়া কাহাকে বলে, তাহাও জানেন না, কেবল হোমিওপ্যাথিক বাক্স হইতে ঔষধ দেন মাত্র। এ সকল ব্যক্তিকে হোমিওপ্যাথ নাম দেওয়া কেবল সাধারণের অনুগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

রোগীর যকৃতে যাতনা হইতেছে কেন? যেহেতু জীবনীশক্তি স্বাভাবিক ভাবে কার্য্য করিতে পারিতেছেন না এবং আর একটী বিরোধী শক্তি, ঐ জীবনী শক্তির সহিত কার্য্য করিয়া যকৃতের অস্বাভাবিক ক্রিয়া করিতেছে, অতএব সেখানে একটী অস্বস্থি বা বেদনা, প্রকাশ পাইতেছে। ঐ বিরোধী শক্তির নিরাকরণ করিয়া জীবনীশক্তিকে বিশৃঙ্খলা বিমুক্ত করিতে পারিলেই, যকৃৎ যন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়া পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে, সুতরাং অস্বাভাবিক অনুভূতি বা যন্ত্রণাদি আর থাকিবে না। প্রত্যেক পীড়ার ক্ষেত্রে ঐ একই নীতি অনুসরণ করিতে হইবে। এই নীতি অর্থাৎ পীড়াতত্ত্ব, আরোগ্যতত্ত্ব, জীবনীশক্তির ক্রিয়াগতি ইত্যাদি না জানিয়া, অথবা বিস্মৃত হইয়া, রোগী চিকিৎসার সময় এলোপ্যাথদিগের মত প্রথা অবলম্বন করিবার আয়োজন ও প্রচেষ্টা অতীব গর্হিত। এলোপ্যাথগণ যাহা করেন, তাহা তাঁহাদের শাস্ত্রসম্মত,—সে শাস্ত্র অসম্পূর্ণ বা প্রমাদপূর্ণ হউক, আর যাহাই বা হউক,

কিন্তু উহাদের অনুকরণে আমাদেরও ঐ প্রথা অবলম্বন, কেবলমাত্র মূর্খতা এবং দাস মনোবৃত্তিজ্ঞাপক ব্যতীত আর কিছুই নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রোগ ও রোগলক্ষণ।

রোগ কাহাকে কহে এবং রোগলক্ষণ বলিতেই বা কি বুঝা যায়, এ বিষয়ে নির্ম্মল জ্ঞান না থাকিলে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা অসম্ভব বলিলেও হয়। কিন্তু অনেকেরই এ ধারণা নাই। কেননা অনেককেই বলিতে শুনি—"জ্বর একটী লক্ষণ, নিউমোনিয়া একটী লক্ষণ, ইত্যাদি"। রোগ বলিতে কি বুঝিতে হইবে?—রোগ বলিলে স্বাস্থ্যের বিপরীত বুঝিতে হইবে,—জীবনীশক্তি যাহার শরীরে স্বাভাবিক ভাবে কার্য্য করিতেছে না, জানিতে হইবে, তাহার রোগ হইয়াছে। রোগ অর্থে **জীবনী-শক্তির মধ্যে বিশৃঙ্খলা** এবং সেই বিশৃঙ্খলা জন্য বা তাহারই ফলস্বরূপ রোগীর জ্বর হইয়াছে অথবা নিউমোনিয়া হইয়াছে। জ্বর বা নিউমোনিয়া এক একটী ফল,—জীবনীশক্তির ক্রিয়াবিশৃঙ্খলার ফল, ফলতঃ সেগুলি রোগ নয়। তবে সাধারণ লোকে সহজ কথায় নিউমোনিয়াটীকে বা জ্বরটীকে রোগ বলিয়া মনে করিতে পারে, কিন্তু চিকিৎসক হইয়া এ ধারণা করিলে বড়ই আক্ষেপের কথা। যাহা হউক, রোগের ফলস্বরূপ নিউমোনিয়া হইয়াছে, তাহার লক্ষণ কাহাকে বলা যাইবে?

জর, নিউমোনিয়া, অর্শপীড়া ইত্যাদি প্রকার অবস্থাগুলি, যাহা রোগের ফলস্বরূপে মানব-শরীরে দেখা যায়, সেগুলিকে আরোগ্য করিবার জন্য লক্ষণ-সমষ্টি প্রয়োজনীয়, কেননা লক্ষণ-সমষ্টির সাদৃশ্যে আরোগ্যকারী ঔষধ নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। উপরোক্ত কোনও একটী অবস্থার আরাম করিবার উদ্দেশ্যে চিকিৎসককে লক্ষণ-সমষ্টি পাইতে হইবে, নতুবা ঔষধ নির্ব্বাচন হইবে না, অতএব আরোগ্যও হইবে না। জর, নিউমোনিয়া প্রভৃতিকে সহজ কথায় যদি রোগ বা এক একটী রোগ বলিয়াই অভিহিত করা যায়, তবে এক একটী রোগের আরোগ্য জন্য ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে গিয়া দেখা যাইবে যে, **রোগ** ধরিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন হইবে না, **রোগী** ধরিয়া নির্ব্বাচন করিতে হইবে। রোগের লক্ষণ-সমষ্টি ধরিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন হয় না, রোগীর লক্ষণ-সমষ্টি আবশ্যক। একটী রোগের লক্ষণ-সমষ্টি ধরিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন হয় না, রোগীর লক্ষণ-সমষ্টি প্রয়োজন। একটি রোগের লক্ষণ কেবল সাধারণ লক্ষণ মাত্র, **বিশেষ** লক্ষণ রোগী ব্যতীত পাওয়া যায় না। প্রত্যেক জরেই অঙ্গ-সন্তাপ একটী সাধারণ লক্ষণ, প্রত্যেক ওলাউঠাতে ভেদ ও বমি সাধারণ লক্ষণ, প্রত্যেক নিউমোনিয়া ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট একটী সাধারণ লক্ষণ, এই সাধারণ লক্ষণ ধরিয়া নির্ব্বাচন হয় না। রোগী ব্যতীত বিশেষ লক্ষণ পাওয়া যায় না, অতএব নির্ব্বাচনও হইবে না। যদি পাঁচটী ব্যক্তির জর হয় বা ওলাউঠা হয়, বা নিউমোনিয়া হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত সাধারণ লক্ষণগুলি প্রত্যেকেরই থাকিবে।

কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ একত্র করিয়া একটী রোগের নামকরণ লইয়া থাকে। যথা, তাপ, শরীরের ভারবোধ, আলস্য, অরুচি, অক্ষুধা ইত্যাদি একত্র করিয়া তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে, জর। তরল বর্ণ হীন ভেদ ও বমন, অস্বস্তি, পিপাসা, অস্থিরতা, ঘন ঘন বলক্ষয় ইত্যাদি লইয়া

একটী নাম দেওয়া হইয়াছে,—কলেরা। এই প্রকার কতকগুলি করিয়া সাধারণ লক্ষণের একত্র সমাবেশ ধরিয়া তাহাদের সমষ্টিগত এক একটী নাম দেওয়া হইয়া থাকে। এই নাম একটী নাম ব্যতীত আর কিছুই নয়,—**নাম** ধরিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন হয় না। নামের মূল্য কিছুই নহে, কেবল ভাবার সুবিধার জন্য নাম,—রোগের চিকিৎসা বা ঔষধ নির্ব্বাচনের হিসাবে নামের কোনও মূল্যই নাই, একথা মনে রাখিতে হইবে। হোমিওপ্যাথ হইয়া যে ব্যক্তি রোগ বা রোগের নাম ধরিয়া ঔষধ দিয়া থাকেন, তিনি হোমিওপ্যাথ নহেন, কেবল হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স ও বহি রাখার জন্য তাঁহাকে একটী নাম দেওয়া হয়,—হোমিওপ্যাথ, এই পর্য্যন্ত। তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা কার্য্য হইবার উপায় নাই।

বিশেষ লক্ষণ কাহাকে কহে? কোনও রোগীর তাহার রোগের সাধারণ লক্ষণ ব্যতীত, যেগুলি তাহার **ব্যক্তিত্বের** নির্দ্দেশ করে, তাহাকেই বিশেষ লক্ষণ কহে। সাধারণ লক্ষণ ও বিশেষ লক্ষণ একত্র করিয়া সেই সমুদয় বা সমষ্টিকে লক্ষণ-সমষ্টি নাম দেওয়া হইয়া থাকে। দুই একটা উদাহরণের সাহায্য ব্যতীত বিষয়টী পরিস্ফুট হইবে না।

মনে করুন, কোনও ব্যক্তির অনেক দিন হইতে পুরাতন ভাবে জর হইতেছে—এক্ষেত্রে পীড়াটীকে লোকে সাধারণ কথায় "জ্বর" বলিবে এবং জ্বর বলিয়া জ্বরের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিবেই থাকিবে, যথা,—অঙ্গে তাপ বোধ, সর্ব্বশরীরে ভার বোধ, নাড়ীর দ্রুতগতি, কার্য্যে অনিচ্ছা ইত্যাদি; ফলতঃ এগুলি প্রত্যেক জ্বরের ক্ষেত্রেই থাকে, নতুবা পীড়াটীকে জ্বর আখ্যা দেওয়া চলে না। এক্ষণে চিকিৎসা করিতে হইলে, রোগীটাকে জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা তাহার ব্যক্তিগত লক্ষণ পাইতে হইবে। অবশ্য জিজ্ঞাসা না করিলেও অনেক ক্ষেত্রেই রোগী আপনিই তাহার ব্যক্তিগত লক্ষণ কহিয়া থাকে,—তবে যদি তাহার দ্বারা

নির্ব্বাচন কার্য্যের জন্য যথেষ্ট লক্ষণ না পাওয়া যায়, তবে অগত্যা জিজ্ঞাসা করিতে হয়। মনে করুন, রোগী আপনিই কহিল—"ডাক্তার বাবু, মাথা-ব্যথাই আমার প্রধান কষ্ট, আর কোষ্ঠবদ্ধের জ্বালায় জ্বলে মলাম, কিছুতেই বাহ্য পরিষ্কার হয় না।" ইহা আপনার ঔষধ নির্ব্বাচনের পক্ষে যথেষ্ট হইল না। আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার পিপাসা কি প্রকার ?" উত্তর পাইলেন—মহাশয়, যতক্ষণ জ্বর থাকে, ততক্ষণ ঘটী ঘটী জল খাই,—আর তাহা ছাড়া, আমি সাধারণতঃ জল একটু বেশী খাই।" জ্বর কখন আসে, কখন ছাড়ে ?—"বেলা ৯।১০ টায় আসে ও বৈকালে বা সন্ধ্যায় ত্যাগ হয় এবং ত্যাগ হইবার সময় প্রচুর ঘর্ম্ম হয়।" আপনি রোগীর ব্যক্তিগত লক্ষণগুলি পাইয়া "নেট্রাম-মিউর" নির্ব্বাচন করিবেন।

মনে করুন, আর একটী পুরাতন জ্বর রোগীর জ্বরের লক্ষণ হয়ত বিশেষ কিছুই পাইলেন না—কেবল জানিতে পারিলেন, বৈকালে ২।৩ ঘণ্টার জন্য জ্বর হয়, জ্বরোদয়ের সময় সামান্য একটু জলপান করে মাত্র, তাহার ঘর্ম্ম না হইয়াই জ্বরটী ত্যাগ হইয়া যায়। এস্থলে যদি ব্যক্তিগত লক্ষণ, যথা সর্ব্বাঙ্গেই জ্বালা, নিত্য ২।৩ বার করিয়া স্নান করিবার প্রবৃত্তি, সকল কার্য্যে উদাসীনতা, সময়ে সময়ে অনর্থক ক্রন্দন করিবার প্রবৃত্তি, জলপানের অনিচ্ছা ইত্যাদি ব্যক্তিগত লক্ষণ পান তবেই "এপিস" নির্ব্বাচন করিবেন।

তৃতীয় রোগীর নিত্য সন্ধ্যায় সামান্য জ্বরবোধ হয়। দুই এক ঘণ্টা বাদেই জ্বরটী ত্যাগ হইয়া যায়। জ্বরের লক্ষণ কিছুই নাই। ব্যক্তিগত লক্ষণ, দক্ষিণ পার্শ্বে ব্যতীত রোগী শয়ন করিতে পারে না। ডাব সরবৎ প্রভৃতি শীতল পানীয়ে একান্ত অভিলাষ; পেটে, বুকে সর্ব্বদাই খালি খালি ভাব থাকে, মাথায় শীতল জল না দিয়া থাকিতে পারে না, ইত্যাদি লক্ষণে "ফস্‌ফোরাস" নির্ব্বাচিত হইবে।

কোনও একব্যক্তি অর্শপীড়ায় অতিশয় কাতর। কিন্তু গুহ্য প্রদেশে বেদনা, রক্তস্রাব ইত্যাদি অর্শপীড়ার সাধারণ লক্ষণসকলের মূল্য বড় কম। তদন্ত করিয়া জানিলেন রোগীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা,—মলত্যাগের পর প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া গুহ্যদ্বারে দারুণ বেদনা, জ্বালা, কাঁটা বেঁধানত কষ্ট থাকে, তাহা ছাড়া রোগীর মূত্রে অতিশয় ঝাঁঝাল গন্ধ,—এই কয়টীর সাহায্যে আপনি "নাইট্রিক-এসিড্" দিতে পারিবেন।

যতদূর আলোচিত হইল, ইহার দ্বারা বোধ হয় বুঝিতে পারা যাইবে যে, চিকিৎসা করিতে হইলে রোগীর লক্ষণসমষ্টি প্রয়োজন। রোগের সাধারণ লক্ষণ লইয়া কোনও কাজ হয় না। প্রত্যেক রোগটীর উপর **রোগীর ব্যক্তিগত ছায়া** কি প্রকার পতিত হইয়াছে, অর্থাৎ রোগের সাধারণ লক্ষণ সকলের উপর রোগীর ব্যক্তিগত বিশেষত্ব যাহা বিকাশ পাইয়াছে তাহাই আবশ্যক। দুই জনেরই জ্বর কিন্তু একজন চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। কেননা তাহার ব্যক্তিগত বিশেষত্ব, নড়ন চড়নে বৃদ্ধি, এই লক্ষণটী প্রকটিত হইয়াছে ; আর একজন সর্ব্বদাই অস্থিরভাবাপন্ন, ছট্‌ফট্ করিতেছে, এপাশ ওপাশ, এ বিছানা ও বিছানায় যাইতেছে,—এই অস্থিরতারূপ ব্যক্তিগত বিশেষত্বটা বিকাশ পাইয়াছে। ঐ ব্যক্তিগত বিশেষত্ব লইয়া ঔষধ নির্ব্বাচন হইবে, রোগ ধরিয়া বা রোগের লক্ষণ ধরিয়া ঔষধ দেওয়া অসম্ভব।

প্রত্যেক রোগীতেই তাহার ব্যক্তিগত বিশেষত্ব ব্যতীত যখন ঔষধ নির্ব্বাচন হইতে পারে না, তখন যে রোগীতে কোনও বিশেষ লক্ষণ না থাকে, সেখানে ঔষধ নির্ব্বাচন হয় না, অতএব রোগীও সারে না, সারিবে না,—ইহার সন্দেহ নাই। রাজযক্ষ্মার শেষে, কর্কট পীড়ায়, বহুমূত্রের পীড়ায় প্রায়ই কোনও বিশেষ লক্ষণ রোগীতে পাওয়া সম্ভব হয় না, অতএব আরোগ্য সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত। সুতরাং যে কোনও পীড়াবস্থায় যদি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য না পাওয়া যায়, বিশেষ চেষ্টা, জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধানের

দ্বারাও পাওয়া না যায়, সে অবস্থায় রোগীর আত্মীয়স্বজনকে মুক্তকণ্ঠে বলা ভাল যে, "এ রোগী আমার দ্বারা সারিবে না,—অন্য চিকিৎসকের নিকট লইয়া যাইতে পারেন," কেননা এখানে চিকিৎসাটী চিকিৎসাধ্যায়ত্তের বহির্ভূত হইয়াছে। নতুবা যাহা তাহা নির্ব্বাচন করিয়া চিকিৎসা করা নিতান্তই গর্হিত এবং ভগবানের নিকট পাপজনক বলিয়া জানিতে হয়।

রোগ কাহাকে কহে? সর্ব্বপ্রথম ইহা কোথায় আবির্ভূত হয়? রোগ ও রোগ ফল।

"রোগ কাহাকে কহে?" এই প্রশ্নটীর উত্তর যত সহজ বলিয়া মনে হয়, তত সহজ নয়। অনেকেই হয়ত মনে করিবেন, এ প্রশ্নের প্রয়োজন কি, রোগ কাহাকে বলে, একথা কি আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়? নিত্য নিত্য কত লোকের কত রোগ দেখা যাইতেছে, সে অবস্থায় আবার এ প্রশ্নের সার্থকতা কোথায়? কিন্তু সামান্য বিচার করিয়া দেখিলেই জানা যাইবে যে, লোকে রোগ বলিলে রোগের কতকগুলি নামকেই বুঝিয়া থাকে। তাহারা কহিবে,—ম্যালেরিয়া জ্বর একটী রোগ, শিরঃপীড়া একটী রোগ, অর্শোপীড়া একটী রোগ, রক্তোৎকাশ একটী রোগ, শোথ একটী রোগ,— এই প্রকারে তাহারা শত শত রোগের নাম মনে আনিয়া থাকে ও মনে করে যে, রোগ কাহাকে কহে, তাহারা উহা বেশ জানে। ফলতঃ তাহারা

রোগের কতকগুলি নাম জানে, রোগ কাহাকে বলে, তাহা জানে না,—কেননা উহা জানা তত সহজ নয়।

রোগ কাহাকে বলে? রোগ একটী অস্বচ্ছন্দতা। অস্বচ্ছন্দতা বলিলেই স্বচ্ছন্দতা মনে আসে, কেননা অস্বচ্ছন্দতাটী স্বচ্ছন্দতারই বিপরীত ভাব। মানব যখন সুস্থ থাকে, তখন তাহার একটী স্বচ্ছন্দতা থাকে, তাহার একটী ছন্দঃ থাকে, নিজের নিজের দেহ ও মনের একটী সুস্থ, সহজ ও স্বচ্ছন্দভাব থাকিলেই তাহাকে নীরোগ বলা যায়। কোনও কারণে যদি তাহার ঐ ছন্দঃ ভঙ্গ হয়, ঐ ছন্দঃ নষ্ট হয় এবং তৎপরিবর্ত্তে একটী অস্বচ্ছন্দতার ভাব অনুভূত হইতে থাকে, তবেই তাহাকে রোগী বলা হইয়া থাকে। এই **ছন্দোভঙ্গকেই** রোগ বা পীড়া বলে।

রেলগাড়ীর একটী এঞ্জিন বিকল হইতে পারে, কিন্তু বিকল হইলে এঞ্জিনটীর রোগ হইয়াছে বা এঞ্জিনটীর পীড়া হইয়াছে, একথা কেহ বলে না। কেন বলে না? এঞ্জিনের কোনও অনুভূতি নাই, এঞ্জিনের স্বচ্ছন্দ বা অস্বচ্ছন্দভাব অনুভব করিবার কোনও শক্তি নাই,—এঞ্জিনটী জড়, কাজেই লোকে বলে,—এঞ্জিনটী বিকল হইয়াছে; ফলতঃ উহার পীড়া হইয়াছে একথা কেহ বলে না। মানবদেহের সহিত এঞ্জিনের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, মানব নিজে **ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন চৈতন্যময় জীব** বলিয়া তাহার দেহের প্রত্যেক অংশে তাহার সুখ ও দুঃখের অনুভূতি আছে, কিন্তু জড়কলেবর এঞ্জিনের তাহা নাই। এঞ্জিনের প্রত্যেক অংশটী খুলিয়া স্বতন্ত্র রাখা চলিতে পারে, আবার তাহার পরে অংশগুলিকে এক এক করিয়া জুড়িয়া দিলে এঞ্জিন প্রস্তুত হয়, কিন্তু মানবদেহের তাহা হইতে পারে না, কেননা মানবদেহের **চেতনা, ধৃতি, সংহতি ইত্যাদি** নানাগুণ দেহের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট আছে,—উহা এঞ্জিনের মত কেবল জড়-সমষ্টি নহে। কতকগুলি অংশের স্থূল-সমষ্টিমাত্রই এঞ্জিনটীর

পক্ষে যথেষ্ট, মানবদেহের তাহা নয়,—মানবদেহ কেবল মাত্র স্থূল-সমষ্টি নহে। তাহা ছাড়া, এঞ্জিনের স্থূলদেহের কোনও কর্ত্তা নাই, মানবদেহের **কর্ত্তা** আছে এবং **সেই কর্ত্তা স্বাধীন-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন চৈতন্যময় জীব**। সেই কর্ত্তা বা জীব আপন ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন ও সুখ দুঃখের অনুভব করিয়া থাকেন। প্রত্যুত ঐ কর্ত্তা বা জীব আপন অভাব ও প্রয়োজনানুসারে নিজের সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম অবস্থা হইতে সূক্ষ্ম মন, আবার তাহা হইতে হস্তপদাদি স্থূল দেহ পর্য্যন্ত গঠন করিয়া থাকেন এবং যে শক্তির দ্বারা উহাদিগকে গঠন করেন, তাহার নাম **জীবনীশক্তি**। এঞ্জিনের ইচ্ছাশক্তিও নাই, অতিসূক্ষ্ম, সূক্ষ্মাদি স্তরও নাই এবং সুখ দুঃখাদির অনুভূতিও নাই—কেবল মাত্র কতকগুলি জড় অংশের সমষ্টি, অন্য কোনও স্বাধীন চিন্তাশক্তিসম্পন্ন জীবের প্রয়োজনানুকূল্যে সুকৌশলে নির্ম্মিত ও গঠিত; এবং এঞ্জিনটী যে শক্তির দ্বারা পরিচালিত, তাহাও জড়শক্তি; মানবদেহের গঠন, পুষ্টি ও বর্দ্ধনাদির উপযোগী জীবনী শক্তির সহিত ঐ জড়শক্তির মর্ম্মান্তিক বিভিন্নতা প্রত্যেকেই জানেন।

যদি ছন্দোভঙ্গই রোগ, তবে জানিতে হইবে যে,—ঐ ছন্দঃ কেন ভঙ্গ হয়? স্বাভাবিক শৃঙ্খলা বা ছন্দঃটী কিজন্য ভঙ্গ হইয়া থাকে? পূর্ব্বোক্ত জীবনীশক্তি যাহার দ্বারা শরীরের শৃঙ্খলা ও ছন্দঃ রক্ষিত হয় এবং শরীরের গঠন, বর্দ্ধনাদি কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেই জীবনীশক্তি যদি নির্ম্মল ও অবিকৃত অবস্থায় কার্য্য করিতে থাকেন, তবে কোনও গোলোযোগ থাকে না, কিন্তু যদি ঐ জীবনীশক্তি বিকৃতভাবে কার্য্য করিতে বাধ্য হয়েন, তবেই যত বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় ও মানবদেহের ও মানবমনের স্বাভাবিক ছন্দঃটী নষ্ট হইয়া যায়, কেননা **বিকৃতিপ্রাপ্ত** জীবনীশক্তির দ্বারা শরীর যন্ত্রের কার্য্যসকল যথারীতি সম্পন্ন হইতে পারে না, কাজেই অস্বচ্ছন্দতার আবির্ভাব হয়। যদি শরীরস্থ যাবতীয় যন্ত্রসকল নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কার্য্যগুলি

সুসম্পন্ন করিতে পারে, তবেই ত তাহার ফলস্বরূপে মানবমনে ও মানব শরীরে একটী স্বাভাবিক আনন্দ, তৃপ্তি ও স্ফূর্ত্তি বজায় থাকিবে ; কিন্তু ঐ ঐ যন্ত্র যদি বিকৃত ভাবে কার্য্য করে, তাহা হইলে মনে ও শরীরে একটী অস্বাচ্ছন্দতার উদয় হইবেই হইবে। যে শক্তির বশে যন্ত্রসকল কার্য্য করিতে সক্ষম হয়, সেই শক্তিই যদি বিকৃত হয়, তবে ঐ ঐ যন্ত্রসকলের কার্য্যও বিকৃত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি ? এক্ষণে জীবনীশক্তি কিজন্য নিজের প্রাধান্য হারাইয়া বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়, তাহা বুঝিলেই এই তত্ত্বটী হৃদয়ঙ্গম হইবে। আসল কথা, রোগের প্রথম আবির্ভাব,— **জীবনীশক্তির বিকৃতিতে,** ইহার সন্দেহ নাই। সর্ব্বপ্রথম বিশৃঙ্খলা, **শক্তিস্তরে,** স্থূলস্তরে কখনই নয়। সর্ব্বপ্রথমে রোগটী কোথায় আবির্ভূত হয়,—ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, বিকৃতিপ্রাপ্ত জীবনীশক্তির বিকৃত বা বিশৃঙ্খলাপ্রাপ্ত কার্য্যেই প্রথম দেখা দেয়,—তাহার পর ঠিক যেন স্রোতের বশে, **ভিতর হইতে বাহিরে নীত** হইয়া থাকে। এ বিষয়টী আরও পরিষ্কার হওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তাহার পর, জীবনীশক্তির নিজস্ব স্বাভাবিক প্রাধান্য হারাইবার কারণ আলোচিত হইবে।

কোনও একব্যক্তি এ পর্য্যন্ত বেশ সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ ছিল। আজি সন্ধ্যার বা বৈকালে সর্ব্বপ্রথম একটী অস্বচ্ছন্দ ভাব অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে ! "ভাল লাগেনা, শরীরটা বেশ ভাল নাই, ইচ্ছা হয় যে চুপ করিয়া শুইয়া থাকি,'—ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। কোথাও কিছুই হয় নাই, কোনও চিকিৎসকের দ্বারা তাহার সর্ব্বশরীর বিশেষরূপ পরীক্ষা করাইলে কোনও বিকৃত ভাব লক্ষিত হইবে না,—অথচ সে ব্যক্তি বড়ই বিমর্ষ এবং কোনও কার্য্যে মন দিতে পারিছে না,—কেননা তাহার কিছুই ভাল লাগে না। রাত্রিতে আহার করিল না বা অতি সামান্য মাত্র

আহার করিল, তৎপরদিনও ঐ ভাব, পুনরায় চিকিৎসক আনা হইল। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ পরীক্ষাদি করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। প্রথম দুই দিন এই ভাবে কাটিয়া যাওয়ার পর ৩য় দিন প্রাতঃকালে ঐ অস্বচ্ছন্দ ভাবটী যেন আরও একটু বৃদ্ধি হইল এবং সর্ব্বাঙ্গ ভার বোধ, অক্ষুধা, অতৃপ্তি ইত্যাদি আসিয়া দেখা দিল। তথনও সে ব্যক্তির কোনও প্রকার রোগলক্ষণ বাহিরে প্রকাশ পাইল না, কেবল একটী অস্বস্তিভাব, একটী কেমন কেমন ভাব, অনুভূত হইতেছে,—যথা, আলস্য, সর্ব্বশরীরে ভার বোধ; আহার পানে অনিচ্ছা ইত্যাদি। এই অবস্থাটী প্রণিধান করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, বিশৃঙ্খলার আবির্ভাব হইয়াছে,—কিন্তু তাহা এখনও অতি **সূক্ষ্মস্তরে** নিবদ্ধ রহিয়াছে, এখনও বাহির পর্য্যন্ত আসে নাই। জীবনীশক্তিতে বিকৃতি আরম্ভ হইয়াছে এবং অবিকৃত জীবনীশক্তির দ্বারা পরিচালিত দেহযন্ত্র ও মন যেরূপ স্বচ্ছন্দ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত ছিল, এক্ষণে তাহা নাই, এক্ষণে বিকৃতিপ্রাপ্ত জীবনীশক্তি বিকৃতভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে বা করিল, এইজন্য ঐ প্রকার বিশৃঙ্খলার আবির্ভাব। ইহার পরে পরেই অর্থাৎ যখনই বিকৃতিপ্রাপ্ত জীবনীশক্তির দ্বারা পরিচালিত যন্ত্রাদিতে অস্বাভাবিক লক্ষণ সকল উদয় হইবে, তখন রোগটী লোকলোচনের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং লোকে কহিবে যে, ঐ ব্যক্তির পীড়া হইয়াছে। ফলতঃ যাহাকে লোকে **রোগ** বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছে, তাহা রোগের **ফলমাত্র**। রোগ অর্থে জীবনীশক্তিতে বিশৃঙ্খলার আবির্ভাব,—তাহার ফলেই শরীরস্থ যন্ত্রবিশেষে অস্বাভাবিক কার্য্য লক্ষিত হইতেছে। উপরোক্ত দৃষ্টান্তে যখন ঐ ব্যক্তির সামান্য জ্বর, শিরঃপীড়া, কোষ্ঠবদ্ধ, পিপাসা, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা ইত্যাদি আসিয়া দেখা দিল, তখন লোকে কহিল যে ঐ ব্যক্তির "জ্বর" হইয়াছে। ফলতঃ এই **নামকরণ** হইবার **বহু পূর্ব্ব হইতেই** "রোগ" দেখা দিয়াছে,—এই জ্বর বা জ্বরলক্ষণগুলি রোগের ফলমাত্র।

যতদিন জীবনীশক্তিতে বিশৃঙ্খলা থাকিবে ততদিন নানাপ্রকার দুষ্টলক্ষণ সকল, ঠিক যেন স্রোতের বশে, ভিতর হইতে বাহিরে নীত হইবে এবং লক্ষণ সকলের সমষ্টি ও প্রকৃতি অনুসারে কেহ কহিবে ঐ ব্যক্তিটার অবিরাম জ্বর হইয়াছে, অথবা বলিবে, বিকার হইয়াছে ইত্যাদি। ফলতঃ এই অবিরাম জ্বর বা বিকার বা যে কোনও নাম দেওয়া হউক না কেন,—তাহা রোগের ফল বলিয়া জানিতে হইবে। রোগ অর্থাৎ জীবনীশক্তির বিকৃতি বা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত না হইলে এসকল লক্ষণসমষ্টি আদৌ আসিত না এবং তৎপূর্ব্বে লোকটার কোনও প্রকার অস্বচ্ছন্দ ভাব দেখা দিত না।

মনে করুন, এই ব্যক্তির যকৃতে বেদনা হইতেছে, এ অবস্থায় যদি কেহ কেবল যকৃৎটার চিকিৎসা করিবার উদ্দেশ্যে যকৃৎটার উপর ব্লিষ্টার বা প্রলেপ দিবার ব্যবস্থা করে, অথবা ঐ ব্যক্তির কোষ্ঠবদ্ধ হইয়াছে, এ অবস্থায় যদি কেহ কেবল কোষ্ঠবদ্ধটা এড়াইবার উদ্দেশ্যে জোলাপাদি প্রয়োগ করে, তবে এই প্রকার প্রতিকারকে চিকিৎসা বলা চলিতে পারে না। কেননা ঐ ঐ যন্ত্র কি স্বাধীন ? ঐ ঐ যন্ত্র কি নিজে নিজে ঐ ঐ লক্ষণ উৎপাদন করিয়াছে ? যেমন বৈদ্যুতিক কারখানায় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায় আমার গৃহস্থে আলোগুলি দপ্ দপ্ করিতেছে, পাখাগুলি এক একবার বন্ধ হইয়া যাইতেছে এ অবস্থায় আলোগুলির বা পাখাগুলির দোষ কি ? এ অবস্থায় আলোগুলিতে বা পাখাগুলিতে প্রতীকার অবলম্বন করিলে তাহা বাতুলতা ব্যতীত আর কি বলা যাইবে ? বৈদ্যুতিক কারখানায় বিশৃঙ্খলাটী অপসারিত হইলেই আলো ঠিক মত জ্বলিবে, পাখাও ঠিকমত ঘুরিবে। ঠিক সেই প্রকার, জীবনীশক্তির বিশৃঙ্খলা অপসারিত হইলেই যকৃতে বেদনা আর থাকিবে না, কোষ্ঠবদ্ধও অন্তর্হিত হইবে। প্রতীকার অবলম্বন করিতে হইবে যকৃতে নয়, কোষ্ঠেও নয়,—তবে কোথায় ? প্রতীকার অবলম্বন করিতে হইবে, জীবনীশক্তির বিশৃঙ্খলা দূরীভূত করিবার

HOMOEOPATHIC L

জন্য। তাহাই চিকিৎসা, তৎব্যতীত অন্য যে কিছু তাহা চিকিৎসার ভাণ মাত্র, চিকিৎসার অনুকল্প বা আড়ম্বর মাত্র।

অতঃপর জানিতে হইবে যে, জীবনীশক্তিতে বিশৃঙ্খলার আবির্ভাব কেন হয়? কি হেতু জীবনীশক্তি তাহার স্বাধীনতা হারাইতে বাধ্য হইয়া থাকে। যতদিন মানব স্বাভাবিক নীতি সকলকে ভঙ্গ না করিয়া স্বাভাবিক ভাবে জীবনপথে চলিতে থাকে, ততদিন কোনও গোলযোগ থাকে না, তাহার জীবনীশক্তিও অবাধিতভাবে তাহার শরীরের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যগুলি, সম্পাদন করিয়া তাহার শরীরে ও মনে একটা স্বাচ্ছন্দ্যবিধান নিটুটভাবে রক্ষা করিতে সক্ষম হয়; কিন্তু স্বাভাবিক নীতিসকল ভঙ্গ করিলে তাহার জীবনীশক্তির স্বাধীনতাটা আর বজায় থাকে না, তখন সে আর একটা বিরোধীশক্তির অধীনে কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ জীবনীশক্তি পূর্ব্বে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া শরীর মনের যে ভাবে স্বচ্ছন্দতা রক্ষা করিতেছিল, এক্ষণে তাহা পারে না,—পূর্ব্ব স্বচ্ছন্দতার পরিবর্ত্তে এক্ষণে একটা অস্বচ্ছন্দতা বা বিশৃঙ্খলার অনুভূতি হইয়া থাকে,—ঐ অস্বচ্ছন্দতা বা বিশৃঙ্খলাই রোগ বা পীড়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রোগ বলিলে জীবনীশক্তির মধ্যে বিশৃঙ্খলার আবির্ভাবকেই বুঝিতে হয়। তাহার পর ঐ বিশৃঙ্খলাপ্রাপ্ত বা বিকৃতিপ্রাপ্ত জীবনীশক্তির দ্বারা নির্ব্বাহিত ও প্রসূত নানাপ্রকারের অনুভূতি যাহা প্রকাশিত হয় তাহাদিগকে রোগের "লক্ষণ" বলিয়া জানিতে হয়। এইভাবে ক্রমিক অনুভূতি হইতে থাকিলে কিছুদিন পরে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অর্থাৎ স্থূল পরিণামসকলের আবির্ভাব হইতে থাকে, তাহাদিগকে রোগের "ফল" বলাই সঙ্গত। একটী উদাহরণের দ্বারা ইহা পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

একটী বালিকা তাহার প্রথম ঋতুবিকাশের বহুপূর্ব্ব হইতেই একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে থাকিল, ভাল ক্ষুধা হয় না, সর্ব্বাঙ্গে

জালা অনুভব হয়, সর্ব্বদাই মুক্ত ও শীতল বাতাসে থাকাই পছন্দ করেন, আবদ্ধ ঘর তাঁহার পক্ষে বড়ই কষ্টজনক বোধ হইতে লাগিল, শরীর গুরুভাব, মুখাভ্যন্তর শুষ্ক,—অথচ জলপানে কোনও প্রবৃত্তি নাই, ইত্যাদি; এ অবস্থায় জানিতে হইবে বালিকাটীর জীবনীশক্তি বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার জীবনীশক্তির মধ্যে প্রথম বিশৃঙ্খলার আবির্ভাব হইয়াছে,—তাঁহার রোগ হইয়াছে, এই অবস্থা চলিতে চলিতে কিছুদিন পরেই প্রথম ঋতুর বিকাশ হইল, কিন্তু অতি সামান্ত স্রাব হইল, তাহা ছাড়া দক্ষিণ ডিম্বাধারে যেন ছুঁচফোটান মত বেদনা হইতে থাকিল, ঐ স্থান ভারী ভারী বোধ হইতে থাকিল, ক্রমে ক্রমে ঋতুটী প্রায় বন্ধ হইয়া গেল, অতি সামান্ত সামান্ত স্রাব হয় মাত্র; মস্তিষ্কে ভয়ানক উষ্ণতানুভব, সর্ব্বশরীরে জালা অথচ ঘর্ম্ম আদৌ নাই, বৈকালে শরীরটী "জড়সড়" অর্থাৎ সামান্ত জরভাব দেখা দিতে থাকিল। এক্ষণে,—এগুলিকে রোগের "লক্ষণ" বলা যাইবে। যাহা হউক এই অবস্থা চলিতে থাকিল, ক্রমে দেখা যাইল যে, দক্ষিণ ডিম্বাধারটী স্ফীত, শক্ত, বেদনাযুক্ত ও সামান্ত প্রদাহান্বিত হইয়াছে। লোকে কহিল এবং চিকিৎসকেরাও তখন কহিতে থাকিলেন যে বালিকাটীর "পীড়া" হইয়াছে। ফলতঃ পীড়া বহুপূর্ব্বেই হইয়াছে, এখন যাহা হইয়াছে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে "**পীড়ার ফল**"। এক্ষণে চিকিৎসকেরা কহিতেছেন যে, দক্ষিণ ডিম্বাধারে একটী অর্ব্বূদ হইয়াছে (It is a tumour over the right ovary); এক্ষণে তাঁহারা অস্ত্রোপচার করিতে পরামর্শ দিবেন ও কহিবেন, অস্ত্রোপচার ব্যতীত উপায় নাই (It should be operated, as operation is the only help). যখন কোনও একটী স্থূল পরিণতি দেখা গেল, তখনই ডাক্তারেরা "**রোগ**" হইয়াছে কহিবে, কিন্তু ইহা তাঁহাদের ভুল, কেননা রোগ অনেকদিন পূর্ব্বেই হইয়াছে। ঐ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শক্ত পদার্থটী রোগের "**ফল**",—রোগ হইয়াছে বলিয়াই উহার

আবির্ভাব হইয়াছে, ঐটী রোগের ক্রম-পরিণত ফল,—ইংরাজীতে "ultimate" কহে।

ঐ অর্ব্বুদটীকে অস্ত্রের দ্বারা অপসারিত করাকেই সাধারণতঃ লোকে ও অন্যান্য পথের চিকিৎসকগণ "চিকিৎসা" বলিয়া কহিবেন। কিন্তু চিকিৎসা তাহাকে বলা চলে না। অস্ত্রোপচার দ্বারা রোগের **ফলটী** অপসারিত হইল বটে, কিন্তু প্রকৃত রোগ যেমন ছিল বা আছে তাহা তেমনই রহিল। এই প্রকার তথাকথিত চিকিৎসাতে দেখা যায় যে ঐ বালিকাটীর অস্বস্তি বা লক্ষণগুলির অপসারণ হইল না বা হয় না। তিনি যে অসুস্থ তাহাই থাকিলেন, কেবল অর্ব্বুদটী কিছুদিনের জন্য অপসারিত হইল। রোগ পূর্ব্ববৎ থাকায় তাহার ফলস্বরূপে ঐ ডিম্বাধারেই বা শরীরের অন্য কোনও স্থানে ঐ প্রকারের বা অন্য কোনও প্রকারের স্থূল অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আবার একটী ক্রম-পরিণতি গঠন হইবে ও দেখা দিবে, তখনও আবার ঐ প্রকার চিকিৎসার পরামর্শ প্রদত্ত হইবে। ইহাকে চিকিৎসা বলিতে পারা যায় না। তবে চিকিৎসা কাহাকে কহে? রোগটীকে আরোগ্য করিবার প্রচেষ্টাকে চিকিৎসা কহে। কি উপায়ে তাহা হইতে পারে? ইহা বিষয়ান্তরে আলোচিত হওয়াই সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

রোগী-চিকিৎসা।

আমাদের দেশে "চিকিৎসা" বলিলে নানা প্রথার চিকিৎসার কথা মনে আসে। সাধারণ লোকের ধারণা, এই সকল প্রথার মধ্যে যে কোনটী অবলম্বন করিলেই হয় এবং ঐ সকল প্রথার মধ্যে কোন্‌টী অবলম্বিত হইবে,

তাহা রোগীর বা গৃহস্থের ইচ্ছা ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। রোগী বা তাহার বাড়ীর আত্মীয়স্বজন তাঁহাদের বিশ্বাস ও সুবিধার উপর, এলোপ্যাথি, কবিরাজী, হাকিমি বা হোমিওপ্যাথি ইত্যাদি যে কোনওটী অবলম্বন করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের ধারণা এই যে, ইহাতে রোগীর চিকিৎসা যথারীতি হইতেছে বা হইয়া থাকে,—তবে ফলাফল ভগবানের হাতে। আমাদের দেশে ইহাই চিকিৎসার ব্যবস্থা।

অতি সুন্দর ব্যবস্থা—কাহারও কিছু বলিবার নাই, কেন না নিজেদের বিশ্বাসের উপর চিকিৎসা-প্রথা নির্ব্বাচন—এ বিষয়ে তো কাহারও কিছু বলিবার বা আপত্তি করিবার থাকিতেই পারে না। অতএব সকলেই এই ব্যবস্থা ও রীতি অবশ্যই অনুমোদন করিবেন, তাহাতে সন্দেহ কি আছে? কিন্তু ব্যাপারটী জীবন-মরণ সম্বন্ধীয়, সুতরাং যদি কিছু বলিবার থাকে, তবে তাহা স্বাধীনভাবে প্রকাশ করিবার শক্তি ও স্বাধীনতা প্রত্যেকেরই আছে,—কেননা যদি এই ব্যাপারে কোনও প্রকার ভ্রম বা প্রমাদ থাকে, তবে তাহার সংশোধন হওয়া অনেক ক্ষেত্রে আদৌ সম্ভব হয় না, এজন্য এ ব্যাপারে প্রত্যেক গৃহস্থকে বিশেষ অবহিত হইয়া চিকিৎসা-প্রথাটী নির্ব্বাচন করিতে হয়।

গৃহস্থের বা রোগীর "বিশ্বাসের" মূল্য কতদূর বা কতটুকু তাহা সামান্য অনুসন্ধান করিলেই জানা যাইবে। নিকটবর্ত্তী কোনও আঢ্য প্রতিবেশী বা কোনও একজন অবস্থাপন্ন কুটুম্ব যে প্রথা অবলম্বন করিয়া থাকেন অথবা ইতিপূর্ব্বে কোনও সময় ঐ গৃহস্থ বা রোগী, অন্য কোনও একটী রোগীর যে প্রথায় চিকিৎসা হইতে দেখিয়াছেন এবং আরও দেখিয়াছেন যে ঐ প্রথায় চিকিৎসার ফলে ঐ রোগীকে যে চিকিৎসক মহাশয় চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তিনি অনেক কষ্টে ও বহু যত্নে দীর্ঘ-দিনের পর কোনও প্রকারে বাঁচাইতে সক্ষম হইয়াছেন। তবে এক্ষণে

ঐ গৃহস্থের বা ঐ রোগীর অবশ্যই ঐ প্রথায় বিশ্বাস হইয়া পড়ে এবং বর্ত্তমানেও, ঐ প্রথাই অবলম্বিত হইবার প্রতি ঐ প্রকার বিশ্বাসই প্রেরণা দিয়া থাকে। এই বিশ্বাসের মূল্য কিছু আছে কিনা, চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। এই প্রকার বিশ্বাসের দ্বারাই পরিচালিত হইয়া আবার অন্য একটী রোগী বা গৃহস্থ হয়ত অন্য আর একটী চিকিৎসা প্রথাকেই উৎকৃষ্ট পন্থা বলিয়া স্থির করিয়া নিজেদের ক্ষেত্রে ঐ প্রথাতেই চিকিৎসা করান কর্ত্তব্য ও সঙ্গত বলিয়া মনে করেন। সুতরাং বাজারে যতগুলি চিকিৎসা প্রথা প্রচলিত আছে, তাহাদের প্রত্যেকটীই এইভাবে অবলম্বিত হইয়াছে ও প্রচলিত হইয়াছে। কেননা ঐ প্রকার বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হইয়াই নানা লোকে নানা মতকে প্রকৃত চিকিৎসা মনে করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি আছে?

এক্ষণে আমার দেশবাসীকে সামান্য চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি যে,—**সত্য পদার্থ একটীই হইয়া থাকে,**—একটীর অধিক কখনও হইতে পারে না। অতএব নানা মতের চিকিৎসা প্রথার মধ্যে অবশ্যই একটীমাত্র সত্য প্রথা। বাকি অন্যগুলি ভ্রান্ত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। যখন মনুষ্যকৃত প্রত্যেক জিনিষটী ভ্রম ও প্রমাদসঙ্কুল, তখন অবশ্য ঐ ঐ প্রথার প্রত্যেকটীই ভ্রান্ত হইতে পারে কিন্তু যদি উহাদের মধ্যে কোনও প্রথা সত্য হয়, তবে মাত্র একটী প্রথাই সত্য হইবে, একথা নিশ্চিত। এক্ষণে কোন্ প্রথাটী সত্য, উপরোক্ত প্রকারের বিশ্বাসের দ্বারা কখনই তাহার নিরাকরণ হইতে পারে না। তাহা ছাড়া যতক্ষণ প্রকৃত সত্য প্রথাটী অবলম্বন করিতে না পারেন, ততক্ষণ আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করা হইবে না এবং যতক্ষণ প্রকৃতভাবে আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে না পারেন, ততক্ষণ "ফলাফল ভগবানের হাতে," একথা বলিবার আপনার কোনও অধিকার নাই। আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুসারে

যথারীতি কর্ত্তব্য নিরূপণ ও কর্ত্তব্য অবলম্বন করিবার পর, ফলাফল ভগবানের উপর নির্ভর করিবার আপনার অধিকার জন্মে, তৎপূর্ব্বে জন্মে না। আপনি যদি পুরীক্ষেত্র পৌছিবার উদ্দেশ্যে উত্তরাভিমুখে ক্রমাগত যাত্রা করেন এবং ভগবানের হাতে ফলাফল অর্থাৎ পুরীধাম প্রাপ্ত হইবার আশাটী পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার উপর নির্ভর করেন, তবে আপনাকে সুস্থচিত্ত বলিয়া কেহই মনে করিতে পারিবে না। সুতরাং নানা প্রথার মধ্যে কোন্ প্রথাটী প্রকৃত আরোগ্যজনক, তাহা স্থির করা আপনার একান্ত কর্ত্তব্য, যেহেতু বিপদকাল উপস্থিত হইলে, ঐ সত্য প্রথা অবলম্বন করিলেই আপনার কর্ত্তব্য পালন করা হইবে নতুবা হইবে না।

"বিশ্বাস" বলিয়া একটী কথা আমরা সর্ব্বদাই ও অতি শীঘ্র ব্যবহার করিয়া থাকি কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ আমরা আদৌ জানিনা বলিলেই হয়। **বিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে তৎবিষয়ের জ্ঞান থাকা চাই,** নতুবা বিশ্বাস আসিতে পারে না। অগ্রে জ্ঞান, তবে তাহার পর বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে। জ্ঞান না থাকিলে কিরূপে বিশ্বাস আসিবে? অতএব আমরা সাধারণতঃ যেখানে যেখানে "বিশ্বাস" কথাটী প্রয়োগ করি, সেখানে সেখানে যদি তৎবিষয়ক জ্ঞান না থাকে, তবে ঐ কথাটী যেন সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া পড়ে; লোকে অবিরতই বলিয়া থাকেন,—"হোমিওপ্যাথিতে আমার বিশ্বাস নাই," কিন্তু এই কথাটী বলিবার পূর্ব্বে যদি তাঁহারা হোমিওপ্যাথির ভিতর কি আছে বা না আছে, ইহার আরোগ্য-নীতি কি, ইহার ফলাফল কিরূপ ইত্যাদি বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিবার পর ইহার সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানলাভ করিতেন, তবেই "বিশ্বাস নাই,"—এই কথাটীর মূল্য থাকিত। আর এক কথা, বিশ্বাস থাক্ বা না থাক্ তাহার উপর ফলাফল নির্ভর করে না,—আপনার বিশ্বাস না থাকিলেও জলে কাপড় ভিজিবে, অগ্নিতে দাহ কার্য্য হইবে,—সত্যনীতি তাহার কার্য্য করিবেই, সে বিষয়ে

আপনার বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের কোনও মূল্য নাই। তবে আপনি যদি প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া তদ্বিষয়ে দৃঢ়তা ও বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়া থাকেন, তবে সে বিশ্বাসের মূল্য অনেক, কেন না এরূপ বিশ্বাস চিরদিনই আপনার মন ও দেহের উপর বিশেষভাবে ক্রিয়া বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং জ্ঞানের পর যে বিশ্বাস অর্জ্জিত হয়, তাহাই প্রকৃত বিশ্বাস এবং তাহার মূল্যও যথেষ্ট।

আমরা প্রায়ই যখন কোনও কার্য্য অবলম্বন করিয়া ভগবানের দোহাই দিয়া থাকি, বা তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করি, তখন আমাদিগকে সর্ব্বদাই দেখিতে হয় যে, আমরা তাঁহার সাহায্যের যোগ্য বটে কিনা। নিজের যোগ্যতা না থাকিলে কেহই সাহায্য করে না, অথবা কেহ সাহায্য করিলেও তাহার ফল পাওয়া যায় না। একদিকে যেমন যোগ্যতা অর্জ্জন না করিলে, তাঁহার সাহায্য পাওয়া যায় না, তদ্রূপ অন্যদিকে যোগ্যতা লাভ করিলে, তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতেই হয় না। উহা স্বতঃই পাওয়া যায়। এক্ষণে কি করিলে তাঁহার সাহায্য প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করা যায়? মনুষ্যের অনুগ্রহ বা কৃপা লাভ করিবার পক্ষে অবশ্যই তোষামোদ বা মিষ্টবাক্য প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু ভগবানের সাহায্য আশা করিতে হইলে সে সকল উপায় কার্য্যকর হইতে পারে না। একথা বলিতেছি না যে, তাঁহার নিকট প্রার্থনার কোনও ফল নাই,—বরং তৎবিপরীতে একথাই বলিতে হইবে যে, প্রার্থনার ন্যায় উপকারী পন্থা জগতে অন্য কিছুই নাই বলিলেও হয়। ফলতঃ প্রার্থনার উপকারীতা অন্যদিকে যথেষ্ট থাকিলেও তৎপূর্ব্বে তাঁহার আদিষ্ট নীতি পালন না করিলে বিশেষ কোনও ফলোদয় হয় না। সর্ব্বাগ্রে **নীতিপালন**, তাহার পর প্রার্থনা না করিলেও, ফল প্রাপ্তির বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। **নীতি ভঙ্গেই দুঃখ ও বিশৃঙ্খলা এবং নীতিপালনই সুখ ও শৃঙ্খলার**

একমাত্র উপায়,—একথা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে। সর্ব্বাদৌ নীতি ভঙ্গ করিয়াই আমরা দুঃখ ও অশান্তির সৃষ্টি করিয়া থাকি। বর্ত্তমানে যে পীড়া হইতে দুঃখভোগ করিতেছি, তাহার কারণও একমাত্র ভগবানের বা প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন। নিয়ম লঙ্ঘনই সকল অনর্থের মূল,—একথা সকলেই জানেন। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে ব্যাধি হইয়াছে; এক্ষণে যে নিয়ম লঙ্ঘন করিবার ফলে পীড়া হইয়াছে সে নিয়মটী প্রতিপালন করিলেই বর্ত্তমান ব্যাধি হইতে মুক্তি পাইবার কোনও উপায় হইল না। একটী উদাহরণ না দিলে বিষয়টী পরিষ্কার হইবে না। মনে করুন একটী জ্বলন্ত অঙ্গার আপনার হাতের কাছে ধরা হইল, তাহার ফলে আপনার হাতে দাহ উপস্থিত হইবে; এ অবস্থায় অঙ্গারটীকে স্থানান্তরিত করিলেই দাহের নিবৃত্তি হইবে ও হইয়া থাকে। কিন্তু যদি ঐ জ্বলন্ত অঙ্গারটী আপনার হস্তের কোনও স্থানটীকে দগ্ধ করে, তবে অঙ্গারটীকে জলে নিক্ষেপ করিলেও দগ্ধ স্থানের যাতনা নিবৃত্তি বা ক্ষত নিরাময় হইবে না। এই হিসাবে যে নীতিভঙ্গ করিয়া আমরা ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হই, সে নীতি প্রতিপালন করিলে ঐ ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ সম্ভব হয় না; এক্ষণে প্রকৃতির নির্দ্দিষ্ট অন্য নীতি পালনের প্রয়োজন এবং তাহার ফলে বর্ত্তমান ব্যাধি-মুক্তি ঘটিবে। ব্যাধি মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ও তাহার পূর্ব্ব নীতি অর্থাৎ যেটী ভঙ্গ করার ফলে ব্যাধি হইয়াছিল তাহা চিরদিনই পালন করা আবশ্যক হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান ব্যাধি হইতে মুক্তি চাহিলে প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট অন্য নীতি প্রতিপালন অর্থাৎ তদনুসারে কার্য্য করিতেই হইবে। কেননা সাধারণ নীতি ভঙ্গে পীড়া, এক্ষণে বিশেষ নীতির সাহায্যে ব্যাধি মুক্তি এ কথাটী হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।

সেই বিশেষ **নীতিটী** কি? সেই বিশেষ নীতিটী আরোগ্য নীতি। অর্থাৎ ব্যাধি হইলে, ব্যাধি পীড়িত দেহে বিকাশ-প্রাপ্ত-লক্ষণ-সমষ্টির সাদৃশ্যে

ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া সেই ঔষধ সেবন করিতে হইবে। ইহাকে **সদৃশ** চিকিৎসা বা **সদৃশ** বিধানে চিকিৎসা কহে, ইংরাজীতে ইহার নাম **হোমিওপ্যাথি**। এই নীতি অনুসারে কার্য্য না করিলে আপনার ব্যাধি মুক্তির কোনও উপায় নাই। অবশ্য যে নীতি ভঙ্গ করার ফলে ব্যাধি জন্মিয়াছে, তাহাত নিত্যই প্রতিপালন একান্ত আবশ্যক, নতুবা ব্যাধি মুক্তি ত দূরের কথা, নিত্য নূতন ব্যাধির কবলে পড়িতে হইবে। তাহা ছাড়া, এই বিশেষ নীতি বা প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট-আরোগ্য-নীতিটী অবলম্বন না করিলে বর্ত্তমান ব্যাধি হইতে পরিত্রাণের কোনও উপায় নাই। এই বিশেষ নীতিটী ব্যক্তিবিশেষের তৈয়ারী নয়, ইহা **প্রকৃতিরই নির্দ্দিষ্ট আরোগ্য নীতি**—তবে হ্যানিম্যান ইহা আবিষ্কার করিয়াছেন মাত্র। এই বিশেষ নীতি চিরদিনই আছে ও পরেও থাকিবে এবং ইহা আবিষ্কারের পূর্ব্বেও যেখানে যেখানে ব্যাধি আরোগ্য হইয়াছে সেখানে সেখানেই ঐ নীতি অনুসারেই হইয়াছে। আমরা কেবল তাহা জানিতাম না এই পর্য্যন্ত।

অতএব আপনার বিশ্বাস ও অবিশ্বাস লইয়া চিকিৎসা প্রথা নির্ব্বাচন বিষম ভ্রান্তি। আপনাকে আরোগ্য হইতে হইলে **প্রাকৃতিক আরোগ্যতত্ত্ব** অবলম্বন করিতেই হইবে, নতুবা গত্যন্তর নাই,—আপনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন। আপনার যতদিন জীবন ততদিনই আপনাকে প্রকৃতির রাজ্যে ও তাঁহার এলেকার মধ্যে বাস করিতে হইবে, সুতরাং তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে ব্যতীত আরোগ্য সম্ভব হইবে না। কতকগুলি চাকচিক্যশালী নাম ও বড় বড় উপাধির মোহে আপনি যতই মুগ্ধ হইবেন আপনার অবস্থা ততই শোচনীয় হইবে, আপনার ব্যাধি জটীল হইতে জটীলতর হইবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যদি আপনার সে প্রকার বুদ্ধিতীক্ষ্ণতা থাকে, তবে আমাদের কথার সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য, তথাকথিত চিকিৎসা শাস্ত্র সকল উত্তমরূপে পাঠ করিয়া ও তুলনা এবং

কল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে পারেন। তাহার ফলে নিশ্চয়ই জানিতে পারিবেন যে, একমাত্র হোমিওপ্যাথি ব্যতীত আরোগ্য পন্থা আর অন্ত কোনওটাই নয়। আর যদি সে প্রকার শক্তি বা জ্ঞান আপনার না থাকে, তবে এখনও সাবধান হউন, আমাদের বাক্য গ্রহণ করুন আমাদের মন্তব্যে বিশ্বাস করুন এবং গৃহস্থে কাহারও পীড়া হইবামাত্রই হোমিওপ্যাথি অবলম্বন করুন ইহাই প্রার্থনা।

"প্রকৃতিকে সাহায্য করাই চিকিৎসা"।

প্রত্যেক শ্রেণীর চিকিৎসক, এমন কি, অতি অজ্ঞ সাধারণ লোক পর্য্যন্ত, সকলেই কহিয়া থাকেন—"প্রকৃতিকে সাহায্য করাই চিকিৎসা", এবং সকলেই জানেন যে, কোনও রোগীর পীড়া আরোগ্য করিতে হইলে, তাহার প্রকৃতিকে সাহায্য করিতে হইবে এবং প্রকৃতিকে সাহায্য না করিলে, অথবা না করিতে পারিলে, চিকিৎসা বিষয়ে কখনও কৃতকার্য্যতা লাভ হইতে পারে না।

কথাটী অতি সহজ এবং শ্রুতিমধুর। কথাটীর যৌক্তিকতাও যথেষ্ট, কেননা প্রকৃতি দুর্ব্বল ও নিতান্ত অপারক হওয়ার জন্তই ত, রোগীর রোগটী সারাইতে পারিতেছে না,—এমন অনেক পীড়া হইয়া থাকে যে, কোনও প্রকার সাহায্য না করিলেও, প্রকৃতি আপন চেষ্টাতেই আরোগ্য করিয়া থাকে, যেহেতু তখন প্রকৃতি বেশ সতেজ থাকে, সবল থাকে, স্থতরাং সাহায্যের আবশ্যকই হয় না। কিন্তু এরূপ পীড়া আছে, যেথানে প্রকৃতি সাহায্য না পাইলে, আরোগ্য করিতে সক্ষম হয় না, স্থতরাং তাহাকে সাহায্য

করা একান্ত আবশ্যক হয়। যে ক্ষেত্রে প্রকৃতি নিজে দুর্ব্বল হওয়ায় বিনা সাহায্যে আরোগ্য করিতে অপারক হয়, সেখানেই সাহায্যের প্রয়োজন এবং সেই সাহায্য প্রদান করাই চিকিৎসা,—একথাটী যে একান্ত যুক্তিপূর্ণ ও সঙ্গত, তাহা কে না বলিবে ?

এক্ষণে, আসল কথা, কার্য্যকালে অর্থাৎ চিকিৎসা করিবার সময়, আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে কি করিয়া থাকি, তাহাই আলোচ্য বিষয়। যদি মুখে বলি এক, কিন্তু কার্য্যতঃ করিয়া বসি আর এক, তবে তাহাকে চিকিৎসা কি প্রকারে বলা যাইবে ? প্রকৃতিকে সাহায্য করিতে হইলে, যাহা যাহা আবশ্যক, তাহা সর্ব্বাদৌ আলোচ্য, তাহার পর অন্যান্য বিষয়ের অবতারণা করিতে হইবে। প্রকৃতিকে সাহায্য করিতে হইলে, তাহার সাহায্য ভিক্ষার **ভাষার** প্রতি মনোনিবেশ করিতে হয়। প্রকৃতির সাহায্য ভিক্ষার ভাষা কি ? রোগীর অস্বাভাবিক **লক্ষণ-সমষ্টিই** প্রকৃতির সাহায্য ভিক্ষার ভাষা। একই **নামের** পীড়া হইলেও, নানা রোগীর নিজ নিজ **ব্যক্তিত্ব** বা **বিশেষত্বের** তারতম্যে, এই ভাষার তারতম্য হইয়া থাকে এবং তৎপ্রতি দৃষ্টি ও মনোযোগ ব্যতীত তাহার ভাষা বা ইঙ্গিত সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি হয় না, সুতরাং প্রকৃত সাহায্য হইতে পারে না। রামের জ্বর হইয়াছে, শ্যামেরও জ্বর হইয়াছে,—তাই বলিয়া উভয়ের প্রকৃতির সাহায্য চাহিবার ভাষা যে একই হইবে, তাহার কোনও কারণ নাই, কেননা মনুষ্যমাত্রেরই জীবনীতন্ত্রীর সুরটী স্বতন্ত্র এবং যেমন দুইটী স্থানে সঙ্গীতের ধ্বনি শ্রুতিমধুর হইলেও একজন হয়ত ভৈরবী আলাপ করিয়া লোকের চিত্তবিনোদন করিতে থাকে, অন্যে হয়ত ইমনকল্যাণ রাগিণী আলাপ করিয়া লোকের মনকে মোহন করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রত্যেক মনুষ্য সুস্থ অবস্থায় থাকিলেও তাহাদের প্রত্যেকের সুরলহরী প্রত্যেকের হইতে স্বতন্ত্র, সুতরাং **স্বাতন্ত্র্য** অনুসারেই প্রত্যেকের

পীড়াকালে বিশৃঙ্খলার এক একটী স্বতন্ত্র সুর ধ্বনিত হইয়া থাকে,—এবং সেই **স্বাতন্ত্র্যটী** ধরিতে পারিলেই প্রত্যেকেরই **বিশেষত্বটী** ধরা যাইবে এবং প্রত্যেকেরই প্রকৃতির সাহায্য ভিক্ষার ভাষাটীর মধ্যে বিশেষত্ব বা ব্যক্তিত্ব হিসাবে **স্বাতন্ত্র্যটী** পরিলক্ষিত হইবে। প্রত্যেক মনুষ্যের এক একটী স্বতন্ত্র বিশেষত্ব থাকে বলিয়াই রামের জ্বরে অস্থিরতা এবং শ্যামের জ্বরে নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধি লক্ষণ পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়। এ জগতের স্বাতন্ত্র্যই মর্ম্মবাণী,—প্রত্যেকে প্রত্যেক হইতে স্বতন্ত্র্য, এমন কি, বেলা-ভূমিতে কোটী বা অনন্ত কোটী বালুকণা অনুবীক্ষণ যন্ত্রসাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, সর্ব্বাংশে এক প্রকার দুইটী বালুকণা প্রাপ্ত হওয়া যায় না! শত সহস্র বা লক্ষ লক্ষ বিটপীসমন্বিত একটী নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখ, এক প্রকারের দুইটী বৃক্ষ কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হইবে না! সুতরাং দুইটী মানবের মধ্যে যে মর্ম্মান্তিক প্রভেদ পরিলক্ষিত হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কি আছে? **অতএব সুস্থাবস্থার যেমন প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র্য, তেমনই পীড়িত অবস্থাতেও প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র্য এবং প্রকৃতির সাহায্য ভিক্ষার ভাষাও বিভিন্ন হইবে, একথা বলাই বাহুল্য।** জাগতিক ব্যাপার সম্পর্কে একমাত্র স্বাতন্ত্র্যটীর বিষয় চিন্তা করিলে, মানব-মন বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া উঠে এবং বিশ্বস্রষ্টার অপূর্ব্ব মহিমার বিষয় মনোমধ্যে আন্দোলিত হইলে, মানব সহজেই পরাৎপর পরমপুরুষের চরণে নতমস্তক না হইয়া পারে না।

যাহা হউক, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই, প্রত্যেক রোগীতে এমন কি, একই নামের পীড়ায় পীড়িত নানা রোগীর মধ্যে প্রত্যেকের **ব্যক্তিত্ব** হিসাবে, প্রকৃতির সাহায্য ভিক্ষার ভাষাটী স্বতন্ত্র, ইহা লক্ষ্য করিয়া সেই ভাষাটী অর্থাৎ লক্ষণ-সমষ্টি একত্র করিয়া, ঠিক তাহারই সাদৃশ্যানুসারে, একটী ভেষজ

প্রয়োগ করিতে পারাই, প্রকৃতিকে সাহায্য করা, ইহা বেশ বুঝিতে পারা গেল। যেখানে আমরা এই প্রকার সাহায্য দিতে পারি, সেখানেই ইহাকে চিকিৎসা বলা যায় এবং এই প্রকার চিকিৎসা হইলেই রোগীর রোগলক্ষণগুলি দূরীভূত হইয়া রোগী আরোগ্য লাভ করে। কিন্তু আরোগ্যের **অন্তরায়** দুইটী,—(১) **প্রকৃতির সাহায্য ভিক্ষার ভাষা বুঝিতে না পারা** এবং (২) **প্রকৃতির সাহায্য ভিক্ষা আদৌ না থাকা**। একে একে এই দুইটীর আলোচনা প্রয়োজনীয়। চিকিৎসকের পক্ষে এই দুইটী অন্তরায় বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই দুইটী ব্যতীত, রোগীর **পথ্যাদি** সম্বন্ধে সাবধানতা বিষয়ে উদাসীন থাকা, রোগীর **অধৈর্য্য**, রোগের **উত্তেজক** কারণ অর্থাৎ **নিদান** ত্যাগ না করা, ইত্যাদি অন্তরায় আরও অনেক আছে, ফলতঃ সেগুলি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয় নয়।

(১) যেখানে চিকিৎসক হইয়া, **প্রকৃতির সাহায্য ভিক্ষার ভাষা বুঝিতে অক্ষম** সেখানে চিকিৎসকের দোষে, রোগীর কষ্টের লাঘব ঘটে না এবং তৎপরিবর্ত্তে তাহার মহান অনিষ্ট ও জটীলতাপ্রাপ্তিও সম্ভব হইয়া থাকে। প্রকৃতির সাহায্য ভিক্ষার ভাষাটী অর্থাৎ লক্ষণ-সমষ্টি ধরিতে পারা বড় সহজ কথা নয়। মুখে এ বিষয় আলোচনা করা যত সহজ, এ বিষয় লিখিয়া একটী প্রকৃষ্ট জ্ঞান প্রদান করা ততোধিক কঠিন এবং কার্য্যতঃ ধরিতে পারা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ; এমন কি, ইহা ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ বলিয়াই মনে হয়। ভগবৎকৃপার পশ্চাতে অনেক দিনের সাধনা অর্থাৎ তৎপথে তপস্যা অতিশয় প্রয়োজনীয়। কোনও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে বহু রোগী পর্য্যবেক্ষণ এবং তাঁহার রোগীলিপির পুস্তক খানি বার বার অধ্যয়ন, পর্য্যালোচনা এবং অনুধ্যান ব্যতীত ঐ শক্তি লাভ হয় না, হইতে পারে না। এইজন্য উহাকে ভগবৎকৃপা সাপেক্ষ বলিয়া কথিত হইল।

"ভগবৎকৃপা সাপেক্ষ" বলিতে কেহ যেন এরূপ অর্থ না করেন যে, উপরোক্ত ভাবে সাধনাদি পরিশ্রম না করিয়া নিত্য কেহ করজোড়ে গল-লগ্নকৃতবাসে কেবল প্রার্থনা করিলেই ঐ শক্তি লাভ হইবে,—প্রত্যেক ব্যাপারে সাধনা ও তপস্যা করিলেই তাঁহার কৃপা প্রাপ্তির অধিকারী হওয়া যায়, নতুবা নয়।

রোগীর লক্ষণ-সমষ্টি কেবলমাত্র কতকগুলি লক্ষণের **স্থূল-সমষ্টি** নয়,—ইহা রোগীর অভ্যন্তর বিশৃঙ্খলার একটী **বিকাশ-চিত্র**; ইহা **জীবন্ত,** ইহার ভিতর একটী **যোগ-সূত্র** আছে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন লক্ষণের সমষ্টি নয়। ইহা একটী **জীবন্ত প্রতিচ্ছবি**; রোগীর জীবনীশক্তিতে আবির্ভূত বিশৃঙ্খলার একটী বাহ্যমূর্ত্তি: ভিতরে dynamic অর্থাৎ সূক্ষ্মস্তরের মধ্যে যে বিপর্য্যয়টী, যে বিশৃঙ্খলাটী, আবির্ভূত হইয়াছে, তাহারই একটী জীবন্ত ছবি এবং এই ছবিটীর গঠনের জন্য রোগীর অস্বাভাবিক অনুভূতিগুলির সাহায্য লওয়া হইয়াছে। ঐ ঐ অস্বাভাবিক অনুভূতিগুলির দ্বারাই ছবিটী গঠিত হইয়াছে। যেমন একটী প্রতিমা গঠনের জন্য কাষ্ঠ, মৃত্তিকা, খড়, দড়ী, ইত্যাদির সাহায্য লইয়া প্রতিমাটীর নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন হয়, ঠিক তেমনই রোগীর শরীরের নানা স্থানে, নানা যন্ত্রে অনুভূত কষ্ট ও যাতনা এবং ভাববিপর্য্যয়ের সাহায্যে ঐ ছবিটী গঠিত হইয়া থাকে। প্রতিমাটী গঠনের যেমন একটী **কৌশল** থাকে, আমাদের ঐ ছবিগঠনেরও একটী কৌশল আছে এবং তাহাই **যোগসূত্র**। রোগীতে এরূপ অনেক লক্ষণ থাকে, যাহা ঐ "সমষ্টির" অন্তর্ভুক্ত হয় না, উহারা **প্রক্ষিপ্ত,** মূল ছবিটীর গঠন কার্য্যে উহাদের প্রয়োজন থাকে না এবং সেগুলির মধ্যে কোনওটী ঐ সমষ্টির মধ্যে লইয়া ফেলিলে যোগসূত্রটী ছিন্ন বা নষ্ট হইয়া যায়, Planটী বা কৌশলটী বজায় থাকে না।

(২) যেখানে **প্রকৃতির সাহায্য ভিক্ষার ভাষা না থাকে**;—এখানে, চিকিৎসকের কোনও ত্রুটী বা অমনোযোগ নাই,—

এখানে প্রকৃতি সাহায্য ভিক্ষা করিতেছে না। এখানে আরোগ্যের আশা আদৌ নাই, জানিতে হয়। লক্ষণ-সমষ্টি না থাকিলে চিকিৎসকের কোনও হাত নাই, তিনি কি করিতে পারেন? যেখানে লক্ষণ-সমষ্টির একান্ত অভাব, সেখানে জানিতে হইবে যে, রোগীর অবস্থাটী চিকিৎসার বহির্ভূত হইয়াছে। লক্ষণ-সমষ্টির অভাব কিরূপ ক্ষেত্রে হয়? যে ক্ষেত্রে পীড়া আর **পীড়া** নাই, পূর্ণমাত্রায় **পরিণতি** আসিয়া দেখা দিয়াছে। পীড়াটী যতক্ষণ পীড়াভাবে ছিল, ততক্ষণ একটা **ক্রমগতি** ছিল, ততক্ষণ **হ্রাস-বৃদ্ধি** ছিল,—পরন্তু এক্ষণে সে **গতিটী** আর নাই, হ্রাসবৃদ্ধিও নাই,—পীড়ার **ফলটী** মাত্র অবশিষ্ট আছে, পীড়াটী পীড়ার **ভাব ও ক্রম** ত্যাগ করিয়া এক্ষণে **পরিণতি বা ফলে** পর্য্যবসিত হইয়াছে, সুতরাং প্রকৃতির আরোগ্য চেষ্টাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে,—যখন চেষ্টাই নাই, তখন আর সাহায্য ভিক্ষারও কোনও হেতু নাই; এ অবস্থায় আর চিকিৎসা চলে না। এ অবস্থায় ক্বচিৎ কোনও কোনও ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার দ্বারা ফলটী অপসারিত করিয়া রোগীকে একটু শান্তি দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু **রোগী** সারে না।

এ পর্য্যন্ত যাহা আলোচিত হইল, তাহাতে প্রকৃতিকে সাহায্য করার অর্থটী হৃদয়ঙ্গম হইবে, আশা করিতে পারা যায়। চিকিৎসক প্রকৃতিকে সাহায্য করেন কখন, এবং কি উপায়ে? তিনি সাহায্য করেন, প্রকৃতি যখন তাঁহার নিকট সাহায্য চাহে এবং তখন ঐ সাহায্যের ভাবটীর প্রতি মনোনিবেশ করিয়া, তাহারই সাদৃশ্যানুসারে তিনি একটী ভেষজ প্রয়োগ করিয়া, ঐ সাহায্য প্রদান করেন। এক্ষেত্রে চিকিৎসক সম্পূর্ণভাবে **প্রকৃতির অধীন,** কেননা প্রকৃতি সাহায্য না চাহিলে এবং তাহা তাহার ভাষার দ্বারা প্রকাশ না করিলে, তিনি কিছুই করিতে পারেন না। চিকিৎসক নিজের খেয়াল অনুসারে, যে কোনও প্রক্রিয়া দ্বারা যে কোনও

ভেষজ দ্বারা সাহায্য করিলে, তাহা প্রকৃতিকে সাহায্য করাও হয় না এবং তাহাকে চিকিৎসা বলা যাইতেও পারে না, সেটা কেবল মাত্র খেয়ালের কার্য্য, কেবল "গুণ্ডামির" কার্য্য হইয়া থাকে। প্রকৃতির চাহিদা নাই, অথবা প্রকৃতি যাহা চাহে এবং যে ভাষার দ্বারা সাহায্য ভিক্ষা করে, তাহার প্রতি মনোযোগ নাই, অথচ যাহা তাহা "তথাকথিত চিকিৎসা" করা **চিকিৎসা নয়**, তাহা প্রকৃতির কার্য্যে বরং **বাধা দেওয়া। চিকিৎসকের যেন ভুল না হয় যে, যাবতীয় কার্য্য প্রকৃতিই করিবে এবং তাঁহাকে করিতে দিতে হইবে**; তাঁহার কর্ত্তব্য কেবল ঐ চাহিদা অনুসারে সাহায্য করা। প্রকৃতির কার্য্যটা অন্য প্রক্রিয়ার দ্বারা করিলে, চিকিৎসকের কর্ত্তব্য হইবে না। মনে করুণ, কোনও এক ব্যক্তির ঘন ঘন মলবেগ এবং মূত্রবেগ হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক বেগটী প্রায়ই নিস্ফল হইতেছে,—এ অবস্থায় তাহাকে "হাগাইলে" বা "মোতাইলে" অর্থাৎ কোনও প্রকারে মলটী ও মূত্রটী বাহির করিয়া দিলে, **"চিকিৎসা"ও** হইবে না এবং **"প্রকৃতিকে সাহায্য করা"ও** হইবে না, কেন না প্রকৃতির কার্য্যটী **প্রকৃতির দ্বারা** না করাইয়া ডুস বা ক্যাথিটারের দ্বারা করান হইল। ঐ প্রকার নিস্ফল বেগ এবং অন্যান্য **লক্ষণসমষ্টির সাদৃশ্যে** যদি নাক্স-ভমিকা বা অন্য কোনও ভেষজ প্রযুজ্য হয়, তাহা প্রয়োগ দ্বারা প্রকৃতিকে সাহায্য করাই চিকিৎসা ; এবং তৎবিপরীতে অন্য কোনও প্রক্রিয়াবিশেষ অবলম্বন করিলে, তাহা চিকিৎসা হইল না এবং প্রকৃতির দ্বারা কার্য্যটী সম্পন্ন করান হইল না।

এক্ষণে, আমাদের এলোপ্যাথিক ভ্রাতাগণও কহিয়া থাকেন যে, তাঁহারাও প্রকৃতিকে সাহায্য করিয়া থাকেন এবং প্রকৃতিকে সাহায্য করাই চিকিৎসা। তাঁহারা কি ভাবে সাহায্য করেন, সে বিষয়ে একটু

সামান্য ভাবে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে হয় না, কেন না তাঁহাদের বিধানটী জানিতে পারিলে, আমাদের বিধানটী আরও স্পষ্টতর ভাবে বুঝিবার সুবিধা হইবে। তাঁহারা দেখেন যে, কোনও একটী জ্বর রোগীর জ্বরটী ত্যাগ হইবার সময় প্রচুর ঘর্ম্ম হইয়া ত্যাগ হয়,—ইহা দেখিয়া তাঁহারা মনে করেন যে, যদি এরূপ কোনও ঔষধ দেওয়া হয়, যাহাতে প্রচুর ঘর্ম্ম নিঃসরণ করাইতে পারে, তাহা হইলেই প্রকৃতিকে সাহায্য করা হইবে। আবার অন্য কোনও ক্ষেত্রে যদি দেখেন যে, রোগীটীর প্রচুর পরিমাণে তরল মলভেদ হইয়া যাইবার পরেই জ্বরটী ত্যাগ হইয়া গেল, তবে মলভেদটী নিশ্চয়ই জ্বরত্যাগের কারণ হইবে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা জ্বর রোগীকে জোলাপ দিয়া থাকেন। কোনও স্থলে, রোগীর মস্তিষ্কে অত্যধিক রক্তসঞ্চয় হওয়ায় রোগী নানা প্রলাপাদি বকিতেছে দেখিয়া, হৃদ্‌পিণ্ডের দ্রুত স্পন্দনটী কমাইয়া দিলেই ঐ যন্ত্রটী আর মস্তিষ্কে রক্ত প্রেরণ করিতে পারিবে না, এই ধারণাব বশবর্ত্তী হইয়া, তাঁহারা ব্রোমাইড প্রভৃতি অবসাদ জনক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। একটি "পুঞে পাওয়া" অর্থাৎ ক্রমিক ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতেছে এরূপ একটী বালক তুলনা করিয়া, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, ক্ষীণ বালকটীর দেহে ভিটামিন্ নামক পদার্থের অভাব হইয়াছে,—অতএব বাজার হইতে ভিটামিন্ ক্রয় করাইয়া ক্ষীণ বালকটীকে খাওয়াইবার উপদেশ দিয়া থাকেন। যদি কেহ অতিশয় নিরক্ত হইয়া গিয়াছে, তবে অন্য কোনও দেহ হইতে রক্ত লইয়া নিরক্ত দেহে প্রবেশ করাইয়া আরোগ্য করিবার চেষ্টা করেন। এই প্রকার শত শত বা সহস্র সহস্র উদাহরণের দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে, তাঁহারা কি ভাবে "প্রকৃতিকে সাহায্য" করেন।

উপরোক্ত উদাহরণগুলি হইতে প্রমাণ হইবে যে, এলোপ্যাথিক শাস্ত্রানুসারে যাঁহারা চিকিৎসা করেন, তাঁহারা রোগীদিগের রোগ আরোগ্য

বিষয়ে, প্রকৃতি যে ভাবে আরোগ্য করিবার চেষ্টা করে, তাহা লক্ষ্য করিতে গিয়া এবং তাহাই নিজেরাও অনুসরণ করিবেন এই ধারণা করিয়া, কখনও বা ঐ ভাবে আরোগ্যের আনুসঙ্গিক অবস্থাটার অনুকরণ করেন, অথবা রোগের ফলটীকে জোর করিয়া অপসারিত করিবার চেষ্টা করেন। যেখানে রোগের ফলটীকে জোর করিয়া তাড়াইবার চেষ্টা করেন, সেখানে অবশ্য সকলেই বুঝিবেন যে, ইহা "জবরদস্তী" মাত্র এবং "প্রকৃতিকে সাহায্য করা" কখনও নয়। যেখানে জোর করিয়া বাহির হইতে ভিটামিন্ প্রয়োগ করিয়া রোগীকে তাজা করিবার প্রয়াস পাওয়া হয়, অথবা অন্যের শরীর হইতে রক্ত লইয়া নিরক্তকে সরক্ত ও সুস্থ করিবার চেষ্টা করা হয়, যেখানে কুইনাইন খাওয়াইয়া জোর করিয়া জ্বরের উদয়টীকে দমিত করা হয় অথবা যেখানে কোনও একটী যন্ত্রবিশেষকে অসাড় করিয়া অন্য স্থানের রক্তসঞ্চয়কে দমিত করিবার চেষ্টা করা হয়,—সে সকল ক্ষেত্রে "প্রকৃতিকে সাহায্য করিবার" কথা ত দূরের কথা, কেবলমাত্র পীড়ার **ফলটীকে** জবরদস্তীর দ্বারা নিজের খেয়ালমত ঔষধ প্রয়োগ সাহায্যে, লক্ষণ বা কষ্টবিশেষকে অপসারিত করা হয়। ফলতঃ ঐ সকল ক্ষেত্রে, সাধারণ লোকে কেহই "প্রকৃতিকে সাহায্য করা হয়" বলিয়া মনে করিবার আশঙ্কা নাই। পূর্ব্ব লিখিত জ্বরের উদাহরণে, ঘর্ম্মকারক বা ভেদক ঔষধ প্রয়োগে জ্বরটী মগ্ন করিবার প্রয়াস দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, বাস্তবিকই তাঁহারা বুঝি প্রকৃতই "প্রকৃতিকে সাহায্য" করিয়া থাকেন,—সুতরাং ঐ বিষয়ে কিছু আলোচনা আবশ্যক হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত জ্বরের উদাহরণে, তাঁহারা দেখেন যে, প্রকৃতি রোগীকে ঘামাইয়া অথবা মল নিঃসরণ করাইয়া জ্বরটী ত্যাগ করাইল সুতরাং তাঁহাদের ধারণা যে, "ঘামান" বা "হাগানই" জ্বরত্যাগের প্রকৃত **কারণ** এবং এই ধারণার বশে তাঁহারাও জ্বরের রোগীতে ঐ ঐ প্রক্রিয়া ব্যবস্থা

করিয়া থাকেন। ফলতঃ সামান্যমাত্র অনুধ্যান করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ঐগুলি জ্বরত্যাগের **কারণ** নয়, উহারা **আনুসঙ্গিক** লক্ষণ বা অবস্থা,—বরং উহাদিগকে **কারণ** বা **কার্য্য** বা **ফল** বলিয়া বলা যাইতে পারে। ঘাম বা ভেদ হয় বলিয়া জ্বরটী ত্যাগ হয় না, বরং জ্বরটী ত্যাগ হয় বলিয়া তাহারই **আনুসঙ্গিক** হিসাবে ঐ সময়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। উহারা concomitants and not causes, অর্থাৎ উহারা **আনুসঙ্গিক লক্ষণ,—কারণ** কখনও নয়। নিত্যই প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই কাক ও কোকিলে ডাক দেয়, তাই বলিয়া যদি বলা হয় যে, কাক ও কোকিলে ডাক দেয় বলিয়া প্রভাত হয়, তবে ইহা বাতুলের কথা হইবে। ঐ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যদি কেহ কতকগুলি কাক এবং কোকিলকে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় ডাক দেওয়ায়, তবে কি উহাদের ডাক দিবার জন্য বেলা দ্বিপ্রহরে প্রভাত হইবে? অথবা, যে দেশে কাক ও কোকিল বাস করে না, সেখানে কি প্রভাত হয় না? সুতরাং উহাদের ডাক দেওয়াটী প্রভাতের প্রত্যক্ষ **কারণ** নয় বরং একথাই বলা যায় যে, প্রভাত হয় বলিয়াই উহারা স্বাভাবিক আনন্দানুভূতির জন্য জগজ্জনকে সূচনা দান করে ও ঠিক যেন কহে—"ভাই সকল,—তোমরা শয্যাত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান কর, দেখ প্রভাতের কি সৌন্দর্য্য, দেখ পূর্ব্ব দিক অরুণ বর্ণে রঞ্জিত,—প্রকৃতির সৌন্দর্য্য পরিদর্শন কর, ইত্যাদি।" জ্বরত্যাগের পূর্ব্বে বা সমসাময়িক হিসাবে ঘর্ম্মোদয় বা মলনিঃসরণও ঠিক সেই প্রকার। উহারা **সূচনাদানকারী**, উহারা **দূত**, উহারা জানাইয়া দেয় যে, জ্বরটী ত্যাগ হইবার উপক্রম হইয়াছে, আর উদ্বেগের কোনও কারণ নাই। নতুবা, জ্বররোগীকে, প্রকৃতি প্রদত্ত সূচনাদানকারী বা অগ্রদূতটীকে **কারণ** বলিয়া মনে করিয়া তদনুকরণে জোর করিয়া "হাগাইলে বা ঘামাইলে" কি কখনও আরোগ্য কার্য্য হয় অথবা কি

কখনও "প্রাকৃতিকে সাহায্য" করা হয়? আপনার ছেলেটী এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, একথা পিয়নে সংবাদ দেয় বলিয়া, পিয়নটাই আপনার ছেলের উত্তীর্ণ হইবার **কারণ**? যদি কোনও ব্যক্তি একথা মনে করেন, সে ব্যক্তি বাতুলালয়েরই যোগ্য, লোকালয়ে বাস করিবার নিতান্ত অযোগ্য।

যাহা হউক, "প্রকৃতিকে সাহায্য" করিলেই প্রকৃত প্রস্তাবে চিকিৎসা হয়, একথাটী সত্য হইলেও নিজেদের মনগড়া বা খেয়ালের বশে সাহায্য করিলে, সাহায্য করা হয় না, চিকিৎসা করাও হয় না,—কি করা হয়, তাহা, যাঁহারা করেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন। আমরা জানি যে, প্রকৃতির চাহিদা অনুসারে তাহাকে সাহায্য করাই চিকিৎসা, এবং সেই চাহিদা কেবলমাত্র প্রকৃতির ভাষা অর্থাৎ লক্ষণসমষ্টির দ্বারাই প্রকাশ পাইয়া থাকে। ঐ ভাষা বা লক্ষণসমষ্টি ব্যতীত সাহায্য সম্ভব নহে। যেখানে সে ভাষা বা লক্ষণসমষ্টি থাকে না, সেখানে ঔষধ নির্ব্বাচন, অতএব চিকিৎসা, একেবারেই অসম্ভব।

আরও এক কথা, এলোপ্যাথগণ "প্রকৃতিকে সাহায্য করি", একথা মুখে বলিলেও, তাঁহারা কখনও প্রকৃতির সহিত পরিচয়ও করেন না, প্রকৃতির সন্ধানও রাখেন না, কেবলমাত্র রোগের **ফলটী** অপসারিত করিয়া থাকেন,—সুতরাং এক্ষেত্রে "প্রকৃতিকে সাহায্য করিয়া থাকি", একথা বলিবার তাঁহাদের অধিকার আছে বলিয়া মনে হয় না, এবং এমন কি, যে সকল হোমিওপ্যাথ তাঁহাদের অনুকরণে "প্যাথলজী" অনুসারে চিকিৎসা করেন বলিয়া গর্ব্ব করেন, তাঁহারাও তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক কিছু করেন না, তবে হোমিওপ্যাথিক বাক্স হইতে ঔষধ দেন এই পর্য্যন্ত বিভিন্নতা।

পীড়া—স্বাভাবিক ও কৃত্রিম।

এই বিষয়টী পাঠ আরম্ভ করিবামাত্রই লোকে মনে করিবে,—"পীড়া ত সবই স্বাভাবিক,—পীড়া কি কখনও কৃত্রিম হইতে পারে?" অথচ প্রকৃত কথা বলিতে হইলে, আজকালের সমাজে আমাদের মধ্যে শতকরা নব্বইটী ক্ষেত্রে কৃত্রিম পীড়া, বাকি দশটী পীড়া স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। একথা শুনিলে অবশ্য অনেকেরই মনে সন্দেহ আসিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা ঠিক তাহাই,—ইহার মধ্যে একটুকুও অতিরঞ্জিত নাই। আমি সেদিন একটী হৃদ্‌রোগাক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসার্থ আহূত হইলাম এবং রোগীর ইতিহাস হইতে জানিলাম যে, গত দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার শরীরের সন্ধিস্থলগুলিতে অতিশয় যন্ত্রণাপূর্ণ বাতরোগ হইয়াছিল,—কোনও একজন কৃতবিদ্য এলোপ্যাথিক চিকিৎসক তাঁহাকে চিকিৎসা করিয়া ৮।১০ দিনের মধ্যে আশ্চর্য্যজনকরূপে আরোগ্য করেন। তিনি স্বেদ, মালিস ও আভ্যন্তর ঔষধও প্রয়োগ করেন। ফলতঃ যদিও বাতরোগটী আরোগ্য হইল, কিন্তু তাহার ২।৩ মাস পরে হইতেই তাঁহার হৃদ্‌প্রদেশে নানা যন্ত্রণা, অতিরিক্ত স্পন্দন, বিশেষতঃ মানসিক উৎকণ্ঠা ও ভীতি ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দিতে থাকিল। উক্ত এলোপ্যাথিক চিকিৎসককে পুনরায় চিকিৎসার্থ আনা হইয়াছিল, তিনি কহিলেন—"Trachy-cardia হইয়াছে, ইহার চিকিৎসা কিছুই নাই, পুষ্টিকর খাদ্য এবং বায়ু পরিবর্ত্তনই একমাত্র ব্যবস্থা। আর ভয় ও উৎকণ্ঠা ইত্যাদি কেবল মানসিক দুর্ব্বলতা ব্যতীত কিছুই নয়,—এ সকলকে রোগ বলিতে পারা যায় না, আপনারা রোগীকে খুব সাহস দিবেন।" আমরা রোগীর লক্ষণাদি সংগ্রহ করিলাম, ইতিহাসাদিও লিপিবদ্ধ করিলাম এবং রোগীকে ও রোগীর আত্মীয়স্বজনকে কহিলাম যে, "পূর্ব্বতন

বাতরোগটী "চাপা দেওয়ার" ফলে এই প্রকার অবস্থা ঘটিয়াছে, —আমরা ঔষধ প্রয়োগ করিবার পর যদি ঐ বাতরোগটী পুনঃ প্রকাশিত হয়, তবেই এ রোগী আরোগ্য হইবে নতুবা কোনও উপায় নাই।" তাঁহারা অন্যোপায় হইয়া, যদিও বিশেষ অনিচ্ছাসত্ত্বে, আমাদের চিকিৎসা আরম্ভ করিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু আমাদের আরোগ্যনীতি বিষয়ে তাঁহাদের মনের সন্দেহ গেল না। যাহা হউক, ঔষধ প্রয়োগ করিবার দুই মাসের মধ্যেই ধীরে ধীরে পূর্ব্বপীড়াটী উদয় হইল এবং তাহার সঙ্গেই হৃদ্‌বেদনাদির উপশম দেখা দিল। যদিও পুনরানীত বাতপীড়াটী আরোগ্য করিতে আমাদিগকে বড়ই বেগ পাইতে হইয়াছিল, কিন্তু এ বিষয়ের সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক নাই। এ স্থলে মন্তব্য বিষয় এই যে, এই রোগীর হৃদ্‌রোগটী স্বাভাবিক নহে,—উহা কৃত্রিম এবং কেবলমাত্র অচিকিৎসার ফলে ইহার উদয় হইয়াছিল।

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার নয়নচাঁদ দত্তের লেনের একটী ৪ বৎসর বয়স্ক বালকের চর্ম্মপীড়া চাপা দেওয়ার ফলে এরূপভাবে গলক্ষত ও টন্‌সিল প্রদাহ আরম্ভ হইয়াছিল যে, বালকটীর জীবনরক্ষা হওয়া সুকঠিন হইয়া উঠে। রোগীর বাড়ীর লোকে জানিতেন না যে, বর্ত্তমান পীড়ার কারণ কি, এবং আমাদিকেও চর্ম্মপীড়া চিকিৎসার বিষয় পরিচয় দেওয়া হয় নাই, কেন না পরিচয় দেওয়া যে একান্ত আবশ্যক বা উহার সহিত বর্ত্তমান পীড়ার কোনও কার্য্যাকারণ সম্বন্ধ আছে, ইহা তাঁহারা কেহই অনুভব করেন নাই। তাঁহাদের ধারণা এই যে, পূর্ব্বে যে পীড়া হইয়াছিল তাহা ত আরোগ্য হইয়াছে, আবার বর্ত্তমান যে পীড়া হইয়াছে, তাহা আরোগ্য করিতে হইবে। যাহা হউক, শীতকাতরতা, বিমর্ষভাব স্থানীয় হ্রাসবৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণসমষ্টির সাহায্যে, **সোরিণাম** ৫০০ শক্তি একমাত্রা প্রয়োগে গলপীড়া উপশমিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বালকটীর সর্ব্বাঙ্গে চর্ম্মপীড়া দেখা

দিল। তখন উভয় পক্ষের প্রতীয়মান হইল যে, চর্ম্মপীড়ার অচিকিৎসা জন্যই এই বর্ত্তমান পীড়ার উৎপত্তি। চর্ম্মপীড়াটী আরোগ্যের জন্য ২।১ মাত্রা **মার্কসল** ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, বর্ত্তমান পীড়াটী কৃত্রিম পীড়া ব্যতীত কি বলা হইবে ?

এই প্রকার উদাহরণ প্রত্যেক সুধী চিকিৎসক শত শত, সহস্র সহস্র দিতে পারেন। হোমিওপ্যাথির আদিগুরু রাশি রাশি উদাহরণ ও প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এ সকল সত্য চিকিৎসকমণ্ডলীর মধ্যেই নিবদ্ধ আছে। সকল চিকিৎসকই যে ইহাতে পূর্ণ বিশ্বাসবান, একথা বলিতে সাহস করি না, তবে হোমিওপ্যাথিতে যাঁহারা পূর্ণ বিশ্বাস করেন এবং প্রকৃত বিজ্ঞানপথে চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ইহার মর্ম্ম অবগত আছেন। কিন্তু সেরূপ চিকিৎসক কয়টী? এ প্রকার চিকিৎসক—"কোটীতে গুটিক মিলে।" ফলতঃ এ সত্য লোক সমাজে পর্য্যন্ত প্রচার চাই, প্রত্যেক ব্যক্তির মনে এ সকল সত্য বদ্ধমূল হইয়া থাকা চাই,—তবেই তাঁহারা নিজ নিজ গৃহস্থের কাহারও পীড়াকালে তদনুসারে চিকিৎসা অবলম্বন করিতে সমর্থ হইতে পারেন।

স্বাভাবিক ব্যাধি কয়টী? আহার বিহারাদির নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে কখনও অজীর্ণ, কখনও সামান্য জ্বরবোধ, কখনও শিরঃপীড়া ইত্যাদি সাধারণ ব্যাধি হইয়া থাকে ; সে অবস্থায় উপবাস, স্নানবন্ধ ইত্যাদির দ্বারা শরীরটীকে শুদ্ধ করিলেই প্রায়ই ঐ সকল অস্বস্থি চলিয়া যায়। সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়পথে বিচরণকারীদিগের কতকগুলি কঠিন ও দুষ্ট জাতির পীড়া হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু সেগুলিও যদি যথাসময়ে আরোগ্য করিবার চেষ্টা করা হয় ও ভবিষ্যতে নিজেদের আচরণ বিশুদ্ধ ও সংযত করা হয়, তবে ঐ সকল দুষ্ট ব্যাধিও অচিরে আরোগ্য হইতে পারে। এই প্রকার হিসাব করিলে দেখা যায় যে যেখানে ব্যাধি, সেখানেই তৎপশ্চাতে নিয়ম লঙ্ঘনরূপ

অন্যায় আচরণ থাকেই থাকে এবং সেই ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে বর্ত্তমানে আরোগ্যনীতি ও ভবিষ্যতে সংযমাদি অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আজি সে প্রথা অবলম্বিত হয় না,—ব্যাধির কারণ ও ব্যাধি নিরাকৃত হয় না, বরং ব্যাধিলক্ষণগুলিকে জোর করিয়া চাপা দেওয়া হয় ও ব্যাধির কারণ হিসাবে নিয়মলঙ্ঘন ও অসংযমাদির প্রতি আদৌ লক্ষ করা হয় না,—তাহারই ফলে নানারূপ ব্যাধি-শঙ্কর উপস্থিত হইয়াছে,—ফলতঃ সেগুলি কেহই ব্যাধি অর্থাৎ স্বাভাবিক ব্যাধি নহে, সেগুলি কৃত্রিম ব্যাধি।

আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে চিরদিনই বায়ুপিত্ত প্রকুপিত হইয়া লোকের জ্বর পীড়া হইত, এখনও হয়। পূর্ব্বে প্রত্যেক ক্ষেত্রে উপবাস, লঙ্ঘনাদির দ্বারা শরীরের আমরস শুষ্ক হইয়া যাইবার পর আবশ্যক মত সামান্য পাচনাদি ব্যবহার করিলেই শরীর নির্ম্মল হইত। সম্প্রতি তৎবিপরীত প্রথা অবলম্বিত হইয়া থাকে। পান ভোজন ও পরিচ্ছদাদির বিষয়ে সমাজে যেরূপ বিলাস আসিয়াছে,—রোগ ও চিকিৎসা বিষয়েও সেইরূপ বিলাস দেখা দিয়াছে। যে ব্যক্তির পীড়া হইয়াছে, তাহাকে **নিদান** ত্যাগ অবশ্যই করিতে হইবে, অর্থাৎ যে কারণে পীড়া হইয়াছে, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে। যথা, রাত্রিজাগরণ বা সন্তরণ জন্য যদি শরীরটী বিনষ্ট হইয়া থাকে, তবে সর্ব্বাদৌ রাত্রিজাগরণ বা সন্তরণ বন্ধ করিতে হইবে, নতুবা নিদানত্যাগ না করিয়া ব্যাধিলক্ষণগুলিকে জোর করিয়া কোনও উগ্রবীর্য্য ঔষধবিষ দ্বারা অপসারিত করিলে, তাহার ফলে আরও দুষ্টতর ব্যাধি আক্রমণ করিবে, ইহা অতি সহজ জ্ঞানের দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়। তখনও প্রকৃত উপায় অবলম্বন করিলে অনেক সুবিধা হয়,—কিন্তু তাহাও হয় না,—কাজেই সমাজের আজ এই অবস্থা। নানা নামের, নানা লক্ষণের, নানা প্রকারের অতিশয় জটীল ব্যাধিসমূহ দেখা দিতেছে ও বর্দ্ধিষ্ণু বংশগুলিকেও ক্রমে নির্ব্বংশ করিতেছে। শরৎকালে

চিরদিনই জ্বর হইয়া থাকে, আজকালও হয়, কিন্তু তাহার চিকিৎসা না করিয়া জোর করিয়া কুইনাইন ব্যবহৃত হইল,—রোগী উপবাস দিবে না, কোনও কষ্ট সহ্য করিবে না। আহার, বিহার, চাকুরী, আনন্দ উপভোগ প্রভৃতির কোনওটীর সামান্য অঙ্গহানি হইবার উপায় নাই, শীঘ্রই জ্বরটী বন্ধ করিতেই হইবে,—ইঞ্জেক্সন দ্বারা একদিনের মধ্যেই তাহাই হয়। তাহার ফলে শরীরের মধ্যে কি একটী তুমুল আন্দোলন ও প্রবল ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া যায়, তাহা লোকলোচনের একান্ত অন্তরালে,—কাজেই কে আর দেখে বা কে আর অনুভব করে? এই প্রকার প্রতীকার চলিতে চলিতে দেহের যন্ত্রাদির **কার্য্যগত ও আকারগত** পরিবর্ত্তন আসিয়া জোটে, নিত্য সামান্য সামান্য জ্বর হইতে থাকে, তখন তাহার নামকরণ হয়—কালাজ্বর; আবার ঐ প্রকারই প্রতীকার,—তাহার পর কাহারও উদরী ও শোথ, কাহারও বক্ষোযন্ত্র আক্রান্ত হইয়া যক্ষ্মা বা ক্ষয়কাশের আবির্ভাব হয়। এ অবস্থায় যখন আর "চাপা দিবার" আদৌ কোনও উপায় থাকে না, তখন "চেঞ্জে" যাইবার পরামর্শ স্থির হয় এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই শেষ যবনিকা পতন হয়। যবনিকা পতনের পর আত্মীয়, গৃহস্থ ও প্রতিবেশীগণ কহিবে— "অনেক করা গেল, বড় বড় বিলাত ফেরত ডাক্তার দেখান হইল, আর কি করা যাইবে,—যাহার পরমায়ূ নাই, তাহার আর কি চিকিৎসা হইবে? ইত্যাদি।" কিন্তু যে ব্যক্তির আজি মৃত্যু ঘটিল, তাহার জীবনের পূর্ব্বাপর সমস্ত ব্যাধি ও চিকিৎসার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, একদিনের জন্যও তাহার চিকিৎসা হয় নাই, কেবল "জবরদস্তি", কেবল "জোর করিয়া চাপা", কেবল বড় বড় রোগের নামোচ্চারণ এবং বড় বড় ঔষধবিষ প্রয়োগের দ্বারা চিকিৎসার ঠিক বিপরীত পন্থা অর্থাৎ যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় ও মৃত্যু নিকটস্থ হয় তাহারই ব্যবস্থা করা হইয়াছে! সামান্য পর্য্যালোচনা করিলে অতি স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিও বুঝিতে পারিবে যে, সর্ব্বপ্রথমে

ঐ ব্যক্তির হয়ত স্বাভাবিক ব্যাধি হইয়াছিল কিন্তু তাহার পর হইতে ক্রমিক "চিকিৎসাজনিত ব্যাধি ও জটিলতা" চলিতে চলিতে শেষে জীবনীশক্তি সংগ্রামে পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। কি শোচনীয় অবস্থা, বিলাসের কি ভয়াবহ পরিণাম!

এ সকল কথা কে শোনে? লোকে অনায়াসেই বলিয়া বসে—"মহাশয়, এত বড় বড় হাঁসপাতাল, এত বড় বড় ডাক্তার, কোটী কোটী টাকার ঔষধ প্রতি বৎসরই চিকিৎসার জন্য বিদেশ হইতে সরবরাহ হইতেছে, কত প্রকার অদ্ভূত ও সুকৌশলপরিপূর্ণ যন্ত্রাদির আবিষ্কার ও ব্যবহার, এত উচ্চ উচ্চ উপাধিধারী চিকিৎসক,—ইহাদের সকলই মিথ্যা ও অনিষ্টজনক, আর আপনার কথাই সত্য?" বাস্তবিক কথা, ইহার উত্তর নাই। **চাকচিক্যে মন যত প্রলুব্ধ হয়, সত্যে তত হয় না, হইতে পারে না।** মায়ার অর্থাৎ মিথ্যার মহীয়সী শক্তি,—সত্য তাহার নিকট দাঁড়াইতে পারে না। একদিকে কত আড়ম্বর, অন্যদিকে একেবারে আড়ম্বরশূন্য সত্য; একদিকে স্থূলের কত শব্দ, কত বাদন, কত ঝন্‌ঝনা, অন্যদিকে নিরবলম্বন সূক্ষ্ম,—সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম, কাজেই সকলকে বুঝান যায় না। তবে ফলাফল দেখিয়া যদি একের ত্যাগ ও অন্যের গ্রহণ, কখনও সম্ভব হইতে পারে, তবেই কল্যাণ, নতুবা একান্ত ধ্বংসের পথটী প্রশস্ত ও উন্মুক্ত রহিয়াছে,—নিস্তার নাই!

সূক্ষ্ম ব্যাপার হইলেও স্থূলের সাহায্যে অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। যদি মল মূত্রাদির বেগ ধারণ করা যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গেই একটী মহান্ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহা সকলেই দেখেন। কাহারও হাম, বসন্তাদি উদ্ভেদযুক্ত পীড়া হইয়াছে,—এ অবস্থায় সকলেই বলিবেন—"যাহাতে গুটীগুলি, উদ্ভেদগুলি **বাহির** হয়, তাহাই কর, কেননা সেগুলি **বাহির হইলেই** রোগীর পক্ষে কল্যাণ হইয়া থাকে, ইহা সকলেই জানেন এবং

যদি বাহির না হইয়া ভিতরে পুনঃ প্রবিষ্ট হইয়া যায়, তবে রোগীর পক্ষে বিপত্তি, এমন কি, অনেক সময় রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে,—ইহা সকলেই জানেন, সকলেই বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রকৃতির মঙ্গলময় বিধান অনুসারে, রোগীর **ভিতর হইতে বাহিরের দিকে একটী স্রোত বা গতি** থাকে, সেই **গতির বশে** যাহা ঘটে, তাহা ঘটিতে দিলেই রোগীর কল্যাণ এবং **তৎবীপরীতে** রোগীর অনিষ্ট হইয়া থাকে। যদি ইহা সকলেই অবগত থাকেন, তবে কোনও রোগীর, রোগ-লক্ষণকে জোর করিয়া "চাপা দেওয়ার" অর্থাৎ ঐ মঙ্গলময়ী গতিটীকে বিপরীত পথে চালিত করিবার ফলে যে অনিষ্ট, যে অকল্যাণ ঘটিতে পারে বা ঘটিয়া থাকে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবার ত কোনও কারণ দেখা যায় না। প্রত্যেক **রোগের গতি বাহির হইতে ভিতরে,** এবং প্রত্যেক **আরোগ্যের গতি, ভিতর হইতে বাহিরে,**—ইহা সকলেই জানেন,—অথচ কার্য্যকালে বিপরীত পথ অবলম্বন করিলে যে অনিষ্ট হইবে, ইহা না জানার হেতু কি? এত সরল ও পরিস্ফুট সত্য যে কেহ না বুঝেন, একথা মনে করা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অমনোযোগ এবং আড়ম্বরের চাকচিক্যে মুগ্ধ হওয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু এ বিষয়ে আলস্য ও মোহ কি ভীষণ অনিষ্টজনক, তাহা কি একবার চিন্তা করিবারও অবসর হয় নাই?

কোনও একটী ব্যক্তির ১৯২৭ সালের মে মাসে দক্ষিণ দিকে নিউমোনিয়া পীড়া হয়,—লোকের ধারণা যে, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড্ ইত্যাদি পীড়ায় এলোপ্যাথিক "ঘটা" জনক চিকিৎসা না হইলে কখনও রোগী আরোগ্য হয় না এবং এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার এলোপ্যাথিক চিকিৎসা হইয়াছিল। ৩১ দিন "পীড়া ও চিকিৎসা ভোগের পর" তিনি অন্নপথ্য পান, কিন্তু তাহার পর হইতে তাঁহার জীবন অসহনীয় হইয়া উঠিল। যেখানে

নিউমোনিয়া আক্রমণ হইয়াছিল সেখানে একটা "খিচ্‌খিচানি" বেদনা রহিয়া গিয়াছিল। সামান্য ঠাণ্ডার দিনে উহা বৃদ্ধি পাইত, সামান্য কোনও জিনিস দক্ষিণ হস্তে তুলিলে ঐ স্থানে বেদনা হইত, এমন কি, রোগীর মনটী সর্ব্বদা ঐখানেই থাকিত। স্নান ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিল, সামান্য ঠাণ্ডাও অসহ্য হইল, রাত্রে প্রত্যেক দরজা ও জানালার ছোট ছোট ফাঁকগুলি কাগজ ও ন্যাক্‌ড়া দিয়া বন্ধ না করিয়া শুইলে প্রাতঃকালে ঐ বেদনা বাড়িত ও অঙ্গোবেদনা এবং কাশি হইত। কিছুদিন পরেই প্রত্যেক সন্ধ্যায় সামান্য সামান্য জর এবং ভোরের সময় শুষ্ক কাশি ও ঘর্ম্ম আরম্ভ হইল, তখন রোগীর মনে ভয় সঞ্চার হওয়ায় পূর্ব্ব চিকিৎসকের নিকট উপস্থিত হইলেন। চিকিৎসক মহাশয় কেবল মাত্র কড্‌লিভার অয়েল ব্যবস্থা করিলেন ও অবিলম্বে "চেঞ্জে" যাইবার উপদেশ দিলেন। ফলতঃ এক ডজন কড্‌লিভার অয়েল এবং ৬ মাস "চেঞ্জে" থাকিয়াও কোনও ফল ত হইলই না,—বরং নিশিঘর্ম্ম, শুষ্ক কাশি, হৃৎপ্রদেশে বেদনা, জর ও শীর্ণতার নিতান্ত বৃদ্ধি পাইল, তখন অগত্যা বাড়ী আসিয়া কলিকাতার কোনও কৃতবিদ্য ও সুবিজ্ঞ হোমিওপ্যাথের নিকটে চিকিৎসাবলম্বন করিয়াছেন এবং কতকটা ভাল আছেন। রোগী নিজে ও চিকিৎসক মহাশয় এখনও আরোগ্য বিষয়ে নিশ্চিত হইতে পারেন নাই। ফলতঃ যে ঔষধ নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তাহা আমরা জানি, তাহা **কেলি কার্ব্ব** এবং বলিতে পারি যে, যেদিন তাঁহার প্রথম নিউমোনিয়া হইয়াছিল সেদিনেও ঐ কেলি কার্ব্বেরই লক্ষণ সকল বর্ত্তমান ছিল। তখন উহা ব্যবহৃত হইলে ১০।১২ দিনের মধ্যেই রোগী নির্ম্মূল আরোগ্য হইতে পারিতেন। এক্ষণে, যদি রোগীর জীবনীশক্তি নিতান্ত নষ্ট হইয়া গিয়া না থাকে, তবে ভগবৎকৃপায় তিনি আরোগ্য হইতে পারেন। এই ক্ষেত্র এবং এই প্রকার শত শত ক্ষেত্র পর্য্যালোচনা করিয়াও লোকে যদি "চাপা দেওয়ার" কুফল না বুঝিতে পারে, তবে আর কিসে

বুঝিবে জানি না। গতানুগতিক ভাবে চলিলে আর চলিবে না, ধ্বংসের আর বিলম্ব নাই। অকালমৃত্যু, শিশুমৃত্যু, গর্ভিণী মৃত্যুর কারণ ও প্রতীকার সভাসমিতির দ্বারা হইবে না, অন্য পথেও হইবে না,—যথেষ্ট সংযম ও চিকিৎসার পরিবর্ত্তন না করিলে উপায়ান্তর নাই। **স্বাভাবিক ব্যাধি শতকরা ১০টী, চিকিৎসাজনিত ব্যাধি শতকরা ৯০টী,** এ কথা মনে রাখিতে হইবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা এই সত্যের প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইবে এবং তদনুসারে অনুকূল পথে চলিতে হইবে। চিকিৎসায় মিথ্যাপথ, চিকিৎসাবিষয়ে বিলাস ও গতানুগতিকতা ত্যাগ করিতে হইবে। আমাদের বহুদিনের পর্য্যবেক্ষণ, ভূয়োদর্শন ও চিকিৎসা-কার্য্যের ফলে যে সত্য সন্দর্শন করিয়াছি, তাহা অবহেলা বা অবজ্ঞা করিলে আমাদের কোনও ক্ষতি হইবে না,—প্রত্যুত নিজেদেরই ঘোর অনিষ্ট হইবে।

পীড়ার কারণ,—উত্তেজক ও সুপ্ত।

যাহাকে আমরা সাধারণ ভাষায় "পীড়া" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি, তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে "পীড়া" নয়,—তাহা "পীড়ার ফল"। "পীড়া" শব্দের প্রকৃত অর্থ,—জীবনীশক্তির বিশৃঙ্খলা, অর্থাৎ জীবনীশক্তি স্বাভাবিক ভাবে কার্য্য করিতে না পারায়, শরীরের মধ্যে নানা অস্বস্থির আবির্ভাব হয়,—কাহারও এরূপ কতকগুলি লক্ষণ হয়, যাহাদের সমষ্টিগত নাম দেওয়া হয়,—"নিউমোনিয়া", কাহারও এরূপ কতকগুলি লক্ষণ উদয় হয়, যাহাদের সমষ্টিগত নাম, "জ্বর-বিকার", ইত্যাদি। এক্ষণে ঐ ঐ নামের পীড়াগুলিকে

সাধারণ ভাষায় পীড়া, অমুক পীড়া, অমুক নামের পীড়া, ইত্যাদি হিসাবে অভিহিত করা হইলেও, সেগুলি কেহই পীড়া নহে, তাহাদের প্রত্যেকটীই পীড়া-**ফল** বলিয়া জানিতে হইবে। সুতরাং চিকিৎসার বিষয়,—ঐ ঐ নামের পীড়া নয়,—চিকিৎসার বিষয় ঐ বিশৃঙ্খলা, যেটী প্রকৃত প্রস্তাবে পীড়া। এক্ষণে, ঐ বিশৃঙ্খলাটীই চিকিৎসার বিষয় হইলেও কি প্রকারে তাহার চিকিৎসা করিতে হয়? চিকিৎসা করিবার প্রণালী এই যে, যে রোগীর চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক আহূত হন, তিনি ঐ রোগীতে বিকাশ-প্রাপ্ত লক্ষণসমষ্টি এবং ঐ ঐ লক্ষণের হ্রাসবৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা, ইত্যাদির সমলক্ষণে একটী ঔষধ নির্ব্বাচিত করিয়া প্রয়োগ করিবেন। ইহাই চিকিৎসা এবং যিনি তাহা করিতে সমর্থ, তিনিই প্রকৃত চিকিৎসক।

যাহা হউক, আমরা সদা সর্ব্বদাই তরুণ জাতীয় পীড়া, অর্থাৎ নিউমোনিয়া, সর্দ্দি কাশি, সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্বর, মস্তিষ্কবিকার, উদরাময়, ইত্যাদি নামের পীড়ার চিকিৎসা জন্য আহূত হইয়া গৃহস্থের নিকট জানিতে পারি—"অতিরিক্ত সাঁতার দেওয়ার ফলে, নিউমোনিয়া হইয়াছে", অথবা, "উপযুক্ত পুত্রটীর অকাল মৃত্যুর সংবাদ পাইবার ফলে, মস্তিষ্কবিকার হইয়াছে", অথবা "অতিরিক্ত ভোজনের ফলে, উদরাময় হইয়াছে", ইত্যাদি; অর্থাৎ প্রত্যেক **তরুণ** জাতীয় পীড়ার আবির্ভাবের পশ্চাতে যেন একটী করিয়া **উত্তেজক** কারণ থাকেই থাকে, ইহাই দেখা যায় এবং সাধারণ লোকের ধারণাও তাহাই। ফলতঃ যে ব্যক্তির অতিরিক্ত সন্তরণ জন্য নিউমোনিয়া হইয়াছে বলিয়া তাহার বা গৃহস্থের ধারণা, সেই সন্তরণকারীর ৫।৬ জন সঙ্গী, যাহারা তাহার সঙ্গেই ততক্ষণ বা তাহাপেক্ষাও আরও অধিক সময় ধরিয়া সন্তরণ করা সত্ত্বেও কেন নিউমোনিয়া বা অন্য কোনও পীড়ার দ্বারাই আক্রান্ত হইল না, তাহার কারণ কেহই অনুসন্ধান করে না। একই উত্তেজক কারণ এক ব্যক্তির পক্ষে পীড়াজনক হইল, অন্যের পক্ষে হইল

না কেন,—অথবা একই উত্তেজক কারণে একজনের জ্বর এবং অন্য জনের মাত্র শিরঃপীড়া, অন্য ব্যক্তির উদরাময়, ইত্যাদি বিভিন্ন নামের ও বিভিন্ন লক্ষণের পীড়া উদয় কেন হয়, তাহা কেহ অনুসন্ধান করে না। ফলতঃ ইহা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ যে, **উত্তেজক কারণের পশ্চাতে প্রকৃত কারণ হিসাবে কোনও কিছু থাকে** এবং বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন ভাবে থাকে, যাহার জন্য ঐ প্রকার পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

কোনও একটী শিশু জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই ভ্রূণ অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কোনটী বা জন্মান্ধ কেহ বা ৫ম বর্ষ পর্য্যন্ত সুস্থ থাকিয়া নানা পীড়া বিকাশ করে, কেহ বা পূর্ণ মাত্রায় সুস্থবৎ প্রতীয়মান হইয়া ১৮শ বা ২০তি বৎসর বয়ঃক্রমে ভীষণ রাজযক্ষ্মা পীড়ায় মানবলীলা সম্বরণ করে, আবার কেহ বা সর্ব্ববিষয়ে উন্নতির শিখরদেশে আরোহণ করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র, দেবোপম গুরুদাস, লোকোত্তরচরিত্র বিবেকানন্দ, প্রভৃতি রূপে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধনান্তে, জগতের উপর চিরদিনের জন্য এরূপ একটী করিয়া সুগভীর রেখাপাত করিয়া যান যে, অনেক শতাব্দী ধরিয়া লোকে স্মরণ রাখে যে, "একটী মানুষের মত মানুষ জন্মিয়াছিল।" ফলতঃ এ সকল বিভিন্নতার পশ্চাতে কি প্রকৃত কারণ নাই? এ প্রকার জীবন্ত পার্থক্য কি কখনও পারিপার্শ্বিক বিভিন্নতা বা উত্তেজক কারণ সমূহের প্রভাবে আবির্ভূত হইবার আশা স্বপ্নেও পোষণ করিতে পারা যায়? যদি সেরূপ আশা কেহ পোষণ করেন, তবে তাহাকে সম্পূর্ণ অদূরদর্শী বা বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যতীত অন্য কিছু বলিতে পারা যায় না। উত্তেজক কারণ বা পারিপার্শ্বিকতার দ্বারা প্রকৃত কারণের ফলপ্রাপ্তির পথে বা বীজের অঙ্কুরোদ্গম শাখা প্রশাখা বিস্তারের পথে সাহায্য হইতে পারে, এই পর্য্যন্ত; ফলতঃ প্রকৃত কারণ বা বীজ অত্যাবশ্যক, নতুবা অভিব্যক্তি

কাহার হইবে ? উদ্যানস্থ রোপিত নানা বীজের বৃক্ষোদ্গমের পক্ষে, জল, বায়ু, রৌদ্র ইত্যাদি একান্ত আবশ্যক, সেই প্রকার মানবদেহস্থ প্রকৃত কারণ সমূহের অভিব্যক্তির পক্ষে উত্তেজক কারণও অত্যাবশ্যক ; কিন্তু যেমন বীজ ব্যতীত বৃক্ষোদ্গম অসম্ভব, তেমনি প্রকৃত কারণ, মানবদেহের মধ্যে অন্তর্নিহিত না থাকিলে, উত্তেজক কারণ সমূহ নিতান্তই নিরর্থক ও শক্তিহীন।

এ অবস্থায়, যে ব্যক্তি কেবল উত্তেজক কারণ সমূহ হইতে সাবধানতা অবলম্বন করিয়া ব্যাধির হাত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্তির আশা করেন, তিনি নিতান্তই ভ্রান্ত ; এবং যে চিকিৎসক রোগীকেও সেই প্রকার উপদেশ প্রদান করেন, তিনি তদপেক্ষা আরও অধিক ভ্রান্ত,—এমন কি, চিকিৎসক পদবাচ্যই নহেন। যাহা হউক, উত্তেজক কারণ হইতে সোরাদি দোষের দ্বারা যে সকল ব্যাধি-লক্ষণ মধ্যে মধ্যে মানবদেহে দেখা দিয়া থাকে, সেগুলিরও যদি প্রকৃত চিকিৎসা হইত, তাহা হইলেও অনেক কল্যাণ হইত, অর্থাৎ বার বার ঐ সকল তরুণ পীড়াগুলির চিকিৎসাব্যপদেশে, আসল বা প্রকৃত কারণের সন্ধান ও তাহার সাক্ষাৎ নিদর্শন প্রাপ্তির পক্ষে সাহায্য হইত, কিন্তু হায়, তাহাও হয় না। প্রতিশ্যায় (Hay fever) একটী তরুণ জাতির পীড়া না হইলেও, যদি উহাকে একটা তরুণ পীড়া মনে করিয়াও যাবতীয় সম্যবিকাশপ্রাপ্ত লক্ষণগুলির সমষ্টিতে ঔষধ নির্ব্বাচন হইত, তাহা হইলেও ঐ প্রতিশ্যায় পীড়াটীর বার বার আবির্ভাবের সাহায্যে চিকিৎসক অতি অবশ্যই বুঝিতে পারিতেন যে, ইহা কখনও তরুণ পীড়া নয়, কেননা প্রতিবার আরোগ্য করা হইলেও সেটী বার বার আবির্ভাব হইতেছে কেন ?—এই সন্দেহটী চিকিৎসকের মনে অবশ্যই জাগিতে পারিত। কিন্তু তাহা না হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে চাপা দিবারই ব্যবস্থা

হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে যে বিষময় ফল উৎপাদিত হইতেছে, তাহা নিত্য নিত্য সকলেই অবলোকন করিতেছেন, কিন্তু তবুও মোহঘোর ভাঙ্গিতেছে না। জানি না, এই মোহঘোর হইতে আমার দেশ কখনও জাগরিত হইয়া আত্মসম্বিৎ প্রাপ্ত হইবে কি না।

যাহা হউক, প্রকৃত হোমিও-মন্ত্রে দীক্ষিত আমাদের চিকিৎসক ভ্রাতাদিগের সমীপে আমার সবিনয় ও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যেন আপাত-মনোরম সুখ্যাতি প্রাপ্তির আশায় কেবলমাত্র **উত্তেজক** কারণের উপরেই পূর্ণ মনোযোগ দিয়া **প্রকৃত** কারণসমূহকে অগ্রাহ্য না করেন। কেননা তাহাতে তাঁহারা সমাজের পূর্ণ কল্যাণসাধনে সক্ষম হইবেন না। উপরের বিকাশপ্রাপ্ত তরুণ লক্ষণসমষ্টির পশ্চাতে যে গভীর দোষ বা দোষগুলির অবস্থিতি রহিয়াছে, তাহার বা তাহাদের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ রাখিয়া চিকিৎসা করাই প্রকৃত চিকিৎসা। আমার চিকিৎসার অন্তর্গত সোরা ও সাইকোসিস্-দুষ্ট একটী রোগীর চিকিৎসায় প্রথম এক বৎসরের মধ্যে তাহার কি ভীষণ যাতনা ও কষ্ট আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা দেখিলে চক্ষে প্রকৃতই জল আসে। ৫।৬ মাস চিকিৎসার পর যখন তাহার **দুষ্ট-গণোরিয়া** স্রাবটী **পুনঃ প্রতিষ্ঠিত** হইল তখন দারুণ জ্বালা ও যন্ত্রণার জন্য কি ভীষণ চীৎকার,—এমন কি, তাহার মুখ হইতে আমার প্রতি অভিশাপও বর্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু আমি তাহাতে ক্ষুব্ধ হই নাই, কেননা আমি মনে-প্রাণে জানিতাম যে, এত যন্ত্রণার পশ্চাতে তাহার যে মহান্ কল্যাণ রহিয়াছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই আমি তাহার এ সকল কষ্টের কারণস্বরূপ হইয়াছি, সুতরাং আমি ঐ রোগীর চক্ষে বা সাধারণের চক্ষে নিষ্ঠুর বলিয়া প্রতিভাত হইলেও ভগবানের নিকট আশীর্ব্বাদযোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পীড়ার কারণ,—
মুখ্য ও গৌণ, সুপ্ত ও উত্তেজক।

এস্থলে "পীড়া" অর্থে যে, কোনও নামের পীড়া, যথা, নিউমোনিয়া, জ্বর, রক্তামাশয়, অম্লশূল ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। হোমিওপ্যাথিতে "পীড়া" শব্দে—জীবনীশক্তির বিশৃঙ্খলা, এ অর্থে এখানে পীড়া শব্দটী ব্যবহৃত হইতেছে না, পরন্তু নানা নামের, নানা যন্ত্রে বিকাশপ্রাপ্ত, নানা লক্ষণের যে সকল পীড়া, সমাজের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে "পীড়া" অর্থে, বুঝিতে হইবে।

যে সকল পীড়া আমরা সাধারণতঃ দেখিয়া থাকি এবং রোগীগণ যে সকল পীড়া চিকিৎসার্থ আমাদের নিকট আসিয়া থাকেন, সেই সকল পীড়ার প্রত্যেকটীরই কারণ কি, এ প্রশ্ন প্রায়ই সকলেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, রোগীগণ ঐ কারণটী জানিতে পারিলেই যেন অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া থাকেন। "এ জ্বর আপনার কিছু নয়, ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বরটী হইয়াছে", বলিলেই তাঁহার হৃদয়ে অনেকটা শান্তি আসে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই কারণ নির্দ্দেশটী সকল সময়ে প্রকৃতভাবে হয় না। পীড়ার কারণ, প্রকৃত কারণ ও সাম্প্রত কারণ, অথবা মুখ্য ও গৌণ, অথবা সুপ্ত ও উত্তেজক, এই দুই প্রকার কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে অনেকেই অনুধাবন করেন না। এলোপ্যাথিক চিকিৎসক মহাশয়গণ যেটীকে সম্মুখে প্রাপ্ত হন, সেটীকেই কারণ বলিয়া অবধারণ করিয়া থাকেন। "গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সাঁতার কাটিয়াছেন, এইজন্যই আপনার নিউমোনিয়া," হইয়াছে ইহাই কহিবেন, কিন্তু আরও অনেক লোক ত সাঁতার কাটিয়াছে,

তাহাদের এ পীড়া বা অন্য পীড়া হইল না কেন? অথবা যদিই বা অন্য ২।১ জনের ঐ সন্তরণের ফলে পীড়া হইয়াছে, তবে একজনের কেবল জ্বর, আর এক জনের কেবল ভীষণ সর্দ্দি এবং এ ব্যক্তির জ্বর সহ নিউমোনিয়া হইল কেন? **একই কারণে** বিভিন্ন ফলের আবির্ভাব কি প্রকারে হয়? এ সকল বিষয় যে আদৌ চিন্তনীয়, তাহাও তাঁহারা মনে করেন না। পরন্তু, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন যে, এই প্রকার বিভিন্নতার মূলে নিশ্চয়ই কোন গূঢ় রহস্য আছে, তবে সে রহস্যটী মানব চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত, এই পর্য্যন্ত।

প্রত্যেক পীড়ার দুইটী করিয়া কারণ থাকে, একটী **প্রকৃত** ও **সূক্ষ্ম** বা **আভ্যন্তর**, অন্যটী **উত্তেজক** ও **স্থূল** বা বাহ্য। যেমন প্রকৃত কারণ না থাকিলে বাহ্য কারণের প্রভাবে কোন পীড়ার উদ্ভব হয় না, সেই প্রকার—বাহ্য বা উত্তেজক কারণ না থাকিলে, কেবল প্রকৃত কারণও পীড়া সৃষ্টি করিতে পারে না। এস্থলে একটী কথা প্রণিধান করিতে হইবে, তাহা এই যে, যেখানে প্রকৃত কারণ থাকে, সেখানে উত্তেজক কারণ আসিবেই আসিবে। একটী উদাহরণ না হইলে এই সূক্ষ্মতত্ত্বটী সাধারণের বোধগম্য হইবার আশা করি না। মনে করুন, একটী আম্রবীজ আপনার বাগানে রোপণ করা হইল। আম্রবীজটী জড় নয়, ইহার মধ্যে চৈতন্য আছে, তবে সুপ্ত অবস্থায় আছে, এই পর্য্যন্ত। এই সুপ্ত চৈতন্য বীজটীর মধ্যে একটী **আকাঙ্ক্ষা** বিরাজ করিতেছে,—"যদি আমাকে কেহ কেবলমাত্র মাটির সহিত সংযোগ করিয়া দেয়, তাহা হইলেই আমি অঙ্কুরিত, পল্লবিত, শাখা প্রশাখাসমন্বিত একটী বৃক্ষরূপে পরিণত হই, এবং রৌদ্র, ঝঞ্ঝাবাত, বজ্রধ্বনি ইত্যাদি সহ্য করিয়াও সুপক্ক ও সুমিষ্ট আম্রফল প্রসব করিব এবং জগতের প্রাণীসমূহকে প্রদান করিব।" এই **আকাঙ্ক্ষাটী** থাকায়, একবার যদি ঐ বীজটীকে মাটির সহিত সংযোগ

করিয়া দেওয়া হয়, তবে তাহাকে জল, বায়ু, রৌদ্রাদির জন্য কোনও চেষ্টাই করিতে হয় না, পরন্তু উহারা **স্বাভাবিকী নীতির** বশে আপনিই আসিয়া ঐ বীজটীকে **ক্রমগতিতে** বৃক্ষরূপে পরিণত করে। বৃক্ষটীর উৎপত্তি পক্ষে প্রকৃত কারণ, অর্থাৎ বীজভাবটী, পূর্ব্ব হইতেই ছিল এবং যে যে উত্তেজক অর্থাৎ সাহায্যকারী কারণের আবশ্যক, অর্থাৎ যেগুলি ব্যতীত ঐ বীজটীর বৃক্ষরূপে পরিণতি সম্ভব নয়, সেই উত্তেজক কারণগুলি আপনিই সমুপস্থিত হয়, সেজন্য কোনও বিশেষ প্রয়াসের আবশ্যকতা নাই। পক্ষান্তরে, আমরা দেখিয়াছি, যদি কাহারও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য দারুণ আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে তাহাকে সেই পথে সাহায্য করিবার জন্য গুরু আপনি আসিয়া জোটেন, ঐ উন্নতিকামীকে সেজন্য কোনও প্রয়াস পাইতে হয় না। ইহাই **নীতি**, ইহাই **স্বাভাবিকী** ব্যবস্থা। অতএব জানিতে হইবে যে প্রকৃত কারণের সহিত উত্তেজক কারণের একটী চিরন্তন সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেটী এই যে, **প্রকৃত কারণের অভ্যন্তরেই যেন উত্তেজক কারণ অবস্থিতি করে।** অন্ততঃ প্রথমটী থাকিলে দ্বিতীয়টীর অভাব হয় না।

এলোপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রে **উত্তেজক** কারণকেই পীড়ার প্রকৃত কারণ বলিয়া অবধারিত করা হয়,—পরন্তু ইহাপেক্ষা ভ্রান্ত ধারণা আর কিছু হইতে পারে না। অথচ ঐ শাস্ত্রানুসারে যাঁহারা চিকিৎসা করেন, তাঁহারা ক্ষণকালের জন্যও চিন্তা করিয়া দেখিবেন না যে, **একই উত্তেজক কারণের ফলে** দশজন মনুষ্যের মধ্যে কেহবা আদৌ পীড়িত হয় না এবং বাকী যাহারা পীড়িত হয় তাহারা প্রত্যেকেই **বিভিন্ন** পীড়ায় পীড়িত হয়,—এই বিভিন্নতার পশ্চাতে কোনও কারণ আছে কিনা? তাঁহারা সম্মুখে যেটীকে পান, তাহাকেই কারণ হিসাবে দায়ী করেন এবং তদনুসারেই প্রতিকার অবলম্বন করিতে যত্নবান্ হয়েন। কেবলই কি

তাহাই? তাঁহারা এক যন্ত্রের পীড়ার ক্ষেত্রে শরীরের যন্ত্রান্তরকে অনায়াসেই দায়ী সাব্যস্ত করিয়া, ঐ যন্ত্র কাটা, ছেঁড়া, ফোঁড়া, দগ্ধকরণ ইত্যাদি ক্লেশ দিয়া মনে করেন ও সকলকেই জানাইয়া থাকেন যে, তাঁহারা রোগীর চিকিৎসা করিতেছেন। আশ্চর্য্য হইবার কথা, এলোপ্যাথিক শাস্ত্রটির ব্যবহার বহুদিন হইতে চলিতেছে এবং বহু বহু মস্তিষ্কবান্ চিকিৎসক ঐ মতে চিকিৎসা করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন, কিন্তু **কার্য্য-কারণ বিষয়ক** প্রকৃত তত্বটীর উন্মেষ কাহারও হৃদয়ে এ পর্য্যন্ত হয় নাই, এমন কি, তাঁহাদের মস্তিষ্কে একটী জিজ্ঞাসাও এ পর্য্যন্ত উদয় হয় নাই। মনুষ্য মাত্রেই বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচার বিশ্লেষণ-প্রবৃত্তি সাহায্যেই জীবনপথে বিচরণ করে এবং প্রত্যেক কার্য্যেরই অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। জানিনা, এলোপ্যাথিক শাস্ত্রচর্চ্চা করিবার প্রারম্ভেই তাঁহারা **বুদ্ধি ও বিচার শক্তি** বিসর্জ্জন দিয়াই ঐ কার্য্যে ব্রতী হন কি না, নতুবা তাঁহারা অতি অবশ্যই অযৌক্তিক প্রথা ত্যাগ করিয়া বিচারপথ গ্রহণ করিতেন। বিশেষতঃ বেদবেদান্ত, ষড়দর্শন, আরণ্যক, কল্পসূত্র, উপনিষৎ, পঞ্চদশী, গীতাদি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা ঋষিদিগের বংশধর হিন্দু-চিকিৎসক ভ্রাতাদিগেরও এই প্রকার ভ্রান্ত পথে বিচরণ এবং অহঙ্কার প্রমত্ততা দেখিয়া বাস্তবিকই হৃদয়ে নিরতিশয় ক্ষোভ ও আক্ষেপ উপস্থিত হয়।

রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ হইয়াছে;—"অতএব যকৃতই ইহার কারণ," ইহা বলিবার পূর্ব্বে কি ক্ষণকালের জন্য এ চিন্তা মনে আসা উচিত নয়, যে, "যকৃৎ ঠিকমত কার্য্য করিতেছে না কেন? অথবা "যকৃৎ কি স্বাধীন ভাবেই কার্য্য করিয়া থাকে?" যকৃৎ একটী যন্ত্রমাত্র, সুতরাং যকৃৎটীও যেমন শরীরস্থ **জীবনীশক্তির** অধীন, অন্ত্রগুলি ও গুহ্যপ্রদেশও তেমনই ঐ জীবনীশক্তির অধীন, এরূপ স্থলে যকৃৎকে দায়ী করা চলে কি প্রকারে? **প্রকৃত** কারণ আরও আভ্যন্তর।

দেখা যায়, একই প্রকার **উত্তেজক** কারণে নানা ব্যক্তি নানা ভাবে পীড়িত হয়, আবার কেহ বা আদৌ পীড়িত হয় না, ইহার প্রকৃত তত্ত্বটী বিশ্লেষণ করিলে, জানা যাইবে যে, পীড়াবির্ভাবের পক্ষে উত্তেজক কারণ ব্যতীত **সুপ্ত** বা **প্রকৃত** কারণ প্রধানতঃ দায়ী। **এই সুপ্ত কারণই প্রকৃত কারণ এবং ইহা থাকিলে, তবেই উত্তেজক কারণ কার্য্যকরী ও ফলপ্রসূ হইয়া থাকে, নতুবা হয় না।**

আরও এক কথা,—উত্তেজক কারণকে আমাদের ব্যাধি দুঃখের একমাত্র কারণ স্বীকার করিলে অন্যদিকেও অনেক অসামঞ্জস্য আসিয়া পড়ে। উত্তেজক কারণের আবির্ভাব বা তিরোভাবের উপর মনুষ্যের কোনও হাত নাই এবং যদিও উহা আমাদের ব্যাধি-দুঃখের কারণ হয়, তবে প্রধান কারণ হইতে পারে না, অবশ্য গৌণ কারণ হইতে পারে। আমাদের সুখ বা দুঃখের জন্য আমরাই একমাত্র দায়ী, অন্য কেহই দায়ী নয়। আমরা নিজের **কুমনন, কুচিন্তন** ইত্যাদির দ্বারা **সোরাদি** দোষগুলিকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া আমাদের শরীরের মধ্যে স্থান প্রদান করিয়াছি, সুতরাং সেজন্য যে কিছু ফল ভোগ করিতে হয়, তাহা আমাদেরই কর্ম্মপ্রসূত ফল। পরন্তু উত্তেজক কারণ সমূহের উপর আমাদের আদৌ কোনও হাত নাই ও থাকে না সুতরাং তাহারা আমাদের দুঃখের প্রধান কারণ বলিয়া কি প্রকারে স্বীকার করা যাইতে পারে? সামান্য চিন্তা করিলেই, এ ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

অতএব রোগীকে প্রকৃত আরোগ্য করিতে হইলে, উত্তেজক কারণের ধ্বংসের দ্বারা, তাহা আশা করা যায় না। **মূল, প্রকৃত এবং আভ্যন্তর কারণ, অর্থাৎ সোরাদি দোষের নিরাকরণ করিতে না পারিলে, স্থায়ী আরোগ্য**

সম্ভব নয়। এই তত্ত্বটী বা নীতিটী হোমিও চিকিৎসক মাত্রেই জানেন, পরন্তু সমাজের প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই অন্তঃকরণে ইহা প্রোথিত করিয়া দেওয়া অত্যাবশ্যক। নতুবা যে কোনও প্রথাকে "চিকিৎসা-প্রথা" জ্ঞানে সমাদর করিয়া দেশের যে প্রকার শোচনীয় অবস্থা ঘটিতেছে, তাহা দেখিয়া বাস্তবিক হৃদয়ে বেদনানুভব করিতে হয়। তবে আমরা সহস্রবার চীৎকার করিলেও কোনও ফল হইবে না, কেননা লোকে সহজেই মনে করিবে যে, আমরা কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া এ সকল কথা কহিয়া থাকি। সুতরাং যিনি তাঁহার সৃষ্ট জনগণের হৃদয়ে সমুপস্থিত থাকিয়া প্রত্যেককে পরিচালিত করেন, তাঁহার কৃপা না হইলে, আমাদের মোহ কদাচই ঘুচিবে না এবং ধ্বংসপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের কোনও আশা করা সম্ভব নহে।

রোগের সূচনা ও প্রবাহ,— সর্ব্বশেষে উহার ফল।

রোগের সর্ব্বপ্রথম **সূচনা** মানবচক্ষুর অন্তরালেই ঘটিয়া থাকে, তবে যে ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে সূচনা দেখা দেয়, সে ব্যক্তি উহা প্রায়ই অনুভব করিতে পারে, যদিও উহা যে কোনও একটী রোগের সূচনা, তাহা অনেক সময়েই স্থির করিতে পারে না। এই সূচনার সময়ে ইহার প্রতিকার করা প্রায়ই ঘটে না, সুতরাং ঐখানেই উহার যবনিকা পতন না হইয়া ক্রমেই নিম্নতর অর্থাৎ স্থূলতর স্তরে উহা নামিতে বাধ্য হয়, অতএব ক্রমগতিটীর ধ্বংস হইতে পারে না।

মানব ও তাহার দেহকে, আমাদের পবিত্র "গীতা-শাস্ত্রে", ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থ দেহী এবং ক্ষেত্র অর্থে মনোবুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত দেহ, ইহাই জানিতে হইবে। ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ দেহী তাঁহার দেহের মধ্যে ৩টী স্তরে বাস করেন, যথা,—**কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল**। যখন ঐ দেহে, পীড়ার সর্ব্বপ্রথম স্থচনা দেখা দেয়, তখন ঐ স্থচনাটী **কারণ দেহে** অবস্থিতি করে। এই কারণ স্তরটা শক্তিস্তর বলিয়া, রোগের স্থচনাটী সর্ব্বপ্রথম শক্তিস্তরে দেখা দিয়া থাকে, ইহাই জানিতে হইবে। কারণ-স্তরও যাহা, জীবনীশক্তিস্তরও তাহা,—স্থতরাং জীবনীশক্তির বিশৃঙ্খলাটীই রোগের সর্ব্বপ্রথম স্থচনা (Disease is the disturbed condition of the vital force.) যাহা হউক, এই অবস্থায়, রোগী কেমন অস্বস্থি (malaise) অনুভব করে,—ইহাই স্থচনা। এই স্থচনাবস্থায়, দেহের কোনও অংশে কোনও প্রকার অস্বস্থি বা লক্ষণ আদৌ বিকাশ পায় না, কেবলমাত্র সাধারণ ভাবে "কেমন যেন ভাল লাগে না" (out of sorts feeling,) এই প্রকার একটা ভাব চলিতে থাকে। যেহেতু কোনও প্রকার লক্ষণের বিকাশ হয় না, স্থতরাং ঔষধ নির্ব্বাচনও সম্ভব হয় না, পরন্তু ঔষধ প্রয়োগ আবশ্যকও হয় না। এই অবস্থাকে মহাগুরু হানিমান "indisposition" নাম দিয়াছেন। এই স্থচনাবস্থায়, মানবদেহের মধ্যে যে একটী "স্বাভাবিকী আরোগ্য-বিধায়িণী শক্তি" (vismedicatrix nature) আছে, সেই শক্তিই আরোগ্য করিয়া থাকে,—অবশ্য উপবাস, বিশ্রাম, প্রভৃতি সাহায্যের আবশ্যক হইয়া থাকে।

এক্ষণে, যদি উপরোক্ত **আরোগ্যকারিণী শক্তি,** রোগের স্থচনাবস্থাটী আরোগ্য করিতে না পারে, তাহা হইলে পীড়াটী কারণস্তর ত্যাগ করিয়া **সূক্ষ্মস্তরে** অবতরণ করে, বস্তুতঃ ঠিক যেন একটী

প্রবাহাকার ধারণ করে। এই প্রবাহ একটী স্বতন্ত্র প্রবাহ নয়, এটী জীবনীশক্তির ক্রিয়াগতি (Influx), যাহা **ভিতর হইতে বাহিরের দিকে, কেন্দ্রস্থল হইতে পরিধির দিকে, অর্থাৎ ক্রমগতিতে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে প্রবাহিত** এবং সেই স্রোতের বশেই ঐ প্রবাহটী বহমান হয় এবং মানবদেহের সূক্ষ্মস্তরে ক্রিয়া প্রকাশ করে। সুতরাং রোগীর মনের একটী পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়,—সামান্য কথায় চঞ্চল হওয়া, বিষণ্ণভাবের বিকাশ, সর্ব্বদাই আলস্য ও শয়নেচ্ছা, আহারাদিতে অনভিলাষ ইত্যাদি মনোলক্ষণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তখন জানিতে হয় যে, রোগটী শক্তি-স্তর ত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ কারণদেহ হইতে সূক্ষ্মদেহে বা **মনোরাজ্যে**, প্রবাহিত হইয়া, **মনস্তরে ক্রিয়া** ও লক্ষণ-বিকাশ করিয়াছে।

অতঃপর, যদি মনের স্তরে পীড়াপ্রবাহটী পৌঁছাইবার পরেও, কোনও প্রতিকার অবলম্বিত না হয়, তখন ঐ প্রবাহ-বশেই উহা স্থূলস্তরে নীত হয় এবং কোনও যন্ত্র-বিশেষে ক্রিয়া বিকাশ করে, যেমন যকৃৎ, হৃদ্‌পিণ্ড, পরিপাকযন্ত্র, অন্ত্র ইত্যাদি। এই অবস্থায় লোকে বলে, "অমুকের কামল পীড়া হইয়াছে", অথবা "অমুকের বুক ধড়ফড়ানি হইয়াছে", অথবা "অমুকের অম্লাজীর্ণ হইয়াছে" ইত্যাদি। যখন পীড়াপ্রবাহটী স্থূলস্তরে দেখা দেয়, তখনও সর্ব্বপ্রথম কিছুদিন ধরিয়া কেবলমাত্র যে যন্ত্রটী ভবিষ্যতে আক্রান্ত হইবে, সেই যন্ত্রটীর **অবস্থিতির অনুভূতিমাত্র** প্রকাশ পায়। সকলেই জানেন, মানবদেহ পূর্ণমাত্রায় সুস্থ থাকিলে, মানব তাহার দেহস্থ কোনও যন্ত্রেরই বা কোনও অংশেরই অবস্থিতি আদৌ উপলব্ধি করে না, কেবলমাত্র "আমি আছি", এই পর্য্যন্ত একটী অনুভূতি চলিতে থাকে। পরন্তু যখনই কোনও যন্ত্র-বিশেষ বা কোনও অংশবিশেষ আক্রান্ত হইবে, তৎপূর্ব্বে ঐ যন্ত্র বা ঐ অংশটীর অবস্থিতি অনুভূত হইতে থাকে এবং তাহার

কিছুদিন পর হইতে ঐ যন্ত্রটীর বা ঐ অংশটীর, প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট যে ক্রিয়া স্থিরীকৃত আছে, সেই ক্রিয়াটা স্বাভাবিক ভাবে সম্পন্ন করিতে অপারকতা প্রদর্শন করে, অর্থাৎ যদি ও ক্রিয়া করে, কিন্তু বিকৃত ভাবে (mal-action) ক্রিয়া করিতে থাকে। তখনই লোকে, ঐ যন্ত্রসংশ্লিষ্ট কোনও একটা নামের পীড়া হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। এক্ষণে, একটী বিষয়ে মনোযোগ আবশ্যক, সেটী এই যে, পীড়াটী স্থূলস্তরে অবতরণ করিয়াছে এবং এখনও **ক্রিয়াগত** (functional) পরিবর্ত্তনের অবস্থায় আছে।

যদি উপরোক্ত ক্রিয়াবিশৃঙ্খলার অবস্থায়, আরোগ্য করা না হয়, তবে পীড়াস্রোতটী বরাবর অপ্রতিহত ভাবে প্রবাহিত হইতে থাকায়, কিছুদিন ক্রিয়াবিশৃঙ্খলার অবস্থায় থাকিবার পর, ঐ আক্রান্ত যন্ত্রটীর **আকারগত পরিবর্ত্তন** সংসাধিত হইবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি আছে। **ক্রিয়া বৈলক্ষণ্য** হইতে যন্ত্রটীর **আকারগত বৈলক্ষণ্য** আসিতে বাধ্য, —বিকৃত ক্রিয়া করিতে করিতে যন্ত্রটী নিজেই বিকৃত হয়। এ অবস্থায় পীড়াটী আর **পীড়াভাবে** থাকে না,—পরন্তু উহা **ফলে** পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। ফলে পর্য্যবসিত হইবার পরেও কিছুদিন আরোগ্যপথের সাহায্যকারী লক্ষণসমষ্টি বজায় থাকে, ফলতঃ আরও কিছুদিন পরে, লক্ষণ-সমষ্টি একেবারেই তিরোহিত হয়, তখন সাধারণতঃ আর আরোগ্যের উপায় থাকে না। অবশ্য, অস্ত্রোপচারের সাহায্যে ঐ ফলটীকে অপসারণ করা কোনও ক্ষেত্রে সম্ভব হইলেও, পীড়া-প্রবাহটীর আরোগ্যবিধান না হওয়ায়, ফলটীর পুনঃ সঞ্চয় অথবা শরীরের অন্যাংশে, প্রায়ই আরও বিশেষতঃ মূল্যবান্ যন্ত্রে, পীড়াপ্রবাহটী ফল প্রসব করিতে থাকে এবং শরীরের নানা প্রদেশে বা অংশে, অথবা সর্ব্বশরীরে অন্ত-ফল প্রদর্শন করিয়া থাকে, সুতরাং রোগীর মৃত্যুরূপী শেষ যবনিকা পতন না হওয়া পর্য্যন্ত, নানা প্রকারের অব্যক্ত যাতনাদি সহ্য করিতে থাকা এবং কাল-প্রতীক্ষা করা ব্যতীত উপায়ান্তর থাকে না।

উপরোক্ত আলোচনাটী হইতে ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে যে, শক্তিস্তর হইতে কি ভাবে পীড়াটী প্রবাহাকারে এক একটী স্তর অতিক্রম করিয়া বাহ্যস্তর পর্য্যন্ত আসিয়া ফলে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। চিকিৎসার সাহায্যে আরোগ্য করিতে হইলে, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তির পরেও কিছুদিনের মধ্যে, অর্থাৎ যতদিন লক্ষণ সমষ্টি অবিকৃত বা অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় থাকে, ততদিনই চেষ্টা ফলবতী হইয়া থাকে। যেহেতু সকলেই জানেন যে, পূর্ণ লক্ষণ-সমষ্টিই (Totality of symptoms) একমাত্র সহায়ক, অন্য কিছুই আরোগ্যপথে সাহায্য করিতে পারে না।

এক্ষণে, জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, রোগটী শক্তিস্তর হইতে সূক্ষ্মস্তর ও তাহার পর স্থূলস্তরে অবতরণ করিবার পর, যে যন্ত্রটীকে আক্রমণ করে, অর্থাৎ পীড়াবিকাশ করিবার জন্য আশ্রয় করে, তাহা কি হিসাবে স্থিরীকৃত হয়? অর্থাৎ কোন্ **নীতি** (law) অনুসারে, কাহারও যকৃৎ, কাহারও অন্ত্র, কাহারওবা হৃদযন্ত্রাদি আক্রান্ত বা লক্ষণবিকাশের ক্ষেত্র বলিয়া নির্ব্বাচিত হয়? ইহা কি ঐ রোগশক্তির বা জীবনীশক্তির "খেয়াল" মতই হয়? অথবা কোনও নির্দ্দিষ্ট **নীতি** আছে? এ জগতের প্রত্যেক কার্য্যটীই **চিরনির্দ্দিষ্ট নীতি** (fixed law) অনুসারে সম্পাদিত হইয়া থাকে। একটী সামান্য তৃণগুচ্ছও তাঁহার ইচ্ছা (His law) ব্যতীত দোলে না, সুতরাং ঐ ব্যাপারের পশ্চাতে অতি অবশ্যই স্থায়ী ও চির-নির্দ্দিষ্ট নীতি থাকা সম্ভব ও প্রয়োজনীয় এবং বাস্তবিকই আছে, আমাদের দৃঢ় অনুসন্ধিৎসা এবং তীক্ষ্ণ গবেষণা থাকিলেই ঐ নীতির সন্ধান অবশ্য পাইতে পারা যায়।

যেমন কোনও একটী জল-ধারা সমতল ভূমিতে অবতরণ করিয়া নিজের স্রোতটী বজায় রাখিবার জন্য নিম্নভূমির অনুসন্ধান করে এবং উহা পাইলেই তদভিমুখে গতিলাভ করে, ঠিক সেইরূপ, পীড়াটী শক্তিস্তর হইতে অবতরণ

করিবার সময় শরীরস্থ যে যন্ত্রটী অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, তাহারই উপর ক্রিয়া-স্থানটী নির্দ্দেশ করে। এক্ষণে, জানিতে হইবে, কি জন্ম একটী যন্ত্রবিশেষ পূর্ব্ব হইতে দুর্ব্বল থাকে? ইহার উত্তর এই যে, বর্ত্তমান পীড়াটী সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে **শরীরস্থ দোষের প্রভাবে** যে যন্ত্র যে ভাবে ক্লিষ্ট ছিল বর্ত্তমান পীড়া প্রবাহটী সেই হিসাবেই স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। বহু পূর্ব্বে হয়ত কেবল ২।৩ বার **টীকা** লইবার ফলে, **সাইকোসিস্** দোষটী ক্রিয়াপর থাকিয়া রোগীর মূত্রযন্ত্রগুলিকে দূষিত ও দুর্ব্বল করিয়াছে, এক্ষণে নূতন প্রবাহটী অবতরণ করিবামাত্র, স্বাভাবিকী নীতি অনুসরণ করিয়াই মূত্রযন্ত্রগুলির উপরেই সমধিক বল প্রয়োগ করিবে ও করিয়া থাকে। আসল কথা, নূতন পীড়াটার আবির্ভাবের পূর্ব্বাবস্থায় শরীরস্থ যন্ত্রবিশেষের দৌর্ব্বল্যটী ঠিক যেন নূতন প্রবাহটীকে নিজের দিকে টানিয়া আনে, ইহাই অনুভব হয়।

যাহা হউক, উপরের বর্ণিত ব্যাপারটীর সহিত কেবল মাত্র **সোরাদি** দোষের প্রভাবই আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু যেখানে আজকালে "**চাপা দেওয়া**" চিকিৎসার প্রভাবও সংমিলিত হয়, সেখানে ধ্বংস-গতিটী আরও দ্রুততর হইয়া থাকে এবং তাহার ফলেই আজকালের লোকের পরমায়ুও ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে, এবং তাহার ভোগ কালের মধ্যেও কাহারও হৃদয়ে বা মনে শান্তি নাই, মুখে লাবণ্য থাকে না, শরীরস্থ কোনও যন্ত্রই সুষ্ঠুভাবে কার্য্য করে না, এবং চিরদিনই একটা নয় একটা পীড়া চলিতেই থাকে। "চাপা দেওয়া" চিকিৎসাটী ঠিক যেন "নীলকরের দাদন",—একবার আরম্ভ হইলে ছাড়িবার উপায় নাই। সামান্ত ব্যাধিলক্ষণ হইতে ক্রমেই গুরু ও জটীল পীড়ার সৃষ্টি হইতে দেখা যায়। অতি সামান্ত "**ম্যালেরিয়া**" নামধেয় জ্বরটী হয়ত সর্ব্বপ্রথম অভিব্যক্তি, কিন্তু "**চাপা দেওয়া**" চিকিৎসার এমনই খেলা যে, রোগীর **ক্ষয়কাশ**

পর্য্যন্ত আনিয়া তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত না পৌঁছাইয়া ক্ষান্ত নাই। আমাদের দেশের লোকের এমনই তামসিক মনোভাব হইয়াছে যে, যাহা কিছু চাকচিক্যশালী, যাহা কিছু বিদেশ হইতে আনীত, যাহা কিছু হ্যাটকোট ধারীদিগের দ্বারা প্রশংসিত, তাহাই উৎকৃষ্ট এবং প্রশংসনীয়,—পরন্তু, তাহাদের নিজের বিবেচনাশক্তি সামান্য পরিচালনা করিলেই প্রকৃত সত্যটী নিজ নিজ হৃদয়ে স্বভাবতই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, কিন্তু তাহা হইবার উপায় নাই,—এমনই অধঃপতন ও ধ্বংস প্রবাহ !

মানব ও ইতর শ্রেণীর জীবকুলের মধ্যে একটা মর্ম্মান্তিক বিভিন্নতা আছে। সেটী এই যে মানব ব্যতীত অন্য কোনও জীবেরই ভগবানকে জানিবার বা আপনার মুক্তির ইচ্ছা থাকে না। একমাত্র মানব-মনে এই আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব হইয়া থাকে। পরন্তু, এই আকাঙ্ক্ষা উদয় হইবার পূর্ব্বে জগতের চিরন্তন গতিচক্রটী চলিবার পথে, তাহাকে ভগবৎ নির্দ্দিষ্ট পথে সাহায্য করা চাই, নতুবা এই আকাঙ্ক্ষার উন্মেষই হয় না। যে ব্যক্তি জগচ্চক্র চলিবার পথে সাহায্য না করে, সে বৃথাই জীবন ধারণ করে, "মোঘং পার্থ স জীবতি।" ফলতঃ জীবন প্রভাত হইতেই যেখানে পীড়া প্রবাহ ও উপরের বর্ণিত "চাপা দেওয়া" পথে চিকিৎসা চলিতে থাকে, সেখানে "ইতো নষ্টঃ ততো ভ্রষ্ট," অর্থাৎ এদিকেও হয় না, ওদিকেও হয় না, জীবনের ভোগও হয় না, মুক্তিপথের আকাঙ্ক্ষাও জাগরিত হয় না। সুতরাং জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে, একদিকে যেমন নীরোগ হওয়া আবশ্যক, অন্যদিকে তেমনই যাহাতে পীড়া প্রবাহটী চিরতরে বন্ধ হইয়া যায়, তাহারই উপায় অবলম্বন একান্ত আবশ্যক। পিতামাতার সংযম এবং পুত্রকন্যার স্বাস্থ্যের প্রতি সর্ব্বদা মনোযোগ না থাকিলে, পুত্রকন্যার জীবনে উত্তরকালে কেবল দুঃখ ও পীড়া যাতনা ভোগ ব্যতীত কিছুই হয় না। কোন্ পথে প্রকৃত আরোগ্য হইতে পারে, প্রত্যেক পিতার

অনুসন্ধান ও অবলম্বন কর্ত্তব্য। সর্ব্বাদৌ আমাদের মনের যে বহির্ম্মুখী গতিটী উচ্ছৃঙ্খল ভাবে বর্ত্তমান সময়ে নানা দিকে প্রধাবিত হইয়াছে, সেটীকে সংযত করিয়া অনেকটা অন্তর্মুখী করিয়া পরিচালিত করিতে হইবে, নতুবা সত্য দর্শন মিলিবে না এবং নিজেদের কোন্ পথে মঙ্গল প্রাপ্তব্য, তাহাও বুঝা যাইবে না। আমাদের সর্ব্ব বিষয়ে কল্যাণ ও সিদ্ধি একমাত্র প্রকৃতির ভাণ্ডারেই আবদ্ধ, সুষ্ঠু বিচার সাহায্যে কেবল মাত্র সেই দ্বারটী উদ্ঘাটিত করিতে হইবে।

বিভূতি (Aura) ও প্রবণতা (Susceptibility).

"**বিভূতি**" শব্দটী সাধারণতঃ **শক্তি** অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যিনি যত "বিভূতি-যুক্ত", তিনি ততই অন্যের উপর তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। শুনা যায়, কোনও মহাপুরুষ কেবলমাত্র তাঁহার দৃষ্টির প্রভাবে, অথবা কেবলমাত্র তাঁহার সান্নিধ্যের প্রভাবে, অন্য লোকের জীবনধারাটাকে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহাকে সৎমার্গে পরিচালিত করিবার সামর্থ্য ধারণ করেন। যে শক্তির বলে, তিনি এই পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ, সেই শক্তিকে "বিভূতি" বলা যায়। "বিভূতি" বাক্যটার সাধারণ অর্থ ইহাই। এই বিভূতির অধিকারী হইতে হইলে, জীবনের প্রথম হইতে কঠোর সংযম, তপস্যা ইত্যাদির প্রয়োজন হইয়া থাকে, ফলতঃ আমরা যে বিভূতির বিষয় এখানে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা শক্তিপদবাচ্য হইলেও, কেবলই ব্যক্তিগত বিভূতি নয়, উহা প্রত্যেক **দ্রব্যগত** বিভূতি,—ক্রমে বিষয়টী পরিস্ফুট করা হইতেছে। ব্যক্তিগত বিভূতির উদাহরণ আমরা প্রায়ই দেখিয়া থাকি। দেখা যায়, একই উপদেশ

আপনি বা আমি কাহাকেও প্রদান করিলে, সে ব্যক্তি ততটা প্রভাবিত হয় না, এমন কি, হয়ত উপেক্ষাই করিয়া থাকে, পরন্তু সেই উপদেশই যদি কোনও মহাপুরুষের মুখ-বিগলিত হয়, তবে তাহার প্রভাব খুবই স্থায়ী ও দৃঢ় হইয়া থাকে। ইহার কারণ অন্য কিছুই নয়,—ইহার কারণ, ঐ মহাপুরুষের মধ্যে সঞ্চিত পবিত্র প্রভাব বা **বিভূতি**। যাহা হউক, এই বিভূতি ব্যাপারটীর সম্যক্ বিশ্লেষণ করিলে, ইহার আভ্যন্তর তথ্যটা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

উপরোক্ত ব্যক্তিগত বিভূতি ব্যতিরেকে, জগতের প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থ অন্য সৃষ্ট পদার্থের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, কেননা সৃষ্ট পদার্থগুলি, একের সহিত অন্যটী অঙ্গাঙ্গীভাবে আবদ্ধ। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সহিত যেন প্রেমসূত্রে আবদ্ধ, এজন্য একটী দ্রব্যান্তরকে, একটী ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে, সর্ব্বদাই নিজের বিভূতির দ্বারা প্রভাবান্বিত করিবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টিত থাকে। ফলতঃ প্রভাব বিস্তার করিবার এই চেষ্টাটী কোনও কোনও ক্ষেত্রে ফলবতী হয়, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে আদৌ কার্য্যকরী হয় না। অধ্যাপক মহাশয়ের উপদেশ যতই মূল্যবান্ হউক না কেন, তিনি স্বয়ং যতই বিভূতিবান্ হউন না কেন, একথা অতিমাত্র সত্য যে, তিনি তাঁহার প্রত্যেক ছাত্রকে সমানভাবে প্রভাবিত করিতে সক্ষম হন না। অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, কোনও এক ব্যক্তির বা কোনও এক দ্রব্যের মধ্যে যতই বিভূতি অবস্থান করুক না কেন, উহার বিস্তারটী বা উহার প্রভাব-বিকীরণ ব্যাপারটী আরও কোনও কিছুর উপর নির্ভর করে। যাহার উপর নির্ভর করে, তাহারই নাম **"প্রবণতা"**। **"প্রবণতা" অর্থে আকাঙ্ক্ষা**, অর্থাৎ প্রভাবিত হইবার জন্য অভিলাষ বা তীব্র বাসনা। এই আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত কোনও দ্রব্য বা ব্যক্তি প্রভাবান্বিত হইতে পারে না। জড় দ্রব্যের মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষাকে আমরা চিরন্তন বিধান বা স্বাভাবিক নীতি বলিয়া স্থির করিয়া থাকি,—যখন কোনও

চুম্বকে কেবলমাত্র লৌহকেই আকর্ষণ করিতে দেখি এবং অন্য কোনও ধাতুর সহিত উহার আকর্ষণ দেখিতে পাই না, তখন আমরা চুম্বক ও লৌহের মধ্যে ঐ আকর্ষণটীকে চিরন্তনী ব্যবস্থা মনে করিয়া তৃপ্তি লাভ করি। কিন্তু যখন দেখি যে, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির দ্বারা বা অন্য বস্তুর দ্বারা বিশিষ্ট-ভাবে প্রভবান্বিত হইতেছে, তখন ঐ প্রভাবান্বিত ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষাটী তাহার কর্ম্মফলজনিত বলিয়া স্থির করিতে বাধ্য হই, যেহেতু প্রত্যেকের আকাঙ্ক্ষা তাহার **কর্ম্মাভ্যাসের** উপরেই নির্ভর করে, ইহা আমরা সর্ব্বদাই অবলোকন করিয়া থাকি।

আমরা অনেক সময়ই কহিয়া থাকি যে, "আমার ছেলেটী সঙ্গদোষের জন্য খারাপ হইয়া গিয়াছে; অথবা কহিয়া থাকি যে, "আমার ছেলেটী ঐ পাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছিল, ঐ পাড়ায় অনেকেরই বসন্ত পীড়া হইয়াছে, সেখান হইতে বসন্ত ধরাইয়া আসিয়া পীড়িত হইয়াছে" ইত্যাদি। কিন্তু আমরা ভ্রমেও মনে করি না যে, কুসঙ্গটী আরও অন্য অনেক ছেলেকে খারাপ করিতে পারে না কেন? অথবা ঐ পাড়া দিয়া আরও অনেকেই ত বেড়াইতে গিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের বসন্ত পীড়া দেখা দেয় নাই কেন? কুসঙ্গের যেমন **বিভূতি** আছে, ছেলেটীর মধ্যেও সেই কু বিভূতির দ্বারা **প্রভাবান্বিত** হইবার **আকাঙ্ক্ষা** আছে এবং ঐ পাড়ায় যেমন বসন্তবীজ রহিয়াছে, যে ছেলেটী আক্রান্ত হইল, তাহার মধ্যেও **আকাঙ্ক্ষা বা প্রবণতা** আছে। বিভূতিও যেমন আবশ্যক আকাঙ্ক্ষা বা প্রবণতাও ঠিক তেমনই আবশ্যক নতুবা কেহ কাহারও উপর প্রভাব বিস্তার করিতে কদাচ সমর্থ হয় না।

মনুষ্য, জীব এবং জড় সৃষ্টির উপর, চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদিরও প্রভাব রহিয়াছে, কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উপরোক্ত আকাঙ্ক্ষা বা প্রবণতা একান্তই আবশ্যক। আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতির তারতম্যে, বিভিন্ন প্রকৃতির প্রভাব

বিস্তার হইয়া থাকে, এজন্যই একই গ্রহ বা একই দ্রব্য, একই সময়ে বিভিন্ন দ্রব্য বা ব্যক্তির উপর বিভিন্ন প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। তথ্যটী অতি জটীল, এজন্য উত্তমরূপে বিশ্লেষণ ও হৃদয়ঙ্গম আবশ্যক।

কোনও ব্যক্তির পীড়া আরোগ্যের ক্ষেত্রেও এই বিভূতির প্রভাব অর্থাৎ পীড়িত ব্যক্তির মধ্যে উপরোক্ত আকাঙ্ক্ষা বা "চাহনা" না থাকিলে, চিকিৎসকের বা তাঁহার প্রদত্ত ঔষধের বিভূতিটী আদৌ **ক্রিয়াশীল** হয় না, ইহা সামান্য অভিজ্ঞতা থাকিলেই অনুভব করা যায়। রোগীর মধ্যে আরোগ্য হইবার "চাহনা" অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে "will to be cured" বলা যায়, তাহা না থাকিলে আরোগ্য আসিতে পারে না। অনেক গৃহস্থে এরূপ গৃহিণী থাকেন যাঁহারা অতিশয় বিবাদ-প্রিয়, সদা সর্ব্বদাই পুত্র, কন্যা, পুত্রবধুর সহিত কলহ ও হিংসার ব্যবহার করিয়া গৃহস্থে অশান্তির সৃষ্টি করিয়া থাকেন,—এ অবস্থায় তাঁহাকে "রোগিণী" হিসাবে চিকিৎসক আরোগ্য করিবার ইচ্ছা করিলে, সকল সময় কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। যে ক্ষেত্রে রোগিণী নিজের ঐ প্রকার অশান্তিজনক ব্যবহারের জন্য বাস্তবিকই অনুতপ্ত এবং মনে প্রাণে আরোগ্য হইবার ইচ্ছা করেন, তিনিই সমলক্ষণসূত্রে ঔষধ ব্যবহারের ফলে আরোগ্য হইতে পারেন এবং চিকিৎসকও কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন, পরন্তু যে ক্ষেত্রে রোগিণী তাঁহার মনে সে ইচ্ছা পোষণ করা দূরে থাকুক, বরং ঐ প্রকার ব্যবহারের দ্বারা নিজের "বাহাদুরী" দেখান এবং নিজের গৌরব প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেখানে কোন প্রকারেই আরোগ্যের সম্ভাবনা থাকে না; অর্থাৎ যদিও চিকিৎসকের প্রদত্ত ঔষধ তাহার বিভূতি প্রকাশ করিতেছে, ফলতঃ রোগিণীর মধ্যে "চাহনা" বা আকাঙ্ক্ষার অভাবে, ঐ বিভূতিটী রোগিণীর মধ্যে ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে না, যেহেতু ঔষধের প্রভাবটী রোগিণীকে প্রভাবান্বিত করিতে সমর্থ হয় না। এই কারণেই ঐ প্রকার কোনও রোগিণী

আরোগ্য হয়েন, আবার কোনও রোগিণী আরোগ্য হয়েন না এবং তদ্বিষয়ে প্রকৃত কারণই,—একজনের ভিতর will to cure আছে, অন্যের মধ্যে তাহা নাই।

রোগী বা রোগিণীর সম্বন্ধে যে কথা, আধ্যাত্মিক ব্যাপারেরও সেই কথা। গুরুদেবের সকল শিষ্যদের মধ্যে তাঁহার নিজের প্রভাব অর্থাৎ আধ্যাত্মিক কল্যাণ করিবার প্রবল ইচ্ছা থাকিলেও সকল সময় সমান ভাবে বিস্তার করিতে সক্ষম হয়েন না। শিষ্যের মধ্যে আধ্যাত্মিক পথে উন্নতি লাভ করিবার একটী প্রবল **ইচ্ছা, ভাবনা** বা "**চাহনা**" একান্ত প্রয়োজনীয়, নতুবা কোনও ফল হয় না। আমরা যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে বহু সময় ঐ সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এমন কি, গুরুদেবও যে শিষ্যের মধ্যে সে প্রকার "চাহনা" বা আকাঙ্ক্ষা থাকে না, তাহার জন্য চেষ্টা করিতেও দ্বিধা বোধ করিয়া থাকেন এবং তাহার কল্যাণের পথে চেষ্টা করিতেও অগ্রসর হইতে চাহেন না। অবতার পুরুষগণ মনুষ্যের ভিতরের অবস্থা বুঝিতে পারেন, সুতরাং তাঁহাদের চেষ্টা বিফল হইবে, জানিতে পারিয়াই যেন ঐ প্রকার শিষ্যের কল্যাণ করিবার পথে দ্বিধা করেন। মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ একদিন তাঁহার কোনও একটী বন্ধুকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমীপে গমন করেন। স্বামীজির ইচ্ছা যে, ঠাকুর তাঁহার সঙ্গী বন্ধুটীকে কিছু উপদেশ দেন। ফলতঃ তিনি যখন আদৌ কিছু দিলেন না, তখন স্বামীজী যেন অভিমান করিয়া ঠাকুরকে কহিলেন, "কই, আপনি ত উহাকে কোনও উপদেশ দিলেন না?" ঠাকুর কহিলেন, "কি কর্‌ব রে, উহার ভিতরে নানা অকট বকট, কাজেই মা যেন আমার মুখ চেপে ধর্‌লেন, কোনও কথা বল্‌তে দিলেন না, আমি কি কর্‌ব বল্?" ইহার কারণ ঐ একই, যাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে হইবে, তাহার ভিতর আকাঙ্ক্ষা বা "চাহনা" না থাকিলে, কোন চেষ্টাই

ফলবতী হয় না, তবে আমরা না বুঝিয়া অনেক ক্ষেত্রে চেষ্টা করিয়া থাকি এবং বিফলমনোরথ হই,—পরন্তু মহাপুরুষগণ যাঁহাদের অন্তর্য্যামিত্ব শক্তি আছে, তাঁহারা চেষ্টা করেন না, এই মাত্র প্রভেদ।

যদি "বিভূতি-তত্ত্বটী" যথার্থরূপ হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে, তবে অবশ্যই বুঝিতে বাকি থাকিবে না যে, কেহ কাহাকেও সৎপথে পরিচালনা করিয়া তাহার উন্নতি সাধন করিব বলিয়া অহঙ্কার করা বা দৃঢ় প্রতীতির ফলে উৎফুল্ল হওয়া নিরর্থক। অধ্যাপক, শিক্ষক বা গুরু কল্যাণকামী হইলেই যে অন্যের উপর নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাকে সৎপথে আনয়ন ও পরিচালন করিতে পারিবেন, ইহা আদৌ সম্ভব নয়। কেননা যাহার কল্যাণ করিবার জন্য চেষ্টা করা হইবে, তাহার মধ্যে আকাঙ্ক্ষা বা "চাহনা" না থাকিলে, শত চেষ্টাও ফলবতী হইবে না। কত কত মহানুভব পিতার দুষ্ট, অশিক্ষিত ও অকৃত-কর্ম্মা সন্তান রহিয়াছে ও থাকে,—পিতা শত চেষ্টাতেও পুত্রকে সৎপথে আনিতে পারেন না। সুতরাং নিজের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে উন্নতি লাভ হয় না, হইতে পারে না।

প্রশ্ন হইতে পারে, ঐ আকাঙ্ক্ষাটী কাহারও থাকে আবার কাহারও থাকে না কেন? উন্নতি লাভ করিতে প্রত্যেকেরই আকাঙ্ক্ষা থাকা স্বাভাবিক বলিয়া অনেকেই মনে করেন, কিন্তু প্রত্যুত তাহা নয়। ঐ আকাঙ্ক্ষা থাকা বা না থাকা ব্যাপারটী সম্পূর্ণ কর্ম্মফলসাপেক্ষ,—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, তাহারই ফলস্বরূপ তদনুরূপ সংস্কার লইয়া মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করে এবং সেই সেই সংস্কার বশে যেন অবশ ভাবেই নিজ জীবন পথে কর্ম্মানুবর্ত্তী হয়, সুতরাং গুরু বা অধ্যাপকের উপদেশ তাহাদের হৃদয়ে রেখাপাতই করিতে চায় না। এরূপ দেখা যায় যে, একই পিতামাতার ঔরস্ গর্ভজাত বিভিন্ন সন্তান সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে চলিয়া একজন সুধীশ্রেষ্ঠ, একজন হয়ত ঘোর বিলাস ব্যসনাসক্ত ও কদাচারী এবং আরও

একজন হয়ত পবিত্রমার্গী হইয়া আধ্যাত্মিক পথে বিচরণ করিতে করিতে নিজের ও জগতের ঐ পথে কল্যাণ করিতে সমর্থ হয়। ইহাই স্বাভাবিক,—প্রত্যেকের মতি এক প্রকার অর্থাৎ প্রত্যেকেরই হৃদয়ে উন্নতি লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকিবে, ইহা আশা করা একান্ত অস্বাভাবিক।

অতঃপর সাধারণতঃ প্রবণতা বলিলে কি বুঝায়, তাহা বুঝিতে হইবে। প্রবণতা বলিলে, বাহিরের কোনও শক্তির দ্বারা অতি সহজেই প্রভাবিত হইবার অবস্থা মাত্র বুঝাইয়া থাকে। ইহাকে পূর্ব্ববর্ণিত আকাঙ্ক্ষা বা চাহিদা বা চাহনা বলিতে পারা যায়, তবে কেবল ভাষার পরিবর্ত্তন, ঐই পর্য্যন্ত। **পীড়া প্রবণতার কারণ একমাত্র নীতিভঙ্গ।** নীতিভঙ্গ করিলেই বাহ্য শক্তির অধীন হইতেই হয়। কোনও প্রকারেই পরিত্রাণ নাই।

উপসংহারে, একটী কথা লিখিতেছি,—সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, অনেক সময় কোনও একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি আমাদের নিকটে আসিলে, আমাদের মধ্যে বিনা কারণেই, কেবল তাহার সান্নিধ্যবশতঃই আমাদের হৃদয়ে, যেন বিরক্তির ভাব উৎপাদিত হইয়া থাকে,—আবার হয়ত অন্য আর একজন আসিলে,—হৃদয়ে একটী প্রীতি ও শান্তির ভাব উদয় হয়। এই প্রকার বিভিন্ন ভাবোদয়ের প্রকৃত কারণ কি? প্রথম ব্যক্তির সান্নিধ্য মাত্রই আমাদের মনে হয়,—"এ ব্যক্তি যেন আমার কাছে না আসিলেই ভাল হইত" এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির আগমন মাত্রই মনে হয়, "এই সৌম্য ব্যক্তিকে আদর করি, যত্ন করিয়া বসাই ও কথোপকথন করি।" এই বিভিন্ন ভাবের অন্তরালে কি আছে বা থাকে? ঐ দুইজন ব্যক্তির বিভূতির তারতম্যেই এই প্রকার বিভিন্ন ভাবের উদয় হইয়া থাকে। যাহার বিভূতি পবিত্র, তাহাকে দেখিলেই হৃদয়ে শান্তি আসে, আর যাহার বিভূতি অপবিত্র, তাহার সান্নিধ্য মাত্রই হৃদয়ে বিরক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। কিন্তু আরও

বক্তব্য আছে। যদি আমার নিজের বিভূতিটী অপবিত্র থাকে, তবে অপবিত্র বিভূতিবান্ ব্যক্তিকে পাইয়া আমার বিরক্তি সঞ্চার না হইয়া বরং আনন্দই আসিবে, ইহাই দেখা যায় সুতরাং এক্ষেত্রে, পরস্পরের মধ্যে বিভূতির তারতম্য অনুসারে ভাবের তারতম্য হওয়া একান্ত স্বাভাবিক।

কোনও ব্যক্তির আভ্যন্তর অবস্থা অনুসারে, বাহিরের দেহে ও মুখে গ্লানি বা কান্তি প্রতিফলিত হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। **ভিতরের ভাবই বাহ্যদেহের সৌষ্ঠভ বা কমনীয়তা এবং পক্ষান্তরে জঘন্যতা, বা শ্রীহীনতায় সৃষ্টি করিয়া থাকে।** যে ব্যক্তি নিত্য পশু হনন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, তাহাকে দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, এ ব্যক্তি ঘাতক, আবার যে ব্যক্তি পবিত্র ও ভগবৎ পথের পথিক তাহাকে দেখিলেই মনে হয়,—আহা, এই পবিত্রপ্রাণ ব্যক্তি কে? **যেহেতু বাহিরটীকে মনই সৃষ্টি করে।** সুতরাং পবিত্র বিভূতিবান্ ব্যক্তিকে, অন্যের নিকট হইতে পরিচয় পাইবার পূর্ব্বেই, চিনিতে বিলম্ব হয় না।

অনেক সময় রোগীর আগমন মাত্রই তাহার রোগতত্ত্ব অনুমান করিতে পারা যায়,—তাহার ভিতরের অবস্থাটী যেন বহির্দ্দেহে মাখান থাকে এবং রোগীর বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিবার পর দেখা যায় যে, আমাদের পূর্ব্ব ধারণা নিতান্ত ভ্রান্ত নয়। অবশ্য অভিজ্ঞতার উপরে ইহা অনেক নির্ভর করে।

যাহা হউক বিভূতির ব্যাপার অতিশয় গভীর এবং আমাদের হোমিওপ্যাথি ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

রোগপ্রবণতা।

বহুদিন পূর্ব্বে যখন মনুষ্যের মন নির্ম্মল ও সুস্থ ছিল, প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করিবার চিন্তাও যখন মানবমনে উদিত হয় নাই, "যদৃচ্ছা লাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ", গীতোক্ত এই অবস্থাটী যখন মানবমনে পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিত, তখন পীড়ার ও পীড়াপ্রবণতার লেশমাত্রও ছিল না। তখন লোকে সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট থাকিত, অতএব প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত হইবার ফলে তাহাদের মনোরাজ্যে একটী শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালক্রমে এই শান্তির ভঙ্গ ঘটিবার কারণ উপস্থিত হইল। লোকের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম হিংসাদি ভাবের সূচনা দেখা দিল এবং ক্রমে ক্রমে সোরাদি দোষত্রয়ের আবির্ভাব ঘটিল। সে সকল বিষয়ের পূর্ণ অবতারণা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় না হইলেও, পীড়া ও পীড়াপ্রবণতার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে সোরাদি দোষের অবতারণা অবশ্যই করিতে হয়। এজন্য যতটুকু আবশ্যক তাহাই লিখিত হইল।

বীজের সহিত অঙ্কুর বা বৃক্ষের যে সম্বন্ধ, প্রবণতার সহিত বিকাশ প্রাপ্ত পীড়ার, সেই একই সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। বীজের মধ্যে বৃক্ষোৎপত্তির কারণ ও শক্তি যেমন নিহিত থাকিয়া অঙ্কুর বা বৃক্ষোৎপন্ন হইবার পক্ষে যেমন কেবল কাল প্রতীক্ষা করে মাত্র অর্থাৎ মাটী, জল, বায়ু, তাপাদির সহিত সংযোগ ও অন্যান্য সুযোগাদি প্রাপ্তির অপেক্ষা করে, মানব দেহের মধ্যে সুপ্ত প্রবণতাও সর্ব্বদা রোগের পূর্ণ বিকাশ পথে সদাসর্ব্বদা উন্মুখ হইয়া থাকিলেও উত্তেজক কারণের প্রতীক্ষা করে। উত্তেজক কারণের

প্রাপ্তি ঘটিলেই প্রবণতা আর প্রবণতাভাবে থাকে না বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া কিছুদিন শরীরের কার্য্যগত বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে এবং তথনও প্রতিকার প্রাপ্ত না হইলে পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নানাপ্রকারের পরিণতি প্রাপ্ত হয়, যদিও এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নানা প্রকারের পরিণতি প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্ব্বাচীন জড়বাদী চিকিৎসকগণ রোগ হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করেন না, যেহেতু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ফল ব্যতীত তাঁহারা তাঁহাদের যন্ত্রাদি সাহায্যে কোন রোগ হইয়াছে বলিয়া সাব্যস্তই করিতে পারেন না। সে যাহা হউক, এই প্রবণতা প্রকৃত প্রস্তাবে রোগেরই সূক্ষ্মাবস্থা বলিয়া বুঝিতে হইবে। ফলতঃ প্রবণতাই প্রথম অবস্থা নয়, ইহাপেক্ষা আরও সূক্ষ্মতর অবস্থায় রোগসকল মানবদেহে অবস্থান করে। সোরাদি দোষের জন্য সর্ব্বপ্রথমে নীতি ভঙ্গ তাহার পরেই মনুষ্যের স্বাভাবিক স্বাধীনতার হানি, তাহার পর বা তৎসঙ্গেসঙ্গেই মানব মনে ভীতিভাবের আবির্ভাব,—এইগুলি যেন প্রবণতার পূর্ব্বাবস্থা বলিয়াই মনে হয়। সুস্থ মানব পূর্ণমাত্রায় স্বাধীন, সে প্রকৃতির সন্তান, প্রকৃতিরই সৃষ্ট মেদোমাংসময় পুত্তলিকা মাত্র। প্রকৃতির চিরন্তন নিয়ম এই যে, "তুমি কাহারও স্বাধীনতা নষ্ট করিও না, অতএব তোমার স্বাধীনতায় কেহ হস্তক্ষেপ করিবে না।" যে মুহূর্ত্তে মানব নিজের অবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া অন্যের স্বাধীনতা হানি করিবার জন্য মনোমধ্যে ইচ্ছা মাত্র পোষণ করে, তথন হইতেই সে নিজের ঐ কর্ম্মদোষে আপনাকে প্রকৃতির দাস করিয়া ফেলিয়াছে। ফলে, তাহার স্বাধীনতা এবং স্বচ্ছন্দ-ভাব ধীরে ধীরে লোপ পাইতে বসিয়াছে। এই অবস্থায় সর্ব্বদা তাহার অন্তরস্থ জাগ্রতশীল অন্তরাত্মা, যিনি পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার জন্য একটী নির্ভীকতা প্রদান করিয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে প্রতিপদে একটী ভয়, একটী আশঙ্কা, একটী নিষেধ বাক্য ইত্যাদি ঘটাইয়া তাহার স্বাধীনতার হানি সম্পাদন করিতেছেন। এই ভয় বা আশঙ্কা

হইতেই প্রবণতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়; শৈত্যে রোগপ্রবণতা না থাকিলে, রোগী শরীরকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে না। শীতল বায়ু সংস্পর্শে তাহার পীড়া সম্ভাবনা, অতএব ভয় না থাকিলে, সে ইতর শ্রেণীর জীবের ন্যায় দারুণ শীতের সময়ও নিঃশঙ্কে অনাচ্ছাদিত অবস্থায় রাজপথে বিচরণ করিত, কিন্তু সে পীড়াপ্রবণ বলিয়াই পারে না। নিজের কর্ম্মদোষে সে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, রৌদ্র, আতপাদি হইতে ভয় পায় এবং শঙ্কিতচিত্তে অবস্থান করে। এই **ভয়ই** প্রবণতার পূর্ব্বরূপ।

কোন কোন মূঢ় ব্যক্তি মনে করিয়া থাকেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিস্থিতির পূর্ব্বে, চিকিৎসাপথ অবলম্বন করিবার কোন কারণ নাই এবং এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যাবতীয় চিকিৎসা প্রথা অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে। ফলতঃ ইহার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহারা পরিণত অবস্থার পূর্ব্বে কি প্রকারে চিকিৎসা করিতে হয় তাহাও জানেন না এবং তাঁহাদের স্থূল ঔষধগুলি শরীরযন্ত্রের সূক্ষ্ম স্তরে অবস্থিত প্রবণতাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহাদের চিকিৎসা প্রথায় এবং স্থূল ঔষধ সাহায্যে কেবল স্থূলদেহেরই পরিবর্ত্তন করিতে পারে,—কেননা সূক্ষ্ম ব্যতীত সূক্ষ্মস্তরে ক্রিয়া করিবার আশা বিফল।

যে সকল ব্যক্তি প্রকৃত জনকল্যাণ কামনায় রোগীকে সর্ব্বতোভাবে রোগমুক্ত করিবার আশা করেন, তাঁহারা অতি অবশ্যই রোগসকলকে বিনাশ করিবার ইচ্ছাই করিয়া থাকেন, কেননা রোগের যত শীঘ্র এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিণতি বিকাশ পাইবার পূর্ব্বেই প্রতিকার আরম্ভ হয় ততই ভাল। এই কার্য্যের সুবিধার জন্য আমাদের চিরমঙ্গলময়ী প্রকৃতি প্রথম হইতেই অতি সুন্দর ইঙ্গিত প্রদান করিয়া থাকেন। যাঁহার অন্তর্দৃষ্টি আছে তিনিই দেখিবেন ও বুঝিতে পারিবেন যে, রোগের প্রবণতা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রিয়াগত, এমন কি, **যন্ত্রগত** পরিবর্ত্তন ও বিকাশ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ

যতদিন পর্য্যন্ত রোগীর আরোগ্য সম্ভাবনা কিছুমাত্র থাকে, ততদিন তিনি অতি স্পষ্ট ভাষায় ঐ সকল ইঙ্গিত দ্বারা আরোগ্যকার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে, যখনই রোগীর অবস্থা আরোগ্যের পরপারে উপস্থিত হয়, তখন হইতে নিতান্ত অনাবশ্যক বিধায় তিনি আর ইঙ্গিত প্রদান করেন না। এজন্যই কর্কটরোগে অথবা ক্ষয়রোগের প্রান্ত-সীমায়, দুর্দ্দান্ত উন্মাদ পীড়ায় অথবা ঘোরতর কুষ্ঠে, রোগীর কতকগুলি যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি ব্যতীত ঔষধ নির্ব্বাচন উপযোগী অর্থাৎ আরোগ্য বিধায়ক লক্ষণ আদৌ থাকে না,—কেবল পীড়ার সাধারণ লক্ষণ থাকে, বিশেষ লক্ষণ বা ব্যক্তিগত লক্ষণ থাকে না; ইহার দ্বারাই বুঝিতে হয় রোগীর আরোগ্য সম্ভাবনা আর নাই। প্রবণতা অবস্থাই যে রোগীর আরোগ্যকল্পে অতি সুন্দর সুযোগ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

প্রকৃতির ইঙ্গিত তবে সর্ব্বপ্রথমে কি ভাবে থাকে?

লোকে যখন পূর্ণমাত্রায় সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ থাকে তখন সে শরীরের কোন যন্ত্র বা কোন অংশ অনুভব করে না,—কেবলমাত্র একটী স্বয়ংবেদ্য ভাব অর্থাৎ "আমি আছি" এই প্রকার অনুভূতি বর্ত্তমান থাকে। যে মুহূর্ত্ত হইতে রোগপ্রবণতার আবির্ভাব হয়, তখনই এবং তখন হইতেই তাঁহার শরীরস্থ যে যন্ত্রে রোগ বিকাশ পাইবার সম্ভাবনা, সেই যন্ত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুভব করে। মনে করুন, কেহ যকৃতের অবস্থানটি অনুভব করিতে লাগিল, কেহ-বা অন্ত্রগুলির অন্ত্রস্থান অনুভব করিতে লাগিল, কেহ-বা তাহার হৃদ্‌যন্ত্র রহিয়াছে বলিয়া বোধ করিতে লাগিল। তখনই জানিতে

হয় যে, ঐ ঐ যন্ত্র অচিরাৎ পীড়িত হইবে, এখনও পীড়িত হয় নাই, সম্ভাবনা মাত্র আসিয়াছে।

এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, একজনের যকৃৎ প্রদেশ আর একজনের অন্ত্র, তৃতীয় ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড এই ভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন যন্ত্রে পীড়া প্রকাশ হইবার সম্ভাবনার পশ্চাতে কোনও কারণ নিহিত থাকে কি? ইহার উত্তরে বলিতে হইবে,—অবশ্যই থাকে, যেহেতু এ জগতে অ-কারণ (accident) কোন ঘটনা ঘটিতে পারে না, প্রত্যেক ঘটনার পশ্চাতে কারণ অবশ্যই থাকে,—মহাকারণ হইতে উদ্ভূত হইয়া শেষে প্রত্যেক ঘটনাই মহাকারণে লয় প্রাপ্ত হয়, ইহাই প্রকৃতির চিরন্তনী বা সনাতনী নীতি। বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন যন্ত্রে রোগ বিকাশ হইবার কারণ—যেমন একটী শৃঙ্খলের (chain) যে ক্ষুদ্র অংশটী (link) সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল থাকে; শৃঙ্খলটী ছিঁড়িবার সময় সেইখানেই ছিঁড়িয়া থাকে,—সেই প্রকার প্রত্যেক মানবের জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মফল হেতু নির্ব্বাচিত পিতা মাতার গর্ভ ঔরসে জন্ম হইবার ফলে, যাহার যে যন্ত্রটী দুর্ব্বল থাকে, পীড়াপ্রবণতা, রোগের প্রথম ঝঙ্কার সেইখানেই উৎপাদন করে। ইহাই প্রকৃত কারণ।

এই ইঙ্গিতের সঙ্গেই চিকিৎসার আভাস ও সাহায্য যথেষ্ট পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপে দেখা যায়, তিনজনের যকৃতপ্রদেশে হয়ত উপরোক্ত প্রথম ঝঙ্কার উৎপাদিত হইয়াছে, যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে এখন পর্য্যন্ত যন্ত্রটীতে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলার উদয় হয় নাই, কেবল মাত্র যকৃতটার অনুভূতি মাত্রের উদয় হইয়াছে। তখন হইতেই দেখা যায় একজনের শুষ্ক মুখ, কোষ্ঠবদ্ধ এবং ডানদিকে লিভারটী চাপিয়া ব্যতীত শুইতে পারে না। দ্বিতীয় ব্যক্তির সরস মুখ, জিহ্বা ক্লেদাবৃত, দেহটী দুর্গন্ধ ঘর্ম্মে সর্ব্বদাই আবৃত এবং কি জানি, বাম পার্শ্ব ব্যতীত শয়ন করিতে পারে না। তৃতীয় ব্যক্তির কেবলই শুষ্ক মুখ নহে—দারুণ পিপাসায় কাতর, ক্ষুধা যথেষ্ট কিন্তু কি জানি কেন,

দক্ষিণ পার্শ্ব ব্যতীত শয়ন করিতে পারে না। কোন পীড়া নাই অথচ প্রত্যেকেরই এই ভাব। এই অবস্থায় যদি সূক্ষ্মদৃষ্টি থাকে, রোগীর রোগ মুকুলেই বিনাশ করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে একজনকে **ব্রাইয়োনিয়া**, দ্বিতীয়কে **মার্কুরিয়াস** ও তৃতীয়কে **ফস্ফোরাস** দিয়া রোগীর রোগ মুকুলেই বিনাশ কর, তাহা হইলে প্রবণতা, প্রবণতার অবস্থাতেই আরোগ্য হইয়া যাইবে, রোগোৎপত্তি হইবে না।

যতদূর আলোচিত হইল, তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম (১) রোগপ্রবণতা রোগের বিকাশপথে একেবারে সূক্ষ্মতম অবস্থা না হইলেও অতি মাত্র সূক্ষ্মাবস্থা বটে, তবে স্থূলতঃ ইহাকেই সূক্ষ্মতম অবস্থা বলা যাইতে পারে। (২) এই প্রবণতা আমাদের নিজ মনন দোষের অর্জ্জিত ফল মাত্র। (৩) দেহ নির্ম্মল করিতে হইলে যে সময় **প্রবণতা** মাত্র থাকে, সেই সময়টাই চিকিৎসার সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ও সুবিধাজনক অবস্থা। (৪) আরোগ্য বিধান সম্বন্ধে প্রবণতাযুক্ত ব্যক্তির মানসিক অবস্থা অর্থাৎ ইচ্ছা, অনিচ্ছা, প্রীতি, দ্বেষ ইত্যাদির সংবাদ লইয়া তাহাদের সমষ্টি আরোগ্যকারী ঔষধকে ইঙ্গিত করিয়া থাকে।

প্রবণতা যদিও সূক্ষ্মাবস্থা, তবুও কোন্ দোষের প্রাধান্য থাকে, তাহার ইঙ্গিতমাত্রও জানা থাকিলে চিকিৎসকের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। **সোরা সাইকোসিস, সিফিলিস এবং টিউবারকুলোসিস** এই চারি প্রকার দোষের মধ্যে কেবল সোরা অথবা মিলিত দোষের সংশ্লিষ্ট প্রবণতা থাকিতে পারে। কেবল **সোরার** প্রবণতা থাকিলে মনুষ্য অসন্তুষ্ট, অস্থির-প্রকৃতি, বুদ্ধিমান, শৈত্যে ইচ্ছা থাকিলেও স্নানে অনিচ্ছা এবং দিবাভাগের দেড় প্রহর হইতে সাড়ে তিন প্রহর পর্য্যন্ত তাহার দেহের ও মনের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা খারাপ থাকে। **সাইকোসোরিক** দেহে, ব্যাকুলতা, সূচ্যগ্র বুদ্ধিমত্তা কিন্তু স্মরণশক্তির শিথিলতা এবং শুষ্ক

হইতে আর্দ্র বায়ুর পরিবর্ত্তন মাত্রে ও রাত্রি সাড়ে তিন প্রহরের পর হইতে বেলা দেড় প্রহর পর্য্যন্ত শরীর ও মনের অবস্থা সাধারণতঃ সর্ব্বাপেক্ষা খারাপ থাকে। **সিফিলোসোরিক** দেহে স্থূলমস্তিকতা, ঘর্ম্মাধিক্য, শীত, বাত আতপাদির তীক্ষ্ণতায় অসহনীয়তা, মধ্য প্রকৃতির জলবায়ুতে স্পৃহা, বিশেষতঃ শয্যাতাপে বৃদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেখানে **ত্রিদোষ** উপস্থিত সেখানে তিনেরই মিলিত অবস্থা হইতে প্রবণতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পরন্তু **টিউবারকুলার** দোষের প্রবণতা থাকিলে সর্ব্বাবস্থায় অসন্তোষ—এবং উত্তম আহারাদি সত্বেও শীর্ণতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। একেবারে সুস্থ মনুষ্যের অবস্থা অর্থাৎ নির্ভীকতা পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত থাকে,—কিন্তু সোরা দোষে ভীতিভাব আরম্ভ হইয়া ত্রিদোষে গিয়া ভীতিভাবটী পূর্ণমাত্রায় বৃদ্ধি হয়, কিন্তু আশ্চর্য্য কথা টিউবারকুলার দোষের প্রবণতার অবস্থাতেই ভীতিভাবের লোপ হইয়া বরং মনুষ্যকে স্বেচ্ছাচারী করে। আর একটী কথা বলিয়া এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। প্রবণতা অবস্থাতেই আরোগ্য করিতে হইলে অতি **উচ্চ** এমন কি **উচ্চতম** শক্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, প্রবণতাটী রোগে বিকাশ হইবার পর নিম্নতর শক্তিতে আরোগ্য হইয়া থাকে কিন্তু তৎপূর্ব্বে উচ্চতম শক্তির প্রয়োজন হইবার কারণ কি? মনে করুন টিউবারকুলার প্রবণতা জন্য কাহারও ঘন ঘন নিউমোনিয়া হইতেছে। এই নিউমোনিয়া বাহ্যস্তরের স্থূলবিকাশ এবং নিউমোনিয়ারূপ বিকাশপ্রাপ্ত পীড়া লক্ষণগুলিকে অপসারিত করিবার জন্য **ব্রাইওনিয়া** বা **মার্কুরিয়াস** বা **ফস্ফোরাস** বা সমলক্ষণ অন্য কোনও ঔষধের ৬।১২।৩০ বা উর্দ্ধতম হিসাবে ২০০ শক্তি হইলেই যথেষ্ট হয়;—পরন্তু সারে কোন্‌টী? সারে বাহ্যস্তরের বিকশিত স্থূলরূপটী মাত্র, প্রবণতাকে স্পর্শ করিতে পারে না; কেননা প্রবণতা সূক্ষ্মদেহের অবস্থা, এইজন্য লক্ষণ হিসাবে আরোগ্যকারী

ঔষধের দ্বারা অতি সূক্ষ্মস্তরে পরিবর্ত্তন ব্যতীত আরোগ্য করিতে পারে না। পীড়া যে স্তরে অবস্থিত, আরোগ্যকারী ঔষধও অতি অবশ্য সেই স্তরে উন্নীত করিতে হয়। ইহাই হইল আরোগ্যবিধায়িনী শক্তির রহস্য।

তৃতীয় অধ্যায়।

আরোগ্যের মূল উৎস কোথায়?

চাষী অতি উৎকৃষ্ট বীজ সংগ্রহ করিল, অতি উত্তমরূপে জমিটী কর্ষণ করিল, যথাসময়ে বীজগুলি বপন করিল, কিন্তু দৈব বিরোধী হইলেন, যথোপযুক্ত বারিপাত হইল না,—চাষীর সকল পরিশ্রম, সকল চেষ্টা, সকল আশা বৃথা হইল, তাহার পরিশ্রমের ফলস্বরূপ শস্য প্রাপ্তি ঘটিল না। ব্যবসায়ী বণিক ডিঙ্গার পর ডিঙ্গা সাজাইল, নানা দিগ্দেশ হইতে দ্রব্যসম্ভার একত্র করিয়া ডিঙ্গাগুলি সজ্জিত করিল, তাহার প্রবল ইচ্ছা যে, সে ঐ বাণিজ্য-সম্ভারে সুসজ্জিত ডিঙ্গাগুলি লইয়া দেশ হইতে দেশান্তরে বিক্রয় করিয়া নিজেকে ও নিজের দেশকে ধনাঢ্য করিবে, কিন্তু হায়! একখানি ডিঙ্গা নদীর চড়ায় গিয়া আটক খাইয়া রহিয়া গেল, আর একখানি ডিঙ্গা হইতে যাবতীয় দ্রব্য রাত্রিযোগে দস্যু দ্বারা লুণ্ঠিত হইল, আরও একখানি ভীষণ ঘূর্ণীপাকে পড়িয়া নদীবক্ষে নিমজ্জিত হইল,—এই প্রকার নানা দৈব-দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া বণিকের আশা তো পুরিলই না, বিপরীতপক্ষে তাহার যাবতীয় সঞ্চিত অর্থ নষ্ট হওয়ায় সে ব্যক্তি পথের কাঙ্গাল হইয়া

দাঁড়াইল। রোগীর চিকিৎসার কোনও ত্রুটী নাই, উৎকৃষ্ট চিকিৎসকদিগের হাতে চিকিৎসা চলিতেছে, ঔষধও ভাল এবং বিশিষ্ট ঔষধ-বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া প্রয়োগ চলিতেছে, সেবা, যত্ন, তদ্বিরাদির কোনও প্রকারেই অঙ্গহানি নাই, অথচ রোগীর পীড়ার কোনও উপশম নাই,—চিকিৎসকগণ কহিতেছেন,—"কি জানি কেন, রোগীর উপকারের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না, বোধ হয় জীবনীশক্তি নাই, অতএব কি আর করা যাইবে ?" এখানেও **দৈব** সাহায্য না করিলে ফলোদয় হয় না, হইলও না।

অনেকেই মুখে বলিয়া থাকেন, "ন চ দৈবাৎ পরং বলং", কিন্তু মনে প্রাণে তাহা বিশ্বাসও করেন না এবং প্রকৃত অর্থও অনুভব করেন না। যদি সকলেই তাহা করিতেন, তবে তাঁহাদের ভিতর এতখানি "অহং"এর প্রভাব লক্ষিত হইত না। আমাদের প্রত্যেক কার্য্যের পশ্চাতে ভগবৎশক্তি ক্রিয়া করিয়া থাকে এবং কার্য্যের ফল প্রাপ্তি আশা করিতে হইলে, তাঁহার সাহায্য ব্যতীত হয় না, হইতে পারে না। একথা যদি আমরা মনে প্রাণে বুঝিতাম, যদি হৃদয়ের নিভৃতপ্রদেশে অনুভব করিতাম, তাহা হইলে আমাদের মনস্তরে অন্য ভাবের চিন্তা ও ভাবনা দেখা দিত এবং বাস্তবিকই প্রতি কর্ম্মে প্রতি চিন্তায়, প্রতি পদে আমরা ঐশীশক্তির উপর নির্ভরশীল হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতাম; তাহার ফলে আমাদের হৃদয়ে "অহং-"রাক্ষসীর স্থানে ভগবানের আসনই প্রতিষ্ঠিত হইত এবং আমাদের জীবনও পবিত্র ও ধন্য হইত। কিন্তু আমরা ঐ সকল কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি না, ঐ সকল কেবল "কথার কথা" মাত্র, কেননা, মুখে যাহা বলি যদি তদনুসারে কার্য্য না করিলাম, তবে তাহা "মুখের কথা" ব্যতীত আর কি ?

আমরা যে "ন চ দৈবাৎ পরং বলম্" বা ঐ প্রকারই অর্থবোধক কথাগুলি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি না ও তদনুসারে কার্য্য করি না, তাহার প্রধান

কারণ দুইটী,—প্রথমতঃ ঐ সকল বাক্যের **যৌক্তিকতা** আমরা বুঝিতে পারি না। জলে কাপড় ভিজিয়া থাকে, একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতে বাধ্য, কেননা ইহার প্রমাণ আছে, কিন্তু উপরোক্ত বাক্যসকলের প্রমাণ স্পষ্টতঃ সম্ভব নয়; তাহা হইলেও, যদি যুক্তির দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহার ফলেও অনেকে বিশ্বাস করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, আমরা অনেক-ক্ষেত্রে যৌক্তিকতা হৃদয়ঙ্গম করিলেও বহুদিনের অভ্যাসবশতঃ গড্ডালিকা-প্রবাহে যেন ভাসমান থাকিতেই চাই। পূর্ব্বাভ্যস্ত চিন্তা-প্রবাহ ও কার্য্যধারা ত্যাগ করিয়া নূতনটী গ্রহণ করিতে যেন ঐ অভ্যাসশক্তির প্রবাহে অনেকটা অনিচ্ছুক থাকি। সাধারণ ব্যাপারে যে নীতি অবলম্বন করিলে সাংসারিক কার্য্যসকল সুশৃঙ্খলার সহিত নিষ্পন্ন হইতে পারে, সেই নীতিই অবলম্বিত হইলে আমাদের মানবজীবন সার্থক হইতে পারে এরূপ নীতি সকল আমাদের শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। ফলতঃ আমরা তাহা জানিতে অবহেলা করি এবং জানিলেও আমরা মনে করি যে, ঐ সকল নীতি অবলম্বন করিলে সংসার অচল হইবে এবং সাংসারিক কার্য্য চালাইবার জন্য নানা কৌশল (policy) নানা চাতুরী অবলম্বন করিতেই হয়। ফলতঃ ইহাপেক্ষা ভ্রান্ত ধারণা আর কিছুই হইতে পারে না। জীবন-প্রভাত হইতে প্রকৃত নীতি প্রতিপালন না করিলে মনের এ প্রকার অধঃপতন হইয়া পড়ে, এতই নীচতা আসে যে, তখন আর প্রকৃত জ্ঞানোদয় হইলেও অভ্যাসপ্রভাবে বিশেষ কিছু উন্নতি হয় না, অনেক সময় বৃথা চেষ্টা করা হয় মাত্র।

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে,—“চিকিৎসার ব্যাপারে এ সকল তত্ত্বের অবতারণা কেন?” ইহার উত্তর নিম্নে প্রদান করিতেছি। সাংসারিক কার্য্যেরও যে নীতি, চিকিৎসাকার্য্যের পশ্চাতেও সেই একই নীতি অবলম্বন করিলে তবেই চিকিৎসাকার্য্যটী সার্থক হইতে পারে, নতুবা কোনও আশা নাই। **একই নীতির উপর জগতের**

প্রত্যেক ঘটনা, প্রত্যেক ব্যাপার সংঘটিত ও পরিচালিত হইতেছে। আমাদিগকে যে কোনও কার্য্যে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে হইলে সেই একই মাত্র নীতির বশে কার্য্য করিতে হয়।

শ্রীমদ্ভাগবৎগীতা আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র হইলেও ইহার উপদেশগুলি সার্ব্বভৌম, অর্থাৎ সকল সময়ে, সকল দেশে সকল জাতি এবং সকল মনুষ্যের পক্ষেই অবলম্বনীয় ও হিতকারী,—একথা কেবল আমি বলিতেছি না,—পরন্তু প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বী উচ্চাঙ্গের প্রকৃত মহাত্মাগণও একথা তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন। জার্ম্মেনি, ইংল্যাণ্ড, এমেরিকা প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশ সমূহে এই গীতাগ্রন্থখানি নানা ভাষায় অনূদিত হইয়া পঠিত ও অবলম্বিত হইতেছে, এমন কি, বরং আমাদের দেশেই ইহা অবহেলিত হইতেছে। যাহা হউক, এই সার্ব্বভৌম গ্রন্থে যাহা যাহা লিখিত আছে, তাহার সামান্য অংশও যদি আমরা জীবনে অবলম্বন করিতে পারি, তবে আমাদের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ সাধন হইতে পারে। গীতা একস্থানে কহিয়াছেন—"প্রকৃতেঃ ক্রিয়া-মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মই প্রকৃতির গুণদ্বারা হইয়া থাকে, অহংকারবিমূঢ় ব্যক্তি আমি কর্ত্তা ইহা মনে করে। এই বাক্যটী প্রণিধান করিলেই দেখা যায় যে, এ সংসারের যাবতীয় কার্য্য **প্রকৃতির** দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, পরন্তু আমরা যে মনে করিয়া থাকি "আমরাই করিলাম", ইহা পূর্ণ মাত্রায় ভ্রান্তি।

এস্থলে প্রশ্ন হইবে, তবে কি আরোগ্য বিষয়ে চিকিৎসকের কোনও কর্ত্তব্য বা ক্ষমতা নাই ? তবে কি সাংসারিক যাবতীয় ব্যাপারে মনুষ্যের পুরুষকার বলিয়া কোনও শক্তি কার্য্য করে না ? তবে কি মনুষ্যের চেষ্টায় কিছুই হয় না ? আমরা সাধারণ সংসারী ব্যক্তি, সুতরাং জীবনের অন্যান্য দিকে পুরুষকারের সামর্থ্য কতটুকু, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া সাধারণ জনগণকে

বুঝাইতে চেষ্টা করিলে আমাদের অনধিকারীর কার্য্য করা হইবে, কিন্তু আমরা জীবনের প্রধান অংশ যে কার্য্যে ব্যয়িত করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, সেই চিকিৎসাকার্য্য সম্পর্কে নিজেদের **পুরুষকারের** শক্তির প্রভাব কতটুকু, তাহা অন্তঃকরণের সহিত যথেষ্ট ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, এবং অতিশয় দৃঢ়তা ও বিশ্বাসের সহিত তাহা আমাদের চিকিৎসক ভ্রাতাদিগের এবং আমাদের অধীনে যাঁহারা চিকিৎসা করাইবার প্রয়াসী, তাঁহাদিগকে বুঝাইতে পারি। মানবজীবনের সাধারণ ব্যাপারেও ঐ একই সত্য এবং ঐ একই নীতি ক্রিয়া করিয়া থাকে, তবে সে সকল বিষয়ে আমাদের জ্ঞান, মাত্র অনুভাবাত্মক, আংশিক ব্যবহারিক ভাবের হইলেও পূর্ণমাত্রায় ব্যবহারিক নয়, সুতরাং সে বিষয় একমাত্র ত্যাগী ও পূতচরিত্র মহাত্মাগণই আমাদিগকে পথপ্রদর্শন করিতে পারেন, আমাদিগের তাহাতে অধিকার না থাকায়, আমরা ক্ষান্ত থাকিলাম এবং কেবলমাত্র চিকিৎসা ও আরোগ্য বিষয়ে যে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছি ও যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাই এস্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি। ইহাতে আমার গৌরব বা "বাহাদুরী" দেখাইবার আদৌ কোনও অভিলাষ নাই, কেবলমাত্র যদি ইহার দ্বারা জনকল্যাণ হয়, এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া একমাত্র ভগবৎকৃপাপ্রার্থী হইবার জন্য লিখিতেছি।

স্থানান্তরে গীতাতেও উক্ত হইয়াছে যে,—"অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্‌বিধম্। বিবিধাশ্চ পৃথক চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চকম্॥" অর্থাৎ কর্ম্মমাত্রেরই সিদ্ধি-সম্বন্ধে ৫টী কারণ আছে, যথা,—ক্ষেত্র, কর্ত্তা, ভিন্ন ভিন্ন সাধন, অর্থাৎ করণ, ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া এবং পঞ্চম অর্থাৎ সর্ব্বশেষ দৈব,—ইহাই জানিতে হইবে। সুতরাং রোগীর রোগ আরোগ্য অভিপ্রেত হইলে চিকিৎসক, চিকিৎসা, ঔষধ ইত্যাদি যাহা কিছু সাধারণতঃ আবশ্যক বলিয়া আমরা জানি এবং রোগীকে অবলম্বন করিবার উপদেশ দিয়া থাকি, তাহার

মধ্যে **দৈব** একটা প্রধান সাধন অর্থাৎ **দৈবানুগ্রহ বা দৈবানুকুলতা প্রাপ্ত না হইলে আরোগ্যরূপ সিদ্ধি সুদূরপরাহত** জানিতে হইবে। দৈবানুকুল না হইলে কোনও কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। এই দৈবানুকুলতাকে ভগবদনুগ্রহই বলুন বা প্রাকৃতিক সাহায্য বা অদৃষ্ট বা প্রাক্তন, বা যে কোনও নামে অভিহিত করুন না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না, তবে আসল কথা,—এরূপ একটা অদৃষ্ট, অভাবনীয় এবং অচিন্ত্য শক্তির সাহায্য বা "যোগাযোগ" আবশ্যক, যাহার উপর মানুষের কোনও হাত নাই।

আপনি বলিবেন,—"মহাশয়, একথা আর বেশী কি কহিলেন ? ইহা ত লোকে সকলেই জানে ? একথা আবার কে জানে না যে, ভগবানের অনুগ্রহ না থাকিলে কোনও সাধনাই ফলবতী হয় না, কোনও কার্য্যই সিদ্ধ হয় না ? বাস্তবিকই সকলেই বলিয়া থাকে, "তাঁহার কৃপা ব্যতীত আশা ভরসা নাই," কিন্তু সেটা লোকের কেবল মুখস্থ কথা,—পাখীতে যেমন অভ্যস্ত নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে, ঠিক তেমনই বাঁধা বুলি হিসাবে লোকে কহিয়া থাকে। ভগবানের অনুগ্রহ পাইবার জন্য লোকে রোগী আরোগ্য অভিপ্রায়ে অনেক ক্ষেত্রে শান্তি, স্বস্ত্যয়ন ও গ্রহপূজাদিও করিয়া থাকে,—অবশ্য মনে প্রাণে আন্তরিকতার সহিত তাঁহার আরাধনা করিলে যে আরোগ্যপথে কোনও সাহায্য পাওয়া যায়, কি যায় না, তাহা আমরা বলিতে পারি না,—অবশ্য প্রার্থনার ফলপ্রাপ্তি কোনও না কোনও প্রকারে ঘটিতে পারে ; ফলতঃ তাঁহার প্রকৃতি নাম্নী শক্তির দ্বারা সাহায্য পাইলে আরোগ্য সম্পাদিত হইতে পারে, সে সাহায্য ঐ প্রকার প্রার্থনার দ্বারা পাওয়া যায় কিনা, আমরা বলিতে পারি না। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে তাঁহার সৃষ্ট নীতি অপরিহার্য্য, অলঙ্ঘনীয়, সুতরাং কেবলমাত্র শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি প্রার্থনার দ্বারা সেই নীতি সকল সময়ে নিবারিত হয় না,—ইহা আমরা দেখিয়া

থাকি। অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে এবং যদি অগ্নির দ্বারা আমাদের শরীরের কোনও স্থান দগ্ধ হয়, তবে শত শত স্বস্ত্যয়নাদি প্রার্থনা সাহায্যেও ঐ দগ্ধ স্থানের সন্তাপ, ক্ষত, ইত্যাদি নিবারিত হয় না, হইতে পারে না। তাহা ছাড়া, রোগীর রোগ আরোগ্যকল্পে প্রকৃতির সাহায্য প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তির পশ্চাতে রোগীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মশক্তি ক্রিয়া করিতে থাকে এবং সেই কর্ম্মের ফলস্বরূপেই ঐ সাহায্য প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি স্থিরীকৃত হইয়া থাকে,—এক্ষণে কেবল প্রার্থনাদির দ্বারা কোনও প্রকার ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভবপর হয় বলিয়া আমাদের মনে হয় না। যাহা হউক, উপরোক্ত বাক্য, অর্থাৎ ভগবৎ সাহায্য ব্যতীত আরোগ্য আসিবে না, একথা যদি আমরা প্রত্যেকেই মনে প্রাণে অনুভব করিতাম, তাহা হইলে আমাদের কার্য্যকলাপ অন্য প্রকার হইত, অর্থাৎ আমরা প্রাণান্তেও প্রাকৃতিক নীতি লঙ্ঘন করিতাম না। আমরা উহা মনে প্রাণে কখনও অনুভব করি না। তাহা যদি করিতাম তবে কি বারবণিতার সহিত প্রণয় ও তাহাতে উপগত হইয়া নিজের সর্ব্বনাশ করিতাম? তাহা হইলে কি জগতের যাবতীয় সৃষ্টপ্রাণীর সহিত প্রেম বন্ধনের পরিবর্ত্তে তাহাদের অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া নিজেদের মনের অধঃপতন ও অধোগতি অর্জ্জন করিতাম? প্রাকৃতিক নীতিসকল, যে সকল নীতির উপর জগদীশ্বরের বিশ্ব সংসার বিধৃত ও প্রতিষ্ঠিত, সেই নীতিগুলির অবাধে লঙ্ঘন করিব, প্রাকৃতিক নীতির একমাত্র অবলম্বনের ফলেই জীবন ও সুখশান্তি, একথা কর্ণেও তুলিব না, আর বিপদে পড়িলেই প্রার্থনা করিব ও উদ্ধার পাইব,—এ প্রকার ব্যবস্থা থাকিলে, বিশ্বরূপ বিশ্বাত্মা বিরাট পুরুষের সৃষ্টি একদিনেই লোপ পাইত। কোনও মহাপুরুষকে অথবা ভগবান্‌কে আমাদের ভক্তি করা হয়, কেবল তখনই, যখন তাঁহাদের নীতিগুলি প্রতিপালন করি, নতুবা অন্য কোনও প্রকার ভক্তি কেবল কথার কথা। কেবল তাহাই নয়,—নীতি লঙ্ঘন করিলে তাহার জন্য ফলভোগ ব্যতীত

অন্য কোনও প্রকার প্রায়শ্চিত্ত নাই, একথা সর্ব্বদাই স্মরণ করিতে হইবে।

যদি প্রাকৃতিক নিয়মাদি লঙ্ঘন না করা হয়, তবে ত ব্যাধিদুঃখ আসিতেই পারে না,—পরন্তু মানবদেহ ধারণ করিয়া সকলেই, অন্ততঃ অনেকেই, কোন প্রকারে নয়, কোনও প্রকারে, ভগবৎনীতি লঙ্ঘন করিয়া ফেলে, ইহা নিত্যই দেখা যায়। যেখানে ঐ প্রকার লঙ্ঘন স্বল্প বা লঘুজাতীয়, সেখানে ব্যাধিদুঃখও অতি সামান্য এবং অল্পায়াসেই তাহা আরোগ্য হইয়া যায়। ফলতঃ যেখানে বার বার তাঁহার সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের পশ্চাতে প্রকৃতি নাম্নীয় শক্তির বিরুদ্ধে কার্য্য করা হয়, সেখানে ব্যাধি-দুঃখের প্রকৃতি ও পরিমাণও সেই প্রকারই হইয়া থাকে। সে প্রকার গুরুতর ক্ষেত্রে, চিকিৎসা এবং তৎসংক্রান্ত ব্যবস্থাও অবশ্য বিশেষ প্রকারেরই অবলম্বন আবশ্যক হইয়া পড়ে। সে অবস্থাতেও যদি রোগী সুপথগামী না হয়, যদি পুনঃ পুনঃ দুরাচারী ও নিয়ম লঙ্ঘনরূপ পাপপথটী পরিত্যাগ না করিয়া ঐ পথেই লিপ্ত থাকে, সে অবস্থায় তাহার আরোগ্যের সম্ভাবনা আর থাকে না, অর্থাৎ ভগবৎকৃপার অধিকারী হইতে সে নিজেকে বঞ্চিত করে।

আপনাদের মনে একটী প্রশ্ন আসিবে,—"কই, ভগবৎকৃপা এখানে কোথায়? রোগী পীড়িত হইল, তাহার চিকিৎসা হইলে সে আরোগ্য হইবে, এখানে ভগবৎকৃপার আবশ্যকতা কি? রোগ হইলেই চিকিৎসা প্রথা আছে, তদনুসারে চিকিৎসা হইলেই ত রোগী সারিবে,—ভগবান্ নাইবা কৃপা করিলেন?" যদি চিকিৎসা কার্য্যে কিছুদিন ধরিয়া কেহ বিশিষ্টভাবে মনোনিবেশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি যেখানে যেখানে আরোগ্য করিতে সক্ষম হইবেন, সেখানেই তৎপশ্চাতে তাঁহার কৃপা অতি অবশ্যই লক্ষ্য করিবেন। আপনি কি প্রত্যেক রোগীকেই আরোগ্য করিতে

পারেন? আপনি তাহা পারেন না। কেন পারেন না, ইহা যদ্যপি চিন্তা করিয়া থাকেন, আরোগ্য না হইবার কি কারণ, তাহা যদি আপনি স্থিরভাবে পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তবে আপনি ভগবৎকৃপার সন্ধান পাইয়াছেন। আপনি দেখিবেন, যে যে বাহ্য কারণে আমাদের চিকিৎসাকার্য্যের অসুবিধা ঘটে, তাহার কোনওটীই যদিও না থাকে, যদিও যথারীতি সংবাদ দেওয়া, ঔষধ সেবন, সেবা, বত্ন, ইত্যাদির কোনও ক্রটীও না থাকে, তবুও দেখিবেন, দৈব বা ভগবৎবিধান বলিয়া কোনও জিনিষ আরোগ্য হইতে দিতেছে না। আপনি চিন্তা করিয়া দেখিবেন,—রোগীকে আরোগ্য করিবার বাহ্য সাধন বা উপায়,— আপনার দ্বারা সুনির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগ। **ঔষধ নির্ব্বাচন করিবার পূর্ব্বে আপনার রোগীতে লক্ষণ-সমষ্টি থাকা চাই।** এই লক্ষণসমষ্টিই রোগীর আভ্যন্তরীন পীড়ার বাহ্য প্রতিরূপ। ফলতঃ এই প্রতিরূপটী প্রাপ্ত না হইলে, আপনার ঔষধ নির্ব্বাচন অসম্ভব এবং রোগীর বাঞ্ছিত আরোগ্যটীও সুদূরপরাহত। সুতরাং আপনার বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, আপনার ক্ষমতাটী অতি অসীম, অতি সঙ্কীর্ণ, যেহেতু প্রতি পদে আপনাকে রোগীর লক্ষণ-সমষ্টির উপরেই নির্ব্বাচন করিতে হয় এবং **এই লক্ষণসমষ্টি থাকা বা না থাকার উপরেই আপনার কৃতকার্য্যতা বা অকৃতকার্য্যতা নির্ভর করিতেছে।** আপনি খুবই উচ্চাঙ্গের চিকিৎসক, এ কথা আমি অস্বীকার করিতেছি না, কিন্তু আপনি যতই বড় চিকিৎসক হউন না কেন, লক্ষণ-সমষ্টি না পাইলে আপনার হাত কি?

এই লক্ষণ-সমষ্টি, যাহা রোগারোগ্য কার্য্যের প্রধান সাধন, তাহাই আপনার হাতের বাহিরে, সম্পূর্ণ বাহিরে,—তাহার জন্য **আপনাকে প্রকৃতির উপর নির্ভর করিতেই হইবে।** যেখানে কোনও

রোগীর দেহযন্ত্র এরূপ শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে আর মেরামতের কোনও উপায় নাই, সেখানে প্রকৃতিও কোনও লক্ষণ-সমষ্টি দ্বারা চিকিৎসকের সাহায্য প্রার্থনা করেন না, সুতরাং সেখানে চিকিৎসকও নিরুপায়। একথা যদি আপনি এতকাল চিকিৎসা করিয়াও না বুঝিয়া থাকেন, তবে প্রকৃতির মর্ম্মকথা, চিকিৎসার রহস্য, ভগবানের সহিত তাঁহার সৃষ্ট মানবের সম্বন্ধ এবং মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আপনার আদৌ কিছু বুঝা হয় নাই, আপনি কেবল মিষ্টান্নের দোকান করেন,—মিষ্টান্নের স্বাদ-গ্রহণে এখনও সমর্থ হন নাই। আপনি যদি নিজের "অহং" বা দম্ভভাব ত্যাগ করিয়া প্রকৃতির তথ্য বুঝিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে সমর্থ হইতেন; কিন্তু নিজের শক্তির বা বুদ্ধিমত্তার উপরেই আপনি নির্ভর করিয়া একাল পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া আসিতেছেন, আপনার শক্তি যে নিতান্ত সীমাবদ্ধ,—তাহা একবারও অনুভব করেন নাই।

যে লক্ষণ-সমষ্টির উপরেই ঔষধ নির্ব্বাচন ও আরোগ্য নির্ভর করিয়া থাকে, তাহাই যদি চিকিৎসকের হাতে না থাকে, তবে যে **প্রকৃতিই একমাত্র আরোগ্য বিধায়িনী,** সে বিষয়ে সন্দেহ কি? **তিনিই লক্ষণ-সমষ্টি প্রদান করিবেন, তবেই চিকিৎসকের কৃতিত্ব।** চিকিৎসকের যাবতীয় জ্ঞান, চেষ্টা, ইত্যাদির সাফল্য নির্ভর করে প্রকৃতির লক্ষণ-সমষ্টি প্রদানের উপর। রোগীর রোগটী আরোগ্যের একমাত্র সহায়,—প্রকৃতিদত্ত লক্ষণ-সমষ্টি,— এই লক্ষণ-সমষ্টির অভাবে চিকিৎসকের যাবতীয় পরিশ্রম ও চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল। লক্ষণ-সমষ্টির দ্বারা প্রকৃতি যেন চিকিৎসকের সাহায্য অন্বেষণ করিয়া থাকেন,—ঐ লক্ষণ-সমষ্টিই তাঁহার ভাষা।

উপরোক্ত লক্ষণ-সমষ্টি দুইটী অবস্থায় থাকে না। প্রথম অবস্থায় এবং সর্ব্বশেষ অবস্থায় কোনও প্রকার লক্ষণ-সমষ্টি থাকে না, সুতরাং ঔষধ

নির্ব্বাচনও হয় না এবং কোনও প্রকার যা তা একটী ঔষধ প্রয়োগ করিলেও কোনও ফল হয় না, কেননা উহা প্রকৃত লক্ষণ-সমষ্টির সাদৃশ্যে নির্ব্বাচিত না হওয়ায় জীবনীতন্ত্রীতে আদৌ কোনও ঝঙ্কার উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। উপরোক্ত দুইটী অবস্থা আমাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে এবং লক্ষণ-সমষ্টির অভাব হইলে ঔষধ নির্ব্বাচন ও প্রয়োগ কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে হইবে। ঐ দুইটী অবস্থা একে একে বর্ণিত হইতেছে।

কোনও রোগী যখন কোনও প্রকার শারীরিক বা মানসিক অত্যাচারের ফলে অসুস্থ হয়, তখন সর্ব্বপ্রথমাবস্থায় অস্নান, উপবাস ও বিশ্রামাদির প্রয়োজন হইয়া থাকে, সে অবস্থায় ঔষধের কোনও **প্রয়োজন** নাই, সুতরাং প্রকৃতিও কোনও প্রকার লক্ষণ-সমষ্টি প্রদান করিয়া বাহির হইতে সাহায্য চাহেন না,—কেননা, আভ্যন্তরীণ আবর্জ্জনাদি উপবাস প্রভৃতি কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করিলেই দূর হইয়া যাইবে, তখন জীবনীশক্তি আপনার নিজের শক্তির দ্বারাই অস্বস্থিভাবের অবসান করিয়া পূর্ব্ব-স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দভাবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন। যেহেতু বাহিরের কোনও শক্তির সাহায্য আবশ্যক নাই, এজন্য লক্ষণ-সমষ্টিও প্রস্ফুটিত হয় না। হ্যানিম্যান্ এ অবস্থাটীকে "Indisposition" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এ অবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ নিরর্থক,—একেই ত **অনাবশ্যক** বিধায় লক্ষণ প্রস্ফুটিত হয় না, অতএব নির্ব্বাচনও হয় না, তাহার উপর উপবাসাদি প্রকৃত প্রয়োজনীয় কষ্টগুলি অবলম্বন করিতে অনিচ্ছুক হইয়া এবং শীঘ্রতর নিরাময় হইবার উদ্দেশ্যে কোনও চিকিৎসকের দ্বারা যদি জোর করিয়া কোনও ঔষধ প্রদত্ত হয়, তাহা কেবলই যে নিরর্থক হয়, তাহা নয়, রোগীর পক্ষে ঘোর **অনিষ্টের** সৃষ্টি করিয়া থাকে। ম্যালেরিয়া জরভাব হইবামাত্র ২য় দিনেই জোলাপ দেওয়া এবং কুইনাইন প্রয়োগ করা "চিকিৎসা" পদবাচ্য নয়,—ইহা কেবল একটী "জবরদস্তি" ব্যবস্থা মাত্র এবং

ইহার কুফল নিত্যই লক্ষিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, উপরোক্ত অবস্থাদ্বয়, যেখানে লক্ষণসমষ্টির প্রকাশ থাকে না, তাহাদের মধ্যে এটী ১ম অবস্থা জানিতে হইবে।

অন্য আরও একটী অবস্থা, যেখানে কোনও লক্ষণসমষ্টি প্রকাশিত থাকে না, সেটী রোগের একেবারে চরম অবস্থা। কেবলই চরম অবস্থা নয়, সেটী আর "রোগ" নয়, রোগের শেষ ফল প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে, ইংরাজীতে যাহাকে ultimate বা final result কহে, তাহাই হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে আরোগ্য অসম্ভব, কেননা জীবনীশক্তি নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়া "অসাড়" ভাবে আছেন, রোগীর রোগ আরোগ্য করিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করেন না, করিবার ক্ষমতাও নাই। এক্ষণে কেবলমাত্র রোগের পরিপক্ক ফলটী মাত্র সর্ব্বসম্পূর্ণ আকারে লোকলোচনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। ইতিপূর্ব্বে জীবনীশক্তি বহুবার বহুভাবে চেষ্টা করিয়াছেন এবং তখন লক্ষণ-সমষ্টিও বিকাশ করিয়া চিকিৎসকের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু বার বার চেষ্টা করিয়াও তিনি প্রকৃত সাহায্য পান নাই, শেষে অতি মাত্র ক্লান্ত হইয়া "হাল ছাড়িয়া" দিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছেন, আর মেরামতের উপায় নাই, মেরামতের পরপারে গিয়াছে, রোগের সাধ্যসীমা অতিক্রম করিয়াছে, সুতরাং লক্ষণ-সমষ্টি বিকাশ করিবার প্রয়োজনও নাই, ক্ষমতাও নাই। এক্ষণে "হুকা ও তাহার নলিচা" এই দুইটীরই পরিবর্ত্তন আবশ্যক, অর্থাৎ মৃত্যু দ্বারা দেহটী পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক। এ অবস্থাতেও লক্ষণ-সমষ্টির বিকাশ থাকে না, জানিতে হইবে।

যাহা যাহা আলোচিত হইল, তাহা হইতে বুঝিতে পারা গেল যে, **প্রকৃত প্রস্তাবে প্রকৃতিদেবীই আরোগ্যের মূল উৎস।** তিনি লক্ষণসমষ্টি বিকাশ করিলে, তবেই চিকিৎসক তৎসাদৃশ্যে ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে পারেন, নতুবা তাঁহার সাধ্য নাই। তাঁহার লক্ষণ-

সমষ্টির বিকাশকেই আরোগ্যের ভিত্তি বলিয়া জানিতে হইবে। এই লক্ষণসমষ্টির বিকাশকে তাঁহার দয়া বলিতে হয়, বলুন, কোনও আপত্তি নাই, ভগবৎ কৃপা বলিতে হয় বলুন, তাহাতেও কোনও আপত্তি নাই,—ফলতঃ আসল কথা, তাঁহার দেওয়া লক্ষণসমষ্টি ব্যতিরেকে কোনও উপায় নাই। এই কৃপা বা দয়া,—ইহাও রোগীর কর্ম্মফলসঞ্জাত এবং তিনি স্বেচ্ছাচারিণী নহেন, তিনি রোগীর কর্ম্মফলের অনুসারেই কার্য্য করিয়া থাকেন,—আরও বিশিষ্টভাবে এই কথাটী কহিতে হইলে বলিতে হইবে যে, ভগবৎনীতিই এই প্রকার এবং সেই নীতি অনুসারেই যেরূপ সৃষ্টি, স্থিতি, লয়াদি ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে,—রোগীর আরোগ্যও ঐ একই নীতির বশে সংঘটিত হইয়া থাকে, দ্বিতীয় নীতি বা দ্বিতীয় ব্যবস্থা নাই। সুতরাং গীতার বাণী পূর্ণমাত্রায় প্রমাণ হইতেছে, যথা "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি—" ইত্যাদি।

"আরোগ্য" কাহাকে বলে ?

আরোগ্য কাহাকে বলে ?—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সাধারণ লোকে অবশ্যই কহিবে,—"কেন মহাশয়, রোগের যাতনা কষ্ট এবং লক্ষণাদি না থাকিলেই জানা যায়, আরোগ্য হইয়াছে। যদি কাহারও জর হইয়াছে, তবে জরটী আর না আসিলেই জানা গেল, রোগী আরোগ্য হইয়াছে; যদি কাহারও চর্ম্মপীড়া হইয়া থাকে, তবে সেগুলি অদৃশ্য হইলেই জানা যায়, পীড়াটী আরাম হইয়াছে।" অর্থাৎ যে পীড়া হইয়াছে, তাহার বাহ্যিক লক্ষণগুলি অপসারিত হইলেই সাধারণতঃ তাহাকে আরোগ্য বলা হইয়া থাকে। কিন্তু কি ভাবে সেগুলিকে অপসারিত করা হয়, বা তাহার

ফলে রোগীর নিজের মধ্যে কি অবস্থা আসে অর্থাৎ লক্ষণগুলির অপসারণের ফলে রোগীর স্বাচ্ছন্দ্য আসে কিনা সে বিষয়ের কোন চিন্তা আদৌ আবশ্যক বলিয়া মনে করে না,— যে কোন প্রকারেই হউক, লক্ষণগুলি যাইলেই হইল। কোনও এক ব্যক্তির ম্যালেরিয়া জ্বর হইয়াছে এ অবস্থায় একটী উগ্রবীর্য্য ঔষধ যথা, কুইনাইন বা আর্সেনিক ইত্যাদির সাহায্যে যদি জ্বরটীকে বন্ধ করা হইল, তবে তাহা সাধারণতঃ আরোগ্য পদবাচ্য হইয়া থাকে, কিন্তু যদি ঐভাবে জ্বরটীকে নিরোধ করিবার ফলে, রোগীর বিবমিষা বা বমনেচ্ছা, অক্ষুধা, অনিদ্রা, হৃদ্‌কম্পন ইত্যাদি লক্ষণের উদয় হয়, তাহাতে লোকে বলিবে,—"জ্বরটা ভাল হইয়াছে, ঐ সকল কষ্ট স্নানাহারের সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া যাইবে।" যদি কাহারও বাতের বেদনা হয়, আর যদি চিকিৎসার ফলে বেদনাগুলি চলিয়া যায়, তাহা হইলেই আরোগ্য হইল, কিন্তু ঐ আরোগ্যের ফলে যদি রোগীর হৃৎপিণ্ডের মধ্যে কোনও কষ্ট দেখা দেয়, অথবা শিরঃপীড়া আসিয়া জোটে, তবে লোকে বলিয়া থাকে,— বাতরোগটী গিয়াছে, এক্ষণে অন্য পীড়া আসিয়াছে,—এজন্য চিকিৎসা করিতে হইবে। ইহার সঙ্গে বাতের বেদনা বা তাহার চিকিৎসার কি সম্বন্ধ আছে ? "আসল কথা, যে কোন প্রকারেই হউক, বাহ্যলক্ষণের তিরোভাব সংঘটনই আরোগ্য এবং যে উপায়ে তাহা সংঘটিত হইতে পারে, তাহাই চিকিৎসা !

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আবিষ্কার হইবার পূর্ব্বে আমাদের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের অনুজ্ঞানুসারে মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য উৎপাদন করিতে পারা আরোগ্যের প্রধানতম বা একমাত্র নিদর্শন বলিয়া কথিত আছে। তাহা ছাড়া, অন্যান্য অর্ব্বাচীন চিকিৎসা প্রথানুসারে এ সম্বন্ধে কোনও প্রকার নিদর্শন আদৌ আবশ্যক বলিয়াই বিবেচিত হয় নাই,—অর্থাৎ বিকাশপ্রাপ্ত লক্ষণ সকলের যে কোনও প্রকার তিরোভাব ঘটাইতে পারিলেই আরোগ্য

বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। হোমিওপ্যাথি এ সম্বন্ধে আরও অধিকতরভাবে আরও সূক্ষ্মতর রাজ্যে, প্রবেশ ও অনুসন্ধান করিয়া **প্রকৃত আরোগ্যের** কতকগুলি **নিদর্শন** সাব্যস্ত করিয়াছে। হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রে একদিকে চিকিৎসানীতি যেরূপ উদার ও উচ্চস্তরের, ইহার অনুমোদিত এবং আদিষ্ট চিকিৎসার ফলও সেইরূপ মহান ও স্থায়ী। হোমিওপ্যাথি একদিকে যেমন রোগের চিকিৎসা করে না,—পরন্তু রোগীরই চিকিৎসা করিয়া থাকে, ইহার ফলও তেমনই সত্য এবং যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার আরোগ্য কেবল রোগ-লক্ষণগুলির যে কোনও প্রকারের তিরোভাবের উপর নয়,—ঐ তিরোভাব একটী নীতি অনুসারে, একটী শৃঙ্খলানুসারে হওয়া চাই। অবশ্য, তিরোভাব অভিপ্রেত হইলেও, যে কোন প্রকারে তিরোভাব অভিপ্রেত নয়, আবশ্যকও নয়, তিরোভাবের পশ্চাতে একটী শৃঙ্খলা থাকা চাই। এ সম্বন্ধে পূর্ণ ও পরিষ্কারভাবে আলোচনা করিতে হইলে, ইহার রোগতত্ত্ব এবং আরোগ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আভাস না দিলে চলে না।

কোনও একটী রোগীর পেটে একটী অর্ব্বুদ হইয়াছে, কেন হইল? রোগীটীর জীবনীশক্তি যদি স্বাভাবিকভাবে কার্য্য করিতে পারিত, তবে ঐ প্রকার একটী অদ্ভুতগঠন কখনই হইত না। একটী রোগশক্তি আসিয়া জীবনীশক্তিকে স্বাভাবিক কার্য্য করিতে বাধা দেওয়ায় জীবনীশক্তি স্বাভাবিকভাবে কার্য্য করার পরিবর্ত্তে অস্বাভাবিকভাবে কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছে। এক্ষণে যদি কেহ ঐ অর্ব্বুদটীকে ছুরিকার দ্বারা কাটিয়া ফেলে অর্থাৎ বাহ্যবিকাশটীকে অপসারিত করে, তবে তাহাকে চিকিৎসাও বলা চলে না অথবা আরোগ্যও বলা চলে না। কেননা জীবনীশক্তির অস্বাভাবিকভাবে কার্য্য করাই রোগ,—সেই রোগের কোনও প্রতীকার ত হইল না, রোগের ফলটীকে, রোগের দ্বারা সংঘটিত স্থূল ও বাহ্যফলটীকে

অপসারিত করিলে কি হইবে ? যাহাতে জীবনীশক্তির স্বাভাবিকভাবে কার্য্য করিবার অবস্থাটী ফিরিয়া আসে, তাহাই দেখিতে হইবে। কিসে তাহা হইবে ? রোগীর যাবতীয় লক্ষণসমষ্টির সাদৃশ্যে একটী ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া প্রয়োগ করা আবশ্যক,—তাহার ফলে প্রকৃত আরোগ্যকার্য্য আরম্ভ হইবে এবং কুগঠন, অগঠন, অদ্ভুদ্ গঠনাদি রহিত হইবে এবং পুষ্টির অভাবে অর্ব্বুদটী অদৃশ্য হইবে। তবেই তাহাকে প্রকৃত আরোগ্য বলা যায়, নতুবা **কারণ থাকিতে কার্য্য কি প্রকারে ধ্বংস হইবে ?**

অর্ব্বুদটী কি ? এটী একটী কুগঠন। কেন হইল ? জীবনীশক্তির কার্য্যই গঠন করা,—কিন্তু যে জীবনীশক্তি সুস্থাবস্থায় থাকিলে, মানব শরীরের রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, এবং ওজঃ প্রস্তুত করিতে থাকে, তাহাই এক্ষণে বিশৃঙ্খলাপ্রাপ্ত হওয়ায়, স্বাভাবিক গঠনের পরিবর্ত্তে অস্বাভাবিক গঠন বা কুগঠন করিতেছে। এক্ষণে যদি কেবলমাত্র ঐ বিশৃঙ্খলাযুক্ত জীবনীশক্তির দ্বারা সংগঠিত অর্ব্বুদটীকে অস্ত্রোপচার সাহায্যে অপসারিত করা হয়, তবে কেবল **ফলটী** মাত্র দূরীভূত হইল, মূল বিশৃঙ্খলার কিছুই করা হইল না। চিকিৎসা কাহাকে কহিব ? চিকিৎসা তাহাকেই কহিব, যাহার সাহায্যে বিশৃঙ্খলাযুক্ত জীবনীশক্তিটী সুশৃঙ্খলভাবে, অপ্রতিহতভাবে কার্য্য করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করাই চিকিৎসা—এবং তাহা একটীমাত্র পথেই হইয়া থাকে অর্থাৎ রোগীর যাবতীয় লক্ষণসমষ্টির সাহায্যে নির্ব্বাচিত ঔষধের নির্ব্বাচন ও যথাযোগ্য শক্তিতে প্রয়োগ। এতদ্ব্যতীত কেবল ফলটীকে অপসারিত করিলে কিছুই হইল না, কেবল রোগীর অসুবিধাটী কিছুদিনের জন্য দূরে গেল মাত্র,—স্থায়ী আরোগ্য হইল না, কেননা ঐ বিশৃঙ্খলাযুক্ত জীবনীশক্তি পুনরায় অন্য স্থানে অর্ব্বুদ গঠন করিতে পারে বা নানা কুগঠন,

অগঠনাদি উদ্ভূত করিয়া শরীরটীকে নানা ভাবে বিনষ্ট করিতে পারে।

প্রকৃত আরোগ্যের একটী সর্ব্বপ্রধান নিদর্শন,—**মনস্তরের নির্ম্মলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য**; বাহ্যফল যতই অপসারিত হউক না কেন, রোগীর মনস্তরের মধ্যে সর্ব্বাদৌ হিতপরিবর্ত্তন কদাচ আসিবেই না,—যতক্ষণ না প্রকৃত আরোগ্য আরম্ভ হয়। প্রকৃত আরোগ্যের পন্থা,—**সমলক্ষণসূত্রে নির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগ**। যেখানে অন্ত পন্থা বা নীতি অনুসারে চিকিৎসা হয়, সেখানে আরোগ্য আসে না এবং আরোগ্যের নিদর্শনস্বরূপ মনস্তরের নির্ম্মলতাও পাওয়া যায় না। অতএব যে কোনও পন্থাকে আরোগ্যপন্থা বলা যায় না। কাহারও উদর মধ্যে নিরতিশয় যাতনা হইতেছে,—একজন চিকিৎসক আসিয়া একটী মরফিয়া ইঞ্জেক্সন দিয়া চলিয়া গেলেন, এদিকে রোগীও নিদ্রাভিভূত হইল। ইহাকে আরোগ্য বলা যায় না। কোন একটী মাদক বা অবসাদক দ্রব্যের সাহায্যে রোগীকে অভিভূত করিয়া রাখিলে রোগী কিছুক্ষণের জন্য বেদনা অনুভব করিতে পারিল না বটে, কিন্তু এই ক্রিয়াটী মাত্র "অনুভূতি-লোপসাধন",—আরোগ্য সম্পাদন নয়, কেননা অতি অল্পক্ষণ পরেই দ্বিগুণ বেদনার উদয় হইবে, তখন আর মরফিয়া ইঞ্জেক্সন করিলেও কোনও ফল হইবে না। এই প্রকার অনুভূতি লোপ করার ফলে আবার রোগীর নিরতিশয় ক্ষতি হয়, কেননা প্রকৃত আরোগ্যের পক্ষে অনেক বাধা ঘটে। যাহা হউক, কাহাকে আরোগ্য পন্থা বলে অথবা কাহাকে প্রকৃত আরোগ্য বলে এ বিষয়ে সাধারণের মধ্যে একটী প্রকৃত জ্ঞান আনিতে পারিলে তাহারাই চিকিৎসা পথটী বাছিয়া লইতে পারে। অতএব এ সকল উপদেশ যতই সাধারণের মধ্যে বিস্তার ও প্রচার হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। লোকশিক্ষা বড়ই আবশ্যক,

যেহেতু লোকে আসল তত্ত্ব জানে না বলিয়াই আপাতমনোরম পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকে এবং শেষে কত সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হয়, তাহা আমরা নিত্যই দেখিতেছি।

রোগের গতি ও আরোগ্যের গতি।

আমাদের দেশের বহু পুরাতন আর্য্যঋষিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময়ের চিকিৎসা-বিশারদ মণিষীগণ পর্য্যন্ত সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, সৃষ্টি বা স্বাস্থ্যের গতি ভিতর হইতে বাহিরে, অর্থাৎ কেন্দ্র হইতে পরিধির দিকে—এবং রোগ অথবা ধ্বংসের গতি ঠিক তদ্বিপরীত। ব্যাপারটী তত সহজভাবে বুঝিবার নয়, এজন্য সামান্য আলোচনা আবশ্যক। সৃষ্টির গভীরতম তত্ত্বের ভিতর প্রবেশ না করিয়া সাধারণতঃ আমরা যাহা যাহা নিত্যই লক্ষ্য করিয়া থাকি, তাহার দ্বারাই বিষয়টী পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিব।

একটী ক্ষুদ্র বটবীজ নিতান্ত নগণ্য হইলেও তাহার ভিতর যেন অনন্তশক্তি ও অমিততেজঃ অন্তর্নিহিত রহিয়াছে বলিয়া আমরা বেশ অনুভব করিতে পারি। আজি যে বীজটী অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য বলিয়া মনে হয়, কিছুদিন পরেই দেখা যায় যে, ঐ বীজটীই একটী বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। আরও কিছুদিন পরে আরও প্রকাণ্ড, এবং দুই দশ বৎসর অতিবাহিত হইবার পর উহাই একটী দুর্জ্জয় মহীরুহরূপে দণ্ডায়মান হইয়া শত সহস্র জীবের আবাস ও আশ্রয়স্থল হইয়াছে। যদি ক্রম-বৃদ্ধি না হইয়া থাকে, তবে ক্ষুদ্র হইতে

এত বৃহতের পরিণতি কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? ঐ বীজের অভ্যন্তরীণ শক্তিটা ভিতর হইতে বাহিরের দিকে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া গঠন বা সৃষ্টিকার্য্যে সহায়তা করিতেছে। প্রত্যেক বর্দ্ধমান দ্রব্যেরও এই প্রকার **ভিতর হইতে বাহিরের দিকে** ক্রমবিকাশটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। আবার, আরও মনোযোগসহকারে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, যদি কেহ ঐ বটবৃক্ষটীর উপর একটা অস্ত্রচ্ছেদ করে, তবে কিছুদিন পরে ঐ ছেদটী আপনা আপনিই যেন আরোগ্য হইয়া যায়। কে উহাকে আরোগ্য করিল? কিসে বা কিরূপে উহা আরোগ্য হইল? ঐ বৃক্ষের অভ্যন্তরশক্তি যাহা উহার ক্রমবর্দ্ধনের পশ্চাতে রহিয়াছে, সেই শক্তিই ভিতর হইতে ঐ ছেদের আরোগ্যকার্য্য সম্পাদন করিয়াছে; ইহা বুঝা বিশেষ কঠিন নয়। বাহির হইতে জল, বাতাস, রৌদ্র ইত্যাদি সাহায্য করে বটে, কিন্তু সে সাহায্যও তাহারা নিজেরা করে না, ঐ বৃক্ষের অভ্যন্তর শক্তি বাহিরের সাহায্যগুলিকে লইয়া ভিতর হইতে বাহিরে প্রেরণ করিয়া থাকে। অগ্রে শক্তিটী ঐ ঐ সাহায্যগুলিকে যেন আপন ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিয়া লয় এবং তাহার পর যেখানে যতটুক প্রয়োজন, ঠিক সেই ভাবে সেখানে ততটুক্ সঞ্চয় হইতে বিভাগ করিয়া দেয়,—ফলতঃ তাহার **গতিটী ভিতর হইতে বাহিরে।** আমাদের দেহেরও পুষ্টি ও বর্দ্ধনের নিমিত্ত বাহির হইতে খাদ্য, জল, বায়ু ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় বটে, কিন্তু সর্ব্বাদৌ ঐ সকল সাহায্য জীবনী-শক্তির দ্বারা পরিপাক করিয়া লইবার পর শরীরের স্থান-বিশেষের আবশ্যকতা বা চাহিদা অনুসারে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। প্রথমে জীবনীশক্তি ঐ সাহায্যগুলিকে যেন আপনার করিয়া লয়, তাহার পর যথামত সঞ্চার করে,—ফলতঃ ইহারও গতি ভিতর হইতে বাহিরে।

কাহারও জ্বর হইয়াছে, দুইদিন গেল, তিনদিন গেল, জ্বরের কোন

বিরাম নাই, ক্রমে দেখা গেল যে, জ্বরটী প্রাতঃকালে সামান্য কম হইয়া তাহার পর বাড়িতে থাকে, আবার পরদিন প্রাতঃকালে কম হইয়া ৯।১০টার সময় হইতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়,—ফলতঃ পূর্ব্বদিনের তুলনায় পরদিনের জ্বর এক ডিগ্রি করিয়া অধিক হইতেছে। এ অবস্থায় সকলেই স্থির করিলেন যে, টাইফয়েড জ্বর আসিতেছে, এ সকল তাহারই পূর্ব্বানুষ্ঠান মাত্র। যাহা হউক, এই অবস্থায় হয়ত ছয়দিন গত হইয়াছে, এরূপ সময় কোনও কৃতী ও উচ্চশ্রেণীর হোমিওপ্যাথ আসিয়া লক্ষণ-সাদৃশ্যে হয়ত **সালফার** বা **সোরিনাম** প্রয়োগ করিলেন। তাহার ফলে দেখা গেল যে, পরদিন প্রাতঃকালে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে **হাম** বাহির হইয়াছে, ক্রমে সর্ব্বাঙ্গটী প্রচুর পরিমাণে হামের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল,—কিন্তু আশ্চর্য্য কথা, হাম বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জ্বরটী ত্যাগ হইয়া গেল। এক্ষণে হামগুলি বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্বরত্যাগ হইয়া যাওয়া,—ইহার মধ্যে কি তথ্য আছে, অবশ্যই অনুসন্ধান করিতে হয়। এরূপ ক্ষেত্র কখনও কল্পনাপ্রসূত নয়, অনেকেই এরূপ ক্ষেত্র স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। উদ্ভেদগুলি বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পীড়ার ধ্বংস হইয়া গেল। এক্ষণে, এরূপ ক্ষেত্রে সামান্য মাত্র চিন্তা করিলেই বোধগম্য হইবে যে, জীবনীশক্তি যেন শেষোক্ত ঔষধের সাহায্য পাইয়া শরীরের ক্লেদগুলি ভিতর হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিয়া শরীরটীকে নিরাময় করিল। এখানেও সেই একই প্রকার গতি,—সেই **ভিতর হইতে বাহিরের দিকে গতি** সাহায্যেই নিরাময়ত্ব আনীত হইল।

বিগত ১৯২১ সালে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় নামে একজন ভদ্রলোক পুরুলিয়া ষ্টেশনে এসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টারের কার্য্য করিতেন। তিনি গত ২।৩ বৎসর হইতে দারুণ শূলপীড়ায় অতিশয় কাতর হইয়া আমার নিকট চিকিৎসার্থ আসেন। তাঁহার লক্ষণাদি লিপিবদ্ধ করিয়া দেখা গেল,—**পেট্রোলিয়ামই** নির্ব্বাচনযোগ্য এবং তাহাই ১০০০ শক্তিতে দেওয়া

হয়। প্রয়োগের ১০।১২ দিন পরেই চণ্ডীবাবু আসিয়া দুঃখের সহিত পরিচয় দিলেন যে, শূলের কষ্ট কয়দিন হইল বড় জানা যায় নাই বটে কিন্তু যে একজিমাটী তিনি অনেক কষ্টে ভাল করিয়াছিলেন, তাহা আবার দেখা দিয়াছে। আমি তাঁহাকে প্রকৃত কথা বুঝাইয়া দিলাম যে,তাঁহার একজিমাটী ভাল হয় নাই, বাহ্য প্রলেপাদির দ্বারা চাপা পড়িয়াছিল বলিয়াই এই শূলপীড়া আসিয়াছিল, এক্ষণে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়ায় "চাপা পড়া" পীড়াটী পুনর্ব্বিকাশ পাইয়াছে এবং তাহার ফলেই শূলবেদনাটা আরোগ্য হইয়াছে। এক্ষণে ঐ একজিমাটীর প্রকৃত আরোগ্য করাই একমাত্র আবশ্যক। পরিশেষে ঐ ঔষধের দ্বারাই একজিমাটী ধীরে ধীরে আরোগ্য হইয়া যায়। এখানেও দেখা যাইবে যে, সর্ব্বপ্রথমে জীবনীশক্তি **ভিতর হইতে** একজিমাটী বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া দেহযন্ত্রটীকে সুস্থ রাখিয়াছিল, তাহার পর যখনই ঐ বহির্নিক্ষিপ্ত দোষটীকে বাহ্য প্রলেপের দ্বারা **বাহির হইতে ভিতরের দিকে গতি** দেওয়া হয়, তখনই শূলব্যাধি দেখা দিয়া রোগীকে নিরতিশয় যন্ত্রণা দিতে লাগিল। পুনরায় যখন জীবনীশক্তি ঔষধের সাহায্য পাইয়া একজিমাটীকে বহির্নিক্ষেপ করিতে সক্ষম হইল, তখনই পীড়ার ধ্বংস ও স্বাস্থ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল।

এই সকল উদাহরণ হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, যেখানে আরোগ্য ও স্বাস্থ্য, সেখানেই **গতিটী ভিতর হইতে বাহিরে** এবং তৎবিপরীত গতিতে পীড়া ও ধ্বংস অনিবার্য্য। যদি এই তত্ত্বটা সুন্দরভাবে একবার হৃদয়ঙ্গম হইয়া যায়, তাহা হইলে বাহ্য প্রয়োগাদির দ্বারা বা ইঞ্জেক্সনাদির সাহায্যে রোগলক্ষণাবলীর সাময়িক অন্তর্ধানকে কখনই আরোগ্য বলিয়া মনে হইবে না,—উহা নূতন নূতন পীড়াসৃষ্টি এবং পূর্ব্ব পীড়ার জটীলতা বৃদ্ধিই করিবার ব্যবস্থা মাত্র বলিয়া মনে দৃঢ় ধারণা হইবে। লোকে **দাদ্, একজিমা,** ইত্যাদি চর্ম্মপীড়াগুলি যে কোনও উপায়ে

হউক, লোপ করাইয়া মনে করে যে, ইহা আরোগ্য হইয়াছে, ফলতঃ যে কোনও প্রকারে সেগুলির লোপসাধন করিতে পারাই আরোগ্যপদবাচ্য নয়। আরোগ্য করিতে হইলে ভিতর হইতে বাহিরের দিকে গতিযুক্ত জীবনশক্তির ক্রিয়া সাহায্যে করিতেই হইবে। এ অবস্থায় বাহির হইতে যে কোনও পীড়ালক্ষণের উচ্ছেদসাধন যে নিতান্ত মারাত্মক প্রথা, একথা বুঝিতে পারা আদৌ কঠিন নহে।

আজকাল যত নূতন নূতন নামের পীড়া আমদানী হইয়াছে ও হইতেছে, সেগুলি মধ্যে অধিকাংশই উপরোক্ত বাহ্য প্রথায় তথাকথিত চিকিৎসার-ফলে" আনীত বিশৃঙ্খলা মাত্র। আমাদের মধ্যে অনেকেই যদি এই সত্য তথ্যটী হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুযায়ী চিকিৎসাপথ নির্ব্বাচন করিতে পারেন, তবে সমাজের অনেক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। বাহ্য চিকিৎসা, বিসদৃশ চিকিৎসা, ইত্যাদির পরিবর্ত্তে যদি কেবল প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রবর্ত্তন হয়, তখন আর কোনও প্রকার বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইতে পারে না এবং সমাজের শান্তি ও স্বাস্থ্য সর্ব্বদাই বিরাজিত থাকে। কিন্তু অধিকাংশ লোকেই ইহা বুঝেন না, আবার যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাহারাও কার্য্যকালে বিস্মৃত হইয়া যে কোনও প্রথা অবলম্বন করিতে দ্বিধা করেন না। অনেক ক্ষেত্রে বহুদিন-ব্যাপী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাকার্য্যে রত থাকিয়াও নিজের বা গৃহস্থের শঙ্কটাপন্ন পীড়াকালে অন্য চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখিয়া মনে বড়ই নির্ব্বেদের সঞ্চার হয়।

রোগের গতি ও চিকিৎসার ধারাবাহিকতা।

প্রত্যেক প্রকার পীড়ার একটী গতি আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে যদিও **সোরাই** একমাত্র পীড়া, তাহা হইলেও যে যন্ত্রে বা যে অঙ্গে বা যে প্রকৃতি অনুসারে রোগলক্ষণ বিকাশ পায়, তদনুসারে একটী করিয়া নামকরণ করিবার রীতি বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। চিকিৎসার জন্য রোগের নামের অবশ্যই কোনও সার্থকতা না থাকিলেও, সাধারণ আলোচনার সুবিধার জন্য সেরূপ নাম প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। মনে করুন, কাহারও শরীরের তাপ নিত্যই কোনও এক সময়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়,—আবার সময় বিশেষে স্বাভাবিক তাপ আসিয়া থাকে,—এই ব্যক্তির "জ্বর" হইয়াছে, একথা বলা হইয়া থাকে। আবার মনে করুন, কাহারও নিয়মিত মলত্যাগ হয় না, দুই তিন দিন অন্তর অতি কষ্টে কতক মল নিঃসরণ হইয়া থাকে মাত্র, এ ক্ষেত্রে লোকে, "কোষ্ঠবদ্ধ পীড়া হইয়াছে", বলিয়া থাকে। ফলতঃ **চিকিৎসা হিসাবে** এই সকল নামের দ্বারা আমাদের কোনও সাহায্য হয় না। অন্যান্য শাস্ত্রের হইতে পারে। যাহা হউক, যে যে নামের ও প্রকৃতির পীড়া মানবদেহে দেখা যায়, তাহাদের প্রত্যেকের একটী **গতি** আছে। মানবদেহের মধ্যে জীবনীশক্তি স্বাভাবিক ভাবে কার্য্য করিতে না পারায়, পীড়ালক্ষণের সর্ব্বপ্রথম উদ্ভব হইয়া থাকে এবং নিরাময় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার একটী **একমুখী গতি** থাকে। এই গতিটী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। লোকে সাধারণতঃ তরুণ পীড়ার গতিটী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে অতি সহজেই সক্ষম হয়। একটী টাইফয়েড্ জ্বরের সর্ব্বপ্রথম সপ্তাহের মধ্যে বিশেষ কিছু লক্ষ্য করিবার মত থাকে না। কেবল সামান্য অলস ভাব, সামান্য বিরক্তি বোধ, সামান্য

কেমন এক প্রকার "বেভাব" মাত্র লক্ষিত হয়, তৎসঙ্গে জ্বরভাবটী নিত্যই অতি অল্প অল্প করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। দ্বিতীয় সপ্তাহে নানাপ্রকার লক্ষণ, যথা স্পষ্ট জ্বর, দৌর্ব্বল্য, তলপেটে টানানি ও বুজবুজানি শব্দ, অবসাদ, ইত্যাদি দেখা দেয়,—এই ভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলিতে থাকে; তাহার পর ঔষধ সাহায্যে বা প্রকৃতির দ্বারাই ক্রমে ক্রমে আরোগ্যের দিকে গতিটী লক্ষিত হইয়া থাকে। এই পীড়া বা বসন্তাদি পীড়ার গতি স্পষ্ট ও নানাপ্রকার লক্ষণযুক্ত বলিয়া অনায়াসে লক্ষ্য করিয়া বিবরীভূত হইয়া থাকে। কিন্তু পুরাতন পীড়ার গতি সেরূপ নয়, একেই ত লক্ষণগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুস্পষ্ট থাকে না, তাহার উপর **গতিও আরোগ্যের দিকে থাকে না**, অবশ্য ঔষধ প্রয়োগ করিলে স্বতন্ত্র কথা। যাহা হউক, পুরাতন পীড়ার এই গতিটী লক্ষ্য করা সুকঠিন হইলেও আমরা যেমন কোনও একটী গভীর জাতির ঔষধের পরীক্ষা (Proving) দৈনন্দিন লক্ষ্য করিয়া লক্ষণাবলি লিপিবদ্ধ করিতে পারি, সেই প্রকার ঐ পীড়ার গতিও লক্ষ্য করিতে পারি। এই গতির দুইটী বিশিষ্টতা আছে— প্রথম—**ইহা ক্রমিক**, দ্বিতীয়—**ইহা আরোগ্যপ্রবণতাশূন্য।** আজি হয়ত সামান্য ঠাণ্ডা লাগা মাত্র উত্তেজক কারণের দোষে সামান্য স্বরভঙ্গ হইল, কিছুদিন পরে ইহাই দারুণ রাজযক্ষ্মাতে পরিণত হইয়া রোগীর জীবলীলা সাঙ্গ করিয়া দেয়,—ইহা আমরা নিত্যই দেখিতেছি। সুতরাং ঐ স্বরভঙ্গরূপ প্রাথমিক নিদর্শন ও লক্ষণটী যদি ক্রম বর্দ্ধমান হইয়া মৃত্যু মুখী গতি অবলম্বন না করিত, তবে উহার শেষফল কখনই এরূপ হইত না। এই গতিটী বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এবং প্রকৃত দ্রষ্টা চিকিৎসকের দ্বারা ব্যতীত এ প্রকার দৃষ্টি সম্ভব নহে। আজকালের রোগীও যেরূপ চঞ্চল ও অধীর, চিকিৎসকও ঠিক সেইরূপ মনোযোগশূন্য হইতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের কোনও দোষ নাই। রোগীপক্ষে একান্ত নির্ভরশীলতা

ও ধৈর্য্য না থাকিলে, চিকিৎসক কি করিবেন? যদিই বা কোনও একটী ক্ষেত্রে চিকিৎসক রীতিমত মনোযোগের সহিত রোগীর প্রত্যেক বিষয়টী, ক্রমবর্দ্ধমানতার ফলে পীড়ার যে সকল নব নব শাখা ও পল্লবাদির সঞ্চার হইতেছে, তাহা বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তৎপ্রতিকারে যত্নবান্ হইতেছেন এবং সুনির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইতিমধ্যে রোগী নিজেরই ইচ্ছায় বা কোনও প্রতিবেশীর পরামর্শমত অন্য কোনও চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইল অথবা অন্য কোনও মতের চিকিৎসা অবলম্বন করিল অথবা ঠাকুর, দেবতার স্বপ্নাদ্য জড়ীবটী প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া বসিল,—এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসক কি করিবেন? মূর্খ রোগী জানে না যে, ঐ চিকিৎসকের দত্ত ঔষধের দ্বারা তাহার পীড়ার ক্রমগতিতে যে বাধা বা যে প্রতিরোধ সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা নষ্ট হইয়া গেল,—কিন্তু **রোগী মনে ভাবিতে থাকিল যে, তাহার চিকিৎসা হইতেছে। ফলতঃ এই প্রকার চিকিৎসা কেবল একটি ব্যাকুল চেষ্টা মাত্র।** অনেকে একবার এলোপ্যাথি, একবার হোমিওপ্যাথি, আবার কবিরাজী, আবার হোমিওপ্যাথি, ইত্যাদি নানা সময়ে নানা পরিবর্ত্তন করিয়া শেষে বলিয়া বসে—"কি করা যায়, চিকিৎসার ত আর ত্রুটি করা গেল না,—রোগীর এক্ষণে অদৃষ্ট।" আমরা জানি, নিত্যই দেখিতেছি যে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ফলে লুপ্ত লক্ষণ দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গেই রোগী পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া থাকে, জিজ্ঞাসিলে বলিবে—"কি করি, মহাশয়, যে রোগ ভাল হইয়াছিল, আবার তাহাই দেখা দিল, কাজেই একটী ইঞ্জেক্সন লইয়া তবে আবার ভাল হইয়াছে!" মূর্খ জানে না যে, ইঞ্জেক্সন বা কুইনাইন প্রয়োগের ফলে কেহ কখনও ভাল হয় নাই, হইতে পারে না,—কেবল রোগলক্ষণগুলি অন্তর্নিরুদ্ধ হইয়া তিরোহিত হয়; মহামূর্খ বোঝে না যে, যে কোনও প্রকারে রোগলক্ষণের

অপসারণটাই আরোগ্য নয়,—তাহা কেবল "চাপিয়া ফেলা" এবং এই "চাপিয়া ফেলার" দ্বারা তাহার অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট হয় না। তাহার কারণ—রোগের **ক্রমবর্দ্ধনগতিতে আরোগ্যবিধায়ক** ঔষধশক্তির দ্বারা **বাধা পড়িল কে?** তাহাছাড়া, "এলোমেলো" অর্থাৎ বিশৃঙ্খলভাবে, এমন কি, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহারের দ্বারাও ইষ্ট হয় না। এমন কি, যে ঔষধের দ্বারা আরোগ্যকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, সেই ঔষধও অসময়ে বা বিশৃঙ্খলভাবে প্রযুক্ত হইলে ইষ্ট বা আরোগ্য আনয়ন করিতে সমর্থ হয় না। চিকিৎসার একটা **ধারা** একান্ত আবশ্যক। ধারাবাহিকতা ব্যতীত চিকিৎসাই হয় না। একটী রোগীর একটী পুরাতন পীড়ায় **ক্রিয়োজোট** নামক ঔষধটী ২০০ শক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া ৫০,০০০ পর্য্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছিল ও ক্রমিক আড়াই বৎসর কাল ধরিয়া চিকিৎসার ফলে তবে সে ব্যক্তি নির্ম্মল আরোগ্য হইয়াছিল। পীড়ার যেমন একটী **ক্রমগতি** থাকে, ঔষধ সাহায্যে চিকিৎসারও **একটী ধারা থাকিলে** তবেই **আরোগ্যেরও একটী ক্রমগতি থাকিবে,** নতুবা চিকিৎসা নিষ্ফল, এমন কি, আরোগ্যবিধায়কের পরিবর্ত্তে এরূপ চিকিৎসা কেবল রোগ ও তাহার জটীলতাবর্দ্ধক,—একথা অনেকে জানে না। চিকিৎসার নামে কি ভয়ানক প্রতারণা হইতেছে! মোহান্ধ ও মূর্খ রোগীকে বিপথে পরিচালিত করিয়া তাহার অর্থ শোষণ ও ঘোর অনিষ্টসাধনের পরাকাষ্ঠা দেখিয়া হৃদয় শঙ্কিত হইয়া উঠে। লোকে একথা বুঝিবে না যে, যেমন একটী রোগ একদিনে বর্দ্ধিতায়তন হয় না, তেমনি চিকিৎসাও একদিনে আরোগ্যবিধান করিতে পারে না; লোকে বুঝিবে না যে, রোগ ও নিরাময়—**এই উভয়টীই ক্রমগতি ও ক্রমবর্দ্ধনশীল।** রোগ যেমন ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কিছুদিন পরে পূর্ণলক্ষণ হইয়া থাকে, তাহাকে আরাম করিতে হইলে ঠিক সেই ভাবেই **ক্রমগতি** একান্ত প্রয়োজনীয়।

একবার এটি, একবার আর একটী প্রথা অবলম্বন দ্বারা "চিকিৎসা হইতেছে" বলিয়া মনে শান্তনা লইলে বা লোককে দেখাইলে কি ফল হইবে? একটী তিন বৎসরব্যাপী পুরাতন জ্বর এক সপ্তাহের মধ্যে ৪টী ইঞ্জেক্‌সন লইলেই আরাম হইবে, যে রোগী ইহা সত্য বলিয়া ভাবে, সে ত মূর্খ বটেই, আবার যে চিকিৎসক ইহা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, সে চিকিৎসকও গোমূর্খ, হস্তীমূর্খ, ইহার কোনও সন্দেহ নাই। রোগীর অর্থব্যয় জন্য আমরা দুঃখিত নহি, তাহার শরীরের যে কি মহান্ অনিষ্ট হয় সেজন্য এবং সে প্রকার ধর্ম্মহীন চিকিৎসকের মানসিক অধঃপতনের জন্যই আমরা দুঃখিত। চিকিৎসার নামে যত জুয়াচুরি হইতেছে, এত জুয়াচুরি বোধ হয় অন্য কোনও দিকে হয় নাই। অথচ চিকিৎসাকার্য্যের ন্যায় পবিত্র ধর্ম্মকার্য্য, বোধ হয়, জগতে আর নাই বলিলেও চলে।

পাপকার্য্য মাত্রেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে। প্রায়শ্চিত্ত কথনও **ভোগ ব্যতীত ক্ষয় হয় না।** যদি কেহ মনে করিয়া থাকে যে, দুষ্টস্থানে গমনজনিত—সিফিলিস বা গনোরিয়া পীড়াগুলি, কেবলমাত্র ২।১টী ইঞ্জেক্‌সন লইলেই আরোগ্য হইয়া যাইবে, তবে তাহাদের ভয়ানক ভ্রান্তি হইবে। তাহা কথনও সম্ভব নয়। ভোগ ব্যতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। তবে চিকিৎসার দ্বারা রোগের **তীক্ষ্ণতাটী মন্দীভূত** হয় এবং **গতিটী অপেক্ষাকৃত অল্প দিনের মধ্যে শেষ হইয়া রোগীর আরোগ্যটী দ্রুত আনিতে পারে,**—এই পর্য্যন্ত। অল্পাধিক ভোগ হইবেই হইবে। লোকে সংযমের পথ অবলম্বন করিবে না, বিলাসব্যসনাদি চরম মাত্রায় চাহিবে, অথচ আরোগ্যটী দুই এক দিনের মধ্যেই হওয়া চাই। পাপের ফলভোগ করিতে আদৌ রাজি নয়। কাজেই একদল চিকিৎসকেরও সৃষ্টি হইয়াছে যাঁহারা দুই একটী ইঞ্জেক্‌সনাদি উপায় অবলম্বন দ্বারা আশু আরোগ্যের প্রলোভন দিয়া লোককে পাপের পথে

আরও প্রশ্রয় দিয়া থাকেন এবং আরোগ্য ত দূরের কথা, রোগীকে আরও জটিল অবস্থায় আনিয়া ফেলেন। লোকশিক্ষার পূর্ব্বে এ প্রকার চিকিৎসার তিরোভাব আদৌ সম্ভব নয়। লোকে যতদিন চাহিবে, ঐ প্রকার চিকিৎসাও ততদিন থাকিবে।

যে ব্যক্তি গতকল্য সমস্তরাত্রি জাগরণ করিয়া যাত্রা থিয়েটার দেখিয়াছে, তাহার পর অনিয়মিত আহার ও স্নান করার জন্য জ্বর এবং অঙ্গবেদনায় কাতর হইয়া পড়িয়াছে, তাহার পক্ষে নির্ব্বাচিত ঔষধের ফল শীঘ্র অর্থাৎ দ্রুতগতিতে ক্রিয়া প্রকাশ করিবে। কেননা তরুণ অবস্থায় রোগের গতিটী দ্রুত, সুতরাং ঔষধও দ্রুত গতিতে কার্য্য করিবে। মনে করুন, এই ক্ষেত্রে **রাসটক্স** ৩০ নির্ব্বাচিত হইল,—ইহার এক মাত্রা বা দুইটী মাত্রা হইলেই রোগী আরোগ্য হইয়া থাকে। কিন্তু যদি এক বৎসরের পুরাতন জ্বর হয় এবং রাসটক্সই নির্ব্বাচনযোগ্য হয়, তবে ইহার ৩০ শক্তির এক মাত্রার কার্য্য অন্ততঃ ১৫ দিন ধরিয়া চলিতে থাকে। আবার মনে করুন, কেহ আজি ৬।৮ মাস পূর্ব্বে **গনোরিয়া** পীড়াক্রান্ত হইয়াছে এবং **সাইকোসিস** দোষে দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে ; তাহার শরীরে নির্ব্বাচিত ঔষধটী ২।১০ দিনের মধ্যেই ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু যাহার সাইকোসিস দোষটী তাহার পিতামহ হইতে প্রাপ্ত, তাহার শরীরে একমাত্রা ঔষধ দিলে হয়ত ক্রিয়াই হইবে না, তাহাকে উচ্চতর শক্তির ঔষধ বার বার **পরিবর্ত্তিত ক্রমে** দিতে দিতে, দীর্ঘ সময় পরে, তাহার প্রথম ঝঙ্কার উৎপাদন করিয়া থাকে। যাহার শরীর ও মনের বিশৃঙ্খলা আজি ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার শরীরে ঔষধের ক্রিয়া দ্রুত বিকাশ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? সূতার "খি"টা কতদিন পূর্ব্বে হারাইয়াছে, তাহা দেখা চাই, তদনুসারে শক্তি নির্ব্বাচন করা চাই এবং তদনুসারে সময় অপেক্ষা করা চাই। নতুবা যেমনই পুরাতন হউক না কেন, "হোমিওপ্যাথি ঔষধ এক মাত্রায়

তিন দিনে আরোগ্য হইবে” এ প্রকার আশা যাহারা করিয়া থাকে, বা লোকের নিকট প্রচার করে বা আশা দেয়, তাহাদের মস্তিষ্ক নিশ্চয়ই বিশৃঙ্খলা জন্মিয়াছে জানিতে হয় এবং সর্ব্বাদৌ তাহাদের চিকিৎসা প্রয়োজনীয় বলিয়া স্থির করিতে হয়। পীড়াটী, অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক বিশৃঙ্খলাটী, **যতদিনের পুরাতন, তাহার গতিটী ততই বিলম্বিত এবং চিকিৎসার ফল ততই দীর্ঘকালব্যাপী** হওয়া অবশ্যই প্রয়োজনীয়। **রোগের তরুণতা ও পুরাতনত্ব হিসাবে ঔষধের শক্তিরও তারতম্য হইয়া থাকে,** কিন্তু শক্তি উচ্চতরই হউক বা নিম্নতরই হউক, ক্রিয়ারম্ভ বা আরোগ্যকার্য্য শেষ করিতে,—সর্ব্বদাই রোগের **সময় ও গতিকে** অপেক্ষা করিতেই হয়। একটী কলেরার রোগীর ভেদবমি, অবসাদ ইত্যাদি নিবারণ করিতে যে **ভিরেট্রাম এল্‌বাম্‌**, ১২শ শক্তি, অর্দ্ধ ঘণ্টার অধিক সময় প্রয়োজন হয় না, আবার ৪।৫ বৎসরের পুরাতন অজীর্ণ (dyspepsia) রোগে, যদি **ভিরেট্রামই** সদৃশলক্ষণানুসারে নির্ব্বাচিত হয়, তবে তাহার ২০০, বা ১০০০ শক্তির প্রয়োজন হয় এবং প্রথম ঝঙ্কারের জন্য অন্ততঃ ৩।৪ মাস অপেক্ষা করিতে হয়। ঔষধের ক্রিয়া নির্ভর করে অনেক বিষয়ের উপর, তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ২টী, যথা,—**রোগের পুরাতনত্ব** (chronicity) **এবং তাহার গতি** (course), একথা ভুলিলে চলে না। মূর্খলোকে অন্য প্রকার মনে করুক যে, “হোমিওপ্যাথি ঔষধে এক মাত্রাতেই মোক্ষফল একদিনেই পাওয়া যায়,” অথবা,—“ইহা ফকিরের জল পড়া,” ইত্যাদি; তাহাতে কিছু আসে যায় না,—কিন্তু অনেক উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিকেও এরূপ মত প্রকাশ করিতে দেখা যায়, ইহাই পরিতাপের বিষয়। **শিশুযকৃৎ পীড়াটী** অন্ততঃ তিন পুরুষে ব্যাধি, অথচ গৃহস্থ ২ সপ্তাহের মধ্যে ফল কামনা করে। আশ্চর্য্য কথা, বড় জোর

৩ সপ্তাহ মধ্যে না সারিলেই ইঞ্জেক্‌সন! ফলাফল সকলেই জানে, অথচ এই প্রকার বাতুল চেষ্টা ও বিফল আশা। শেষে লোকে মনে করে, "অনেক করা গেল, এখন অদৃষ্ট!"

কোনও একটী গৃহস্থ যদি আজি উৎকৃষ্ট আম্রফলের বীজ বা চারা রোপণ করিয়া আগামী কল্যই তাহার ফলাকাঙ্ক্ষা করে, তবে লোকে সে গৃহস্থকে উন্মাদ পীড়াগ্রস্ত কহিবে। বীজ বা চারা রোপণ করিবার পর দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয় এবং শীত বাত আতপাদি হইতে চারা ও বৃক্ষটীকে রক্ষা করিতে হয়, তবে তাহার ফলকামনা সঙ্গত। অবশ্য ইন্দ্রজাল বিদ্যার সাহায্যে ১ ঘণ্টার মধ্যেই ফল পাইতে পারা যায়, কিন্তু সেটী ইন্দ্রজাল, বাস্তব পদার্থ নয় এবং সে ফলে রসও থাকে না, অথবা তাহা খাইয়া আত্মতৃপ্তিও হয় না,—সেটী একটী মোহ মাত্র। সেইরূপ ২।৪টী ইঞ্জেক্‌সনে, হঠাৎ আরোগ্যের একটী মোহ উৎপাদন হইতে পারে, ফলতঃ প্রকৃত আরোগ্য হয় না। **কিছু পাইতে হইলে, ত্যাগ চাই, ধৈর্য্য চাই এবং পাইবার মত মনকেও সেই স্তরে আনয়ন করিতে হয়।** বিনাত্যাগে লাভ হয় না,—মূল্য না দিলে প্রাপ্তি ঘটে না, আশাও করিতে নাই।

প্রকৃত আরোগ্যের প্রকৃতি ও গতি।

প্রকৃত আরোগ্য কাহাকে বলে,—কি নিদর্শন প্রাপ্ত হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, রোগীর পীড়াটী আরোগ্য পথে যাইতেছে, তাহা জানা বিশেষ আবশ্যক। অন্য কোনও পন্থায়, অর্থাৎ হোমিওপ্যাথি ব্যতীত অন্য

যে কোনও চিকিৎসা পথে প্রকৃত আরোগ্য হয় না, সুতরাং নিদর্শন কি প্রকারে পাওয়া যাইবে, "শিরোনাস্তি শিরোপীড়া" কি প্রকারে সম্ভব হইবে? আমাদের হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রে প্রকৃত আরোগ্য কাহাকে কহে তাহা যেমন নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনই প্রকৃত আরোগ্যের নিদর্শনগুলিও স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং আমাদিগের কোনও অবস্থাতেই সন্দেহ বা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকিতে হয় না, এমন কি, আমরা রোগীর আরোগ্য বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী দিয়া থাকি ও দিতে পারি, কেননা একবার যদি আরোগ্যের সূচনা দেখা দেয়, তবে আরোগ্যটী কি ভাবে, কি গতিতে চলিতে থাকিবে তাহা আমরা বেশ অনুভব করিতে পারি। যেমন অরুণোদয় দেখিলে উদীয়মান্ সূর্য্যের উদয় সম্বন্ধে কৃত নিশ্চয় হওয়া যায় ও ভবিষ্যৎবাণীও প্রচার করা যায়,—ঠিক তদ্রূপ, ঔষধ প্রয়োগের পর ক্রিয়ারম্ভ মাত্রেই আমরা বুঝিতে পারি যে, নির্ম্মল আরোগ্য আসিতেছে।

হোমিওপ্যাথি ব্যতীত অন্যান্য তথাকথিত চিকিৎসাপথে প্রকৃত আরোগ্যের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং নিদর্শনাদির কথা একান্ত অবান্তর। একমাত্র রোগলক্ষণগুলির কোনও প্রকারে তিরোভাব ঘটাইতে পারিলেই জয় জয়কার প্রচারিত হয়, কিন্তু ঐ প্রকার তিরোভাবের ফলে রোগী যদি নিতান্ত অস্বস্তি অনুভব করে, তবে তাহা রোগীর "বেয়াদবী" ব্যতীত আর কিছুই নয়, অথবা যদি ঐ প্রকার তিরোভাবের ফলে অন্য আর একটী কঠিন জাতির রোগ লক্ষণ দেখা দেয়, তবে তাহা একটী "নূতন" রোগ বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়, এবং একটী নূতন "নামকরণ" করিতে পারিলেই চিকিৎসক ও রোগী উভয় পক্ষেই আশ্বস্ত হইয়া থাকেন। আসল কথা, যে কোনও প্রকারে রোগলক্ষণের তিরোভাব ঘটাইতে পারিলেই তাহাকে আরোগ্য বলিয়া প্রচারিত হয়। তাহাতে রোগীর দশায় যাহাই হউক না

কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না,—ইহাই "বৈজ্ঞানিক প্রথা",—তাহাতে আপত্তি করিলেই আপত্তিকারীর কথা "অবৈজ্ঞানিক" হইবে।

আমাদের চিকিৎসা প্রথায়, যে কোনও প্রকারে রোগ বিকাশকে তিরোহিত করিতে পারাই আরোগ্য বলিয়া গৃহীত হয় না, এমন কি, রোগ বিকাশ বিশেষের সহিত আমাদের চিকিৎসার কোনও প্রকার সম্বন্ধ নাই বলিলেই চলে। আমাদের প্রথানুসারে, রোগীর লক্ষণ সমষ্টির সাদৃশ্যানুসারে ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হয়, তাহার ফলে রোগ বিকাশটী তিরোহিত হইয়া থাকে—বাহ্য পদার্থের সাহায্যে উহাকে তিরোহিত করিবার কোনও প্রকার চেষ্টা নিতান্তই গর্হিত ও হোমিওপ্যাথির বহির্ভূত জানিতে হইবে। অবশ্যই একথা যুক্তিযুক্ত যে, যে কোনও রোগীর রোগটী অর্থাৎ রোগের বিকাশটী তিরোধান হওয়াই আরোগ্য,—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই,—কিন্তু যে কোনও প্রকারে তাহাকে লোপ করা, একটী কথা, আর লক্ষণ সমষ্টির সাদৃশ্যানুসারে নির্ব্বাচিত আভ্যন্তরিণ ঔষধের সাহায্যে লোপ করা, অন্য কথা ; ১ম ক্ষেত্রে, উহাকে চাপা দেওয়া হয়, ২য় ক্ষেত্রে উহাকে প্রকৃত আরোগ্য করা হয়। ১ম ক্ষেত্রে, রোগটাকে বাহির হইতে তাড়া দিয়া যেন অন্তঃপ্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, সুতরাং উহার গতিটী বাহির হইতে ভিতরে, কিন্তু ২য় ক্ষেত্রে রোগটীকে স্পর্শ করা হয় না, আভ্যন্তর ঔষধের সাহায্যে ভিতর হইতে বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়, সুতরাং উহার গতিটী ভিতর হইতে বাহিরে।

রোগ বিকাশের তিরোধান উভয় প্রকার চিকিৎসাতেই ঘটিয়া থাকে বটে, কিন্তু ১মটীর প্রকৃতিই এই যে উহার দ্বারা রোগীর শরীরে সোয়াস্তি বা শান্তির পরিবর্ত্তে বরং অস্বস্তি ও অশান্তির বৃদ্ধিই হইয়া থাকে, অন্যদিকে আমাদের চিকিৎসা প্রথানুসারে তিরোভাবের ফলে রোগীর সর্ব্বতোভাবে পূর্ব্ব স্বাস্থ্যের ও শান্তির পুনঃ প্রাপ্তি ঘটে। সুতরাং দুইটীর প্রকৃতি ও

গতি একেবারে বিপরীত। চাপা দেওয়া প্রথাটীকে "চিকিৎসা-প্রথা" বলা চলে না, কেননা চিকিৎসায় যেটী আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ রোগীর পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ও পূর্ব্ব শান্তি পুনঃ স্থাপন করা, সেই উদ্দেশ্যটিই সিদ্ধ হয় না,—বরং রোগটী আরও জটীলতর ও বহুবিধ নব নব লক্ষণের আবির্ভাব ঘটে ; সেই হিসাবে ঐ প্রথাকে চিকিৎসা প্রথা ত বলা চলেই না, বরং রোগ বৃদ্ধি বা জটীলতা বৃদ্ধি করিবার প্রথাই বলা অধিকতর সঙ্গত হইবে। অতএব আরোগ্যের আশা করিলে একমাত্র হোমিওপ্যাথি ব্যতীত অন্য কোনও চিকিৎসাপথে হইতে পারে না। তবে এক্ষণে প্রকৃত আরোগ্যের প্রকৃতি ও গতি বিষয়ে সামান্য আলোচনা করা সঙ্গত মনে করি।

প্রকৃত সদৃশবিধানে ঔষধ প্রয়োগ করিবার পরেই আমরা দেখিতে পাই যে, যদিও রোগীর রোগবিকাশের চিহ্নগুলি অথবা রোগের যন্ত্রণাদির বিশেষ কিছু ইতরবিশেষ এখনও হয় নাই, ফলতঃ রোগী তাহার **মনস্তরে** যেন সামান্য আভাস পাইতেছে, যাহার ফলে রোগী ও চিকিৎসক উভয়েই বুঝিতে পারেন যে, ঔষধের হিতক্রিয়া বা আরোগ্য-ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে এবং রোগ-বিকাশজনিত যাতনাদির উপশম অতি শীঘ্রই ঘটিবে অর্থাৎ **মনস্তরেই আরোগ্যতত্ত্বের সর্ব্বপ্রথম বিকাশ হইয়া থাকে,** ইহাই দেখা যায়। ক্রমে ক্রমে ঐ আরোগ্য কার্য্যটি মনস্তর হইতে দেহস্তরে ঠিক যেন প্রবাহবশে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং রোগীর যাতনাদায়ক অনুভূতিগুলির শমতা উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। **ঔষধ দিবার অল্প পরেই রোগীর মনস্তরের উপর এই ক্রিয়াই আরোগ্যের প্রথম, প্রধান ও একমাত্র নিদর্শন।**

কোনও কোনও ক্ষেত্রে, ঔষধ প্রয়োগের পরে রোগীর যাতনা ও বিকাশপ্রাপ্ত রোগলক্ষণগুলি অভাবনীয় বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাকে

"হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি" বলে। সেরূপ হলেও রোগীর মনস্তত্ত্বের মধ্যে একটা আনন্দভাব একটা স্বস্তিভাব আসিয়াই থাকে; অর্থাৎ লক্ষণগুলির বৃদ্ধি দেখা গেলেও রোগী হিসাবে তাহার মনের মধ্যে একটা আনন্দের রেখা একটা আশার আলোক দেখা যাইবেই যাইবে; নতুবা জানিতে হইবে, অভ্রান্ত নির্ব্বাচন হয় নাই।

আরোগ্য ও আরোগ্যের অনুকল্প।

নির্ম্মল আরোগ্য কাহাকে বলে বা তাহার স্বরূপ ও নিদর্শন কি, একথা আমরা বহুবার কহিয়াছি। নির্ম্মল আরোগ্য অতি অল্পই দেখা যায়। কেননা, নির্ম্মল আরোগ্য আনয়নের পথে অনেক বাধা। আমাদের মধ্যে প্রত্যেক চিকিৎসকেরই ইচ্ছা যে, যাহাতে রোগীকে প্রকৃতভাবে আরোগ্য করিয়া ইহকালে যশঃ এবং পরকালে ভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইতে পারি কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহা কার্য্যতঃ সম্ভব হয় না। আমরা দুইজন চিকিৎসক অন্য আর একজন বহুদর্শী ও খ্যাতনামা চিকিৎসক মহাশয়ের সহিত কোনও একটী রোগীর বাড়ীতে পরামর্শ জন্য আহুত হই,—কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাদের দুইজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আচ্ছা, আপনাদের অভিজ্ঞতা কিরূপ? দশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার বা লক্ষ ও ততোধিক শক্তি কি আপনারা ব্যবহার করিয়া থাকেন? যদি করেন, তবে কিরূপ ফল হয়?" আমরা কহিলাম।—"আবশ্যক হইলে আমরা উচ্চতর ও উচ্চতম শক্তি সকল প্রায়ই ব্যবহার করিয়া থাকি, ফলও বেশ হয়। তিনি আবার কহিলেন "দেখুন, আমি ২০০ শক্তিই সর্ব্বদা

ব্যবহার করিয়া থাকি,—কচিৎ হাজারে উঠি মাত্র”। যখন আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—“তবে আপনি অনেক দিনের অতি জটিল, এমন কি, বংশপরম্পরাগত দোষজ পীড়া সকল কি প্রকারে এত নিম্নতর শক্তি সাহায্যে আরোগ্য করেন?” তিনি উত্তর করিলেন না, না, আমি নির্ম্মল আরোগ্য করি না, করিতে পারি না, কেননা লোকে তাহা চায় না, লোকে কেবল বর্ত্তমান সময়ের কষ্টকর লক্ষণগুলি দূরীভূত হওয়াই চায়, সুতরাং আমিও কেবল বাহ্যস্তরের নিতান্ত অসুবিধা ও যন্ত্রণাগুলি অপসারিত করিবার মত ঔষধ দিই এবং লোকেও তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে, অতএব আমিও তাহাই করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি।” যে সুচিকিৎসকের কথা এখানে উল্লেখ করিলাম, তিনি বহুদিনের অভিজ্ঞ, লোককল্যাণকামী এবং সুধী চিকিৎসকবৃন্দের মধ্যে অগ্রণী। যদি তাঁহার অভিজ্ঞতা এ প্রকার হয়, তবে অন্যের ত হইতেই পারে।

কোনও একটী রোগীর পীড়ালক্ষণের লিপি প্রস্তুত করিলেই দেখা যাইবে,—হয়ত নিজের **উপার্জ্জিত** অথবা পূর্ব্বপুরুষ হইতে **প্রাপ্ত**, উভয় প্রকারের **দোষ** হইতে উৎপন্ন নানা লক্ষণের একত্র সমাবেশ হইয়াছে। বর্ত্তমান রোগীর যে যে লক্ষণ ও অবস্থা লিপিবদ্ধ করা হইল, সেগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে একটী সমুচ্চয় বা সমষ্টি অর্থাৎ স্বোপার্জ্জিত বা প্রাপ্ত দোষজ লক্ষণাবলির সমুচ্চয়। জাহ্নবী নদীটী যেখানে বঙ্গোপসাগরে নিপতিত হইয়াছেন, সেখানে তাঁহার প্রস্থ হয়ত যোজন বিস্তৃত, কিন্তু হিমালয়ে তাঁহারই প্রস্থ কয়েক হস্ত পরিমিত মাত্র। কেন এরূপ হইয়াছে? ইহার কারণ এই যে, প্রথম উদ্ভবের স্থান হইতে সাগরসঙ্গম স্থান পর্য্যন্ত কত কত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পয়ঃপ্রণালী, কত কত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নদী ইত্যাদি আসিয়া জাহ্নবীপ্রবাহে মিলিত ও মিশ্রিত হইয়াছে এবং তাহারই ফলে ক্রমেই তাঁহার আয়তন, প্রবাহ ও আকৃতি বর্দ্ধমানা হইতে হইতে সাগরসঙ্গমের

স্থলে উত্তালতরঙ্গমালাসমন্বিত ভীষণ ও প্রচণ্ড রূপ ধারণ করিয়াছে। রোগীর বর্ত্তমান লক্ষণ-লিপিখানি লইয়া চিন্তা করিলে চিকিৎসকের মনে অতি সুন্দরভাবে ইহাই প্রতিভাত হইবে যে, রোগীর জীবনে কোনও একদিন অতি সামান্য মাত্র নিয়মলঙ্ঘন বা শারীরিক অত্যাচারের ফলে হয়ত অতি সামান্য প্রকারের পীড়ালক্ষণ দেখা দিয়াছিল এবং তাহা দুই একদিন লঘুপথ্য বা সংযমের দ্বারাই আরোগ্য হইতে পারিত, কিন্তু তাহা না হইয়া হয়ত তাহারই উপর আরও অত্যাচার অনাচার হইয়াছিল। তাহার উপরও যদি তখন সুপথ্য ও সুচিকিৎসা অবলম্বিত হইত, তবে তখনও প্রতিকার হইত কিন্তু তাহাও হয় নাই। কষ্ট ভোগ করিতে কেহই চায় না,—রোগীও হয়ত সংযম ও সুপথ্যাবলম্বন করিতে প্রস্তুত না হইয়া চিকিৎসকসমীপে গিয়া যাহাতে অতি শীঘ্র তাহার লক্ষণগুলির প্রতিকার হয়, তজ্জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইয়াছিল, চিকিৎসকও যে, সে অবস্থায় হিতপরামর্শ না দিয়াছিলেন, তাহা নয়, কিন্তু রোগী হয়ত শোনে নাই বা তাহার ব্যবসা ও কার্য্যানুরোধ ঐ হিতপরামর্শ শুনিবার মত অবসর ছিল না, সুতরাং চিকিৎসক জোর করিয়া কষ্টকর লক্ষণগুলিকে অপসারিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এদিকে পূর্ব্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত **সোরাদোষটী** তখন তাহার স্বভাবসুলভ তন্দ্রা বা নিদ্রাবস্থা হইতে জাগরিত হইয়া উঠিল এবং ঐ সুপ্ত সিংহ জাগরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রোগীর স্বোপার্জ্জিত দুইটী বা একটী দোষও সোরাদোষের সহিত মিলিত হইয়া রোগীর আভ্যন্তর যন্ত্রাদির কার্য্যদুষ্টি ও কার্য্যবিশৃঙ্খলা আনয়ন করিল। তাহার পর হয়ত পুনরায় "চাপা" দেওয়া, ইঞ্জেক্সন প্রয়োগ ইত্যাদি নানা জটিলতার সৃষ্টি হইতে থাকিল। ক্রমে ক্রিয়া-বিশৃঙ্খলার স্থলে যান্ত্রিক পরিবর্ত্তনও সংঘটিত হইল,—তখন হয়ত রোগীর ধ্যানভঙ্গ হইল যে, এতকাল এইরূপ চিকিৎসা করাইয়াও তো কোনও ফল পাওয়া দূরের কথা, এ আবার যে একটী

টিউমার হইল এবং এরূপ অবস্থায় হয়ত প্রকৃত আরোগ্যকারী চিকিৎসা অবলম্বন করিবার সঙ্কল্প করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছে ও আপনি লিপি প্রস্তুত করিয়াছেন। এক্ষণে চিন্তা করিয়া দেখিলেই জাহ্নবীর আয়তন ও প্রচণ্ডতার বৃদ্ধি এবং রোগীর বর্ত্তমান অবস্থার জটিলতা প্রায় সমবর্গের বলিয়া অনুমিত হইবে।

যাহা হউক বর্ত্তমান অবস্থায় রোগীর জটীল অবস্থা সমুদ্ভবের জন্য দায়ী কে? প্রধানতঃ দায়ী—অবশ্যই রোগী, তাহার পর গৌণভাবে দায়ী,—তাহার লক্ষণগুলি চাপা দেওয়া চিকিৎসার সাহায্যে আরোগ্যের একটা ভাণ বা আরোগ্যের অনুকল্প প্রদর্শন। রোগী প্রতিবারই মনে করিয়াছিল যে, "এইবার আমি আরোগ্য হইলাম"; কিন্তু উহা প্রকৃত আরোগ্য নয়, আরোগ্যের অনুকল্প মাত্র। প্রতিবার এই অনুকল্প আরোগ্যের ফলে অতি ভীষণ প্রকারের অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা রোগী জানিত না, এমন কি, চিকিৎসকও জানিতেন বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক এক্ষণে রোগীকে প্রকৃত আরোগ্যের ইচ্ছা করিলেও সে পথে অনেক বাধা সৃষ্টি হইয়াছে।

মানব শরীরে পীড়াটা কি? পীড়াটা জীবনীশক্তির বিশৃঙ্খলা। যখন জীবনীশক্তিটা স্বাভাবিকভাবে কার্য্য করিতে না পারে অর্থাৎ অন্য কোনও শত্রু শক্তির দ্বারা বাধ্য হইয়া অস্বাভাবিকভাবে কার্য্য করিতে বাধ্য হয়, তখনই মানব নানা প্রকার কষ্ট ও অসুবিধা অনুভব করে; সেগুলিকে পীড়ালক্ষণ বলে। যাহা হউক ঐ বিশৃঙ্খলাযুক্ত জীবনীশক্তিকে নিরাময় করা অর্থাৎ তাহার পূর্ব্ব শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করাই আরোগ্য করা। কি উপায়ে তাহা হইয়া থাকে? উপায়,—যে যে লক্ষণ ও অস্বাভাবিক অনুভূতি সকল উদয় হয়, তাহাদের সমষ্টির সাদৃশ্যানুসারে ঔষধ নির্ব্বাচন ও প্রয়োগ। এক্ষণে, তাহা না করিয়া যদি কেবল মাত্র রোগ লক্ষণগুলি জোর করিয়া অপসারিত করা হয়, তবে স্বাভাবিক নীতি অনুসারে রোগ

শক্তিটী আরও অন্তর্মুখীন হয় অর্থাৎ জীবনীশক্তিটী আরও অধিক বিশৃঙ্খলা প্রাপ্ত হয় এবং তাহার ফলে, শরীরের মধ্যে আরও আভ্যন্তর যন্ত্রগুলিকে দূষিত হইতে থাকে। আবার যে যন্ত্রে পীড়া লক্ষণ বিকাশ পাইল, তাহার প্রকৃত উপায় বা প্রতিকার অবলম্বন না করিয়া যদি আবার ঐ যন্ত্রের পীড়া লক্ষণগুলিকে চাপা দেওয়া হয়, তবে তাহার ফলাফল আরও গুরুতর ও আভ্যন্তর হইবে তাহাতে বিচিত্রতা কি? এই ভাবের তথাকথিত চিকিৎসা চলিতে চলিতে ক্রমে ক্রমে অধিকতর অভ্যন্তর প্রদেশে পীড়া-লক্ষণের আবির্ভাব হইতে থাকিবে, এদিকে রোগীর জীবনীশক্তি তাহার স্বাভাবিক পথে কার্য্য করিবার পক্ষে নানাদিক দিয়া বাধা পাইতে পাইতে নিতান্ত ক্লিষ্ট ও ক্ষীণ হইয়া উঠিতে থাকে।

রোগকে কেহ কখনও চাপা দিতে পারে না, লক্ষণগুলিকেই চাপা দিতে পারে। রোগ লক্ষণগুলিকে চাপা দিলে সাধারণ লোকে বা কখনও কখনও রোগী নিজেও অনেকটা সন্তোষলাভ করিয়া থাকে যে, লক্ষণগুলি যখন গিয়াছে তখন রোগও গিয়াছে; কিন্তু তাহা হয় না। রোগটাকে ধ্বংস করা সমলক্ষণতত্ত্ব ব্যতীত কখনও আশা করা যায় না। লক্ষণগুলি লোকলোচনের বহির্ভূত করিয়া অপসারিত করা এক কথা এবং রোগশক্তিকে সুনির্ম্মলভাবে শৃঙ্খলাযুক্ত করিয়া রোগীকে আরোগ্য করা আর এক কথা।

এক্ষণে, রোগীকে আরোগ্য করিবার পথে যে যে বাধা তাহার আলোচনা করিতে হইবে। সমলক্ষণ সূত্রে সুনির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগ হইবামাত্র যেমনই ঔষধের প্রথম ঝঙ্কারটী উৎপাদিত হইবে, তেমনই আরোগ্য সূত্রটী আরম্ভ হইবে এবং **সর্ব্বশেষ লক্ষণটী সর্ব্বাগ্রে চলিয়া যাইবে, তাহার পর ক্রমে ক্রমে পশ্চাৎ গতি ধরিয়া একে একে লুপ্ত লক্ষণগুলি পুনরাবির্ভাব**

হইতে থাকিবে এবং অপসারিত হইবে। রোগী এই অবস্থায় লুপ্ত লক্ষণের পুনরাবির্ভাব সহ্য করিতে না পারিলে তাহার আরোগ্যের আশা একেবারেই থাকে না। কেননা অন্য পথে আরোগ্য হয় না। লুপ্ত লক্ষণ সকল একে একে পশ্চাৎ গতিতে বাহির হইতেই হইবে; নতুবা আশা নাই। অনেক ক্ষেত্রে সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও সেগুলি বাহির হয় না। আবার অনেক ক্ষেত্রে বাহির হইলে রোগীর তাহা সহ্য করিবার মত শক্তি না থাকায় রোগী অতিশয় বিপন্ন হইয়া উঠে অথচ ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থ নাই।

আরও একপ্রকার বাধা আছে; পূর্ব্বে যদি রোগীর কোনও যন্ত্রবিশেষে রোগ লক্ষণ বিকাশ পাইয়া থাকে এবং অস্ত্রোপচারের দ্বারা সেই যন্ত্রটীকে অপসারিত করা হইয়া থাকে, তবে পূর্ব্বপূর্ব ক্রমে লুপ্ত পীড়া বাহির হইবার সময় ঐ যন্ত্রটীর অভাব হয় বলিয়া উহা বিকাশ পাইতে পারে না সুতরাং আরোগ্যের পথে ভয়ানক বাধা সৃষ্টি হয়। এরূপ ক্ষেত্র নিতান্ত বিরল নয়। প্রায়ই দেখা যায় অমুকের টন্‌সিলটী কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে, অমুকের ডানদিকের ডিম্বাধারটী তুলিয়া ফেলা হইয়াছে, অমুকের সরলান্ত্র বাহিরে আসিত বলিয়া তাহার কতক অংশ কাটিয়া বর্জ্জন করা হইয়াছে, অমুকের অর্শের বলিগুলি কাটিয়া ফেলা হইয়াছে অথবা অমুকের দেহে অনেকগুলি বড় বড় আঁচিল ছিল, সেগুলি নিতান্ত বিশ্রী বলিয়া কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে;—ইত্যাদি নানা ইতিহাস পাওয়া যায়। চিকিৎসার নামে আজকাল কি না হইতেছে?

কোনও একটী যন্ত্র, যাহাতে বর্ত্তমানে পীড়া লক্ষণ বিকাশ পাইয়াছে, সেই যন্ত্রটীকে অপসারিত অর্থাৎ কাটিয়া ফেলিলে, পীড়াটী দূরীভূত হইল,—একথা স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ মনে করিতে পারেন কিন্তু উচ্চশিক্ষিত

ব্যক্তিগণও যে ইহা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, ইহাপেক্ষা অধিকতর পরিতাপের কথা আর কি হইতে পারে? আদালতের বিচারপতি, উকিল, কেরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া স্কুল কলেজের শিক্ষক ও অধ্যাপক পর্য্যন্ত নিজ নিজ পরিবারের ছেলেমেয়েদের **টন্‌সিল, এডিনয়েড, নাসা ইত্যাদি** ডাক্তারের দ্বারা অস্ত্রোপচার করাইয়া কাটিয়া ফেলিবার জন্য ব্যস্ততা দেখান,—ইহাই আশ্চর্য্য কথা। কি মোহ! রোগটী বিকাশ পাইবার স্থানটী বা যন্ত্রটী অপসারিত করিলে রোগটী অপসারিত হইতে পারে, এই ধারণা ভারতবর্ষের কোনও অধিবাসীর পক্ষে পোষণ করা যে কতবড় আক্ষেপের কথা, ইহা আমরা প্রকাশ করিবার ভাষা পাই না, বলিয়া মনে হয়। পাশ্চাত্য জড়বাদী শিক্ষার কি প্রভাব! পৃথিবীর মধ্যে যাবতীয় তথাকথিত সভ্যগণ যখন ইতর শ্রেণীর জীবের ন্যায় অসভ্যাবস্থায় আম-মাংস ভোজন করিয়া ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করিতেছিল, তাহারও বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেখানে পূতপ্রাণ মুনিঋষিগণ আধ্যাত্ম-তত্ত্ব ও নিখিল বিশ্বরচনার অন্তরালে ভগবানের "সূত্রে মণিগণাইব" অবস্থিতি উপলব্ধি করিয়া মানবজীবন সার্থক করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের বংশধরগণ নিতান্ত জড়বাদী ও বহির্ম্মুখী হইয়া আত্ম অনাত্ম বিচার পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসকদের বাঁধাবুলি অনুসরণ করিয়া নিজেদিগকে সুপণ্ডিত ও গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন, ইহাপেক্ষা দুঃখের কথা আর কি হইতে পারে? মানব শরীরটীর মধ্যে **স্থূল** ব্যতীত যে ব্যক্তি **সূক্ষ্মের** সন্ধান পায় না, যে ব্যক্তি **কারণ** ও **কার্য্যের** মধ্যে **বিভিন্নতা** আদৌ অনুভব করিতে পারে না, যে ব্যক্তির ধারণায় আত্ম অনাত্ম একই প্রতীয়মান হয়, তাহাকে এ সকল কথা বলা যে সম্পূর্ণ নিরর্থক, তাহা জানি তবুও ইহার অবতারণা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, যদি কখনও স্থূলমতিদিগেরও চিন্তাশক্তি উন্মেষ পায়, তবে হয়ত এ সকল বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা জাগিতে

পারে, ইহাই একমাত্র আশা। রোগ কাহাকে কহে, রোগের ফল কোনটী বিকাশস্থল কি প্রকার, আরোগ্য কাহাকে বলে, তাহার তত্ত্ব কি, নীতি কি, —ইত্যাদি বিষয় অনুসন্ধিৎসা ও জিজ্ঞাসা ব্যতীত জানা যায় না।

যখন বিকাশক্ষেত্রটী বা যে যন্ত্রে পীড়া লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, সেই যন্ত্রটিকে কাটিয়া ফেলা হয়, তখন রোগশক্তিটী আরও অন্তর্ম্মুখীন হইয়া আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদিকে আরও বিকৃত ও পীড়িত করিয়া তোলে,—**টন্‌সিল কাটিবার পর টিউবারকুলোসিস দেখা দিয়াছে,** এরূপ রোগী বিরল নহে। **অর্শের বলি অপসারিত ও কর্ত্তন করিয়া ফেলিবার পর হৃদ্‌যন্ত্র আক্রান্ত হইবার** ও শেষে ঐ যন্ত্রের দুরারোগ্য পীড়া উপস্থিত হইবার উদাহরণ অনেকই পাওয়া যায়। যাহা হউক, এই প্রকার রোগীর স্থায়ী আরোগ্য আরম্ভ হইলে, রোগশক্তি পূর্ব্বাক্রান্ত ক্ষেত্র বা যন্ত্রটীতে পুনরায় রোগলক্ষণ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু সে যন্ত্রটী বহু পূর্ব্বেই অপসারিত হওয়ায় উহা সম্ভব হয় না, সুতরাং আরোগ্য অনেক ক্ষেত্রেই সুদূরপরাহত হইয়া থাকে। যদিই বা রোগীর এখনও অতিরিক্ত বলক্ষয় না হইয়া থাকে, তবুও ঐ প্রকার পূর্ব্ববিকাশ ক্ষেত্রটির অভাবে রোগশক্তি অভ্যন্তর প্রদেশ ত্যাগ করিয়া স্থূলতর রাজ্যে তাহার ক্রিয়া প্রকাশ করিতে যেন অপারক হইয়া উঠে সুতরাং আরোগ্য সম্ভব হয় না।

সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানতম বাধা,—রোগীর ও তাহার আত্মীয় স্বজনের নিরতিশয় অধৈর্য্য। লোকে পাপ করিবে নিজেদের অসংযম ও কদভ্যাসের ফলস্বরূপে নানাপ্রকার বীভৎস পীড়াক্রান্ত হইবার পর ৩৩টী ইঞ্জেক্সন লইতে দ্বিধা করিবে না, শরীরের প্রত্যেক যন্ত্রটীকে দূষিত করিবে, কিন্ত প্রকৃত চিকিৎসা আরম্ভ হইলে ১০।১৫ দিনের মধ্যেই আরোগ্য আশা করে। পুরাতন জটীল পীড়া আরোগ্য করিবার পথে অনেক বাধা। লোকে

এখনও জানে না, আসল তথ্য বুঝে না, যাহারা ১০।১৫ বৎসরের একটী জটীল পীড়া এক সপ্তাহে সারাইবে বলিয়া ধাপ্পা দেয়, তাহাদের কথা বিশ্বাস করিয়া সত্যভাষী চিকিৎসকদিগের হিতকথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারে না, —তাহারা জানে না যে, হিত কথা বা সত্যকথা কখনও মনোহর হয় না। অনেক দিন হইতে একখানি খ্যাতনামা ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন স্তম্ভে পাঠ করিয়া আসিতেছি—"গণোরিয়া বা সিফিলিস বা উভয়ই যত দিনেরই হউক না কেন, দুই সপ্তাহেই আরোগ্য হইবে ইত্যাদি।" লোকে এই সকল চিকিৎসক নামধারী প্রবঞ্চকের কথা শুনিবে,—না, "দুই তিন বৎসরের পূর্ব্বে আরোগ্যের আশা নাই," এই কথা শুনিবে। একেই ত শরীরস্থ সাইকোসিসাদি দোষের অবস্থিতি জন্য লোকের মনোভুষ্টি যথেষ্টই থাকে, তাহার উপরে এই প্রকার প্রলোভন। পেটেন্ট ঔষধ, ইঞ্জেক্‌সন ইত্যাদির প্রাচুর্য্যে ও মোহে সুধী চিকিৎসকের হিতবাক্যের আদর বড় নাই। অবশ্য সত্যের মহিমা অটুটই থাকে এবং অতি অল্পদিন পরেই নানাদিকে নানাভাবে প্রবঞ্চিত হইয়া রোগীদিগকে প্রকৃত কল্যাণকামী সুধী চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হয়। কিন্তু অর্থ হিসাবে, শারীরিক ও মানসিক শক্তি হিসাবে, তাহারা একেবারে বিধ্বস্ত ও ক্লিষ্ট হইয়া আসে, তখন আর তাহাদের বৃদ্ধি লক্ষণ সহ্য করা বা লুপ্ত পীড়ার পুনরাগমন সহ্য করা কঠিন হইয়া উঠে এবং ধৈর্য্যাবলম্বনও দুষ্কর হয়। সয়তান ও মিথ্যার এমনই প্রভাব যে, লোকের অর্থ সয়তানের ভাগ্যেই লাভ হয়, কিন্তু যাঁহারা একান্ত সত্যবাদী ও জগতের কল্যাণকামী তাঁহাদিগকে চিরদিনই অভাবগ্রস্তই থাকিতে হয়।

সর্ব্বশেষে একটী কথা লিখিয়া এই বিষয়ের উপসংহার করিতে বাসনা করি। আমাদের পরম পবিত্র শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতে উপদিষ্ট হইয়াছে ঃ—

"ঈশ্বরো সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে'র্জ্জন তিষ্ঠতি,
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্ররূঢ়ানি মায়য়া ॥"

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ সর্ব্বভূতের অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গমাদির হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া স্বকীয় মায়ার সাহায্যে সকলকে ঠিক যেন অবশভাবেই পরিচালিত করিতেছেন। তাঁহার এই পরিচালনা স্বেচ্ছাচার নহে,—পরন্তু প্রত্যেকেরই নিজ নিজ কর্ম্মফলের হিসাবে তাঁহার এই পরিচালনা। সুতরাং জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত পুঞ্জীকৃত কর্ম্মফলের অধীনে প্রত্যেকেই সু বা কু চিকিৎসকের সমীপবর্ত্তী ও তদনুসারে ফল লাভ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। যতদিন এই সত্যটী আমাদের হৃদয়ে স্ফুরিত ও প্রতিভাত না হয়, ততদিনই আমরা নিজের নিজের কার্য্যে নিজেদের স্বাধীনতা অনুভব করিয়া থাকি।

অসাধ্য পীড়া।

অসাধ্য পীড়ার আলোচনা বিশেষ আবশ্যক, কেননা পূর্ব্ব হইতে যদি জানিতে পারা যায় যে, পীড়াটী অসাধ্য অবস্থায় আসিয়াছে, তবে রোগী-পক্ষে এবং চিকিৎসক-পক্ষে অনেক সুবিধা হইয়া থাকে। রোগী-পক্ষে সুবিধা এই যে, অনর্থক কতকগুলি খরচ করিবার প্রবৃত্তি থাকে না, কেননা আরোগ্যের আশা না থাকিলে লোকে আর বৃথা অর্থব্যয় করিবার প্রয়াস পায় না; তাহা ছাড়া, অনেকেই রোগীর আসন্ন-মৃত্যুর অবস্থা জানিতে পারিলে, প্রায়শ্চিত্তাদি শেষ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিবার প্রতি যত্নবান হয়, উইলাদি প্রস্তুত করিবার উপায়ও অবলম্বন করিতে পারে, কেহ বা গঙ্গাতীরে

বাস করিয়া যথাসময়ে "তীরস্থ" হইবার ইচ্ছাও পোষণ করিতে পারে,—ইত্যাদি অনেক দিকে সুবিধা ও সুযোগ ঘটে। চিকিৎসকের পক্ষে যে কেবলই যশোরক্ষা হইবার জন্য পীড়ার অসাধ্যতাটী জানা আবশ্যক, তাহা নয়,—**সাধ্য** ও **অসাধ্য** পীড়ার চিকিৎসাপ্রথা বিভিন্ন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, উহা অগ্রেই জানিতে পারিলে, চিকিৎসা পক্ষে সুপথ অবলম্বিত হইতে পারে। এজন্য এ বিষয়ে আলোচনা অবশ্যই আবশ্যক।

সর্ব্বপ্রথমেই একটী কথা আমাদিগকে অর্থাৎ হোমিওপথাবলম্বীদিগকে জানিয়া রাখিতে ও সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে,—তাহা এই যে, **পীড়ার সাধ্যতা বা অসাধ্যতা, পীড়ার মধ্যে বা পীড়াটীর নামের মধ্যে থাকে না, পরন্তু উহা থাকে, রোগীদেহের অবস্থার উপর।** নাম হিসাবে যে পীড়াটী অতিমাত্র সহজ ও সাধ্য বলিয়া পরিজ্ঞাত, তাহাও **রোগীদেহের অবস্থার শোচনীয়তার** জন্য অসাধ্য অবস্থায় আসিতে পারে। আবার যে পীড়া নিতান্ত অসাধ্য বলিয়াই জনসমাজে ও চিকিৎসকদিগের মধ্যে সুবিদিত আছে, তাহাও রোগীদেহের **বল** ও **বয়স** থাকিলে অবশ্যই সাধ্য, অন্ততঃ কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাধ্য হইতে পারে। যে দুর্জ্জয় **রাজযক্ষ্মা** পীড়া সাধারণতঃ অতি অসাধ্য বলিয়াই খ্যাত তাহাও ঐ কারণে অনেক রোগীর আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি। যে **কর্কট** বা **ক্যান্সার** পীড়ার কোনও চিকিৎসা নাই বলিয়াই সুবিদিত, সে রোগেও রোগী বাঁচিয়া যাইতে দেখিয়াছি। অবশ্য এখানে প্রকৃত আরোগ্য হিসাবেই এসকল কথা লিখিত হইতেছে, কেননা অনেক ক্ষেত্রে অসমলক্ষণে চিকিৎসার প্রভাবে বর্ত্তমান স্পষ্ট বিকশিত লক্ষণযুক্ত একটী পীড়াকে জোর করিয়া চাপা দিয়া রোগান্তর প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হয় এবং রোগান্তর ঘটিলে "পূর্ব্বের পীড়াটী সারিয়াছে, এটী একটী নূতন রোগ হইল" বলিয়া

স্তোকবাক্যে বা প্রতারণা সাহায্যে "আরোগ্য" এস্থলে আদৌ অভিপ্রেত নয় এবং তাহার বিষয়ে আলোচনা করাও হইতেছে না,—এখানে পূর্ণমাত্রায় নির্ম্মল আরোগ্য সম্পর্কেই যাবতীয় কথা বলা হইতেছে, জানিতে হইবে। যাহা হউক, সাধ্যতা ও অসাধ্যতা নির্ভর করে একমাত্র রোগীদেহের **অবস্থার** উপর।

কিপ্রকার দেহে ঐ অসাধ্য অবস্থা আসিবার সম্ভাবনা অথবা অসাধ্য অবস্থার **নিদর্শন** কি, প্রকৃতই অসাধ্য অবস্থা আসিলে চিকিৎসকের কর্ত্তব্য কি, কি উপায় অবলম্বন করিলে অসাধ্য অবস্থাটীর আবির্ভাব রোধ করা হইতে পারে, ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় তত্ত্বের আলোচনাই এস্থলে অভিপ্রেত। একে একে সেগুলি লিখিত ও আলোচিত হইতেছে। এসকল তত্ত্ব আলোচনা করিবার পূর্ব্বে অগ্রে সাধ্যাবস্থার বিষয় সামান্য কিছু না লিখিলে বিষয়গুলি হৃদয়ঙ্গম হইবে না। এজন্য **সাধ্যাবস্থার নিদর্শনাদি** লিখিত হইতেছে, তাহার পর বর্ত্তমান বিষয়গুলির সম্বন্ধে লিখিত হইবে।

রোগীকে আরোগ্য করিবার শক্তি চিকিৎসকের থাকে না, অর্থাৎ তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে নয়। আরোগ্যটী নির্ভর করে **লক্ষণ-সমষ্টির** অবস্থিতির উপর। **যেখানে লক্ষণ-সমষ্টি থাকে, সেখানেই আরোগ্য সম্ভব হইয়া থাকে, নতুবা হয় না।** প্রত্যেক সাধ্য পীড়ায়, যেখানে প্রকৃতি বিনা সাহায্যে আরোগ্য করিতে পারে না, সেখানে ঐ সাহায্য ভিক্ষার ভাবাস্বরূপ লক্ষণ-সমষ্টি বিকাশ করিয়া থাকেন এবং চিকিৎসক কেবল ঐ লক্ষণ-সমষ্টির সাদৃশ্যে ঔষধ নির্ব্বাচন দ্বারা রোগীকে আরোগ্য করিতে সক্ষম হয়েন, সুতরাং লক্ষণ-সমষ্টি না পাইলে রোগীকে আরোগ্য করা আদৌ সম্ভব হয় না। এ সকল কথা ইতিপূর্ব্বে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। যাহা হউক, একথা বুঝিতে বিলম্ব

হইবে না যে, যেখানে লক্ষণ সমষ্টির একান্তই অভাব হইবে সেখানে আরোগ্য করা সম্ভব হয় না। এক্ষণে কোনও কোনও ক্ষেত্রে লক্ষণ-সমষ্টি কুচিকিৎসার ফলে যেন আবরিত থাকে এবং সামান্য চেষ্টা করিলেই ঐ কুচিকিৎসাজনিত আবরণটী সরিয়া যায়। তখন লক্ষণ-সমষ্টির পূর্ণবিকাশ হইয়া পড়ে এবং চিকিৎসক তখন রোগীকে আরোগ্য করিতে পারেন। কিন্তু যেখানে কোন প্রকারেই লক্ষণ-সমষ্টি পাওয়া যায় না, সেখানে জানিতে হইবে যে, রোগী-শরীরে এরূপ অবস্থা আসিয়াছে যে, তাহার রোগটী সাধ্যসীমার পরপারে উপনীত হইয়াছে। যেহেতু প্রকৃতি লক্ষণ-সমষ্টির দ্বারা সাহায্য ভিক্ষা করিতেছেন না, সুতরাং চিকিৎসকের ক্ষমতা বহির্ভূত হইয়া উঠিয়াছে। শরীরের কি অবস্থায় ইহা আশা করিতে হয়? কি প্রকার দেহে ঐ অসাধ্য অবস্থাটী আসিবার সম্ভাবনা?

যেখানে দুইটী শক্তির মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ ঘটে, তখন একটী শক্তির পরাভব কখন ঘটে? যখন একটী শক্তি অপেক্ষা আর একটী শক্তি অধিক বলবতী হয়, তখন ঐ শক্তিটী পরাভূত হইয়া থাকে। আমাদের দেহের মধ্যেও পীড়াকালে দুইটী শক্তির মধ্যে যুদ্ধ চলে, একটী জীবনী-শক্তি, অপরটী দোষ-শক্তি। যেখানে জীবনীশক্তির অধিক বল থাকে এবং যতদিন অধিক বল থাকে, ততদিন শত্রুশক্তি অর্থাৎ দোষ-শক্তিটীকে দাবাইয়া নিজের প্রভাব বিস্তার করতঃ লক্ষণ-সমষ্টির বিকাশ করিতে সমর্থা হন। কিন্তু মনে করুন, **সোরাদি দোষ, অচিকিৎসা ও কুচিকিৎসা জনিত দোষ,** একত্রীভূত হইয়া ঐ মিলিত শক্তিটী এতই প্রভাবশালিনী হইল যে, জীবনীশক্তি উহাদের উপর ক্ষমতা বিস্তার করিতে সক্ষম হইল না, তখন যে জীবনীশক্তির পরাভব হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে? আমার ধারণা, অনেকেই দোষ অর্থে সোরা সাইকোসিস ও সিফিলিস নামক দোষত্রয়ই বুঝিয়া

থাকেন, কিন্তু **চিকিৎসা জনিত দোষও অতি ভয়ানক।** "দোষ" শব্দটীর অর্থ কি? কেহ বা দোষ বলেন, কেহ বা রোগ-বীজ বলেন,—ফলতঃ সেগুলির অর্থ কি? সেগুলির অর্থ এই যে, ভিতর হইতে বাহিরের দিকে যে শক্তি আরোগ্যকারিণী শক্তি বলিয়া বিদিতা, তৎবিপরীত শক্তি অর্থাৎ বাহির হইতে ভিতরের দিকে যে শক্তি, **চাপা** দেওয়া চিকিৎসার কালে উদ্ভূত হয়, তাহাই পীড়া স্থষ্টিকারিণী, পীড়াবর্দ্ধনী-শক্তি; যেহেতু তাহা অন্তর্ম্মুখীন শক্তি, সুতরাং পীড়াশক্তি বা ধ্বংশ-শক্তি। **সুতরাং দোষ অর্থে প্রত্যেক অন্তর্ম্মুখিনী শক্তি জানিতে হইবে। সাইকোসিস** দোষ হইতে উদ্ভূত বাতপীড়া দেখা দিবার পর যদি কেহ অসমলক্ষণে বহিঃপ্রলেপাদির সাহায্যে ঐ বাতের বেদনা লোপ করেন, বা চাপা দেন, তাহা হইলে ঐ সাইকোসিস্ দোষটী অতিমাত্র শক্তিশালিনী ও অন্তর্ম্মুখীন হইয়া রোগীর বাতবেদনার পরিবর্ত্তে **হৃদযন্ত্র** আক্রমণ করিয়া থাকে, ইহা ত নিত্যই পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং অসমলক্ষণে চিকিৎসার ফলে দোষেরই স্থষ্টি ও বর্দ্ধন হইয়া থাকে। যাহা হউক, যতদিন ঐ অন্তর্ম্মুখিনী শক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সামর্থ্য থাকিয়া জীবনীশক্তি লক্ষণ-সমষ্টি প্রকাশ করেন, ততদিন আরোগ্য আশা করিতে পারা যায়, কিন্তু জীবনীশক্তি অপেক্ষা অন্তর্ম্মুখিনী-শক্তি অধিক প্রভাবশালিনী হইলে ঐ উদাহরণে হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ার আর লক্ষণ প্রকাশ ঘটিবে না, তখন ঐ মিলিত দোষ সমূহ হৃদযন্ত্রটীকে বিধ্বস্ত করিবারই ব্যবস্থা করিবে এবং ধ্বংসমুখে বা ধ্বংসপথের লক্ষণ, যথা শোথ, নিরক্তুতা, অক্ষুধা, অজীর্ণ ইত্যাদি আসিয়া উপস্থিত হইয়া রোগীর শেষ যবনিকা পতনের ব্যবস্থা করিবে। চিকিৎসকগণ এক্ষণে কহিবেন,—"হৃৎপীড়ার রোগিটীর বাঁচার কোনও আশা নাই, কেননা লক্ষণ-সমষ্টির অভাব"। ফলতঃ হৃদ্‌পীড়াটী শেষকালের বিকাশ

এই পর্য্যন্ত, আসলে রোগীটীরই শরীরের অবস্থা অসাধ্য হইয়াছে। ঐ যন্ত্রটী বা ঐ যন্ত্রের পীড়াটী দোষী নয়,—কেবল ভাবার সুবিধার জন্য বলা হয় হৃদপীড়াটী অসাধ্য।

যদি উপরোক্ত আলোচনাটী হৃদয়ঙ্গম হয়, তবে এই কথাটী অতি স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যাইবে যে, **সোরাদি "নামজাদা" দোষত্রয়ই রোগীর ধ্বংশ জন্য কেবলই দায়ী নয়, অসম-লক্ষণে চিকিৎসাই প্রধান দায়ী।** তাহা ছাড়া, সোরাদি দোষত্রয়ের উদ্ভব হইল কোথা হইতে? উহাদের উদ্ভবও একমাত্র অসম-লক্ষণে বা চাপা দেওয়া চিকিৎসা হইতে। অতএব অসম-লক্ষণে চিকিৎসাই একমাত্র ধ্বংস শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়,—চিকিৎসা নামটী একেবারেই উপহাসের কথা।

এ প্রসঙ্গে আরও একটী কথা মনে রাখিতে হইবে, তাহা এই যে, এলোপ্যাথিক চিকিৎসা একটী "নামজাদা" অসম-লক্ষণে চিকিৎসা হইলেও অন্য নানা জাতীয় ও নানা নামের চিকিৎসা প্রচলিত আছে। সেগুলিও অসম-লক্ষণের চিকিৎসা,—সুতরাং সেগুলিও ঘোরতর অনিষ্টজনক। একমাত্র হোমিওপ্যাথিই সম-লক্ষণের চিকিৎসা। আমাদের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ধাতুঘটিত ঔষধ সাহায্যে যে চিকিৎসা প্রচলিত আছে, তাহাও সম-লক্ষণে চিকিৎসা। যে নামেরই হউক না কেন, যে চিকিৎসা পথে রোগীর লক্ষণ সাদৃশ্যে ঔষধ নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, তাহাই সম-লক্ষণতত্ত্বানুযায়ী জানিতে হইবে।

সাধ্য ও অসাধ্য অবস্থাদ্বয়ের নিদর্শন আমরা উপরোক্ত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারিয়াছি; অর্থাৎ **যে স্থলে রোগীর পীড়ায় লক্ষণ-সমষ্টি সুস্পষ্ট বর্ত্তমান থাকে তাহাই সাধ্যাবস্থা।** বিপরীত পক্ষে **তাহা না থাকিলে উহা অসাধ্য বলিয়া**

জানিতে হইবে। এই দুইটী অবস্থাই রোগের নয়—পরন্তু রোগী-দেহের, একথাটী মনে রাখিতে হইবে। জরটী কেবল জর বলিয়া সাধ্য বা অসাধ্য হয় না। তবে যদি জর-রোগীর দেহ-যন্ত্রটার অবস্থা এ প্রকার হইয়া উঠে, এতই শোচনীয় হয় যে, জীবনীশক্তি আর লক্ষণ-সমষ্টি প্রকাশ করিতে অসমর্থা হন, তবে জানিতে হইবে যে, ঐ জর-রোগটী অসাধ্য অবস্থায় আসিয়াছে। আমাদের দেশের ত্রিকালজ্ঞ ঋষি প্রণীত আয়ুর্ব্বেদে যদিও পীড়া হিসাবে অরিষ্ট লক্ষণ অর্থাৎ অসাধ্যাবস্থার নিদর্শন, প্রত্যেক পীড়াধিকারের লিখিত আছে, তবুও সাধারণ ভাবে অসাধ্য অবস্থার বর্ণনা অনেকাংশে আমাদের উপরোক্ত অভিমতের অনুকূল ও পোষক। সাধারণ ভাবে লিখিত আছে।

"বাতব্যাধীরপস্মারী ব্রণীকুষ্ঠী চিরজ্বরী,
গুল্মীচ মধুমেহীচ রাজযক্ষ্মীচ যো নরঃ।
অচিকিৎস্যা ভবেত্ত্যেতে বলমাংস পরিক্ষয়াৎ,
স্বল্পেষপি বিকারেষ্ ভিষগেতান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥

অর্থাৎ বাত, অপস্মার অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে "Epilepsy" বলে, দুষ্টফোড়া, কুষ্ঠ, পুরাতন জ্বর, গুল্ম, মধুমেহ, রাজযক্ষ্মা—এই সকল রোগের রোগীতে বল ও মাংসের নিতান্ত ক্ষীণতা প্রাপ্তি ঘটিলে, উহারা স্বল্পলক্ষণযুক্ত হইয়া উঠে এবং তখন চিকিৎসার অযোগ্য হয়। সুতরাং চিকিৎসকগণ সে অবস্থায় চিকিৎসা বর্জ্জন করিবেন। অর্থাৎ এই এই পীড়ায় ঐ প্রকার অবস্থা আসিলে জানিতে হইবে যে, পীড়ার সাধ্যাবস্থা আর নাই।

পূর্ব্বলিখিত দুইটী শক্তির মধ্যে যখন জীবনীশক্তির পরাভব ঘটে এবং রোগশক্তি বা দোষশক্তি জয়ী হয়, তখন আর রোগীর লক্ষণ-সমষ্টি থাকে না, কেননা রোগীর সাধ্যসীমা অতিক্রম করিয়াছে। সুতরাং জীবনীশক্তি এক্ষণে নিশ্চেষ্ট,—এক্ষণে রোগশক্তি তাহার ইচ্ছামত পচনাদি অবস্থা

আনিয়া রোগীর দেহ-যন্ত্রটী ধ্বংশ করিয়া ফেলিতে থাকে এবং যতদিন না ধ্বংশকার্য্যটী শেষ হয়, ততদিন রোগী কোনও প্রকারে জীবিত থাকে মাত্র। তখন সাধারণলোকে ও চিকিৎসকগণ তাহাকে "মুমূর্ষু" বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইবে যে, যদি সোরাদি দোষ না থাকিত, অথবা সৃষ্টির আদিকালে যখন ঐ সকল দোষ মানবশরীরে আবির্ভূত হয় নাই, তখন কি মনুষ্য অমর ছিল? এ প্রশ্ন খুবই সমীচীন এবং সামান্য চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় ও আমাদের শাস্ত্রাদি হইতেও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় যে, তখন মনুষ্যের অগাধ পরমায়ু ছিল,—এমন কি বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি আসে না। তবে যদি কেহ নিজেদের পিতা পিতামহের পরমায়ুর সহিতও অধুনাতন লোকের পরমায়ু তুলনা করেন, তবে জানিতে পারিবেন যে, ক্রমেই মনুষ্য স্বল্পজীবী, ক্ষীণপ্রাণ, হীনমস্তিষ্ক এবং খর্ব্বাকৃতি হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে যেমন ৫০।৬০ বৎসর কালই উর্দ্ধতন পরমায়ু বলিয়া দেখিতেছি, আজি হইতে ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ৮০।৯০ বৎসর পরমায়ু দেখিয়াছি, আরও পূর্ব্বে ১০০।১২০ বৎসর পরমায়ু ছিল, সুতরাং সত্যযুগে যে সহস্র বৎসর পূর্ণ পরমায়ু থাকিবে, ইহা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। আমার পিতৃদেব ৯৭ বৎসর জীবিত ছিলেন, আমার পূজ্যপাদ পিতামহ ১১৮ বৎসর বয়সে স্বর্গলাভ করিয়াছেন দেখিয়াছি এবং তাঁহার ১১৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে স্বহস্তে ফুল তুলিয়া কুলদেবতার পূজা করিতে এবং নিত্য প্রায় ১ ঘণ্টাকাল ধরিয়া প্রাণায়াম ও ধ্যানমগ্ন থাকিতে দেখিয়াছি। এক্ষণে আমি নিজের জীবন-কালেই দেখিতেছি ও অনুভব করিতেছি যে মনুষ্য নিত্য নিত্য হীনায়ু হইতেছে, ক্রমেই হইতেছে, আরও হইবে। শেষে নাকি ২০ বৎসরের মধ্যেই জীবলীলা সাঙ্গ হইবার কথা পুরাণাদিতে লিখিত আছে। যেরূপ

আমাদের সমাজের অবস্থা ঘটিতেছে, তাহাতে আমাদের ভবিষ্যৎ পরমায়ু যে ঐ প্রকার হইতে পারে, ইহা অবিশ্বাস করা যায় না।

এক্ষণে রোগীর অসাধ্য অবস্থাটী আসিলে, কি প্রকার চিকিৎসা অথবা চিকিৎসকের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, সে বিষয়ে সামান্য দুই একটী কথা বলিলেই হইবে। এ অবস্থা উপস্থিত হইলে রোগীকে আরোগ্য করিবার আশা কখনও করিতে পারা যায় না, অতএব চেষ্টাও নিরর্থক, কেবলই যে নিরর্থক, তাহা নয়, অনেক সময় বিপজ্জনক; কেননা, যদিই বা কোন প্রকারে একটী ঔষধ কতকটা সমলক্ষণ সূত্রে নির্ব্বাচিত হইতে পারে, ফলতঃ তাহা প্রয়োগ করিবার ফলে, হয়ত বৃদ্ধিলক্ষণ দেখা দিয়া জীবনীশক্তি যেটুকু "ধিকি ধিকি" করিয়া বা "মিট মিট" করিয়া রোগীকে কোনও প্রকারে "হাড়ে মাসে" জড়িত করিয়া জীবিত রাখিয়াছিল, তাহাও নিভিয়া যাইবে এবং শেষ যবনিকা পতন হইয়া গৃহস্থকে শোকসন্তপ্ত করিবে। **তবে যদি ঐ প্রকার নির্ব্বাচিত ঔষধের নিম্নতর শক্তি প্রয়োগ করিয়া সামান্য প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয়, তবে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে উচ্চতর শক্তিতে উঠিতে থাকিলে ক্বচিৎ কোনও ক্ষেত্রে রোগীর জীবনকাল কিছুদিন বৃদ্ধি হইতে পারে,** ফলতঃ সেরূপ ক্ষেত্র অতি কম। সাধারণতঃ অসাধ্য অবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কষ্টগুলির আশু উপশমকারী ঔষধের **নিম্নতর শক্তি** প্রয়োগ দ্বারা **যন্ত্রণাহীন ম**রণ আনয়ন করা বা করিতে পারাই কৃতিত্ব ও কর্ত্তব্য জানিতে হইবে।

স্তন্যপায়ী শিশুর আরোগ্যকল্পে জননীকে ঔষধ প্রয়োগ।

হোমিওপ্যাথির দর্শনতত্ত্বে যিনি সামান্য প্রবেশলাভও করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ক্রিয়াবান্ হইতে হইলে, **সমলক্ষণ তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া** প্রয়োগ আবশ্যক। তরুণ পীড়ায় পীড়িত শিশুর যে লক্ষণসমষ্টি থাকে,—তাহার স্তন্যদায়িনী মাতার মধ্যে তাহা কখনও থাকে না, আশাও করা যায় না। তবে সমলক্ষণযুক্ত পীড়ায় অথবা অন্য যে কোনও তরুণ পীড়ায় পীড়িত থাকিয়া যদি **উভয়েই সমলক্ষণযুক্ত** হয়, তবে **কেবল সেই ক্ষেত্রে** মাতাকে ঔষধ প্রয়োগ করিলে, সেই ঔষধ মাতার শরীরযন্ত্রে ক্রিয়া উৎপাদন করিয়া তাঁহার স্তন্যপথে সেই ক্রিয়া শিশুতে পৌঁছিবার আশা করিতে পারা যায়,—নতুবা অন্য কোনও ক্ষেত্রেই এ প্রকার আশা করা যায় না। এ কথাটী আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইবে। মনে করুন মাতারও নিউমোনিয়া এবং শিশুরও নিউমোনিয়া হইয়াছে; অথবা, মনে করুন, মাতার উদরাময় হইয়াছে এবং সেই সময়েই শিশুর নিউমোনিয়া পীড়া হইয়াছে;—এই উভয় ক্ষেত্রেই মনে করুন, দেখা গেল যে, মাতার **ফস্ফোরাসের** উদরাময় এবং শিশুরও ফস্ফোরাসেরই নিউমোনিয়া অথবা মাতারও ফস্ফোরাসের নিউমোনিয়া এবং শিশুরও ফস্ফোরাসের নিউমোনিয়া; অর্থাৎ উভয় রোগীরই **সমলক্ষণের পীড়া,** অতএব **একই** ঔষধের পীড়া—এক্ষেত্রে এবং **কেবলমাত্র এই ক্ষেত্রে,** মাতাকে ঔষধ প্রয়োগ করিলে, ঔষধটী যেন **সঞ্জীবিত** হইয়া মাতার মধ্য হইতে স্তন্যপথে শিশুকেও আরোগ্য করিবে এবং শিশুকে পৃথকভাবে

ফস্ফোরাস (বা যে কোনও ঔষধের উভয়েই সমলক্ষণ দেখা যাইবে) দিবার আবশ্যক হইবে না। **সমলক্ষণত্ব না থাকিলে,** অর্থাৎ স্তন্যদায়িনী জননী ও স্তন্যপায়ী শিশু একই ঔষধের রোগী না হইলে, মাতার ঔষধ শিশুতে ক্রিয়া করিবে না। মোট কথা, মাতা নিরোগী থাকিলে শিশুরই চিকিৎসা প্রয়োজনীয়। মাতাকে যদ্যপি, শিশুর পীড়ায় যে ঔষধটী সমলক্ষণ হিসাবে নির্ব্বাচিত হইয়াছে, সেই ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, তবে, মাতার মধ্যে **ঐ ঔষধের লক্ষণ সমষ্টি না থাকায়,** উহা মাতার শরীরযন্ত্রে কোনও ঝঙ্কারই উৎপাদন করিবে না, সুতরাং তাহাতে শিশুর পক্ষে কোনও উপকারই হইবে না, পরন্তু, আশা করাও নিতান্ত অসঙ্গত এবং হোমিও দর্শনতত্ত্ব বিরোধী।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধটী জড় নয়, চৈতন্যও নয়,—তবে উভয়ের মধ্যবর্ত্তী, অর্থাৎ **শক্তি** বিশেষ। মাতৃদেহ হইতে স্তন্যপথে **শক্তি হিসাবে** শিশুতে পৌছিয়া শিশুদেহে ক্রিয়া করিতে হইলে, উহা **প্রথমে মাতৃদেহে ক্রিয়া উৎপাদন করা আবশ্যক,** ফলতঃ মাতৃদেহে ক্রিয়া উৎপাদন করিবার পূর্ব্বে উহা মাতার **সমলক্ষণে** প্রযুক্ত হওয়া চাই। শিশুর সমলক্ষণে নির্ব্বাচিত ঔষধটী **মাতার পক্ষে সমলক্ষণ না হইলে** মাতার মধ্যে ইহার কোনও ক্রিয়াই হইবে না। সুতরাং **শক্তি হিসাবে** স্তন্যপথে আসিয়া শিশুর মধ্যে ক্রিয়া উৎপাদন করিবার কোনও সম্ভাবনাই থাকিবে না।

তরুণ পীড়ার ক্ষেত্রে, উপরোক্ত আলোচনা হইতে প্রকৃত সমাধান প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। এক্ষণে, প্রাচীন বা সোরাদি দোষসঞ্জাত **পুরাতন** ব্যাধির ক্ষেত্রটী বিচার করিতে হইবে। নীতি হিসাবে যদিও সমাধান একই প্রকার হইবে, তবুও ইহার পৃথক আলোচনা প্রয়োজনীয়।

মহাগুরু হ্যানিমান্ অবশ্য এ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত

তাঁহার অর্গ্যানন নামক গ্রন্থে হোমিওপ্যাথির যে সকল নীতি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া তাঁহার উপদেশের অর্থ করিতে হইবে। তাঁহার মত ঋষিপ্রতিম ব্যক্তির লেখার মধ্যে, কোনও স্থানের কোনও উক্তির অন্য স্থানের বা অন্য অংশের কোনও উক্তির সহিত পরস্পর বিরোধ বা অসামঞ্জস্য থাকা অসম্ভব। তিনি তাঁহার অর্গ্যাননে বিশেষভাবে লিখিয়া গিয়াছেন যে, **অসমসূত্রে** নির্ব্বাচিত হইলে, তাহা হোমিওপ্যাথি নয়। তাঁহার উপদেশ বিশ্লেষণ করিলে তিনটী মৌলিক তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। (১) **সমলক্ষণে ঔষধ প্রয়োগ,** (২) **সূক্ষ্মতম মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ** এবং (৩) **একই সময়ে একটী মাত্র ঔষধ প্রয়োগ।** এই তিনটী নীতির মধ্যে প্রথমটী সর্ব্বপ্রধান বলিয়া প্রত্যেক হোমিওপ্যাথের নিকট সুবিদিত। তিনি লিখিয়াছেন, পুরাতন পীড়ার চিকিৎসার সময় স্তন্যপায়ী শিশুকে পৃথকভাবে ঔষধ দিবার আবশ্যক নাই, স্তন্যদায়িনী মাতাকে দিলেই হইবে। ইহার দ্বারা একথা বুঝিতে হইবে না যে, এক্ষেত্রে তিনি তাঁহার মূলতত্ত্ব,—"সমলক্ষণ ব্যতীত হোমিওপ্যাথি ঔষধ দেওয়া চলে না", অগ্রাহ্য বা ভঙ্গ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সমলক্ষণে ঔষধ প্রয়োগ সর্ব্বস্থলেই অত্যাবশ্যক, তাহার কোনও ব্যতিক্রম কখনও হয় নাই, হইতে পারে না। অতএব তাঁহার উল্লিখিত উপদেশ অর্থাৎ স্তন্যপায়ী শিশুর আরোগ্যকল্পে মাতাকে ঔষধ প্রদানের উপদেশ, সমলক্ষণে ঔষধ প্রয়োগের উপদেশককে **বজায় করিয়াই,** আমাদিগকে পালন করিতে হইবে। তাঁহার লিখিত পরবর্ত্তী উপদেশ কোনও কারণেই পূর্ব্ববর্ত্তী উপদেশকে **খণ্ডন করিবে না।** এ অবস্থায়, শিশুকে আরোগ্য করিবার উদ্দেশ্যে স্তন্যদায়িনী মাতাকে ঔষধ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে, আমাদিগকে সর্ব্বস্থলেই দেখিতে হইবে যে, শিশুর মধ্যে যে লক্ষণসমষ্টি বিচার করিয়া একটী ঔষধ বিশেষকে

নির্ব্বাচন করা হইয়াছে, সেই ঔষধের লক্ষণসমষ্টি মাতার মধ্যে আছে কিনা; যদি থাকে, তবেই মাতাকে প্রয়োগ করিলেই হইবে, শিশুকে পৃথকভাবে দিবার আবশ্যকতা নাই। উহা মাতাকে প্রয়োগ করিলে, **সমলক্ষণতত্ত্বের প্রভাবে**, মাতার শরীরযন্ত্রে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া, ঠিক যেন **সঞ্জীবিত হইয়া**, স্তন্যপথে শিশুর শরীর যন্ত্রে ক্রিয়া প্রকাশ করিবে। উহা স্তন্যপথে **শক্তিরূপে** নিস্যন্দিত হইয়া শিশুর মধ্যে ক্রিয়া করিয়া আরোগ্যঝঙ্কার উৎপাদিত করিবে। মাতার সহিত ঔষধটার **সমলক্ষণ না হইলে**, উহা প্রয়োগ করিলেও, **হোমিওপ্যাথিক ঔষধের** গুণ বা শক্তি প্রকাশ করিতে পারিবে না, কেবল সামান্য সুরাসার বা সামান্য চিনি অথবা ২।৪টা চিনির বড়ী হিসাবেই অর্থাৎ নিতান্ত **জড়ভাবেই**, মাতার শরীরে প্রবেশ করিবে এবং জড়ের গতি অর্থাৎ পরিপাক যন্ত্র, বৃহদন্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র ইত্যাদি পথে প্রবিষ্ট ও পরিচালিত হইয়া পূরীষ মার্গে নিঃসারিত হইবে,—হোমিওপ্যাথিক ঔষধরূপে অর্থাৎ **শক্তিরূপে** মাতৃদেহে **সঞ্জীবিত** হইবে না, অতএব শিশুদেহেও কোন পরিবর্ত্তন আনিতে পারিবে না।

আমার চিকিৎসিত রোগীর ক্ষেত্রে, ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, কলিকাতার বেনিয়াটোলার কোনও একটী সম্ভ্রান্ত পরিবারস্থ স্তন্যদায়িনী জননী ও তাঁহার স্তন্যপায়ী শিশুর চিকিৎসাটী এস্থলে উদাহরণ স্বরূপ তুলিয়া সাধারণের গোচরে আনিতে পারি। বিস্তৃত চিকিৎসা বিবরণ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। মাতার ৫।৬ বৎসর ধরিয়া প্রতিশ্যায় পীড়া (hay fever) এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী একটী সন্তানেরও জন্মের পর হইতে এই পীড়া দেখা দেয় এবং দৈব দুর্ব্বিপাকে ছেলেটী এক বৎসর বয়সে নিউমোনিয়া রোগে মারা যায়। জননীর ধারণা হইয়াছিল যে, বোধ হয়, সন্তানটীকে জন্মের পরে পরেই প্রতিশ্যায় পীড়ার চিকিৎসা করাইয়া

আরোগ্য করিলে এই প্রকার অকাল মৃত্যু ঘটিত না, এমন কি, তাহার নিউমোনিয়া পীড়াই হইত না, (বাস্তবিকই তাঁহাদের পরিবারস্থ এলোপ্যাথিক চিকিৎসক মহাশয়ও ঐ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন)। যাহা হউক, ২য় সন্তানটী ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে, তাহারও প্রতিশ্যায় অর্থাৎ হঠাৎ যেন ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি, কাশি হাঁচি হইতে থাকে, আবার অল্পক্ষণ পরেই ঐ সকল লক্ষণের তিরোভাব হয়। এই অবস্থায় উক্ত চিকিৎসক মহাশয় ছেলেটীর চিকিৎসাভার আমার হস্তে দিবার জন্য উপদেশ দেন। মাতার ধারণা তাঁহার নিজের কোনও চিকিৎসা নাই, সুতরাং তাঁহার সন্তান কন্যার চিকিৎসাই আবশ্যক এবং সেগুলি নীরোগ হইলেই তিনি সৌভাগ্য মনে করিবেন। আমি যখন মাকে কহিলাম যে, তাঁহার আরোগ্য অতি নিশ্চয়ই আশা করি, তখন তিনি স্বীকৃতা হন এবং তাঁহার স্বামী মহাশয়ের নিকট সমস্ত ইতিহাস ও লক্ষণ জানিতে পারিয়া দেখিলাম, **জননী ও শিশুটী একই ঔষধের সমলক্ষণ।** এ অবস্থাতে নির্ব্বাচিত ঔষধ জননীকে প্রয়োগ করিয়া অনেক দিন ধরিয়া চিকিৎসার ফলে, উভয়েই আরোগ্য হইয়াছে,—অতঃপর, তাঁহাদের চিকিৎসা আর অনাবশ্যক বিধায় ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ করিয়াছি।

সুতরাং জানা গেল যে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধটী মাতার পক্ষেও সমলক্ষণ না হইলে, স্তন্যপথে উহা শিশুতে পৌছিবে না। মাতার শরীরে ঔষধটী ক্রিয়া করিয়া **সঞ্জীবিত** হওয়া চাই এবং তাহা হইতে হইলে **সমলক্ষণত্ব** অত্যাবশ্যক।

বিধিনিষেধ ও পথ্যাপথ্য।

রোগীর চিকিৎসা সময়ে, প্রত্যেক প্রথার চিকিৎসাশাস্ত্রে, ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে রোগীর বিধি নিষেধের ব্যবস্থা আনুসঙ্গিক ভাবে বিজড়িত। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে লিখিত আছে—"নতু পথ্যবিহীনানাং ভেষজানাং শতৈরপি", অর্থাৎ রোগী যদি পথ্য বিহীন হয়,—চিকিৎসকের নির্ব্বাচিত ও অনুমোদিত পথ্য ব্যবহার না করে, তবে শত শত ঔষধ সাহায্যেও রোগীর রোগ আরোগ্য হইবে না। এলোপ্যাথিক চিকিৎসক মহাশয়েরাও এ বিষয়ে অন্য পথাবলম্বী চিকিৎসকদিগের সহিত একমত। আমরা অর্থাৎ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণও বিধি নিষেধের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। অন্য পথের চিকিৎসার আনুসঙ্গিক পথ্য ব্যবস্থার বিষয় আমাদের কিছু কহিবার নাই।—যাঁহারা যে পথাবলম্বী, তাঁহারা নিজ নিজ শাস্ত্রানুসারে কার্য্য করেন ও করিবেন,—কেবল আমাদের এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে কোন্ ভিত্তির উপর করিতে হইবে সে বিষয়ের বিশেষ প্রণিধান একান্তই আবশ্যক।

রোগীর স্নানাহার, নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যাদি ও অন্যান্য বিষয়েও সংযমই,—বিধি নিষেধের একমাত্র লক্ষ্য এবং রোগীর আরোগ্যই একমাত্র উদ্দেশ্য। এ অবস্থায় বিধি নিষেধ সম্বন্ধে অবহেলা বা আংশিক জ্ঞান না থাকিলে রোগীর অনিষ্ট হইতে পারে, সুতরাং প্রত্যেক চিকিৎসককেই এ বিষয়ে যথারীতি অবহিত হইতে হয়। আমাদের রোগী চিকিৎসা,—রোগ ধরিয়া নয়, কাহারও মতামতের উপর নির্ভর করিয়া নয়, চিকিৎসকের ইচ্ছা বা খেয়ালের বশে নয়,—একটী স্বাভাবিক চিরনির্দ্দিষ্ট ও চিরন্তন নীতি বা নিয়মের অধীনে হইয়া থাকে অতএব এই চিকিৎসার একটি স্থায়ী ও স্থির ও দৃঢ় ভিত্তি আছে। এ অবস্থায় এ চিকিৎসার অন্তর্গত রোগীর প্রতি

পথ্যাপথ্যের বিধি নিষেধও অতি অবশ্যই স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, হওয়া উচিত এবং প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতিষ্ঠিতও বটে। তাহা কি?—ইহাই জ্ঞাতব্য বিষয়।

প্রত্যেক রোগীর পথ্যাপথ্য বিষয়ে, সংযত হইবার জন্য, স্বভাব হইতেই অনেকটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়—এবং তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে,—সংযম একান্ত প্রয়োজনীয়, নতুবা স্বভাব সেই পথে ইঙ্গিত দিবেন কেন? জিহ্বা ক্লেদযুক্ত, আহারে অনিচ্ছা, এমন কি, অনেক সময় বিবমিষাদি জন্য প্রকৃতি যেন রোগীকে আহার দিতে নিষেধ করিতেছেন, এই প্রকার আভাস পাওয়া যায়। যদিও অনেক ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক ক্ষুধা বর্ত্তমান থাকে কিন্তু সে স্থলে আহার দিলে অনেক রোগী খাইতেই পারে না, কেহ বা আহার করিতে পারিলেও তাহার তৃপ্তির অভাব ঘটিতে দেখা যায় এবং তাহার পর অজীর্ণ লক্ষণ অতি অবশ্যই আসিয়া থাকে। প্রকৃত স্বাভাবিক ক্ষুধার সময় আহার করিলে একটি আত্মতৃপ্তি আসে, ঐ আত্মতৃপ্তিই সুস্থের লক্ষণ এবং স্বাস্থ্যের নিদর্শন।

যেখানে পরিপাক যন্ত্রটী বা তাহার আনুসঙ্গিক যন্ত্রাদি আক্রান্ত হয়, সেখানে আহার সংযম একান্ত কর্ত্তব্য, এ বিষয় কাহাকেও কহিয়া দিতে হয় না। কিন্তু যেখানে এই যন্ত্র মুখ্য ভাবে আক্রান্ত হয়, কেবল গৌণভাবে পীড়িত, যেমন জ্বর, শিরঃপীড়া, স্নায়ুশূলাদি পীড়া, সেখানেও আহার সংযম কর্ত্তব্য, তবে সে সকল ক্ষেত্রে রোগীর অভিলাষ ও রুচি অনুসারে কার্য্য করাই বিধেয়। রোগীর ইচ্ছা অনিচ্ছা,—অনেক সময়,—চিকিৎসককে চালিত করে। শিরঃপীড়ার সময়ে কাহারও বা দারুণ ক্ষুধা থাকে, যেমন **সোরিনাম,** কাহারও বা আহারে অনিচ্ছা থাকে, যেমন **নাক্স ভমিকা,** আবার কাহারও বা একেবারেই আহারে দ্বেষভাব বর্ত্তমান থাকে, যেমন **আর্সেনিক**;—ফলতঃ শিরঃপীড়া বলিলেই

পথ্যাপথ্য নির্ণয় করা যায় না, রোগীর **ইচ্ছা, অনিচ্ছাদি** জানিয়া লইতে হয়। পিপাসা থাকিলেও কাহারও জলপানে তৃপ্তি ও উপকার দেখা যায়, কাহারও বা পীড়া বৃদ্ধি হয়,—ক্ষেত্র হিসাবে পিপাসার জল দেয় বা অদেয় বা কি পরিমাণে দেয়, তাহা স্থির করিতে হয়।

আবার এরূপ পীড়া আছে, যেখানে আহার সংযম আদৌ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয় না,—কেবল দ্রব্য বিশেষের নিষেধ থাকিলেই যথেষ্ট হয়। যেমন বাতরোগ, পক্ষাঘাত ইত্যাদি স্নায়ু সংশ্লিষ্ট পীড়া। অধিকাংশ পুরাতন পীড়ার ক্ষেত্রে পথ্যাপথ্যের বিধি নিষেধ প্রায়ই অপ্রয়োজনীয়।

যাহা হউক, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই, কি **তরুণ** বা কি **পুরাতন —রোগীর ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর অনেক নির্ভর করে।** তবে যেখানে রোগীর **মস্তিষ্ক বিকৃতি** ঘটিয়াছে, সেখানে চিকিৎসকের বিশেষ প্রণিধান ও চিন্তা আবশ্যক। কেবলই যে, সে ক্ষেত্রে রোগীর ইচ্ছা অনিচ্ছা জানা যায় না বলিয়া, তাহা নয়,—ইহা ছাড়া আরও কারণ আছে। উদর ও মস্তিষ্ক এরূপ সূত্রে আবদ্ধ যে, আহারের পরিমাণ হিসাবে ও দ্রব্য হিসাবে মস্তিষ্ক পীড়া হ্রাস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

রোগীর ইচ্ছা অনিচ্ছা, রোগের প্রকৃতি ও প্রকার এবং চিকিৎসকের প্রণিধান ব্যতীত আরও একটি বিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ সমীচীন। পথ্যাপথ্যের বিষয়ে, বা বিধি নিষেধের বিষয়ে, **নির্ব্বাচিত ঔষধ** আমাদিগকে অনেক সময় বিশেষ সাহায্য করে। যদি **ল্যাকেসিস** নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, তবে অম্ল ভোজন অবশ্যই নিষেধ **রাসটক্সের** রোগীর স্নান অবশ্যই অপথ্য। **নেট্রাম মিউরের** শোথ রোগীকেও আমরা লবণ ও জল বন্ধ করিবার কেবল যে আবশ্যকতা দেখি না, তাহা নয়, লবণ ও জলবন্ধ করিয়া রোগী আরোগ্যের পক্ষে

বাধা হয় দেখিয়াছি। তবে ঔষধ ব্যবহার হইবার পর রোগীর যত সারিতে থাকে, ততই লবণ ও জলে তাহার অতৃপ্তি বা অনিচ্ছা আসে।

উপরোক্ত বিষয় হইতে দুইটী কথা আমাদের মনে রাখা আবশ্যক, তাহা হইলেই রোগীর পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে আমরা উপযুক্ত উপদেশ দিতে সমর্থ হইব। প্রধান কথা, যে ঔষধ রোগীর পক্ষে বর্তমান সময়ে নির্বাচিত হইয়াছে ও প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহার সহিত যে যে খাদ্য দ্রব্যের **বিরোধ ভাব**, সেগুলি বন্ধ করা এবং যে যে দ্রব্য উহার ক্রিয়ার **সহায়তা** করে, সেগুলি ব্যবহারের উপদেশ দেওয়া আবশ্যক। তাহার পর, রোগীর ইচ্ছা ও অনিচ্ছা পর্যবেক্ষণ করিয়া যদিও প্রায়ই নির্বাচিত ঔষধের সহিত বিরোধ না থাকাই স্বাভাবিক, তবুও যদি দেখা যায় যে, কোনও কোনও দ্রব্য রোগীর ব্যবহার করিবার বিশেষ অভিলাষ অথচ ঔষধের বিরোধী তবে তাহা অবশ্যই বন্ধ করিতে হইবে; কিন্তু তদ্ব্যতীত যতদূর সাধ্য রোগীর ইচ্ছানুসারে পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহার বিশেষ যুক্তিসঙ্গত কারণও রহিয়াছে। প্রথমতঃ অযথা বিধি নিবেধের জন্য রোগীর নিরতিশয় কষ্ট ও অসুবিধা ঘটে, কাজেই পারতপক্ষে বিধি নিবেধ যত কম হয় ততই ভাল। দ্বিতীয়তঃ যখন কোনও একটি দ্রব্য ব্যবহার করিতে রোগীর বিশেষ অভিলাষ দেখা যায়, তখন জানিতে হইবে,—প্রকৃতি উহা চাহিতেছেন এবং অনেক সময় ঐ প্রকার অভিলষিত দ্রব্যের ব্যবহার ফলে অনেক জটিল পীড়ার উপশম ও আরোগ্য হইতে দেখা যায়। জগৎবরেণ্য ডাক্তার ন্যাস মহাশয়ের বর্ণিত একটী ক্ষেত্র উল্লেখ করিবার পর আমার নিজের চিকিৎসার মধ্যে একটী রোগিণীর বিবর উদাহরণ স্বরূপ এখানে বর্ণনা করিতেছি।

স্বর্গীয় ডাঃ ই. বি. ন্যাস এম. ডি. লিখিয়াছেন যে, তাঁহার কোনও একটী রোগী টাইফয়েড জ্বরে পীড়িত হইয়াছিল। ডাঃ ন্যাসের পূর্ব্বে

২।৩ জন কৃতবিদ্য চিকিৎসক ঐ রোগীকে বিশেষ গবেষণার সহিত চিকিৎসা করিয়াও আরোগ্য করিতে না পারিয়া ডাঃ ন্যাসকে আনান হয়। তিনিও প্রায় দুই সপ্তাহ ধরিয়া চিকিৎসা করিয়াও বিফল মনোরথ হইয়া যখন রোগীকে ত্যাগ করিবার মানস করিতেছেন, এরূপ সময় রোগী ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিল যে, সে ব্যক্তি ২।১টী নেবু খাইতে পারে কিনা। অন্য রোগী হইলে হয়ত তিনি নিষেধ করিতেন, কিন্তু এ রোগী বড়ই জটীল, এজন্য ডাঃ ন্যাস খাইবার অনুমতি দিলেন ও নিজের সম্মুখে একটী নেবু আনাইলেন এবং রোগীকে খাইতে দিলেন। রোগীর ঐ নেবু খাইবার এতই তীব্র আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল যে, সে ব্যক্তি নেবুটীর খোলা ও বীজ সমেত খাইয়া ফেলিল, ইহাতে ডাঃ ন্যাসের বড়ই কৌতূহল হইল এবং তিনি আরও একটী খাইতে দিলেন। বলা বাহুল্য যে রোগীর জর তাহার পরদিনেই ত্যাগ হইয়া গেল।

আমার নিজ চিকিৎসার মধ্যে ঠিক এইরূপ ঘটনা ৪।৫টী ক্ষেত্রে ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে একটী মাত্র এখানে উল্লেখ না করিয়া পারি না। একটী সাবঅর্ডিনেট জজের কন্যার অন্ত্র মধ্যে ক্ষত হইয়াছিল (Duodenal Ulcer), আমার পূর্ব্বে ৩।৪টি সুযোগ্য বিখ্যাত এলোপ্যাথিক চিকিৎসক রোগিনীকে দেখিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া চিকিৎসা করিয়াছিলেন। কোনও উপকার ত দূরের কথা বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকায় সাবজজবাবু হোমিওপ্যাথিতে পরিবর্ত্তন করিতে মানস করেন এবং কলিকাতার কোনও যোগ্য হোমিওপ্যাথ ও আমাকে একত্রে নিযুক্ত করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে কলিকাতার ডাক্তার বাবুটীর হঠাৎ পত্নী বিয়োগ ঘটায় তিনি ২।৩ দিনের পর চলিয়া আসেন, রোগিনীর চিকিৎসা কেবল আমারই উপর ন্যস্ত হয়। যাহা হউক, প্রায় দেড় মাস চিকিৎসা করিয়াও রোগিনীর বমন ও বিবমিষা নিবারণ করিতে অপারক হইয়া উঠিলাম এবং সুনির্ব্বাচিত ঔষধ ফস্ফোরাস

১০০০ শক্তির সাহায্যেও বিশেষ উন্নতি না হওয়ায় প্রকৃতই চিন্তার বিষয় হইয়া উঠে। রোগিনীর পিতা পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন যে এ পীড়া দুরারোগ্য, কাজেই হতাশ হইয়া পড়িলেন, এই প্রকার অবস্থায় রোগিনী কহিলেন, তৎপূর্ব্বেও মধ্যে মধ্যে কহিতেন—"আমাকে যদি শাঁক আলু খাইতে দেন, তবে আমার ভিতরটা ঠাণ্ডা হয়",—কিন্তু আমরা এ পর্য্যন্ত দিতে সাহস করি নাই। কিন্তু সেদিন মনে হইল যে, সামান্য কিছু দিয়া দেখিতে দোষ কি? এই মনে করিয়া ঝরিয়া বাজার হইতে শাঁক আলু আনাইয়া রোগিনীকে অল্প কিছু দেওয়া হয়,—আশ্চর্য্য কথা, সেদিন আর বমি হইল না, তাহার পর দিন আরও কিছু দিয়া দেখা গেল, ফল আরও ভাল, রোগিনীর যেন মানসিক উন্নতিও সামান্য পরিলক্ষিত হইল। তখন হইতে সাহস পাইয়া নিত্যই বৈকালে অল্প অল্প শাঁক আলু দেওয়া হয়, অবশ্য তৎসঙ্গে নির্ব্বাচিত ঔষধও চলিতেছিল। যাহা হউক, একথা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, রোগিনীর একান্ত ঈপ্সিত দ্রব্যে ঔষধের ক্রিয়াকে সাহায্য করিয়াছিল। যাহা হউক, প্রায় ৩ মাস পরে উক্ত রোগিনীর পুনরায় বৃদ্ধিলক্ষণ দেখা দিবার পর ব্যাসিলিনাম ১০০০ শক্তি ও আরও কিছুদিন পরে ৫০,০০০ শক্তি দেওয়াতে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য হন। প্রসঙ্গক্রমে, Duodenal Ulcer একটী টিউবার-কুলার ব্যাধি—ইহাই জানা যায়।

পথ্যাপথ্যের বিষয় যেন অন্ধভাবে বা খেয়ালের বশে অথবা কেবলমাত্র অভ্যাস অনুসারে ব্যবস্থা করা না হয়, ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের লক্ষ্য রোগীকে মৃদুভাবে অর্থাৎ কোন প্রকার যাতনাদি না দিয়া আরোগ্য করা। অতএব বিনা কারণে অযথা নিষেধ ব্যবস্থায় রোগীর বিশেষ কষ্ট হয়, ইহা জানিয়াও "কেবল ডাবের জল, কেবল মিশ্রীর জল, সামান্য সাগুর জল," ইত্যাদির ব্যবস্থা বড়ই নিষ্ঠুর ও অমানুষিক।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই প্রকার ব্যবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া প্রাণে বেদনা অনুভব করিয়া একথার অবতারণা করিতে হইল। তাহা ছাড়া, অনর্থক নিষেধ জনিত দৌর্ব্বল্য ও জীবনীশক্তির অবসাদের জন্য দায়ী কে? আমি একটী ক্ষেত্রে ঐ প্রকার ব্যবস্থা আমার পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও চিকিৎসক করিয়াছেন দেখিয়া এবং তাহা একেবারে নিরর্থক ও চিকিৎসক মহাশয়ের অস্বাভাবিক ভীতি ও আশঙ্কাব্যঞ্জক বলিয়া, প্রথম দিনেই মসূরের যূস ও নির্ব্বাচিত ঔষধ, দ্বিতীয় দিনে ওথ্ড়া ও তৃতীয় দিনে অন্নপথ্য দিয়া আরোগ্য করি।

রোগীর বায়ু-পরিবর্ত্তন।

দুরারোগ্য পীড়ার রোগীকে অনেকেই বায়ু-পরিবর্ত্তনের উপদেশ দিয়া থাকেন। এলোপ্যাথিক চিকিৎসক মহাশয়গণ এবং তাঁহাদের উপদেশানুসারে সাধারণ লোকে এরূপ পরিবর্ত্তন যে অতিশয় হিতকর, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ করেন না, এমন কি, যে স্থলে কোনও ঔষধেই স্থায়ীফল প্রদান করিতেছে না, অথবা রোগীর অবস্থা অতীব শঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছে, সে ক্ষেত্রে ঐ প্রকার পরিবর্ত্তনের ফলে রোগীর স্বাস্থ্যের একান্ত উন্নতি হইবে এবং তাহার ফলে আরোগ্য হইয়া যাইবে, ইহাও তাঁহারা আশা করেন। আমাদিগের মধ্যেও অনেকেই এরূপ উপদেশ দান করিতে দ্বিধাবোধ করেন না, তবে তাহা অনেকটা অন্য মতাবলম্বী চিকিৎসক মহাশয়দিগের অনুকরণানুসারেই দিয়া থাকেন,—নিজেদের শাস্ত্রের অনুমোদনের অপেক্ষা রাখেন বলিয়া মনে হয় না।

বায়ু-পরিবর্ত্তনের যে আদৌ কোনও ফল নাই, তাহা আমরা কখনও বলি না,—কিন্তু ঐ ফল নিরপেক্ষ নহে,—উহা দেশ কাল ও পাত্র অপেক্ষা

করে, সকল সময়ে, সকলের পক্ষে এবং সকল অবস্থায় উপকারী ত নয়ই, বরং অনেক ক্ষেত্রেই অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া থাকে। এজন্য কোন্ সময় ইহা হিতকর এবং কোন্ সময় ইহা অনিষ্টজনক, তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত না হইয়া এ বিষয়ের উপদেশ কখনও সঙ্গত হইতে পারে না। যাঁহারা হোমিওপথাবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রত্যেক উপদেশ, নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা আবশ্যক, নতুবা রোগীর অনিষ্ট হইয়া থাকে। উদ্দেশ্য মহৎ হইলেই যে সকল সময় প্রত্যেক উপদেশ হিতজনক হইবে, এমন কথা কেহ বলিতে পারেন না,—ফলতঃ সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক উপদেশটী সত্য ও নীতির উপর নির্ভর করা নিতান্ত আবশ্যক। অন্যের অনুকরণে পরিচালিত হইলে সকল সময়ে ইষ্ট হয় না।

কোনও একটী পুরাতন পীড়ার রোগীর চিকিৎসাকালে বায়ু-পরিবর্ত্তনের উপদেশ দিলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অনিষ্ট না হইলেও চিকিৎসাকার্য্যের ব্যাঘাত অবশ্যম্ভাবী। বায়ু-পরিবর্ত্তন অর্থাৎ স্থান-পরিবর্ত্তনের একটা না একটা ফল আছেই, তাহা হিতজনকই হউক বা অহিতজনকই হউক। একই স্থানে একটী রোগী হিত-পরিবর্ত্তন অনুভব করিলেও হয়ত অন্য রোগী বিপরীত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহা হউক, যে কোনও প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিলে চিকিৎসক মনে করেন, তাঁহার ঔষধের কার্য্য এবং রোগী মনে করেন, ইহা নিশ্চয়ই বায়ু-পরিবর্ত্তনের ফল। এ অবস্থায় চিকিৎসক কি মনে করিবেন? তিনি এ অবস্থায় ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইতে বাধ্য, কেননা পুরাতন পীড়ার চিকিৎসা প্রধানতঃ **পর্য্যবেক্ষণের** উপরেই নির্ভর করে। কখনও হ্রাস, কখনও বৃদ্ধি, কখনও স্থগিদ্, কখনও লুপ্ত লক্ষণগুলির পুনরাবির্ভাব ইত্যাদি নানা বিষয়ের উপর,—চিকিৎসকের ঔষধ পুনঃ প্রদান, অন্য শক্তিতে প্রদান, ঔষধ বন্ধ

রাখা, অনুপূরক ঔষধ প্রয়োগ, ইত্যাদি নানা ব্যবস্থাবলম্বন একান্ত নির্ভর করিয়া থাকে। যাঁহারা পুরাতন পীড়ার চিকিৎসক হইয়া লিপি প্রস্তুত করেন না, কেবলমাত্র একটী ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া ঔষধের নাম ও শক্তিটী লিখিয়া ছাড়িয়া দেন, তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণের বালাই নাই,—তাঁহাদের পক্ষে এ সকল কথার কোনও মূল্যই নাই, কেননা সেরূপ স্থলে চিকিৎসকের দায়িত্বে চিকিৎসা হয় না, **রোগীর দায়িত্বেই** চিকিৎসা চলে, সুতরাং ঐ সকল উপদেশ নিরর্থক। কিন্তু যাঁহারা হ্যানিম্যান প্রদর্শিত পথে তাঁহার উপদেশানুসারে রোগীর রোগ লক্ষণ-লিপি প্রস্তুত করিয়া রীতিমত চিকিৎসাভার নিজ স্কন্ধে চাপাইয়া চিকিৎসা করিতে থাকেন, তাঁহাদের দায়িত্ব অনেক এবং তাঁহাদের জন্যই বর্ত্তমান বিষয়ের অবতারণা। শেষোক্ত দায়িত্বযুক্ত চিকিৎসকের প্রত্যেক পদেই জানা চাই "ঔষধ কি ভাবে ক্রিয়া করিতেছে"। ঔষধ প্রয়োগের পর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যে শুভপরিবর্ত্তন ঘটিবে, এমন কোনও কথা নাই, কেননা হয়ত ঔষধটীর নির্ব্বাচনে ভুল হইয়াছে, এজন্য **নূতন** লক্ষণ সকলের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী, অথচ স্থান পরিবর্ত্তনের ফলে সেরূপভাবে নূতন লক্ষণের অনুভূতির অভাব ঘটিতে পারে। এ অবস্থায় চিকিৎসক ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইবেন, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। যদি স্থান পরিবর্ত্তন না করিয়া রোগী ঔষধ ব্যবহার করিতেন এবং ভ্রান্ত নির্ব্বাচনের ফলে কষ্টজনক নূতন লক্ষণ সকলের আবির্ভাব হইত, তখন হয়ত চিকিৎসকের কর্ত্তব্য অন্য প্রকার হইত। তাহা ছাড়া, একই স্থানে রোগীর কতকগুলি লক্ষণের উপশম হইলেও অন্য আর কতকগুলির বৃদ্ধি পাওয়া অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব। মনে করুন, কোনও একটী রোগীদেহে **সোরা, সাইকোসিস** এবং **সিফিলিস** দোষ একত্রে অন্তর্নিহিত আছে, সে অবস্থায় জগতে এমন কোনও স্থান থাকিতে পারে না, যেটী তাহার পক্ষে বিশেষ হিতজনক হইবে। সমুদ্রতীরে তাহার সাইকোটিক

লক্ষণগুলির বৃদ্ধি হইবেই হইবে, আবার যেখানে আর্দ্র বায়ুর পরিবর্ত্তে শুষ্ক বায়ুর প্রাধান্য বর্ত্তমান, সেখানে সোরিক লক্ষণগুলির বৃদ্ধি হইবে, অথচ সিফিলিটিক লক্ষণের উপশম হইয়া থাকে। এই হিসাবেও স্থান পরিবর্ত্তনের ফলে নানা গোলযোগ উৎপন্ন হইবার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে।

অন্য পক্ষে যদিই বা এরূপ কোনও স্থান থাকে, যেখানে রোগীর সর্ব্বদা উপশমই আশা করা যাইতে পারে, তবুও সেরূপ পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা কেবলই যে ঐ প্রকার উপশম একটা কুহক বা মোহ মাত্র, (অধিক দিন স্থায়ী হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই) তাহা নয়, ইহার ফল বড়ই শোচনীয়। একদিকে, যেখানে উপশমটী স্থায়ী হয় না, সে ক্ষেত্রে এত খরচপত্র করিয়া স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া ২।১০ দিনের জন্য একটী উপশম আনয়ন করিবার জন্য কোনও সুধীব্যক্তি প্রয়াস পাইবেন না। অন্য দিকে, যদি তর্কস্থলে ঐ উপশম স্থায়ী হয়, তবে ত আরও বিপদ, কেননা উহা একপ্রকার "চাপা দেওয়া" ব্যবস্থা মাত্র। "মার চেয়ে যে বেশী ভালবাসে, সে নিশ্চয়ই ডাইনী"—ইহা একটী প্রবাদ বাক্য,—এই বাক্যটী এই প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হইতে পারে। সদৃশ বিধানে নির্ব্বাচিত ঔষধের ক্রিয়ায় যে উপশম আবির্ভূত হয়, তাহাই প্রকৃত আরোগ্যজনক উপশম, তাহা ব্যতীত অন্য কোনও বিধানে যে উপশম প্রাপ্তি ঘটে, তাহা আরোগ্যমূলক ত নয়ই,—বিপরীত পক্ষে উহা **"চাপা দেওয়া"** হয় মাত্র এবং তাহার ফলে অতি ভয়ানক অনিষ্ট ঘটে, অর্থাৎ "চাপা দেওয়া" জন্য রোগশক্তিটী আরও অন্তর্ম্মুখীন হইয়া আরও অধিক আবশ্যকীয় এবং অধিক অভ্যন্তরপ্রদেশে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে এবং রোগীকে আরও গুরুতর পীড়ায় পীড়িত করে। যখন তাহা ঘটে, তখন হোমিওপ্যাথি ব্যতীত অন্য মতের চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন যে, "যে পীড়ার জন্য স্থান পরিবর্ত্তন ব্যবস্থিত হইয়াছিল, তাহা আরোগ্য হইয়াছে, ইহা একটী নূতন পীড়া মাত্র, ইহাকে আবার চিকিৎসা দ্বারা

আরাম করিতে হইবে, ইত্যাদি"। অন্যান্য প্রথার "চাপা দেওয়ার" যে কুফল, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে স্থান পরিবর্ত্তনের ফলে যদি কোনও প্রকারে স্থায়ী উপশম হয়, তবে সেই কুফলই আশা করিতে হইবে।

তবে কি বায়ু বা স্থান পরিবর্ত্তনের কোনও উপকারিতা নাই? অবশ্যই আছে, কিন্তু তাহা **অত্যন্ত গৌণ**,—আদৌ **মুখ্য** বা **অত্যাবশ্যক** নহে। রোগী প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সাহায্যে নির্ম্মল **আরোগ্য হইবার পর** পূর্ব্বতন ব্যাধির দ্বারা আনীত **জরা বা দৌর্ব্বল্য নাশ** করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিলে, ঐ পরিবর্ত্তনের ফলে শীঘ্র শীঘ্র বলপ্রাপ্তি আশা করা যাইতে পারে,—এই পর্য্যন্ত। ফলতঃ অধিক দিন ধরিয়া থাকিলে আর ততটা উপকার পাওয়া যায় না। আরোগ্যের পূর্ব্বে বা চিকিৎসার সময়ে স্থান পরিবর্ত্তন কখনই হিতজনক হইতে পারে না,—একথা হোমিওবিজ্ঞান-সম্মত। সুস্থশরীরের নিদর্শন,—একমাত্র নিদর্শন,—এই যে, সে ব্যক্তি সকল স্থানেই সমান আনন্দে কালাতিপাত করিতে পারিবে। আমরা যখনই পীড়িত, তখনই বহিঃপ্রকৃতি আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয়, কিন্তু আমরা নির্ম্মল ও সুস্থ থাকিলে সকল স্থানই আমাদের পক্ষে সমান সুখ ও আনন্দপ্রদ। পরম কারুণিক পরমেশ্বর অথবা মঙ্গলময়ী প্রকৃতি তাঁহার সৃষ্টজীবসমূহকে কষ্ট দিবার অভিপ্রায়ে কোনও দ্রব্য সৃষ্টি করেন নাই,—পরন্তু আমাদের নীতিভঙ্গের ফলেই বহিঃপ্রকৃতিকে অথবা স্থানবিশেষকে বা দ্রব্যবিশেষকে আমাদের স্বাস্থ্যের বিরোধী করিয়া ফেলিয়াছি। আসল কথা, পীড়িত ব্যক্তিদের দেহের ও মনের স্বাস্থ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা, —তাহা হইলে তখন আর স্থান-বিশেষকে আমাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল বা প্রতিকূল বলিয়া মনে হইবার কোনও কারণ থাকিবে না।

চতুর্থ অধ্যায়।

ব্যক্তিগত বিশেষত্ব।

বৈচিত্র্যই ভগবানের সৃষ্টিকার্য্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বিশিষ্টতা। এক একটী দ্রব্যের নানা জাতি আছে, কিন্তু প্রত্যেক জাতির মধ্যে দুইটী দ্রব্য এক নয়,—সাধারণ অবয়ব, গঠন, ইত্যাদি বিষয়ে অনেকটা একত্ব পরিদৃষ্ট হইলেও, প্রত্যেকের মধ্যেই স্বাতন্ত্র্য আছে; বেলাভূমিতে গিয়া যদি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে নিরীক্ষণ করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে প্রত্যেক বালুকণাটী অন্য বালুকণা হইতে স্বতন্ত্র, অথচ প্রত্যেকটীই বালুকণা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই তত্ত্বটী চিন্তা করিলে, মনের মধ্যে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের উদয় হয়;—বিস্ময়, যেহেতু যিনি এই বিচিত্র্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি কি বিরাট, কি অনন্ত! এবং আনন্দ, যেহেতু আমাদের নিজেদের মধ্যে প্রত্যেকেরই একটী করিয়া বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে।

যাহা হউক, উপরোক্ত তত্ত্বটী যদি মানবদেহ সম্পর্কে চিন্তা করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করা হয়, তবে দেখা যাইবে, সাধারণ অবয়ব এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠনাদি হিসাবে—যদিও দুইটী দেহের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে বিভিন্নতাও অনেক। প্রকৃত পর্য্যবেক্ষণের ফলে জানা যায় যে, প্রত্যেক দেহটীই যেন স্বতন্ত্র। সাধারণ সাদৃশ্যের সঙ্গে প্রত্যেকের মধ্যেই যেন কতকগুলি বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে। কেবল তাহাই নয়, যখন কতকগুলি ব্যক্তি একই নামের পীড়ায় পীড়িত হয়, তখনও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে যে, প্রত্যেক দেহের স্বাতন্ত্র্য অনুসারে ঐ

পীড়ায় বিকাশপ্রাপ্ত লক্ষণগুলিও পরস্পর বিভিন্ন। ম্যালেরিয়া পীড়িত কোনও একটী পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া জ্বর রোগীদের মধ্যে প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র লক্ষণের জ্বর দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও প্রত্যেকেই ম্যালেরিয়া জ্বরে পীড়িত। সুতরাং পীড়াক্ষেত্রেও যদিও নাম হিসাবে পীড়াটী একই, কিন্তু বিকাশ হিসাবে প্রত্যেকটী স্বতন্ত্র্য। আশা করি, আমার মন্তব্য সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

এক্ষণে চিকিৎসা ব্যাপারে ঐ স্বাতন্ত্র্যের মূল্য বা প্রয়োজনীয়তা কি, তাহাই প্রধানতঃ আলোচ্য বিষয়। যখনই কোনও মানবদেহ পীড়িত হয়, তখনই বাহিরে ও মনে কতকগুলি চিহ্ন ও লক্ষণ (Signs & Symptoms) বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাই নিয়ম, ইহাই স্বাভাবিক ও চিরন্তন নিয়ম। এই বিকাশপ্রাপ্ত চিহ্ন ও লক্ষণগুলি কখনও নিরর্থক নয়,—এইগুলিই চিকিৎসাকার্য্যের প্রধান সহায়। এগুলি না পাইলে চিকিৎসাই চলে না, কেননা ঐ চিহ্ন ও লক্ষণগুলির একত্র সমাবেশ করিয়া একটী চিত্র সংগঠন এবং তৎসাদৃশ্যে একটী ঔষধ নির্ব্বাচন ব্যতীত চিকিৎসা ও আরোগ্য সম্ভব হয় না। সুতরাং আরোগ্য করিতে হইলে, ঔষধ প্রয়োগ এবং ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইলে, লক্ষণ-সমষ্টি একান্ত আবশ্যক। এই লক্ষণ-সমষ্টি সংগ্রহ করিবার সময় প্রত্যেক রোগীর **ব্যক্তিগত বৈচিত্র্য** বা **বিশিষ্টতাটী** অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিতে হয় এবং সমজাতীয় ঔষধগুলির মধ্যে যাহার ঐ বৈচিত্র্য বা বিশিষ্টতাটী থাকে, তাহাই নির্ব্বাচনযোগ্য ও প্রযুজ্য বলিয়া স্থির করিতে হয়। একটী উদাহরণ ব্যতীত, বিষয়টী সকলের পক্ষে বিশদ না হইতে পারে, এজন্য একটী উদাহরণ সন্নিবেশিত হইতেছে।

মনে করুন, একই গৃহস্থে তিনজন ব্যক্তির নিউমোনিয়া নামক পীড়া হইয়াছে। আপনি চিকিৎসার্থ আহূত হইয়া বাস্তবিকই দেখিলেন যে,

প্রত্যেকেরই বক্ষোদেশে শ্লেষ্মা-সঞ্চয়, প্রত্যেকেরই শ্বাসকষ্ট, প্রত্যেকেরই তীব্রজ্বর, ইত্যাদি। যদিও আপনি স্থির করিবেন যে, প্রত্যেকেরই নিউমোনিয়া হইয়াছে, কিন্তু চিকিৎসার জন্য এই জানায় কোনও সাহায্য হইবে না,—অর্থাৎ নিউমোনিয়া হইয়াছে জানিলেই চিকিৎসা কখনও সম্ভব হয় না, হইতে পারে না। যদি বলেন যে, এলোপ্যাথিক চিকিৎসক মহাশয়গণ ত উহা জানিয়াই চিকিৎসা করিয়া থাকেন, আমরা কেন পারিব না ? ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, তাঁহারা রোগীর বা রোগের চিকিৎসা ত করেন না,—রোগফলের চিকিৎসা করেন, অর্থাৎ রোগটী বিকাশ পাওয়ার জন্য কোষ্ঠবদ্ধ, শ্লেষ্মা-সঞ্চয়, অঙ্গবেদনা, অনিদ্রা, ইত্যাদিরই তিরোভাব যাহাতে হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করেন,—যে রোগের জন্য এগুলি আসিয়াছে, সে রোগের কোনও প্রতিকার করেন না, ঐ লক্ষণ-গুলিরই প্রতিকার করেন। কোষ্ঠবদ্ধ জন্য এরূপ ভেষজ দিবেন, যাহার ক্রিয়ায় অন্ত্র হইতে মলটী জোর করিয়া নিঃসরিত হইতে পারে ; নিদ্রা হইতেছে না, এজন্য কোনও মাদক বা অবসাদক ভেষজের প্রয়োগ দ্বারা জোর করিয়া রোগীকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন ; শ্লেষ্মাগুলিকে ভেষজ সাহায্যে জোর করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিবেন, ইত্যাদি। তাঁহারা ঐগুলিরই চিকিৎসা অর্থাৎ জোর করিয়া সরাইবার জন্য যে যে ভেষজ প্রয়োজন হইবে, সেইগুলি একটী নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় একত্র করিয়া প্রয়োগ করিবেন। এজন্য একই রোগীর রোগের অবস্থায় যদি পৃথক পৃথক সময়ে পৃথক পৃথক চিকিৎসককে ডাকা হয়, তবে তাঁহাদের ঔষধ বিভিন্ন হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, তাঁহাদের ঔষধ নির্ব্বাচনের কোনও নীতি নাই, অর্থাৎ কোষ্ঠবদ্ধতাটী দূরীকরণার্থ একজন চিকিৎসক একটী ভেষজ নির্দ্দেশ করিলেন,—তিনি যে কেন ১০টী ভেদক বা মল-নিঃসারক ভেষজের মধ্যে ঐটী প্রয়োগ কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন, তাহার কোনও হেতু নাই ; অথবা ২য় বা ৩য়

চিকিৎসক তৎপরিবর্ত্তে কেন অন্য ভেষজ সাব্যস্ত করিলেন, তাহারও কোনও হেতু নাই,—একমাত্র চিকিৎসকের খেয়াল মতই প্রদত্ত হইয়া থাকে। আপনার প্রত্যেক রোগীর চিকিৎসা বিষয়ে ঔষধ নির্ব্বাচনের পশ্চাতে একটা চিরনির্দ্দিষ্ট নীতি আছে। আপনি আপনার খেয়াল মত ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে পারেন না। তাহা ছাড়া, আপনি ঐ ঐ লক্ষণের চিকিৎসা করিবেন না,—আপনি প্রত্যেক রোগীর বিশেষত্ব অনুসারে বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে সমলক্ষণ তত্ত্বের বিধানে ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে বাধ্য,— তাহাতে এরূপ ঔষধও অনেক ক্ষেত্রে নির্ব্বাচিত হইতে পারে, যাহাতে ঐ পীড়া আদৌ কখনও হয় নাই। রোগীর ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা থাকিলে, ঐ প্রকার ঔষধও আরোগ্য করিতে সমর্থ হইবে। পরে, এ বিষয়ে বিশদভাবে উদাহরণ সাহায্যে সামান্য কিছু লিখিত হইতেছে।

এক্ষণে, যে ৩টী নিউমোনিয়া রোগীর চিকিৎসার জন্য আপনি আহূত হইয়াছেন, অগ্রে তাহাদের প্রত্যেকের জন্য ঔষধ নির্ব্বাচন ব্যবস্থা কি, তাহা লিখিত হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেকেরই নিউমোনিয়া হইয়াছে, সুতরাং সাধারণ লক্ষণ যাহা যাহা আছে, যেগুলিকে সরাইবার জন্য এলোপ্যাথিক চিকিৎসক ভেষজ প্রয়োগ করেন, সেগুলি ত প্রত্যেক নিউমোনিয়া রোগীতে থাকিবেই, আপনি সেগুলির প্রতি ঔষধ নির্ব্বাচন ও রোগী আরোগ্য উদ্দেশ্যে, আদৌ মনোযোগ দিবেন না, আপনি প্রত্যেকেরই **ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা** অনুসন্ধান করিবেন এবং সেই বিশিষ্টতা কখনও সাধারণ লক্ষণসকলের মধ্যে পাইবেন না, পাইবেন একমাত্র রোগীর যাবতীয় কষ্টের, যাবতীয় অসুবিধার, যাবতীয় অস্বচ্ছন্দতার অনুভূতিসকলের ও তাহাদের **হ্রাস-বৃদ্ধির** মধ্যে। যেগুলি সরাইবার জন্য এলোপ্যাথিক চিকিৎসক মহাশয় ভেষজ প্রয়োগ করিবেন, সেগুলি "চিহ্ন ও লক্ষণ" (Signs and Symptoms) নয়, সেগুলি রোগের ফলমাত্র। সেগুলি লইয়া আপনার

কোনও প্রয়োজন সিদ্ধি হইবে না। আপনার আবশ্যক,—রোগীর, প্রত্যেক রোগীটীর, যাবতীয় অস্বাভাবিক অনুভূতি এবং তাঁহাদের হ্রাস-বৃদ্ধি।

মনে করুন, আপনি ১ম রোগীতে এইগুলি পাইলেন, যথা,—যে দিকে নিউমোনিয়ার আক্রমণ, রোগী সেই পার্শ্ব ব্যতীত শয়ন করিতে পারিতেছে না; রোগী সামান্যমাত্র সঞ্চালনও সহ্য করিতে পারিতেছে না, কেননা নড়াচড়া করিলেই তাহার যাবতীয় কষ্ট বৃদ্ধি হয়; অনেকক্ষণ পরে পরে অনেকখানি করিয়া জলের পিপাসা, কোষ্ঠবদ্ধ, তবে ২।১ দিন পরে অতি কষ্টে একটা করিয়া মোটা ও শুষ্ক "ন্যাড়" মল বাহির হয়; দারুণ শিরঃপীড়া ও অঙ্গবেদনা, এই পীড়া ও বেদনা চাপনে উপশম হইয়া থাকে। সুতরাং আপনি ঐ ঐ লক্ষণ সমষ্টিহিসাবে অতি অবশ্যই **ব্রাইওনিয়া** স্থির করিবেন। আপনি ২য় রোগীর ক্ষেত্রে কি কি পাইলেন? বুকে দারুণ শ্লেষ্মা সঞ্চয় জন্য শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট ও বিবমিষা কথঞ্চিৎ উপশমিত হইতেছে,—দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে। নাকের পাখা দুইটী উঠা-পড়া করিতেছে; তন্দ্রাঘোর অবস্থা; পিপাসা আদৌ নাই; জিহ্বাটী ক্লেদাবৃত ও সরস; সুতরাং আপনি **এণ্টিম-টার্ট** ব্যবস্থা করিবেন। মনে করুন, আপনার ৩য় রোগী পরীক্ষা করিতে গিয়া পাইলেন,—রোগী সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্মাবৃত এবং ইহাতে রোগীর জ্বর বা অন্য কষ্ট কম হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহার অস্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে; রোগী একমাত্র বাম পার্শ্বে ব্যতীত অন্য কোনও পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না; জিহ্বাটী ক্লেদাবৃত, মোটা এবং নিরন্তর লালায় পরিপূর্ণ, এমন কি, লালাটী মুখ-গহ্বর হইতে গড়াইয়া পড়িতেছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে শীতল জলের পিপাসা; মুখে ও ঘর্ম্মে কেমন এক প্রকার দুর্গন্ধ। এ অবস্থায়, আপনি একমাত্র **মার্ক-সল** ব্যতীত অন্য কিছু সাব্যস্ত করিতে পারিবেন না।

যদিও প্রত্যেকেরই নিউমোনিয়া নামক পীড়া এবং সাধারণ লক্ষণ প্রায়

একই, তবুও ব্যক্তিগত বিশিষ্টতার তারতম্যে, আপনার নির্ব্বাচিত ঔষধ প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র। এক্ষণে, বোধ হয় আপনার ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসক মহাশয়ের লক্ষ্য সম্বন্ধে বিভিন্নতাটী সুন্দরভাবে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি। যদি না হইয়া থাকে, তবে পুনরুক্তির কোনও দোষ নাই। এলোপ্যাথিক চিকিৎসক মহাশয়ের লক্ষ্য মুখ্যতঃ এই যে, রোগের সাধারণ লক্ষণগুলি, যাহা প্রত্যেক নিউমোনিয়া রোগীর প্রায় একই প্রকার, সেই সাধারণ লক্ষণগুলি, অর্থাৎ ফলগুলি, কোনও প্রকারে দমন মাত্র,—অন্য কিছুই নয় এবং এই লক্ষ্য যদিও প্রত্যেক এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরই একই ভাবে থাকে, তবুও যদি কোনও একটী ক্ষেত্রে একাধিক চিকিৎসককে ডাকা হয়, তবে বিভিন্ন প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন হইবেই, কেননা তাঁহাদের ঔষধ নির্ব্বাচনের কোনও নীতি নাই; তবে যদি দুইজনের প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন একই হইয়া যায়, তবে তাহা হঠাৎ কোনও প্রকারে (accidental) হইয়া গিয়াছে, জানিতে হইবে। যাহা হউক, আপনার মূল লক্ষ্য,—রোগীকে তাহার রোগ হইতে নির্ম্মলভাবে মুক্ত করা এবং তদুদ্দেশ্যে আপনি কেবলমাত্র অনুসন্ধান করিবেন যে, প্রকৃতি কোন্ কোন্ লক্ষণ ও চিহ্ন (Signs and Symptoms) এক একটী রোগীতে প্রকাশ করিয়াছেন এবং আপনি জানেন যে, ঐ ঐ চিহ্ন ও লক্ষণ, প্রত্যেক রোগীর ব্যক্তিগত বিশিষ্টতানুসারে বিকাশ পাইবে। ঐ ঐ চিহ্ন ও লক্ষণগুলিকে একত্র করিয়া তাহার সমলক্ষণে ঔষধ নির্ব্বাচন করাই আপনার একমাত্র কর্ত্তব্য, কেননা আপনার ঔষধ নির্ব্বাচনের পশ্চাতে ইহাই একমাত্র নীতি। আপনার নির্ব্বাচিত ঔষধ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক, কেননা ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র। আপনার ঔষধ প্রয়োগের ফলে পীড়াটী সারিবে, অতএব কষ্টকর লক্ষণাদি স্বতঃই তিরোহিত হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, কেননা কারণের ধ্বংস হইলে কার্য্যের বা ফলের একান্ত ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

পক্ষান্তরে, মনে করুন, আরও ৩টী রোগী আপনার নিকট চিকিৎসার্থ সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ তিন জনের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক নামের পীড়া। একজনের দারুণ শিরঃপীড়া, ২য় ব্যক্তির নিত্য সন্ধ্যায় জ্বর হইতেছে এবং ৩য় ব্যক্তির অতি স্বল্প স্বল্প কিন্তু দারুণ দুর্গন্ধ মল-নিঃসারী উদরাময়। "লক্ষণ ও চিহ্ন" (Signs and Symptoms) অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিলেন,—প্রত্যেকেরই শীত শীত ভাব, এজন্য প্রত্যেকেরই শরীরটী বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে; প্রত্যেকেরই আহারে অনিচ্ছা এবং বিবমিষা বর্ত্তমান; প্রত্যেকেরই পিপাসা সত্ত্বেও জলে রুচি আদৌ না থাকায়, প্রতিবার কেবলমাত্র মুখটী ভিজাইবার জন্য অতি সামান্য করিয়া জলপান করে, আবার প্রত্যেকেই মৃত্যুভয়ে ব্যাকুল এবং প্রত্যেকেরই অস্থিরভাব রহিয়াছে। এ ক্ষেত্রে, যদিও পীড়াগুলি সম্পূর্ণ বিভিন্ন নামের এবং বিভিন্ন যন্ত্র আক্রান্ত, তবুও একই ঔষধ, যথা, আর্সেনিকাম্ এল্‌বাম্ প্রত্যেকেরই ঔষধ হইবে।

সর্ব্বশেষে, রোগীর ব্যক্তিগত বিশিষ্টতার মূল্য কতদূর, অর্থাৎ তাহাকে আরোগ্য করিবার উদ্দেশ্যে ঔষধ নির্ব্বাচনের পক্ষে, ব্যক্তিগত বিশেষত্ব কতখানি সাহায্য করিতে পারে, তাহা একটী উদাহরণের দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। মনে করুন, কোনও রোগিণীর অতিশয় অধিক ঋতুস্রাব হইয়া থাকে, এজন্য তিনি চিকিৎসাপ্রার্থী হইয়াছেন। মনে করুন, তিনি সর্ব্বপ্রথম কোনও এলোপ্যাথের নিকট গমন করিলেন,—তিনি প্রচুর রক্তস্রাব হইতেছে জানিয়া, ঐ রক্তস্রাবটী কমাইবার উদ্দেশ্যেই, প্রায় ২০৷২২টী ঔষধ যাহারা প্রচুর রক্তস্রাব কমাইবার উদ্দেশ্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে চারিটী বা পাঁচটী ঔষধ একত্র করিয়া প্রয়োগ করিলেন। ফলতঃ ফল না পাইয়া রোগিণী আরও একজন এলোপ্যাথের নিকটে গমন করিলেন। ২য় চিকিৎসক ১ম চিকিৎসকের প্রেস্‌ক্রিপ্‌সেন দেখিলেন,

এবং উহার মধ্য হইতে ২।৩টী ঔষধ পরিবর্ত্তন করিয়া, পূর্ব্বোক্ত ২০।২২টী ঔষধের মধ্য হইতে, অন্য ২।৩টী ঔষধ সংযোগ করিয়া দিলেন। ১ম চিকিৎসক যে কয়টী ঔষধ একত্র করিয়া প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা কেন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ ২০।২২টীর মধ্যে ঐ ৪।৫টী কেন দিলেন, অন্য আরও ঔষধের মধ্যে ৪।৫টী কেন দিলেন না, তাহার কোনও কারণ নাই,—তিনি কেবল নিজের খেয়ালের বশেই, অথবা পূর্ব্বে পূর্ব্বে এরূপ ক্ষেত্রে ঐ ৪।৫টী দিয়া ফল পাইয়াছিলেন বলিয়াই, প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ২য় চিকিৎসক ১ম চিকিৎসকের প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনের মধ্য হইতে ২।৩টীর পরিবর্ত্তে আরও অন্য ২।৩টী ব্যবহার করিলেন কেন, তাহারও কোনও হেতু, কারণ বা নীতি ছিল না। কেবলমাত্র যখন ঐ কয়টীতে ফল হইতেছে না, তখন ঐ প্রকার পরিবর্ত্তিত প্রেস্‌ক্রিপসন করিয়া "দেখা যাক্ কি হয়", এই ধারণার বশে অর্থাৎ নিছক্ নিজের খেয়ালের বশেই দিয়াছিলেন। এই প্রকারে রোগিণী যদি ১০ জন এলোপ্যাথের নিকট যান, তবে প্রত্যেকেই ঐ ভাবেই "এটী ওটী" জোড়া দেওয়া ও বাদ দেওয়া প্রথাই অবলম্বন করিবেন,—পরন্তু কোনও নীতি বা যুক্তির উপর নির্ভর করিবেন না।

এক্ষণে, মনে করুন, রোগিণী কোনও উপযুক্ত হোমিওপ্যাথের নিকটে গেলেন এবং চিকিৎসাপ্রার্থী হইলেন। হোমিও-চিকিৎসক পীড়ার কথা শুনিবা মাত্রই তাঁহার মনে কতকগুলি ঔষধ-চিত্র সমুপস্থিত হইল, যাহাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে প্রচুর রক্তস্রাব রহিয়াছে, উহাদের মধ্যে কোন্‌টী এই রোগিণীর পক্ষে প্রযুজ্য তাহাই তাঁহার বিচার্য্য। তিনি রোগিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন বা কি অবস্থায় স্রাবটী অধিক হয়? রোগিণী উত্তর করিলেন,—"ঘুরিয়া বেড়াইলেই স্রাবটী যেন থামিয়া যায়, পরন্তু শয়ন করিয়া থাকিলেই বৃদ্ধি হয়।" চিকিৎসক দেখিলেন, ঐ ঐ ঔষধের মধ্যে কেবল

মাত্র ৬টী ঔষধে এই প্রকৃতির স্রাব রহিয়াছে, অর্থাৎ শয়নাবস্থাতে স্রাবটী বাড়ে, ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ালেই উহা কম হইয়া যায় বা থাকে না। তিনি বুঝিলেন যে, রোগিণীর ঔষধ এই ৬টীর মধ্যে অতি অবশ্যই পাওয়া যাইবে। অতএব পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার স্রাবটী কি ক্ষতকারী অথবা ঠাণ্ডা?" রোগিণী উত্তর করিলেন,—"ভয়ানক ক্ষতকারী, বাবা, এমন কি, ভিতরে অতিশয় চুলকানি, টাটানি এবং ক্ষত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।" এক্ষণে কেবলমাত্র ৩টী ঔষধের মধ্যে রোগিণীর ঔষধ পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা আসিল, কেননা ৩টী ঔষধের মধ্যে উভয় লক্ষণই রহিয়াছে, অর্থাৎ শয়নাবস্থায় স্রাবের বৃদ্ধি এবং ক্ষতকারী স্রাব এই উভয় বিশেষত্বই রহিয়াছে। ফলতঃ ৩টী হইলেও হইবে না,—মাত্র ১টী ঔষধ চাই। সুতরাং আরও বিশেষত্ব প্রয়োজনীয়। চিকিৎসক পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, মা, আর কিছু অনুভূতি আপনার আছে?" তখনই রোগিণী উত্তর করিলেন—"আছে, বাবা, আমার শরীরের নানা স্থানে দপ্‌দপ্‌ করে, যেন মাংসগুলি সব লাফাইতে থাকে।" এক্ষণে, একমাত্র ঔষধে উপনীত হওয়া সম্ভব হইল, এবং সেটী ক্রিয়োজোট। ক্রিয়োজোট নামক ঔষধটীর মধ্যে রোগিণীর যাবতীয় বিশিষ্টতা বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই ঔষধটী প্রয়োগে, রোগিণীর রোগ অর্থাৎ জীবনীশক্তির বিশৃঙ্খলাটী নষ্ট হইয়া তাঁহার শরীরটী স্বাভাবিক শৃঙ্খলার প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, অতএব তাঁহার প্রচুর রক্তস্রাবাদি পীড়ালক্ষণ স্বতঃই দূরীভূত হইবে।

এক্ষণে বুঝিতে আদৌ কষ্ট বা অসুবিধা হইবে না যে, রোগী বা রোগীণীর ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা লইয়াই ঔষধ নির্ব্বাচন, চিকিৎসা ও আরোগ্য আশা করিতে পারা যাইবে, অন্য কোনও প্রকারেই নয়। যাঁহারা প্যাথলজী, প্যাথলজী, করিয়া চীৎকার করেন, জানিতে হইবে যে, তাঁহাদের মস্তিষ্কে এলোপ্যাথিক ধারণা এখনও বদ্ধমূল।

উপসংহারে ব্যক্তিগত বিশিষ্টতার মূল্য কত অধিক, তাহা উত্তমরূপে সাধারণের হৃদয়ে জাগরিত থাকিবার উদ্দেশ্যে লিখিত হইতেছে যে, মনে করুন, কোনও রোগীর কোনও একটী পীড়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসার্থ আহূত হইয়া আপনি এরূপ একটী ঔষধে উপনীত হইলেন, যেটী রোগীর ব্যক্তিগত বিশেষত্ব ও মানসিক লক্ষণাদি হিসাবে নির্ব্বাচিত হইতেছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ একমাত্র ঔষধের প্রুভিংএ বর্ত্তমান রোগীর পীড়াটী কখনও বাহির হয় নাই। এ অবস্থাতেও, নিশ্চয়ই জানিবেন যে, **ঐ ঔষধই একমাত্র প্রযুজ্য ও আরোগ্যকারী।** অন্য কোন ঔষধ কখনও প্রযুজ্য হইতে পারে না, এবং জোর করিয়া প্রয়োগ করিলেও তাহাতে কোনও ফল হইবে না। এ বিষয়ে, শত শত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে এবং প্রকৃত হোমিও-চিকিৎসক মাত্রেই তাঁহার রোগী চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রায় নিত্যই ইহার প্রমাণ পাইয়া থাকেন।

লক্ষণসমষ্টি ও নির্ব্বাচন প্রণালী।

চিকিৎসা কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে হইলে নির্ব্বাচন কার্য্যটী একেবারে অভ্রান্ত হওয়া বিশেষ আবশ্যক, একথা সকলেই কহিবেন। যদি নির্ব্বাচনে কোনও প্রকার ভ্রান্তি থাকে, তবে আরোগ্য সুদূরপরাহত এবং তাহার ফলে রোগীর নিরতিশয় যন্ত্রণা ভোগ ও চিকিৎসকের অযশ ব্যতীত অন্য কিছু আশা করা যায় না। অতএব নির্ব্বাচন কার্য্যের উপরেই সমস্ত ফলাফল নির্ভর করিয়া থাকে। যেখানে নির্ব্বাচন অভ্রান্ত, সেখানে

রোগী ও চিকিৎসকের পক্ষে মঙ্গল, নতুবা চিকিৎসাও বিরক্তিজনক ও নিষ্ফল এবং রোগীর পক্ষে বড়ই নিরাশার কথা।

এই নির্ব্বাচন কার্য্যটী আবার লক্ষণ সমষ্টির উপর একান্ত ভাবে নির্ভর করে। সুতরাং লক্ষণ ও লক্ষণ সমষ্টি কাহাকে বলে, সে বিষয়ে বেশ নিশ্চিত জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আমরা বহুদিনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন চিকিৎসককেও এই বিষয়ের ভ্রমে পতিত হইতে দেখিয়াছি ও দেখিয়া থাকি। লক্ষণ কাহাকে কহে এবং লক্ষণ সমষ্টি কি,—ইহার বিস্তৃত আলোচনা একান্তই আবশ্যক।

নির্ব্বাচন কার্য্যটী আবার **তরুণ** ও **পুরাতন** পীড়ার রোগী হিসাবে স্বতন্ত্র। মনে করুন, কোনও একটী শূল ব্যাধির রোগী একদিন বিকালে তাহার শূল বেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া আপনার নিকট ঔষধ চাহিল। আপনি এই ব্যক্তিকে তাহার ঐ দিনের শূল ব্যথাটীর নিবৃত্তি জন্য চিকিৎসা করিতে পারেন, অথবা যাহাতে তাহার শূল বেদনাটী চিরতরে স্থায়ীভাবে আরোগ্য হইয়া যায়, এইভাবেও চিকিৎসা করিতে পারেন। রোগী অনেক সময় বর্ত্তমান কষ্ট হইতে আশু পরিত্রাণই আকাঙ্ক্ষা করে; তখন তাহাকে তরুণ ভাবে আরোগ্য করাই যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ ঐ দিনের বেদনাটী আরোগ্য করিতে হইবে। যদি কেবল মাত্র রোগীর **রোগটীকে** তরুণ ভাবে আরোগ্য করিতে হয়, তবে কেবল **রোগের** লক্ষণ-সমষ্টি হইলেই যথেষ্ট হয়; অর্থাৎ ঐ বেদনাটীর যাবতীয় লক্ষণগুলি একত্র করিয়া ঐ সমষ্টির সাদৃশ্যে একটী ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া প্রয়োগ করিলেই হইবে। মনে করুন, আপনার রোগীর বেদনাকালে পেটের উপর প্রবলভাবে চাপ দিতে হয়, গরম স্বেদ দিলে কথঞ্চিৎ উপশম হয়, সম্মুখ দিয়া অবনতভাবে ব্যতীত বসিয়া থাকা সম্ভব নয় ইত্যাদি শূল বেদনার লক্ষণ কয়টী একত্র করিয়া আপনি তদনুসারে ম্যাগনেসিয়া-ফস্ ৬ বা ১২ শক্তি প্রয়োগ

করিলেন এবং তাহার ফলে তখনই তাহার শূল বেদনায় উপশম আসিবে; কিন্তু তাহার বেদনাটী চিরদিনের জন্য আরোগ্য করিতে হইলে, রোগ লক্ষণের সমষ্টি হিসাবে নির্ব্বাচনের দ্বারা কোনও ফল হইবে না। তাহাকে রোগী হিসাবে স্থায়ীভাবে আরাম করিবার ইচ্ছা করিলে, রোগ লক্ষণ সমষ্টির দ্বারা কোনও ফল হইবে না, রোগীর লক্ষণ সমষ্টি একান্ত আবশ্যক। আমি সেদিন একটী প্রবল শূল বেদনা রোগীকে আরোগ্য করিয়াছি, তাহার বিবরণ হইতে এই বিষয়টী অতি সুন্দরভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

রোগীর বয়স, ৩০।৩২ বৎসর, সুন্দর সুঠাম, মেজাজ অতি সুন্দর; বিগত ৮।৯ বৎসর হইতে তাঁহার এই পীড়া মধ্যে মধ্যে ২।৩।৪ মাস ধরিয়া প্রবলভাবে চলিতে থাকে, আবার হয়ত ১৫।২০ দিনের জন্যই ভালই থাকে। ফলতঃ কিছুদিন হইতে তাহার ব্যথাটী অবিরাম গতিতে অর্থাৎ নিত্যই দেখা দিতেছে। তাহাকে স্থায়ীভাবে অর্থাৎ রোগী হিসাবে আরোগ্য করা প্রয়োজনীয়, এজন্য আমার পুরাতন রোগীর ডায়েরীর মধ্যে তাহার লক্ষণাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া লইতে হইয়াছিল। তাহার বেদনার লক্ষণাবলি চিন্তা করিলে অনেকেই ম্যাগ্নেসিয়া ফস্ই দিবেন এবং প্রকৃত প্রস্তাবে একজন চিকিৎসক তাহাকে ম্যাগ্নেসিয়া ফস্ সি, এম, শক্তি দিয়াছিলেন, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। ফল না হইবার কারণ রহিয়াছে। কেননা ম্যাগ্নেসিয়া ফস্টী কেবল মাত্র বেদনার লক্ষণ সাদৃশ্যে নির্ব্বাচন যোগ্য, কিন্তু রোগী লক্ষণ চিন্তা করিলে অন্য ঔষধের চিত্র পাওয়া যায়। আমি রোগীকে জিজ্ঞাসার দ্বারা জানিলাম, সে বামপার্শ্বে ব্যতীত শয়ন করিতে পারে না, মুখে সর্ব্বদাই দুর্গন্ধ লালাস্রাব হইয়া থাকে, এজন্য তাহাকে অনেকবার নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে হয়, জিহ্বাটী সর্ব্বদাই স্থূল ও ক্লেদাবৃত মুখ হইতে প্রায়ই দুর্গন্ধ বাহির হয়, দন্তপাটী এবং মাঢ়ীগুলি প্রায়ই ফোলে

ও মাঢ়ী হইতে রক্তস্রাব হয়, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম বাহির হয় আস্বাদ সর্ব্বদাই পচাটে, পিপাসাও যথেষ্ট, ইত্যাদি সমস্তই মার্কসলের লক্ষণ পাওয়া গেল। আমি তদনুসারে তাহাকে **মার্কসল** ১০০০ এবং তিন মাস পরে ১০,০০০ এই দুই মাত্রা ঔষধের সাহায্যে নির্ম্মল আরাম করিয়াছি, বলা বাহুল্য,—তাঁহার শূল বেদনা আর দেখা দেয় নাই।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে তরুণ ও পুরাতন পীড়ার ঔষধ নির্ব্বাচনের জন্য যথাক্রমে রোগের ও রোগীর লক্ষণ সমষ্টির সাদৃশ্যে ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হয়, ইহা বেশ বুঝিতে পারা গেল। কিন্তু ঔষধ নির্ব্বাচনের পক্ষে লক্ষণ বা লক্ষণ সমষ্টি কাহাকে কহে, ইহার সবিস্তার আলোচনা আবশ্যক।

যে সকল লক্ষণ বা লক্ষণসমষ্টির উপর ঔষধ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা, সেই লক্ষণ একটু স্বতন্ত্র প্রকারের; লোকে সাধারণতঃ লক্ষণ কথাটী অতি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকে। লোকে অনেক সময় বলে, "এই লোকটীর লক্ষণ ভাল", সেখানে লক্ষণ অর্থে কেবল চিহ্ন, অর্থাৎ জ্ঞাপক চিহ্ন, অথবা রোগের সম্বন্ধেও অনেকে কহিয়া থাকে, "রোগীটীর নানাপ্রকার দুর্লক্ষণ জুটিয়াছে", যথা পেট জোড়া প্লীহা, অর্শ, নাসিকাপথে রক্তস্রাব শিরঃপীড়া ইত্যাদি, এখানে "লক্ষণ" অর্থে বিকাশপ্রাপ্ত পীড়া, অন্য কিছুই নয়। এই বিকাশ প্রাপ্ত পীড়াগুলি পাইলে কেহই নির্ব্বাচন করিতে পারে না। এইগুলি লক্ষণ নয়, এগুলি রোগের নাম, বা প্রকৃত প্রস্তাবে রোগের ফল। রোগের ফলগুলিকে লক্ষণ বলিয়া ধারণা করিয়া অনেকে এমন একটি ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন, যাহার ভিতরে ঐ ঐ রোগগুলি সকলই আছে,—ফলতঃ ইহা একটি বিষম ভ্রান্তি। কেননা, মনে করুন, তিনটি রোগীর শিরঃপীড়া, কোষ্ঠবদ্ধ, পিপাসার আধিক্য ও শুক কাশি হইয়াছে। এই ৪টি পীড়া অন্ততঃ ১৫।২০টি ঔষধের মধ্যে দেখা যায়, এ অবস্থায় এই ৩টি রোগীকে যদি ঐ ৪টি রোগ যাহাতে আছে, সেই প্রকার

একটী ঔষধ দেওয়া হয়, তবে ঐ ১৫।২০টী ঔষধের মধ্যে কি উপায়ে কোন্ ঔষধটী নির্ব্বাচিত হইতে পারে? সুতরাং সে প্রকার প্রথা কখনই বিজ্ঞানসম্মত হইতে পারে না। কেননা যদি উপরোক্ত চারিটী রোগ যে ঔষধে আছে, তাহাই দেওয়া সঙ্গত হয়, তবে কেহ বা নেট্রাম মিউর দিবেন, কেহ বা এলুমিনা দিবেন, কেহ বা নাক্স ভমিকা দিবেন, কেহ বা ব্রাইওনিয়া দিবেন,—আসল কথা খাঁটি অভ্রান্ত নির্ব্বাচন হইতে পারে না। লক্ষণ বলিলে বিকাশ প্রাপ্ত রোগ বা রোগের নামকে বুঝিলে প্রায়ই নির্ব্বাচন-ভ্রান্তি ঘটিয়া থাকে। প্রকৃত নির্ব্বাচন স্বতন্ত্র জিনিস। প্রকৃত নির্ব্বাচন, লক্ষণ-সমষ্টির উপর নির্ভর করে। তবে লক্ষণ কি? অথবা লক্ষণ সমষ্টি কি?

লক্ষণ একটী অনুভূতি। জীবন্ত মানবদেহে পীড়া জন্য যে যে অস্বাভাবিক বোধ বা অনুভূতি প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেগুলিকে মহাত্মা হ্যানিমান্ ও ডাঃ কেণ্ট প্রভৃতি মনীষীগণ "প্রকৃতির ভাষা" (Voice of Nature) বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন, তাহাদিগকেই লক্ষণ বলিতে পারা যায়। রোগ কি? উহা জীবনী শক্তির একটী বিশৃঙ্খলা বা বিশৃঙ্খলাবস্থা। ইতঃপূর্ব্বে জীবনীশক্তি স্বাভাবিকভাবে কার্য্য করিতে ছিল, সুতরাং শরীরের মধ্যে কোনও প্রকার অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভূত হইতেছিল না, এক্ষণে বিশৃঙ্খলার আবির্ভাব হওয়ায় নানা স্থানে নানা প্রকার যাতনা, অসুবিধা ও কষ্ট অনুভূত হইতেছে,—সেগুলির সাহায্যে ঠিক যেন প্রকৃতি সাহায্য চাহিতেছেন, সেইগুলি ঠিক যেন তাঁহার ভাষা, যাহার দ্বারা তিনি পীড়া হইয়াছে বলিয়া জ্ঞাপন করিতেছেন এবং সাহায্য প্রাপ্তির ইচ্ছা করিতেছেন। এই অস্বাভাবিক যাতনা ও অস্বাস্থ্য বা অসুবিধাগুলিকে লক্ষণ বলা যায়। কিন্তু নির্ব্বাচনের জন্য প্রত্যেক অনুভূতি মাত্রকেই লক্ষণ বলা যাইতে পারে না, কারণ সেই অনুভূতিগুলিকেই লক্ষণ বলা যাইতে পারে, যাহাদের

হ্রাসবৃদ্ধি (modality) আছে। যে সকল অনুভূতির কোনও প্রকার হ্রাস বৃদ্ধি নাই, তাহারা লক্ষণ পদবাচ্য হইতে পারে না। **সুতরাং ঔষধ নির্ব্বাচনের পক্ষে সাহায্যকারী যে অনুভূতি, তাহার যদি হ্রাসবৃদ্ধি থাকে, তবেই তাহাকে লক্ষণ বলা যাইবে, নচেৎ নহে।** হ্রাসবৃদ্ধিযুক্ত অনুভূতি ব্যতীত নির্ব্বাচন কার্য্য হইতে পারে না। কর্কট পীড়ার অনেক প্রকার অনুভূতি ও যন্ত্রণা থাকে, কিন্তু কোনও প্রকার হ্রাসবৃদ্ধি না থাকায় ঔষধ নির্ব্বাচন হয় না, সুতরাং কর্কট পীড়া অসাধ্য। কেবলই কর্কট পীড়া কেন, যে কোনও পীড়া, যাহার **হ্রাসবৃদ্ধিযুক্ত অনুভূতি** না থাকে, সে পীড়া অসাধ্য। ফলতঃ সে পীড়ার দোষ নাই, পীড়া ত একটী নাম মাত্র, কতকগুলি কষ্ট যাতনা একত্র করিয়া একটী সাধারণ নামই পীড়া। দোষ,—যে ব্যক্তির পীড়া হইয়াছে, তাহার শরীর যন্ত্রটীর। ঐ রোগীর শরীর যন্ত্রটী এরূপ শোচনীয় অবস্থায় আসিয়াছে যে, কেবল কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ ব্যতীত প্রকৃত লক্ষণ অর্থাৎ হ্রাসবৃদ্ধিযুক্ত লক্ষণ প্রকাশ করিতে অপারগ হইয়াছে, অর্থাৎ পীড়াটী অসাধ্য অবস্থায় আসিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, জীবন্ত মানবদেহের মধ্যে জীবনীশক্তি বিশৃঙ্খলা প্রাপ্ত হইলে যে সকল অস্বাভাবিক এবং অস্বাচ্ছন্দ্যসূচক অনুভূতি প্রকাশ করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করেন, সেই সকল অনুভূতির মধ্যে যেগুলির হ্রাসবৃদ্ধি থাকে, সেগুলিকেই লক্ষণ বলে এবং সেই প্রকার লক্ষণই ঔষধ নির্ব্বাচন কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকে। অতঃপর লক্ষণ-সমষ্টি কাহাকে কহে, জানা আবশ্যক।

একটী লক্ষণ যতই মূল্যবান হউক না কেন, তাহার দ্বারা বাঞ্ছিত ফল লাভ হয় না, অর্থাৎ নির্ব্বাচন কার্য্য সমাধা হয় না, হইতে পারে না,—লক্ষণ সমষ্টি আবশ্যক। যেমন একটী হস্ত বা একটী পদ কখনও

মনুষ্যপদবাচ্য নয়, তেমনই একটী লক্ষণ কখনই নির্ব্বাচন-সহায়ক রোগীচিত্র বা ঔষধচিত্র হইতে পারে না; লক্ষণ-সমষ্টি আবশ্যক,—লক্ষণ-সমষ্টি না হইলে নির্ব্বাচন হয় না। একথা একান্ত মনোযোগ সহকারে বুঝিতে হইবে, নতুবা, কেবল একটী মাত্র বিশিষ্ট বা প্রয়োগ-প্রদর্শক লক্ষণ পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া তখনই একটী ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া বসা নিতান্ত অধীরতা ও অজ্ঞতার লক্ষণ। অবশ্যই হোমিওপ্যাথি এরূপ অমৃতনিস্যন্দিনী পন্থা যে, তাহাতেও সময়ে সময়ে রোগীর রোগযন্ত্রণা অল্প সময় মধ্যে তিরোহিত করে এবং রোগীকে নিঃশেষ আরোগ্য করিয়া ফেলে—ইহাও স্বচক্ষে দেখিয়াছি; ফলতঃ সেরূপ নির্ব্বাচন বিজ্ঞানসম্মত নয় এবং অনেক সময় নিরর্থক। যাহা হউক, যে লক্ষণ-সমষ্টি নির্ব্বাচন কার্য্যে সহায়ক, তাহা কেবলমাত্র লক্ষণসমূহের সমষ্টি নয়,—কতকগুলি লক্ষণ মাত্রের জড় সমষ্টি লইয়া, কখনও লক্ষণ সমষ্টি হইতে পারে না। ইষ্টকের উপর ইষ্টক চাপাইলে যেমন ইমারত প্রস্তুত হয় না সেইরূপ কতকগুলি লক্ষণের একত্র সমাবেশ হইলেই লক্ষণ-সমষ্টি হয় না। যেমন ইমারত প্রস্তুত করিতে হইলে একটী কৌশল একটা অভিপ্রায় আবশ্যক, সেই মত লক্ষণ-সমষ্টির মধ্যে একটী কৌশল, একটী অভিপ্রায়, একটী যোগ-সূত্র আবশ্যক,—এই যোগসূত্রটী বা অভিপ্রায়টাই লক্ষণসমষ্টির মধ্যে প্রাণযোজনা বা প্রাণ-সঞ্চার করিয়া থাকে। পরস্পর অসংবদ্ধ লক্ষণ-পরম্পরা একত্র করিয়া কখনও লক্ষণসমষ্টি হয় না এবং সে প্রকার সমষ্টিতে নির্ব্বাচন হয় না। লক্ষণসমষ্টির দ্বারা জীবন্ত দেহের মধ্যে নবাগত একটী বিশৃঙ্খলার পূর্ণচিত্র প্রতিফলিত হওয়া আবশ্যক। এক একটী ঔষধ যেমন এক একটী সুস্থ মানবের চিত্র, এক একটী লক্ষণসমষ্টিও সেই প্রকার এক একটী সুস্থ বা পীড়িত রোগীর চিত্র হওয়া চাই,—অর্থাৎ উহাই আভ্যন্তর-বিশৃঙ্খলার একটী পূর্ণ প্রতিফলিত মূর্ত্তি হইতে হইবে। পীড়ার নামের সহিত তাহার

কোনও সম্বন্ধ না থাকিলেও তাহার ভিতর দুইটী জিনিষ থাকিবে,—(১) **বিশৃঙ্খলার মূর্ত্তি** এবং (২) **রোগীর ব্যক্তিত্বের একটী ছাপ-মোহর** (Impression of the Individuality) এই দুইটী জিনিষের একত্রীভূত সমাবেশ হওয়া চাই। নতুবা কেবল সমষ্টি মাত্রেরই কোনও মূল্য নাই। পক্ষান্তরে, যেহেতু কোনও একটী রোগীর একটী মাত্র ঔষধই একই সময় নির্ব্বাচন যোগ্য, অতএব সেই রোগীটার একই সময়ে দশ জন চিকিৎসক লক্ষণ-লিপি প্রস্তুত করিলে "লক্ষণসমষ্টি" ঠিকই একই হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

সুতরাং লক্ষণসমষ্টি যাহা রোগীর ঔষধ নির্ব্বাচন কল্পে একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা একটী জীবন্ত প্রতিচ্ছায়া, মানবদেহের বিশৃঙ্খলার একটী পূর্ণ প্রতিচ্ছবি এবং ব্যষ্টি লক্ষণসমূহ, যাহাদের একত্র সমাবেশ বা সমষ্টি করা হইয়া থাকে, সেই ব্যষ্টি লক্ষণসমূহের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে গ্রন্থিবদ্ধ করিবার জন্য যেন একটী যোগসূত্রে আবদ্ধ,—অর্থাৎ পরস্পর সম্পর্কশূন্য বা বিচ্ছিন্ন নহে। এইরূপ একটী লক্ষণসমষ্টিকে ইংরাজীতে "(Totality of Symptoms)" বলে।

কোনও একটী রোগীর আজি ২।৩ সপ্তাহ হইতে সামান্য জ্বর চলিতেছে এবং তৎসহ অতিশয় তরল উদরাময়,—ইহার রোগের নাম এবং লক্ষণ-সমষ্টি বিচার করিলেই বিষয়টী হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে অনেক সুবিধা হইবে। ঐ ব্যক্তি প্রায় সকল সময় মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া থাকে, খাওয়াইলে খায়,—কেননা ক্ষুধাও নিতান্ত মন্দ নয়, এতদিন জ্বর ও উদরাময় সত্ত্বেও বিশেষ দুর্ব্বলও মনে হয় না, ফলতঃ আহারের পরে পরেই মলবেগ হইয়া থাকে এবং মলের সহিত ভুক্তদ্রব্যের অজীর্ণ অংশ দেখিতে পাওয়া যায়, শীতল পানীয় সেবনে বিশেষ স্পৃহা, অন্ত্রের মধ্যে গল গল করিয়া শব্দ হয়,—বিশেষ কথা, এত মলবেগ সত্ত্বেও প্রচুর পরিমাণে

জলবৎ মূত্রত্যাগ হইয়া থাকে। এক্ষণে পীড়াটীর নাম হিসাবে, কেহ কহিবেন, উদরাময়-প্রধান-জ্বর; কেহ কহিবেন, জ্বরপ্রধান-উদরাময়; কেহ কহিবেন, গ্রহণী হইয়াছে; কেহ বা কহিবেন, লোকটীর জ্বরাতিসার হইয়াছে ইত্যাদি; কিন্তু লক্ষণসমষ্টি হিসাবে,—এত অজীর্ণ মলত্যাগ ও জ্বরভোগ সত্ত্বেও দুর্ব্বল না হওয়া, আহারের পর বৃদ্ধি এবং ঐ সকল সত্ত্বেও ক্ষুধা, রসাল ও শীতল পানীয়ে স্পৃহা এবং প্রচুর জলবৎ প্রস্রাব,—এই কয়টির সঙ্গে মানসিক জড়তা লইয়া যে সমষ্টি, তাহারই নাম লক্ষণসমষ্টি এবং তাহাই নির্ব্বাচন কার্য্যের পক্ষে একমাত্র সহায়ক। অর্থাৎ কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ এবং ব্যক্তিত্বের ছাপটি একত্র করিলে যে সমষ্টি হয়, তাহাকেই লক্ষণসমষ্টি কহে।

অন্য ভাবে দেখা যায়,—রামের নিউমোনিয়া নামক ব্যাধি হইয়াছে, শ্যামেরও নিউমোনিয়া হইয়াছে, অর্থাৎ পীড়ার নাম হিসাবে একই পীড়া হইয়াছে। এমন কি, উভয়ের দক্ষিণদিকেই নিউমোনিয়াটীর আক্রমণ; ফলতঃ নির্ব্বাচন জন্য লক্ষণসমষ্টি বিচার করিয়া দেখা গেল যে, রাম দক্ষিণ পার্শ্বে চাপ দিয়া শয়ন না করিলে থাকিতে পারে না, চুপ করিয়া শুইয়া থাকে, কেন না নড়াচড়া করিলে তাহার সকল কষ্ট বৃদ্ধি হয়, চাপনে উপশম হয় বলিয়া যে দিকে আক্রমণ, সেইদিকেই শয়ন করিয়া থাকে। শিরঃপীড়া জন্য মাথায় একখানি রুমাল বাঁধিয়া রাখে, অনেকক্ষণ পরে পরে অনেকখানি করিয়া জলপান করে এবং জলপানে তাহার সাময়িক শান্তি হয়, শুষ্ক কাশি এবং তাহাও নড়িলে চড়িলেই বৃদ্ধি হয় ও তৎসঙ্গে শ্বাসকষ্ট বাড়ে; শ্যামের সমষ্টি অন্য প্রকারের,—সে বামপার্শ্ব ব্যতীত শয়ন করিতে অপারক, মুখে দুর্গন্ধ ও প্রচুর লালাস্রাব হয়; জিহ্বাটী মোটা এবং ক্লেদাবৃত, প্রচুর ঘর্ম্ম, কিন্তু ঘর্ম্মে উপশম হওয়া ত দূরের কথা বরং তাহার কষ্ট বৃদ্ধি হয় ও বিরক্তি জন্মে, রাত্রে বিশেষতঃ শয্যাতাপে

সকল কষ্টেরই বৃদ্ধি, পিপাসা যথেষ্টই থাকে কিন্তু জল অতিশয় বিস্বাদ বোধ হয়,—এই দুই প্রকার লক্ষণসমষ্টি যদিও একেবারেই বিভিন্ন, কিন্তু নির্ব্বাচনকল্পে নিজ নিজ ক্ষেত্রে একমাত্র প্রয়োজনীয়।

উপরোক্ত তিনটী উদাহরণে লক্ষণসমষ্টি বিচার করিয়া দেখিলে বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রধানতম লক্ষণসমূহ অর্থাৎ জ্বর, উদরাময়, শ্লেষ্মা, বুকের টান, ইত্যাদি দৃশ্যতঃ উল্লেখযোগ্য ব্যাপারগুলি, নির্ব্বাচনকল্পে লক্ষণসমষ্টির মধ্যে আদৌ স্থান পায় নাই। কেন? তাহার কারণ এই যে, সেগুলি রোগের ফল মাত্র,—বিশৃঙ্খলা প্রাপ্ত জীবনীশক্তির দ্বারা সংঘটিত পীড়া বা পীড়ার ফল হইলেও, নির্ব্বাচনের সাহায্য করিবার মত কোনওটীই লক্ষণ পদবাচ্য নয়, অতএব তাহারা লক্ষণসমষ্টি অন্তর্গত হইল না; পীড়ার নামকরণ বা নিতান্ত বিশৃঙ্খলা-প্রাপ্ত-জীবনীশক্তির কার্য্য হিসাবে তাহাদের মূল্য যথেষ্ট থাকিলেও, নির্ব্বাচনের জন্য মূল্যহীন বলিয়া জানিতে হইবে।

এই ত গেল সাধারণ নির্ব্বাচনের জন্য লক্ষণসমষ্টির কথা। আবার যেখানে বহুদিনের পুরাতন পীড়ায় রোগী এবং তাহার শরীরে একাধিক দোষ বর্ত্তমান, সেখানে লক্ষণসমষ্টি স্থির করা অতীব দুর্ঘট ও কঠিন ব্যাপার। সেখানে এত সহজভাবে লক্ষণসমষ্টি স্থির করা আদৌ সম্ভব নয়। অতএব পুরাতন পীড়ার ক্ষেত্রে কি ভাবে লক্ষণসমষ্টি স্থির করিতে হয় তাহা আলোচিত হইতেছে।

পুরাতন পীড়ার রোগীর লক্ষণসমষ্টি গ্রহণ, লক্ষণ বিচার এবং ঔষধ নির্ব্বাচন ব্যাপার একটী ভয়ানক জটীল সমস্যার মধ্যে পরিগণিত। অনেকেই এই জটীল সমস্যার গ্রন্থিভেদ করিতে পারেন না এবং ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। আমরা দেখিয়াছি, যে সকল ছাত্র ৩।৪ বৎসর ধরিয়া হোমিওপ্যাথিক স্কুল বা কলেজে রীতিমত অধ্যয়নাদি করিয়া চিকিৎসা

কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন বা সম্প্রতি হইয়াছেন, তাঁহাদেরও এ বিষয়ে আদৌ জ্ঞানার্জ্জন ঘটে না, সুতরাং নিজের নিজের ধারণানুসারে কার্য্য করিতে থাকেন, তাহার পর হয়ত দীর্ঘকাল পরে আসল তথ্য স্ফুরিত হইতে পারে, তখন এ সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ ঘটিতে পারে। আজকাল যতগুলি স্কুল বা কলেজ আছে, সেগুলিতে হোমিওপ্যাথিক দর্শনাংশ এবং প্রাচীন পীড়ার তত্ত্বগুলি যেন আরও ভাল করিয়া শিক্ষাদান প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক পুরাতন পীড়ার রোগী চিকিৎসা একদিকে যেমন কঠিন অন্যদিকে তেমনই আবশ্যকীয়; কেননা এই শ্রেণীর রোগী সংখ্যায় অত্যন্ত অধিক এবং প্রকৃত কবিরাজী চিকিৎসা বা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যতীত আরোগ্যের অন্য কোনও পথ আদৌ নাই। এলোপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা এই শ্রেণীর রোগীর সাহায্য ত দূরের কথা, তরুণ রোগী এলোপ্যাথিক চিকিৎসার দ্বারা পুরাতন রোগীতে পরিবর্ত্তিত হয় এবং পুরাতন রোগীকে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করাইলে তাহার অবস্থা আরও জটিলতর, এমন কি, ক্ষেত্রবিশেষে অসাধ্য হইয়া উঠে। প্রকৃত কবিরাজী চিকিৎসা আজকাল আর দেশে নাই বলিলেও চলে, সুতরাং হোমিওপ্যাথিই একমাত্র আশ্রয়, নতুবা পুরাতন রোগীর শান্তি এবং আরোগ্যের আশা একেবারেই সুদূরপরাহত।

এক্ষণে পুরাতন পীড়ার রোগীর চিকিৎসা জন্য কিরূপ ভাবে লক্ষণ সংগ্রহ ও ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হয়, ইহাই আলোচ্য বিষয়। এই বিষয়টী আলোচনা করিবার পূর্ব্বে পুরাতন পীড়ার রোগীর আভ্যন্তর অবস্থাটী কি প্রকার, তাহার রোগ কি প্রকার, কোন্ প্রদেশে নিহিত, কি প্রকার ঔষধের সাহায্যে তাহার কল্যাণ আশা করিতে পারা যায় ইত্যাদি অতি গভীর তত্ত্বগুলি পরিষ্কার না করিলে চলে না। কেবল উপরে উপরে কতকগুলি বিধি নিষেধের বর্ণনা ও উপদেশের দ্বারা সকলের সন্দেহ দূর হয়

না, অল্পজ্ঞানসম্পন্ন চিকিৎসক ভ্রাতাদিগের সম্যক্ দৃষ্টি উন্মোচন হইতে পারে না। এজন্য এ সকল তত্ত্ব সামান্যতঃ আলোচনা করিতেই হইবে।

আমাদিগের পরম পবিত্র ও অপৌরষেয় বেদের মধ্যে পর পর সপ্ত ভূমির বিষয় উল্লেখ আছে এবং স্থূলতম অর্থাৎ বাহ্য ভূমি হইতে মনকে ধীরে ধীরে উর্দ্ধপথে তুলিয়া সপ্তম ভূমিতে দৃঢ় করিতে পারিলে তাহার সমাধি এবং মুক্তিলাভ ঘটে,—এই প্রকার উপদেশ নিহিত আছে। পারলৌকিক পথে উন্নতি লাভ করিতে হইলে ঐ সকল তত্ত্ব ও তদনুযায়ী অভ্যাস এবং তপস্যা অবশ্যই উপযোগী বটে; কিন্তু নিতান্ত স্থূলভাবে ধরিলেও দেখা যায় যে, মানব সাধারণতঃ তিনটী স্তরে বা তিনটী ভূমিতে অবস্থান করিয়া থাকে। এই তিনটী স্তর যথা,—(১) **কারণ**, (২) **সূক্ষ্ম** এবং (৩) **স্থূল**। একটী উদাহরণ ব্যতীত বিষয়টী হৃদয়ঙ্গম হওয়া সুকঠিন। মনে করুন, কোনও একটী পীড়িত ও দুস্থ ব্যক্তি রাস্তার উপর নিতান্ত নিরাশ্রয় অবস্থায় শায়িত আছে,—শত শত ব্যক্তি উহা দেখিতেছে কিন্তু অমনোযোগ বা উপেক্ষা সহকারে তাহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া চলিয়া যাইতেছে। আপনি তাহাকে দেখিয়া স্বতঃই অনুকম্পাপরবশে কাতর হইলেন এবং যত্নসহকারে তাহাকে তুলিয়া লইয়া নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিলেন এবং বিশেষভাবে তাহার চিকিৎসা সেবাদির দ্বারা তাহাকে নীরোগ ও সুস্থ করিয়া তাহাকে তাহার বাড়ীতে আত্মীয় স্বজনের নিকটে নিরাপদে প্রেরণ করিলেন।

যতক্ষণ আপনি উপরোক্ত রোগীটীর সেবা যত্ন ও চিকিৎসাদি কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, ততক্ষণ আপনি **বাহ্যস্তরে** ছিলেন এবং যখন সে কার্য্যটী সমাধা হইয়া গেল, তখন আপনার মনে ঐ কার্য্য সম্বন্ধে চিন্তা থাকে এবং কার্য্যটী সৎকার্য্য বলিয়া মনের মধ্যে একটী আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতে থাকেন। এই অবস্থায় আপনি মনস্তর বা **সূক্ষ্মস্তরে**

থাকেন। আরও কিছুদিন পরে এ সম্বন্ধে সমস্ত ব্যাপার আর আপনার চিন্তার মধ্যেও রহিল না। কোথায় যায়? একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় কি? কখনই না,—এ জগতে কিছুই একেবারে ধ্বংশ হইতে পারে না,—রূপান্তরিত হইতে পারে, কিন্তু কখনও বিলুপ্ত হইতে পারে না। ঐ ব্যাপারের বা ঐ কার্য্যের সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্মাংশ আপনার **কারণদেহে** সঞ্চিত হইয়া থাকে। এইরূপ প্রত্যেক জন্মে নানা কার্য্যের ঐ প্রকার সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্মাংশ সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত অংশগুলি একত্রীভূত হইয়া মনুষ্যের **চরিত্র** সংগঠন করিয়া থাকে। এই সঞ্চিত সূক্ষ্মাংশ হইতেই মানবের মানবত্ব প্রস্তুত করে এবং তাহার প্রবৃত্তি, ইচ্ছা বা "ঝোঁক" স্থায়ীভাবে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকে।

যেমন আমাদের নিত্য প্রবর্ত্তিত কার্য্যের ফলে, মনস্তরে এবং সর্ব্বশেষে সূক্ষ্মতম স্তরে অর্থাৎ কারণস্তরে সঞ্চিত অংশরাশি হইতে চরিত্র সংগঠন হয় তেমনই আবার চরিত্র হইতে আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের প্রবৃত্তি বা প্রেরণা আসিয়া থাকে। অর্থাৎ স্থূলদেহের ও স্থূল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফলে চরিত্রগঠন, আবার চরিত্র হইতে কার্য্য-প্রেরণা, —এই ভাবে আমাদের কারণদেহ ও স্থূলদেহের মধ্যে একটী যোগসূত্র আছে ও থাকে। অতএব ইহাদের পরস্পর যে সম্বন্ধ, তাহাকে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ বলা যায়। একের পরিবর্ত্তনে অন্যের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। বার বার এবং বহুদিন ধরিয়া পবিত্রকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে অথবা জনহিতকর কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে যেমন পবিত্র চরিত্রগঠনে সাহায্য হইয়া থাকে, ঠিক তেমনই পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হইলে, আমরা সর্ব্বদাই পবিত্রকার্য্য করিবারই প্রেরণা পাইতে থাকিব। এই প্রকার পারম্পর্য্য সম্বন্ধ বা কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বা অঙ্গাঙ্গী যোগসূত্রটী বিশেষভাবে মনে রাখিবার বিষয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই!

যদ্যপি আমরা আমাদের সর্ব্বপ্রথম জন্ম হইতেই বরাবর অবিশ্রান্ত ভাবে জনহিতকর ও পবিত্র কার্য্যসকল অনুষ্ঠান করিয়া ভগবৎ নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া আসিতাম, তবে ত কোনও কথাই থাকিত না,—এবং তাহা হইলে একদিকে আমরা আমাদের শরীর হিসাবে সর্ব্বস্তরেই নির্ম্মল ও নীরোগী থাকিতাম,—অন্যদিকে জাগতিক কার্য্যাদি ভগবৎনির্দ্দিষ্ট বিধানে সম্পন্ন করিবার পর আমরা শেষে পরব্রহ্মে লীন হইবার পথে আদৌ কোনও বাধা প্রাপ্ত হইতাম না কিন্তু তাহা ঘটে নাই,—মধ্যপথে, যে কোনও কারণে, আমরা স্বাভাবিক নীতি লঙ্ঘন করিয়াছি এবং তাহার ফলে আমাদের শরীরকে একদিকে যেমন বাহ্যপ্রকৃতির অধীন অর্থাৎ শরীরযন্ত্রটাকে পীড়িত করিয়াছি, অন্যদিকে ক্রমিক আত্মোন্নতির পথেও বাধা সৃষ্টি করিয়াছি। ইহারই নাম "সোরা" দোষ। এই সোরাদোষটীর আবির্ভাব হইবার পর, সর্ব্বপ্রথম বার বার নিরন্তর কার্য্যদুষ্টি এবং তাহার ফলে আমাদের কারণস্তরে চরিত্রদুষ্টি ঘটিয়াছে। চরিত্রদুষ্টির জন্য আমরা আবার নিত্যই কদর্য্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার প্রেরণা প্রাপ্ত হইতেছি, আবার ঐ প্রকার প্রেরণাবশে কদর্য্য অনুষ্ঠান করিবার ফলে দুষ্টচরিত্র দুষ্টতর ও দৃঢ়তর ভাবে নির্ম্মাণ করিতেছি। এ অবস্থায় পরিত্রাণ প্রাপ্তি বড়ই কঠিন,—একথা সামান্য চিন্তাদ্বারাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। আমাদের শাস্ত্রে লিখিত আছে—"স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে", অর্থাৎ চরিত্র বা স্বভাবটী অতি সূক্ষ্মস্তরে অর্থাৎ কারণ স্তরে নিহিত থাকে সুতরাং ইহার পরিবর্ত্তন-সাধন বড়ই আয়াসসাধ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি?

এক্ষণে যদি কোনও পুরাতন পীড়ার রোগীকে চিকিৎসা করিতে হয়, তবে তাহার **সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মস্তরের** সংবাদ লওয়া প্রয়োজনীয়,—একথা অতি স্পষ্ট বলিয়া ধারণা হইবে। তাহার চরিত্রগত, স্বভাবগত পরিবর্ত্তনগুলি জানিতেই হইবে। মনুষ্যের স্বাভাবিক জীবন-নীতি অর্থাৎ

যেরূপ ভাবে জীবনযাপন করিলে মানবজন্মের চরমোদ্দেশ্য সাধনের কোনও বিঘ্ন হয় না, সেইপ্রকার একটী জীবন-নীতি আছে, সেটি কি? সেটী ভগবানের সৃষ্ট যাবতীয় স্থাবর, জঙ্গম, ও উদ্ভিদ পদার্থের প্রতি আত্মোপম্য প্রেম বা আত্মীয়-বোধ। জড় ও চেতন প্রত্যেকের প্রতি একটী অন্তর্নিহিত ভালবাসা এবং সেই ভালবাসার মূলে যাবতীয় জনহিতকর কার্য্যানুষ্ঠান, ক্ষুদ্র স্বার্থের পরিবর্ত্তে পরার্থে উৎসর্গ,—ইহাই জীবন-নীতি। সোরা-দোষে এই সার্ব্বভৌম জীবন-নীতির ব্যতিক্রম ঘটে। "একা রামে রক্ষা নাই,—আবার দোসর লক্ষণ",—সোরা একাই নানা অনিষ্টের মূল, তাহার উপর আবার সাইকোসিস ও সিফিলিস নামক দোষ দুইটার আবির্ভাব হইলে, মানবমন ও মানবদেহ যে প্রকৃতির বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ঘোষণা করিবে তাহাতে সন্দেহ কি? স্বাভাবিক নির্ম্মলদেহে ও নির্ম্মল মনের নিকট পূর্ব্ববায়ু বা দক্ষিণবায়ু পরম সুখদ, কিন্তু ঐ সকল দোষ,—দুষ্ট দেহ ও মনের নিকট উহাদের নানা দোষ বাহির হইয়া থাকে। "পূর্ব্ববায়ু লাগাইলে বাতরোগ হইয়া থাকে," "দক্ষিণ বায়ু প্রবাহে কখনই বসিবে না, উহাতে সর্দ্দি হয়", ইত্যাদি ভাবে বায়ুর দোষ ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত দোষ কাহার? পূর্ব্ব বা দক্ষিণ বায়ুপ্রবাহ চিরদিনই নির্ম্মল, সুখদ, মনঃপ্রাণের প্রফুল্লতাজনক,—পূর্ব্ব বা দক্ষিণ বায়ু ভগবানের সৃষ্ট যাবতীয় প্রাণীবর্গের পক্ষে কতই আরামদায়ক,—উহাদের দোষ কি? দোষ,—সোরাদি দোষ-দুষ্ট দেহের, অন্য কাহারও নহে। দুগ্ধ, ঘৃত, ইত্যাদি অতি মনোজ্ঞ ও পরমায়ুবর্দ্ধক সামগ্রী,—কাহার পক্ষে? যাহার শরীর ও মন নির্দ্দোষ ও স্বাভাবিক, তাহার পক্ষে উপাদেয়; দোষদুষ্ট দেহমনের নিকট ঐ সকল দেবদুর্ল্লভ দ্রব্যেরও পরিত্রাণ নাই। এই ভাবে প্রকৃতির যাবতীয় দ্রব্যের সঙ্গে সোরা-দোষদুষ্ট ব্যক্তির চিরসংগ্রাম চলিয়াছে ও চলিতে থাকিবে, যতদিন না, তাহার শরীর ও মন পুনরায় নির্ম্মল হইতে পারে।

সোরাদোষটী মানবজাতিকে বহুদিন হইতে আক্রমণ করিয়াছে,—সাইকোসিস ও সিফিলিস, তাহার পরে আসিয়াছে। প্রত্যেকটাই মানবদেহ ও মানব মনের শত্রু ; তবে প্রত্যেক দোষেরই এক একটা স্বতন্ত্র শক্তি বা স্বতন্ত্র মহিমা আছে। সেজন্ত ইহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বতন্ত্র শক্তির দ্বারা মানবদেহ ও মানবমনকে স্বতন্ত্রভাবে বিকৃত করিয়া থাকে। ইহারা প্রত্যেকে অথবা সঙ্ঘবদ্ধভাবে মনুষ্যের জীবনীশক্তিকে এরূপ হীনবল ও বিকৃত করে যে, তাহার ফলে তাহার সমগ্র জীবনস্রোতটী শ্রীহীন এবং পঙ্কিল হইয়া উঠে। দীর্ঘকাল ধরিয়া ঐ দোষগুলি মানবদেহে অধিকার ও সাম্রাজ্য স্থাপন করিলে, মনুষ্যের প্রত্যেক স্তরটী বিকৃত করিয়া ফেলিবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি আছে ?

এ অবস্থায় পুরাতন পীড়ার রোগীর চিকিৎসা করিতে হইলে, প্রত্যেক স্তরের বিকৃতিগুলি উত্তমরূপে জানিতে হইবে, নতুবা সোরাদি দোষের মধ্যে কাহার কতটুকু কারুকার্য্য রহিয়াছে, তাহা স্থির করা অসম্ভব হইয়া থাকে। গভীরতম প্রদেশের সংবাদগুলি বিস্তারিতরূপে গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করিয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক। গভীরতম প্রদেশেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব,—তাহার মনুষ্যত্বের কি অবস্থা আছে ও চলিতেছে তাহা জানা চাই এবং তদনুসারে ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হয়।

মনুষ্যের মনুষ্যত্ব বা তাহার অন্তরতম প্রদেশ অথবা কারণস্তর কোন্খানে বা কিসে প্রকাশ ? প্রকাশ, তাহার ইচ্ছা ও অনিচ্ছার মধ্যে। মানবটী কেমন ?—তাহার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা যেমন। অতএব তাহার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার প্রকৃতি দেখিয়াই তাহার আভ্যন্তর অবস্থার বিচার করিতে হয়। সকলেই জানেন, সোরা মানুষকে স্বার্থপর করে ; সাইকোসিস তাহাকে হিংসাভাবাপন্ন করে ও প্রত্যেক কার্য্যই গোপনে করিবার প্রবৃত্তি দিয়া

থাকে। আবার টিউবারকুলার দোষ হেতু মানুষের যেটীতে অসুখ হইবে বা তাহার অসুখটী বৃদ্ধি করিবে, তাহাই পাইতে, খাইতে এবং উপভোগ করিতে প্রবৃত্তি দিয়া থাকে। সুতরাং মানুষের ইচ্ছা ও অনিচ্ছার প্রকৃতি জানিতে পারিলেই কোন্ দোষের কতখানি কৃতিত্ব ও কারুকার্য্য রহিয়াছে তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। অতএব, পুরাতন পীড়ায় রোগীর আহার্য্য পদার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া, শয়ন, উপবেশন, ভ্রমন, স্নান, শীতবাতাতপাদি ঋতুবিকার ও বিপর্য্যয়, সাধারণ ব্যক্তি ও আত্মীয়জনগণের প্রতি ব্যবহার, এমন কি, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার পর্য্যন্ত সকলবিষয়ের সম্বন্ধে তাহার ইচ্ছা ও অনিচ্ছার সংবাদ লইতে হয়। তাহার মনস্তরের প্রত্যেক খুটিনাটির সংবাদও আবশ্যক। কোন্ রোগী ঘুমাইতে ঘুমাইতে পা দুইটী নাড়ে, কোন্ রোগী ঘুমাইবার সময় পায়ের চেটো দুইটী লেপের বাহিরে রাখে,—ইত্যাদি সাধারণ চক্ষে যে বিষয়গুলি নিতান্তই অনাবশ্যক বলিয়া মনে হয়—এরূপ বিষয়গুলিও জানিবার আবশ্যকতা যথেষ্টই রহিয়াছে। কোনও রোগী দুগ্ধ সেবন করিতে ভালবাসে, কিন্তু দুগ্ধের উপর সরটী থাকিলেই সর্ব্বনাশ—আবার কোনও রোগী হয়ত সর খাইবে কিন্তু দুগ্ধ পানে ভয়ানক নারাজ, আবার কেহ হয়ত ঘন দুগ্ধ পান করিলে ভালই থাকে, কিন্তু সামান্য পাতলা হইলে তাহার অসুবিধা হয়, পেট ফাঁপ রাখে এবং ভালও লাগে না,—ইত্যাদি অতি সামান্য সামান্য বিভিন্নতার পশ্চাতেও দোষের কৃতিত্ব আছে,—নিশ্চয়ই জানিতে হইবে। এই ভাবে তাহার মনস্তরের যাবতীয় সংবাদ লিপিবদ্ধ করিবার পর, তবে, তাহার স্থূলতর স্তরের সংবাদ জানিতে হইবে। নিম্নে এ বিষয়ে একটী বংশবৃক্ষ প্রস্তুত করিয়া

দেওয়া হইল এবং সর্ব্বশেষে একটী রোগীতত্ত্ব সন্নিবেশিত করিয়া বিষয়টী সুপরিস্কৃত করিয়া দেওয়া হইবে।

কোনও একটী পুরাতন পীড়ার রোগীর নিম্নলিখিত বিভাগ বা বিষয়গুলি সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ এবং লিপিবদ্ধ করিতে হয়।

১। সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম রাজ্যের সংবাদ সাধারণতঃ তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়, যথা—

(ক) **ইচ্ছা ও অনিচ্ছা**—কোনও দ্রব্যবিশেষের জন্য অতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা অথবা কোনও দ্রব্য বিশেষের প্রতি নিরতিশয় বিদ্বেষ, এই বিভাগের অন্তর্গত। স্নেহ মমতারও অস্বাভাবিকতা ইহার অন্তর্গত।

(খ) **বুদ্ধিবৃত্তির** বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাহা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। যেমন, কোনও রোগী খরচ পত্রের হিসাব রাখিতে গেলে, মাথায় গোলমাল অনুভব করে। বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ্নতা নষ্ট হইয়া যায়।

(গ) **স্মৃতি** বিষয়ক গোলোযোগ,—কেহ বা বহু পূর্ব্বের ঘটনা মনে রাখিতে অপারগ, কেহ বা, অতি সম্প্রতি যাহা ঘটিয়াছে, তাহা ভুলিয়া যায়, কেহ বা নাম, অর্থাৎ ব্যক্তির নাম, দ্রব্যের নাম, রাস্তার নাম, কথার বানানগুলি মনে রাখিতে পারে না,—এই সকল স্মৃতি বিষয়ক ব্যাপার রোগীর মধ্যে যে অবস্থায় থাকে, তাহা সংগ্রহ আবশ্যক।

ফলতঃ এই তিনটী বিভাগের মধ্যে প্রথমোক্ত অর্থাৎ (ক) বিভাগোক্ত বিষয়টী **সর্ব্বপ্রধান** জানিতে হইবে।

২। **সার্ব্বদৈহিক** অবস্থা ও লক্ষণাবলি তাহার পরের শ্রেণীতে পড়িবার যোগ্য। শীতবাতাতপাদির সহিত রোগীর কিরূপ সম্বন্ধ, অর্থাৎ রোগী শীতকাতর, কি গ্রীষ্মকাতর, অথবা বর্ষাকাতর, রোগী স্নান করিতে ইচ্ছুক কি না, স্নান না করিয়া থাকিতে পারে কি না, স্নানটী উপভোগের বিষয় কি না ইত্যাদি সার্ব্বাঙ্গিক সংবাদগুলি আবশ্যক। রোগী স্থিরভাবে

থাকা পছন্দ করে অথবা সর্ব্বদা ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইবার অভিলাষ করে—ইহাও ইহারই অন্তর্গত।

মল, মূত্র, ঘর্ম্ম এবং ঋতুসম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপার, তাহাদের প্রকৃতি, বর্ণ, গন্ধ ইত্যাদি প্রত্যেক খুঁটিনাটীগুলি জানিতে হইবে। এ সকলের হ্রাস বৃদ্ধি ব্যাপার একান্ত উপযোগী।

৩। সর্ব্বশেষে,—যে **পীড়ার** জন্য অর্থাৎ রোগী শরীরে যে অংশে পীড়া জন্য চিকিৎসাপ্রার্থী হইয়াছে তাহার যাবতীয় বৃত্তান্ত আবশ্যক। পীড়াটি কোথায়, যাতনা কিরূপ, কিসে হ্রাস এবং কিসে বৃদ্ধি ইত্যাদি অতি যত্ন সহকারে সংগ্রহ করিতে হয়।

একটী বিষয়, যদিও ইতঃপূর্ব্বে বিশেষভাবে লিখিত হইয়াছে, তবুও এখানে পুনরায় বলিবার কোনও দোষ নাই,—সেটী **হ্রাসবৃদ্ধি সম্বন্ধে।** রোগীর যাবতীয় ব্যাপার বিনা হ্রাসবৃদ্ধিতে অসম্পূর্ণ জানিতে হইবে। যে কোনও লক্ষণ অর্থাৎ অনুভূতি,—তাহা কিসে, কখন, কি করিলে, দিবা রাত্রির মধ্যে কোন্ অংশে, কোন্ ঋতুতে, কোন্ অবস্থায়, শীতবাতাতপাদি সহযোগে, হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা অতি নিশ্চয়ই জানা চাই, নতুবা সে লক্ষণ আদৌ কোনও কার্য্যকর হয় না।

উপরোক্ত বিধানে লক্ষণ সংগ্রহ এবং লিপিবদ্ধ করিবার পর, ঐ লিপিখানি বার বার পাঠ করিয়া জানিতে হইবে যে সোরা সাইকোসিস্ এবং সিফিলিস এই তিনটী দোষের মধ্যে কাহার **প্রাধান্য** রহিয়াছে। মানসিক লক্ষণ ও অবস্থা হইতে যাহার প্রাধান্য, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। **যে দোষের মানসিক লক্ষণ ও অবস্থার প্রাধান্য থাকিবে, তদনুসারে ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইবে।**

এক্ষণে, যতদূর আলোচনা হইল, তাহাতে রোগীর ঔষধ নির্ব্বাচন

হিসাবে বিচার করিয়া দোষঘ্ন ঔষধের একটী শ্রেণীতে পৌছিয়াছি, কিন্তু আমাদের একটী ঔষধই নির্ব্বাচন করিতে হইবে। কি উপায়ে তাহা করা যাইবে? উপরোক্ত প্রকারে বিচার করিয়া মানসিক লক্ষণের সাদৃশ্যে এক শ্রেণীর ২।৫টী ঔষধ প্রাপ্ত হইলাম,—অতঃপর সার্ব্বদৈহিক লক্ষণের এবং সর্ব্বশেষে,—স্থানীয় লক্ষণের বিচার করিয়া একটী মাত্র ঔষধে উপনীত হওয়া যাইবে।

প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসাতে যাঁহারই অভিজ্ঞতা যথেষ্ট জন্মিয়াছে, তিনিই দেখিয়াছেন যে, কোনও একটী রোগীর শরীরে যদিও সোরা, সাইকোসিস্ এবং সিফিলিস্ দোষ বর্ত্তমান থাকে, অথবা ইহাদের মধ্যে সোরা এবং আরও একটী দোষ বর্ত্তমান থাকে, তবুও একই সময়ে একাধিক দোষ ফলপ্রসূ অবস্থায় থাকে না,—অর্থাৎ কোনও একটী মাত্র দোষ উত্তেজিত অবস্থায় থাকে, বাকি একটী বা দুইটী দোষ যেন নিদ্রিত অবস্থায় থাকে। আমার কোনও একটী রোগীর দেহে প্রাপ্ত ও অর্জ্জিত সকল দোষই বর্ত্তমান থাকার কথা জানা গেল, কিন্তু লক্ষণ-সমষ্টি সংগ্রহ করিয়া দেখা গেল যে, রোগীর সমস্ত লক্ষণই নেট্রাম মিউরিয়েটিকামের রহিয়াছে। রোগীর জীবন বৃত্তান্ত বা পিতৃপিতামহের ইতিহাস শুনিয়া কেহ হয়ত মনে করিবেন, ইহার এণ্টিসাইকোটিক অথবা এণ্টিসিফিলিটিক ঔষধের মধ্যে একটী নিশ্চয়ই প্রয়োগ করিতে হইবে। যাঁহারা রোগলিপি তৈয়ার না করিয়া কেবল মুখের বর্ণনা শ্রবণ করিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নির্ব্বাচন যে পদে পদে ভ্রান্তিপূর্ণ হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? বাস্তবিক পক্ষে হ্যানিম্যান যে উপদেশ দিয়াছেন—"পুরাতন রোগীর লক্ষণ-লিপি উত্তমরূপ লিখিত হইলে, জানিতে হইবে, তাহার আরোগ্যকল্পে অনেক কার্য্য করা হইল,"—ইহা অতি সারগর্ভ কথা। লক্ষণ-লিপি না

করিলে, কেমন করিয়া জানা যাইবে যে, অমুক দোষটা সুপ্ত এবং অমুকটা জাগরিত বা ফলপ্রসূ ? এবং উহা না জানিলে, কেমন করিয়া নির্ব্বাচন কার্য্য অভ্রান্তভাবে সম্পন্ন হইবে ?

রোগীলিপি প্রস্তুত করিয়া অভিনিবেশ সহকারে বার বার অধ্যয়নের পর তবেই বুঝিতে পারা যাইবে যে **কোন্ দোষটী উত্তেজিত অবস্থায় অবস্থিত।** সেই দোষ হইতে যে যে লক্ষণাবলীর আবির্ভাব হইয়াছে, তদনুযায়ী ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইবে। ঐ দোষজ লক্ষণাবলীর মধ্যে **মানসিক স্তরের** লক্ষণগুলির মূল্য অনেক বেশী, একথা পূর্ব্বেই কহিয়াছি। মনস্তরে বিকাশপ্রাপ্ত লক্ষণগুলি যে যে ঔষধে বিশিষ্টভাবে পাওয়া যায়, সেই সেই ঔষধগুলির মধ্যে আবার যাহাদের ভিতর **সার্ব্বদৈহিক** লক্ষণাবলী আছে, সেইগুলি রাখিয়া বাকি গুলিকে বর্জ্জন করিতে হইবে; বর্জ্জন করিবার পর, যে যে ঔষধগুলি থাকিল, তাহাদের মধ্যে রোগীর মনস্তরের লক্ষণ এবং সার্ব্বদৈহিক লক্ষণ রহিয়াছে; এক্ষণে এইগুলির মধ্যে যাহাদের বা যাহার ভিতর রোগীর **স্থানীয়** লক্ষণ থাকে, সে গুলি বাদে বাকি গুলিকে বর্জ্জন করিতে হয়। এস্থলে যদি একের অধিক ঔষধ অবশিষ্ট থাকে, তবে মেটেরিয়া মেডিকা হইতে যেটীর সহিত রোগীর **অবস্থা এবং বিশিষ্ঠতা** বর্ণে বর্ণে মিল থাকে, সেটীকেই নির্ব্বাচিত ঔষধ বলিয়া জানিতে হয়; আর যদি কেবল একটীমাত্র ঔষধ অবশিষ্ট থাকে, তবে সেটীই রোগীর ঔষধ বলিয়া জানিতে হয়। এক্ষণে মনে করুন, এরূপ অবস্থা ঘটিল যে, রোগীর মনস্তরের লক্ষণাবলীর সাদৃশ্যযুক্ত ঔষধগুলির মধ্যে সার্ব্বদৈহিক লক্ষণ কেবলমাত্র একটী ঔষধে পাওয়া গেল, কিন্তু **তাহার ভিতর স্থানীয় লক্ষণ বা রোগী যে জন্য চিকিৎসা করাইতে চিকিৎসক সমীপে আসিয়াছে,**

সেই স্থানীয় লক্ষণ বা স্থানীয় পীড়া ঐ **ঔষধটীর মধ্যে নাই,**— তাহা হইলেও ঐ ঔষধটাই নির্ব্বাচনযোগ্য, ইহাই জানিতে হইবে। ঐ ঔষধই রোগীকে আরোগ্য করিবে, তাহার কোনও সন্দেহ নাই, যদিও সেই ঔষধটীতে ঐ পীড়া কখনও তৈয়ার করে নাই বলিয়াই জানা আছে। একটী উদাহরণ দ্বারা এই নির্ব্বাচন কৌশলটী পরীক্ষা করিতে হইবে।

মনে করুন, কোনও একটী স্ত্রীলোকের **জরায়ুতে অর্ব্বুদ** হইয়াছে (Uterine Tumour), আপনার নিকট তিনি চিকিৎসার্থ আসিলেন; আপনি নিম্নলিখিত লক্ষণ-লিপি তৈয়ার করিলেন। যথা,—"আজ ১২।১৩ বৎসর হইতে রোগিনীর মাসিক স্রাবটী অতিশয় অল্প এবং ঐ সময় হইতে তলপেটে অল্পবিস্তর যাতনাও হইয়া আসিতেছে, এক্ষণে তাঁহার বয়স ৩৭।৩৮ বৎসর, ১৯ বৎসর বয়সের সময় তাহার একটীমাত্র সন্তান হইয়া আর গর্ভসঞ্চার হয় নাই। গত ৩।৪ বৎসর হইতে তাঁহার শরীরে সর্ব্বাঙ্গে অতিশয় জ্বালা বোধ হইতেছে, স্নানাদি শৈত্যক্রিয়াতে কথঞ্চিৎ উপশম হয় মাত্র। চিত্তের শান্তি আদৌ নাই, সর্ব্বদাই বিরক্তি ভাব দেখা যায়, সংসারের কোনও কাজ ভাল লাগে না, এমন কি, অনেক সময় নির্জ্জনে বসিয়া কান্দিতে ইচ্ছা হয়। ক্ষুধা অতি কম, আহারের সময় হইলে কেবল পেটের শূন্যভাবটী কমাইবার জন্য আহার করেন বটে, ফলতঃ তাহাতে শূন্যভাবটী যায় না। কোষ্ঠবদ্ধ একটী প্রধান লক্ষণ,—মলচেষ্টাই নাই, তিন চারি দিন অন্তর মলের ছোট ছোট গুলি ২।৪টী বাহির হয়, এই পর্য্যন্ত। মলে, প্রস্রাবে, ঘর্ম্মে অতিশয় ঝাঁঝাল গন্ধ, এমন কি, নিজেরই ঘৃণা হয়।

"রোগিনীর বালিকা বয়সে, তাঁহার হাতের ও পায়ের অঙ্গুলির ফাঁকে পাঁচড়া হইত, পাছাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইত, সকল সময়েই থাকিত, যদিও বর্ষাকালে বেশী বলিয়া মনে আছে,—ঐগুলিতে নানা প্রকার বাহ্য

ঔষধের প্রলেপ দেওয়া হইয়াছিল, ১০।১২ বৎসর পর্য্যন্ত ছিল, তাহার পর আর দেখা যায় নাই।"

চিকিৎসকের প্রয়োজন লক্ষণ-লিপি প্রস্তুত করা, কেননা তাঁহাকে সুনির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে, কিন্তু রোগী বা রোগিনীর একমাত্র স্বার্থ,—তাঁহার আরোগ্য। এক্ষেত্রে রোগিনী চাহেন, যাহাতে তাঁহার জরায়ুর অর্ব্বুদটী আরোগ্য হইয়া যায়। কিন্তু, এই আরোগ্যের জন্য লক্ষণ সমূহ কি ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, কি ভাবে লক্ষণাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে, কি হিসাবে ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইবে, ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিবার আবশ্যকতা, চিকিৎসকের।

উপরোক্ত রোগিনীর লক্ষণাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে যে, রোগিনীর দেহে **সোরা** এবং **সাইকোসিস্** দোষ দুইটীর সংমিশ্রণ রহিয়াছে, কিন্তু সাইকোসিস্ দোষেরই প্রাধান্য রহিয়াছে। এ অবস্থায় নির্ব্বাচিত ঔষধটী **এণ্টি-সাইকোটিক** হইতেই হইবে। আমরা এক্ষণে মানসিক স্তরের লক্ষণ অনুসারে নির্ব্বাচন কার্য্যে ব্রতী হইব। তৎপূর্ব্বে, অল্পশিক্ষিত হোমিওপ্যাথদিগের বুঝিবার সুবিধা জন্য সামান্য বিচার করিতে হইবে যে, কি নিদর্শন সাহায্যে রোগিনীর দেহে সাইকোসিসের প্রাধান্য স্থির করা গেল। যে যে লক্ষণের সাহায্যে তাঁহার দেহে সাইকোসিস্ দোষটীর প্রাধান্য স্থিরীকৃত হইল, সেই সেই লক্ষণ কোন্ কোন্ ঔষধে আছে, তাহাও দেখা আবশ্যক,—তাহা হইলে যে ঔষধটী নির্ব্বাচনযোগ্য তাহা স্থির হইয়া যাইবে। মানসিক লক্ষণ সর্ব্বপ্রথম স্থান পাইবার যোগ্য, ইহা সকলেই জানেন।

১। সর্ব্বদাই মনের অশান্তি ও বিরক্তি ভাব,—এপিস, আর্স, চায়না, জেল্‌স, ইগ্নে, ওপি, এসিড্-ফস, পিকরিক্-এসিড, পাল্‌স, **সিপিয়া**, ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া।

২। নির্জ্জনে কান্দিতে ইচ্ছা হয়,—এমন-মিউর, এপিস, আর্স, ইগ্নে, লাইকো, নেট্রাম-মিউর, এসিড্-ফস্, পাল্স, **সিপিয়া**, ষ্ট্যানাম্।

৩। স্রাবে ঝাঁঝাল গন্ধ—এসিড্-নাই, এসিড্-ফস্, **সিপিয়া**।

৪। সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা, শৈত্যক্রিয়ায় উপশম,—এপিস্, নেট্রাম-মিউর, পাল্স, **সিপিয়া**।

৫। কোষ্ঠবদ্ধতা—নেট্রাম-মিউর, **সিপিয়া**।

৬। পেটে শূন্যতানুভব, আহারেও উপশম নাই,—**সিপিয়া**।

৭। চর্ম্মপীড়া, বর্ষায় বৃদ্ধি,—মার্ক-সল, নেট্রাম-মিউর, **সিপিয়া**, সাল্ফার।

* টিউমার একটী **লক্ষণ** নয়, উহা রোগের **ফলমাত্র**, এজন্য উহাকে এই প্রসঙ্গে স্থান দেওয়া হইল না।

এক্ষণে উপরোক্ত লক্ষণহিসাবে ঔষধ-নির্ঘণ্ট পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, একমাত্র **সিপিয়াতেই** সমস্ত লক্ষণের সমাবেশ করিতে পারা যায়,—অন্য কোনও ঔষধেই সমস্ত লক্ষণের একত্র সমাবেশ নাই,—এ অবস্থায় সিপিয়াই নির্ব্বাচনযোগ্য হইবে, একথা বলাই বাহুল্য। ফলতঃ সাধারণ অল্পশিক্ষিত চিকিৎসক ভ্রাতাদিগের মনে এ সময় একটী প্রবল সন্দেহ বা সংশয় উপস্থিত হইবে যে,—"সিপিয়ার পরীক্ষাতে (Proving) অর্ব্বুদ বাহির হয় নাই, তবে সিপিয়ার ক্রিয়ায় অর্ব্বুদ কি প্রকারে আরোগ্য হইবে?" আমাদের সসম্ভ্রম নিবেদন এই যে, যদিও সিপিয়াতে অর্ব্বুদ কখনও প্রস্তুত করে নাই, তবুও এই রোগিনীর অর্ব্বুদ সিপিয়ার দ্বারাই আরোগ্য হইবে। যদি পুনঃ সংশয় আসে ও প্রশ্ন হয়, কেন হইবে? তদুত্তরে নিবেদন এই যে, নির্ব্বাচিত ঔষধে রোগিনীর **জীবনীশক্তির বিশৃঙ্খলাটী,—যে বিশৃঙ্খলার জন্য ঐ অর্ব্বুদটী তৈয়ার হইয়াছে,** সেই বিশৃঙ্খলাটী বিদূরিত হইবে, এবং তৎপরিবর্ত্তে

স্বাভাবিক শৃঙ্খলা পুনঃ স্থাপিত হইবে, অতএব অর্ব্বুদটী **পোষণের অভাবে** ক্রমে অদৃশ্য ও আরোগ্য হইয়া যাইবে।

অনেক ক্ষেত্রে, প্রথম নির্ব্বাচনের ঔষধের সাহায্যে রোগী নির্ম্মল আরোগ্য প্রাপ্ত হয় না। প্রথম নির্ব্বাচিত ঔষধ নানা শক্তিতে প্রয়োগ করিবার পর, ঐ ঔষধের সদৃশ লক্ষণসমষ্টি অদৃশ্য হইয়া যায় এবং তৎপরিবর্ত্তে হয়ত অন্য আর একটি ঔষধের চিত্র দেখা দেয়। তখন এই দ্বিতীয় চিত্রানুসারে ও তাহারই সাদৃশ্যে পুনরায় নির্ব্বাচন করিতে হয়। এই দ্বিতীয় নির্ব্বাচনটী প্রায়ই প্রথম নির্ব্বাচিত ঔষধের **পরিপূরক** ঔষধই হইয়া থাকে, আবার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ঔষধও হইতে পারে। যাহা হউক, এখানে দ্বিতীয় নির্ব্বাচিত ঔষধ, আবার আবশ্যক হইলে তৃতীয় এবং চতুর্থ নির্ব্বাচনের প্রয়োজন হইতে পারে। যখন আর কোনও লক্ষণ পাওয়া না যায়, এদিকে রোগীও যদি আর কোনও অভাব, অভিযোগ বা অসুবিধা অনুভব না করে, তখনই জানিতে হইবে যে, আর ঔষধ প্রয়োগের আবশ্যতা নাই, কেননা রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, পুরাতন পীড়া আরোগ্যকল্পে অধিক সময় আবশ্যক হয়, এমন কি দুই এক বৎসর হইতে প্রায় ছয় বৎসর পর্য্যন্ত সময় প্রয়োজন হইয়া থাকে। এজন্য বিশেষ ধৈর্য্যাবলম্বন আবশ্যক। উভয় পক্ষই এ বিষয়ে অবহিত না হইলে চিকিৎসায় ফল আংশিক হইয়া থাকে অথবা চিকিৎসাটী নিষ্ফলও হইতে পারে। অধিকাংশ পুরাতন পীড়ার রোগীতে বংশানুক্রমে রোগলক্ষণ সকল চলিয়া থাকে, সুতরাং বিলম্ব হইলে তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। পুরাতন পীড়ার রোগীর চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করা এক কথা এবং মুখে মুখে ২।৪টী কথা শুনিয়া কিছু অর্থ বিনিময়ে একটী প্রেসক্রিপ্সন দিয়া বিদায় করা স্বতন্ত্র কথা। লোকে মনে করে, একটী ঔষধের নাম পাইলেই হইল।

লক্ষণ-লিপি করা ত দূরের কথা,—মুখের কথা কয়টী শুনিবারও চিকিৎসকের সময় নাই! এরূপ চিকিৎসা কেবলমাত্র বিড়ম্বনা, এরূপ চিকিৎসা হোমিওপ্যাথির কলঙ্ক প্রচার করে, চিকিৎসকের অধর্ম্ম অর্জ্জন করা হয় এবং রোগীর অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট হওয়া অসম্ভব।

ঔষধ নির্ব্বাচন।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় প্রকৃত আরোগ্যরূপ অমৃত প্রাপ্তির আশা করিতে হইলে রোগীর ঔষধ নির্ব্বাচন অভ্রান্ত হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়। একথা সকলেই কহিয়া থাকেন ও উপদেশও দিয়া থাকেন, ফলতঃ কার্য্যতঃ ইহা বড়ই কঠিন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যাঁহারা এলোপ্যাথিক স্কুল বা কলেজ হইতে এলোপ্যাথিক উপাধিলাভ করিয়া অথবা কিছুদিন এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করিয়া হোমিওপ্যাথিতে দীক্ষিত হন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা বড়ই দুষ্কর বলিয়া মনে হইবে। তাঁহারা যে ভাবে শিক্ষিত ও অভ্যস্ত, হোমিওপ্যাথিক নীতি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা "রোগ" হিসাবে চিকিৎসা করিতে হয়, ইহাই শিক্ষা করিয়াছেন এবং হয়ত তদনুসারে কিছুকাল ধরিয়া চিকিৎসাও করিয়াছেন,—এক্ষণে হোমিওপ্যাথিতে আসিয়া একেবারে "রোগী" হিসাবে চিকিৎসা প্রথাটী বহুদিন পর্য্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করিতেও পারেন না, অথবা তাহা পারিলেও আসল কাজের সময় তাঁহাদের অভ্যাসানুসারে "রোগ" হিসাবেই ঔষধ দিয়া বসেন। বাস্তবিকই ইহা তাঁহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অভিনব পন্থা বলিয়া অনেকদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা বড়ই

গোলোযোগে পড়িতে থাকেন। আবার অনেককেই দেখা যায় যে, তাঁহারা খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথ হইয়াও চিরদিন ধরিয়াই এলোপ্যাথিক ধারানুসারেই "রোগ" চিকিৎসার হিসাবেই ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে থাকেন,—সংশোধন আর সম্ভবই হয় না। তাঁহারা "যেন তেন প্রকারেণ" একটী "নাম" ও খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারিলেও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন না এবং ইহার অমৃতের স্বাদ গ্রহণ করিবার ভাগ্য তাঁহাদের কোনও কালেই জোটে না। আমাদের দেশে লোকের সাধারণতঃ ধারণা এই যে, যাঁহারা এলোপ্যাথিক পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হইয়া হোমিও-প্যাথি চিকিৎসা করেন, তাঁহারাই উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথ,—কিন্তু শতকরা ২।৪ জন ব্যতীত বাকি সকলেই না এলোপ্যাথ, না হোমিওপ্যাথ হিসাবে কোনও একটা নীতি দৃঢ়ভাবে অবলম্বন ও অনুসরণ করিতে অপারক হইয়া নিতান্ত "গোল মেলে" ভাবে চিকিৎসা করিয়া থাকেন। অভ্রান্ত নির্ব্বাচন বা জটীল ক্ষেত্রে আরোগ্য কার্য্য তাঁহাদের নিকট আশা করা সুদূরপরাহত। অভ্যাসের মহীয়বী শক্তি এবং তাহার উপর প্রায়শঃই একটী অহমিকা আসিয়া জোটে এবং হোমিও-নীতিগুলি শিক্ষা করিবার পথে বিষম বিঘ্ন উৎপাদন করে। এলোপ্যাথিক উপাধি-ভূষিত হইলেই যেন একটী দম্ভ ও আত্মাভিমান সর্ব্বদার তরে সহচর হইয়া পড়ে এবং নূতন পথে জ্ঞানার্জ্জন অসম্ভব করিয়া তোলে। আমরা একথা অতি সহজ ও সত্য বলিয়া প্রকাশ করিতেছি, নতুবা কোনও প্রকার দুষ্টভাব-প্রণোদিত হইয়া কহিতেছি না,—কেননা চিকিৎসক মাত্রেই আমাদের স্বজাতি ও আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম। অবশ্যই যেখানেই বিধি, সেখানেই ব্যতিক্রম আছে। কেননা এলোপ্যাথদিগের মধ্যে এখন অনেক মহাত্মাকে আমরা জানি, যাঁহারা হোমিও-মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার পর বরণীয় ও স্মরণীয় হোমিওপ্যাথ হইয়া হোমিওপ্যাথির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং জনকল্যাণের

পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। সকলই **ব্যক্তিত্বের** উপর নির্ভর করে।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় কৃতিত্ব নির্ভর করে, প্রধানতঃ অভ্রান্ত নির্ব্বাচনের উপর। অভ্রান্ত নির্ব্বাচনের উপায় কি? সর্ব্বপ্রথমেই চিন্তা করিতে হইবে যে, "আমি কোনও একটী নামধের "রোগের" জন্য ঔষধ নির্ব্বাচন করিতেছি না, কোনও "রোগের" সহিত আমার কোনও সংস্রব নাই",—মনে প্রাণে জানিতে হইবে যে,—"আমি একটী "রোগীর" জন্য ঔষধ নির্ব্বাচন করিতেছি"। "রোগ" সম্বন্ধে কোনও প্রকার চিন্তা যেন মনোমধ্যে উদয় না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। একটী উদাহরণ ব্যতীত, বিষয়টী পরিষ্কার হইবে না। মনে করুন, ৩টী রোগীর চিকিৎসায় আপনি আহূত হইয়াছেন,—লোকে তাহাদের রোগের নাম হিসাবে আখ্যা দিয়াছে যে, একজনের "রক্তামাশা" হইয়াছে, একজনের "রেমিটেণ্ট জ্বর" ও আর একজনের "দন্তশূল"; এই অবস্থায় যদি আপনি গিয়া চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে রোগের নামে আপনার কোনও প্রয়োজন হইবে না; আপনি তাহাদের ব্যক্তিগত হিসাবে লক্ষণ সমষ্টি সংগ্রহ করিবেন এবং যদি দেখেন যে ঐ ৩টী রোগীরই জিহ্বাতে সরস ক্লেদ বর্ত্তমান, প্রত্যেকেরই অতিশয় প্রচুর এবং দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম এবং প্রত্যেকেই বামদিকে ব্যতীত অন্য পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না—তবে **মার্কসল** নামক একটী ঔষধ ঐ ৩টী রোগীকেই তাহাদের প্রত্যেকের রোগ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিবে,—যদিও রোগের নাম হিসাবে ৩ জনের ৩টী স্বতন্ত্র পীড়া হইয়াছিল। আবার মনে করুন, ৩টী ব্যক্তিরই নিউমোনিয়া নামক পীড়া হইয়াছে এবং আপনি চিকিৎসার্থ আহূত হইলেন। ১ম ব্যক্তির লক্ষণ সংগ্রহ করিয়া দেখিলেন যে, তাহার কোষ্ঠবদ্ধ, দক্ষিণদিকে নিউমোনিয়া হইয়াছে এবং সে ব্যক্তি ঐ দিকেই অর্থাৎ দক্ষিণদিকেই চাপিয়া ব্যতীত

শুইতে পারে না। অতিশয় শিরঃপীড়া পিপাসাও যথেষ্ট, কিন্তু অনেকক্ষণ পরে পরে অনেকখানি করিয়া জলপান করে; ২য় ব্যক্তিরও দক্ষিণদিকেই নিউমোনিয়া, তাহার অতিশয় শ্বাসকষ্ট জন্য নাকের পাখা দুইটী উঠা পড়া করিতেছে, কোষ্ঠবদ্ধ, পেটটীও ফাঁপা ফাঁপা এবং সামান্য কিছু খাইলেই রোগী বলে যে, তাহার পেটটী যেন ভরিয়া উঠে এবং বিকালেই তাহার জ্বর ও সকল কষ্টেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে; ৩য় ব্যক্তির নিউমোনিয়াতে, জ্বরের সঙ্গেই সর্ব্বদাই ঘর্ম্ম হইয়া থাকে, কিন্তু সেই ঘর্ম্মে জ্বর বা অন্যান্য কষ্ট কম হওয়া ত দূরের কথা,—বরং বৃদ্ধি বোধ হয়, রোগী বাম দিকে ব্যতীত শয়ন করিতে অপারক, রাত্রে শয্যার গরম সহ্য করিতে পারে না এবং রাত্রেই সকল কষ্টের বৃদ্ধি, জিহ্বাটী সরস ও ক্লেদাবৃত, ইত্যাদি; এ অবস্থায়, যদিও প্রত্যেকেরই নিউমোনিয়া হইয়াছে, তবুও ঐ লক্ষণ সমষ্টি অনুসারে প্রত্যেককেই বিভিন্ন ঔষধ প্রয়োজন হইবে অর্থাৎ প্রথম রোগীকে **ব্রাইওনিয়া**, দ্বিতীয়কে **লাইকোপোডিয়াম** এবং তৃতীয়কে **মার্ক-সল,** নামক ৩টী পৃথক ঔষধ প্রয়োজন হইবে। অতএব জানিতে হইবে যে, হোমিও-প্যাথিতে "রোগ" হিসাবে ঔষধ নির্ব্বাচন হইতে পারে না,—"রোগী" হিসাবেই করিতে হইবে।

রোগের "নাম" কি প্রকারে দেওয়া হয়, তাহা সকলেই জানেন। কতকগুলি **সাধারণ** লক্ষণের সমষ্টি অনুসারে এক একটি নামকরণ হইয়া থাকে। যদি ভেদ, বমন, নাড়ীক্ষয়, আক্ষেপ ইত্যাদির একত্র সমাবেশ হয়, তবে তাহার নাম "ওলাউঠা" দেওয়া হয়; যদি অতিরিক্ত কুন্থন, ঘন ঘন মলবেগ এবং কুন্থনের সহিত সামান্য সামান্য আম ও রক্ত-স্রাব হয়, তবে তাহার নাম "রক্তামাশা" দেওয়া হয়; যদি শিরঃপীড়া, অঙ্গবেদনা, দেহতাপ, কোষ্ঠবদ্ধ ইত্যাদির একত্র সমাবেশ কোনও রোগীতে দেখা যায়, তবে লোকে তাহার নাম "জ্বর" পীড়া দিয়া থাকে ইত্যাদি

ইত্যাদি। এই ভাবে, কতকগুলি **সাধারণ** লক্ষণ ধরিয়া একটী একটী নামকরণ হইয়া থাকে। কিন্তু রোগের ঐ সাধারণ লক্ষণ লইয়া তাহার ঔষধ নির্ব্বাচন হইতে পারে না। কোনও ব্যক্তির একটী রোগ হইলে, ঐ ব্যক্তির শরীরে বা মনে বিকাশ প্রাপ্ত **বিশেষ** লক্ষণের সাহায্য ব্যতীত ঔষধ নির্ব্বাচন হয় না। দুইটী ব্যক্তিরই রক্তামাশা হইয়াছে, অতি সত্য কথা,—এক্ষণে উহাদিগকে আরোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইলে দেখিতে হইবে, ঐ দুইটী ব্যক্তির মধ্যে প্রত্যেকেরই বিশিষ্টতা কি? উভয়ের মলবেগ ও কুন্থন লক্ষণ একই প্রকারের ও সমানই কষ্টপ্রদ, প্রত্যেকেরই সামান্য আম ও রক্ত নির্গত হইতেছে, কিন্তু **বিশেষত্ব** না পাইলে ত নির্ব্বাচন হইতে পারে না। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, একজনের সর্ব্বদাই শীত শীত ভাব এবং মলবেগ হইবার পর সামান্য কিছু আম ও রক্ত নির্গত হইলেই কিছুক্ষণের জন্য শান্তি হয়, কিন্তু অন্য জনের সর্ব্বদাই গরমভাব এবং ঘর্ম্ম, তৎসঙ্গে মলবেগ হইবার পর আম ও রক্ত স্রাব হইলেও কুন্থনের ও কষ্টের শান্তি নাই,—পায়খানায় বসিয়া বসিয়া কুন্থন দিতেই হইবে,—কোনও শান্তি নাই। এই **বিশেষত্বের** সাহায্যে একজনকে **নাক্সভমিকা** ও অন্যজনকে **মার্কুরিয়াস** প্রয়োগ করিতে হইবে। **সাধারণ** লক্ষণ সমষ্টিতে **নামকরণ** হইতে পারে কিন্তু **বিশেষ** লক্ষণ না থাকিলে ঔষধ **নির্ব্বাচনের** আশা করা যায় না।

কোনও একটী পীড়া, কোন এক ব্যক্তিকে আক্রমণ করিলে, ঐ পীড়াটীর উপর ঠিক যেন ঐ ব্যক্তির **ব্যক্তিত্বের** একটী ছাপ পড়ে। ঐ ব্যক্তির **বিশেষত্বটী** ঐ রোগের অন্যান্য লক্ষণের সঙ্গে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে, ঐ **বিশেষত্বটীই** ঔষধ নির্ব্বাচনের একমাত্র সাহায্য স্থল। **বিশেষত্ব না থাকিলে** ঔষধ নির্ব্বাচন হইতে পারে

না। এজন্য কর্কট পীড়া (Cancer) অসাধ্য, যেহেতু এই পীড়ায় কেবল কতকগুলি যন্ত্রণাদায়ক **সাধারণ লক্ষণ** মাত্র দেখা দেয়,—**বিশেষ** লক্ষণ আদৌ বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং ঔষধ নির্ব্বাচন সম্ভব হয় না। অন্যান্য পীড়া ক্ষেত্রেও, যদি **রোগীর ব্যক্তিত্ব বা বিশেষত্ব প্রকাশ না পায়,** তবে তাহা "অসাধ্য" মধ্যেই পরিগণিত হয়। বিশেষত্ব না পাইলে, কখনই রোগী আরোগ্য হইতে পারে না।

ঔষধের শক্তি নির্ব্বাচন।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, কোনও একটী রোগীর ক্ষেত্রে, নির্ব্বাচন করিবার যেরূপ প্রণালী বা তত্ত্ব আছে, উহা কোন্ **শক্তিতে** প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহাও একটী প্রণালী বা তত্ত্বানুসারে স্থির করিতে হয়,—উহা যে নিজের নিজের খেয়াল বা ইচ্ছানুসারে প্রয়োগ করিলেই হইল, একথা যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা খুবই ভ্রান্ত। সমতত্ত্ব উভয়ের মধ্যেই রক্ষিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। রোগীর লক্ষণ সমষ্টির সহিত নির্ব্বাচিত ঔষধের যেরূপ সম-লক্ষণতত্ত্ব আবশ্যক, ঠিক সেই প্রাকারেই উহার শক্তি সম্বন্ধেও বিশেষ প্রণিধান ও বিচার প্রয়োজনীয়, এবং রোগীর পীড়াস্তরের সহিত ঔষধের শক্তির সামঞ্জস্য থাকা চাই, নতুবা যতই সুনির্ব্বাচিত হউক না কেন, ঔষধের পূর্ণ ফল প্রাপ্তির কোনও আশা করিতে পারা যায় না। ব্যাপারটী একটু পরিষ্কার করিয়া আলোচনা করিতে হইবে, নতুবা ইহা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে না। হোমিওপ্যাথির যাবতীয় বিষয়,—সকলই

অতি সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং ইহার প্রত্যেক অংশেই বিশেষ মনোযোগ, সুস্থির চিন্তন এবং গভীর গবেষণা অত্যাবশ্যক।

মানব শরীরের পীড়া হইলে, উহা যে একটী মাত্র **স্তরেই** বিকাশ পাইবে এমন কোনও কথা নাই। **স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ স্তর** ভেদে, নানা পীড়ার নামকরণ হইয়া থাকে এবং নানা লক্ষণেরও আবির্ভাব হইয়া থাকে। যদি প্রত্যেক পীড়া একই স্তরে প্রকাশ পাইত, তাহা হইলে, ঔষধের এত বিভিন্ন শক্তির প্রয়োজন হইত না,—কিন্তু তাহা নয়। আরও এক কথা, প্রত্যেক পীড়ার ভোগকালও সমান নয়,—কোনও এক ব্যক্তির কোনও একটী পীড়া হয়ত গত দুই মাস পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছে, আবার কাহারও বা বাল্যকাল হইতে আরম্ভ হইয়া অদ্যতক ভোগ হইতেছে, আবার কাহারও বংশপরম্পরা হইতে প্রাপ্ত দোষ হইতে পীড়া বরাবর চলিয়া আসিতেছে। এই বিভিন্নতার উপর শক্তির তারতম্য অনেক নির্ভর করে। আরও একটী বিষয় এই যে, কোনও রোগীর শরীর বাহ্যতঃ বেশ বলিষ্ঠ, আবার অন্য আর এক ব্যক্তির শরীর নিতান্ত জীর্ণ ও শীর্ণ,—এ অবস্থায় উভয়েরই একই প্রকার পীড়া লক্ষণ উপস্থিত হইলেও নির্ব্বাচিত ঔষধের শক্তির তারতম্য অবশ্যই আবশ্যক। রোগী-দিগের বয়সের তারতম্যে এবং সহিষ্ণুতার তারতম্যে শক্তির তারতম্য হইয়া থাকে। সুতরাং একই পীড়া অর্থাৎ একই নামের পীড়া হইলেও অনেক দিকে অনেক চিন্তা করিয়া শক্তি নির্ব্বাচন করিতে হয়। তাহার পর, তরুণ ও পুরাতন পীড়া ভেদেও শক্তিভেদ হইয়া থাকে। সুতরাং ঔষধের শক্তি নির্ব্বাচন, অতি গূঢ় ব্যাপার,—হঠকারী ব্যক্তির দ্বারা শক্তি নির্ব্বাচন হইবার আশা নাই। যেহেতু এ বিষয়ে বহু চিন্তা ও গবেষণা আবশ্যক। বিশদভাবে আলোচনা করিতে হইলে, উপরোক্ত এক একটী বিভাগ লইয়া আলোচনা আবশ্যক। এজন্য সর্ব্বাদৌ ঐ ঐ বিভাগ বা

দফাগুলি সর্ব্বাগ্রে লিখিত হইতেছে। তাহার পর এক একটী দফা লইয়া বিস্তারিত বিচার করিলেই ব্যাপারটী সুবোধ্য হইবার আশা করা যায়।

যে যে বিষয়ের উপর শক্তি নির্ব্বাচন নির্ভর করে, সেগুলি এই (১) স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ হিসাবে পীড়া বিকাশের স্তর বা ভূমি। (২) প্রাপ্ত বা অর্জ্জিত হিসাবে বিভিন্নতা। (৩) রোগীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা। (৪) বয়স ও সহিষ্ণুতা হিসাবে তারতম্য। (৫) তরুণ ও পুরাতন পীড়া হিসাবে প্রভেদ। (৬) আরোগ্যের সাধ্যসীমার বহির্ভূত রোগীর ক্ষেত্র। সর্ব্বশেষ, (৭) রোগীর উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া তদনুসারে শক্তি প্রয়োগ। এক্ষণে একে একে ইহাদের বিচার ও আলোচনা আবশ্যক।

(১) পীড়া বিকাশের **স্তর বা ভূমি** হিসাবে ঔষধের শক্তি নির্ণয় করিতে হইবে। মনুষ্যের পীড়া সকল কখনও একস্তরে বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। সাধারণতঃ তিনটী স্তরে মনুষ্য অবস্থিত; অবশ্য আরও একটী অতিমাত্র সূক্ষ্মস্তর আছে, তাহার নাম, মহাকারণ, কিন্তু সে স্তরে "অহং" তত্ত্বের লয় হওয়ায় মনুষ্যের রোগ, শোক, সন্তাপ ক্লেশ বা পীড়াদি অবস্থা বিকাশ পাইতে পারে না, কেননা সে স্তরে "আমি" বলিয়া কোনও জিনিসের অনুভূতি থাকে না,—জলের বিন্দু জলেই লয় হয়," অথবা, —সিন্ধুতে বিন্দুর লয় হইয়া যায় সুতরাং কে আর অনুভব করিবে? যাহা হউক, কেবল ৩টী স্তরে **উপলব্ধি** বর্ত্তমান থাকে এবং ৩টী স্তরেই পীড়াদি বিকাশ পাইয়া থাকে। যে তিনটি স্তরে পীড়া সকল প্রকাশ পায়, তাহাদের নাম, যথাক্রমে, **স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ।** **স্থূল বা বাহ্যস্তরে** যে সকল পীড়ার বিকাশ হয়, সেগুলি অতি সাধারণ পীড়া, যথা উদরাময়, চর্ম্মপীড়া, মূত্রপীড়া, বক্ষোযন্ত্রের পীড়া, ইত্যাদি; **সূক্ষ্মস্তরের** পীড়া সকল মানসিক, অর্থাৎ মানসিক বৈকল্য, মনের অসুস্থতা,—অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি

অনুভূতি এবং ইচ্ছাবৃত্তি সম্পর্কীয় বিশৃঙ্খলা সকল সূক্ষ্মস্তরের অন্তর্গত; **কারণস্তরের** পীড়া সকল সাধারণতঃ লোক-লোচনের অন্তরালেই থাকে, দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে যে সকল ব্যক্তির অতি সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি থাকে, তাঁহারা অন্যের মধ্যে কারণস্তরের অন্তর্গত পীড়া বা বিশৃঙ্খলা অবলোকন করিতে পারেন, সাধারণ জনগণের সে ক্ষমতা না থাকায় কারণস্তরের পীড়া সকল দৃষ্টির বহির্ভূত থাকে। কারণস্তরের পীড়া প্রকৃত প্রস্তাবে পীড়া বলিয়া পরিচিত নয়, সেগুলি বরং মানসিক ও শারীরিক পীড়া সকলের কারণ, এবং এজন্যই ঐ স্তরটীর নাম কারণস্তর। কারণস্তরের মধ্যে মনুষ্যের **স্বভাব বা প্রকৃতি** সঞ্চিত থাকে এবং সেইগুলিই মনে ও শরীরে প্রতিফলিত ও প্রতিবিম্বিত হইয়া মানসিক ও শারীরিক ব্যাধিরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হয়। মনুষ্যের প্রত্যেক বিষয়ের, প্রত্যেক কার্য্যের, চিন্তাদির প্রেরণা বা উৎস ঐ কারণস্তর হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা হউক, স্থূলরাজ্যের অপেক্ষা, সূক্ষ্মরাজ্যের, আবার সূক্ষ্মরাজ্য অপেক্ষা কারণরাজ্যের পীড়া অথবা বিশৃঙ্খলা অধিক ও অধিকতর সূক্ষ্ম,—সুতরাং ঔষধ শক্তিও তদনুসারে নির্ব্বাচন করিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। একটী নিউমোনিয়ার রোগীকে আরোগ্য করিবার প্রয়োজন হইলে, মার্ক-সল বা ব্রাইওনিয়া বা ফস্ফরাস, অথবা যে কোনও ঔষধ সমলক্ষণসূত্রে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, সেই ঔষধের ৬ বা ১২ বা ৩০, ঊর্দ্ধসংখ্যায় ২০০ শক্তি হইলেই যথেষ্ট হয়; পরন্তু **সূক্ষ্মস্তরের** কোনও ব্যাধি, যথা, মনের অস্বাভাবিক ভীতি, মানসিক চাঞ্চল্য, অস্থিরতা, বিষণ্ণতা, ইত্যাদি, ২০০ শক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া ১০০০, ১০,০০০, বা ঊর্দ্ধসংখ্যায় ৫০,০০০ পর্য্যন্ত শক্তিই যথেষ্ট হয়; ফলতঃ মনুষ্যের **প্রকৃতির** পরিবর্ত্তন ঘটাইতে হইলে অর্থাৎ তাহার কারণস্তরের বিশৃঙ্খলা দূর করিবার আশা করিলে, ৫০,০০০ শক্তিও অতি নিম্ন শক্তি বলিয়া মনে হয় এবং লক্ষ ও লক্ষাধিক

শক্তি নিত্যই প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, যে বিষয়টীর পরিবর্ত্তন করা উদ্দেশ্য হইবে, সেটী যত উচ্চস্তরের, সেটীর সূক্ষ্মতা যত বেশী, ঔষধের শক্তিও সেই পরিমাণে উচ্চবর্গের হওয়া আবশ্যক। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণস্তরের পীড়াদি বিষয়ের অনেক আলোচনা আবশ্যক, ফলতঃ এই প্রসঙ্গে সে সকল বিষয়ের আবশ্যকতা নাই। কেবলমাত্র শক্তি নির্ব্বাচনের জন্য যতটুকু আবশ্যক, তাহাই এখানে লিখিত হইল।

(২) দোষগুলি নিজ নিজ জীবনে অর্জ্জিত বা পূর্ব্ব-পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত, এই দুয়ের মধ্যে বিভিন্নতাটী কি, তাহা সর্ব্বাগ্রে সামান্যতঃ না জানিলে এ সম্পর্কে শক্তি নির্ব্বাচন-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবার আশা করা যায় না। সোরা দোষটী আর অর্জ্জিত অবস্থায় নাই, উহা আজ কালকার লোকের প্রত্যেকেরই শরীরে পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত হিসাবে অন্তর্নিহিত আছে। অন্য দুইটী, অর্থাৎ সাইকোসিস্ ও সিফিলিস্, যদি নিজ জীবনে অর্জ্জিত হয় এবং ঐ ঐ দোষের, **দোষভাবে** পরিণতি লাভ করিবার পূর্ব্বে, প্রাথমিক পীড়ায়, অর্থাৎ দূষিত গণোরিয়া ও সিফিলিস বা উপদংশ নামক **পীড়ায়** প্রাথমিক-রূপ যথা স্রাব ও ক্ষতাদি বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ যদি এখনও তাহারা **পীড়াভাবেই** থাকে, **দোষে** পরিণত না হয়, এখনও চাপা দিবার মত কোনও প্রকার প্রতিকার অবলম্বিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে, নিম্ন বা মধ্য শক্তির ঔষধের দ্বারাই উদ্দেশ্য সাধিত হয়, কচিৎ সহস্র শক্তির আবশ্যক হইতেও পারে, তবে প্রায়শঃই ৬, ৩০, ২০০ শক্তিই যথেষ্ট হয়।

ফলতঃ যেখানে দোষগুলি বহুদিন হইতে শরীরে স্থায়ীভাবে আবাস নির্দ্দেশ করিয়াছে, অর্থাৎ অর্জ্জিত হইলেও চাপা দিবার চিকিৎসা প্রভাবে দোষে পরিণত হইয়া দীর্ঘদিন অবস্থিত করিতেছে, প্রাথমিক স্রাব বা ক্ষত আদৌ নাই, দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্য্যায়ের (Secondary or Tertiary) লক্ষণগুলি দেখা দিয়াছে, সেখানে ১০০০ শক্তি নিম্ন শক্তি বলিয়া জানিতে

হইবে। এ ক্ষেত্রে দোষসমূহের স্থায়ীকাল (Chronicity) চিন্তা করিয়া তদনুসারে শক্তি নির্ব্বাচন করিতে হয়। যে ব্যক্তির ২০।২১ বৎসর বয়সে গণোরিয়াটী সাইকোসিসে পরিণত হইয়াছে, এক্ষণে হয়ত তাহার বয়স ৪০ বৎসর, সে ক্ষেত্রে ১০০০ শক্তির কম প্রয়োগ করিলে আদৌ কোনও ঝঙ্কারই উৎপাদিত হইবে না, এবং আরোগ্য হওয়া পর্য্যন্ত অন্ততঃ ৫০,০০০ শক্তির আবশ্যক হইবে। পরন্তু ঐ ব্যক্তির বয়স যদি ৩০ বৎসরের কম হয়, তবে হয়ত ১০০০ হইতে ১০,০০০ পর্য্যন্তই যথেষ্ট হয়। আবার যদি ৬০ বৎসর বয়সে তাহার চিকিৎসা অবলম্বিত হয়, তবে ১০,০০০ শক্তি লইয়া আরম্ভ করিতে হয়, ফলতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ম্মল আরোগ্যের আশা নাই বলিয়া এই বৃদ্ধ রোগীকে বিদায় দিতে হয়,—কেননা এত উচ্চ শক্তি সহ্য করিবার সামর্থ্য এই বয়সে প্রায়ই থাকে না।

যেখানে দোষগুলি প্রাপ্ত, সেখানে উহাদের স্থায়ীকাল অনেক অধিক, সুতরাং ১০০০ শক্তি হইতে উচ্চতম শক্তির আবশ্যক হইবে, ইহার বিচিত্রতা কি? এরূপ ক্ষেত্রে ২০০ বা ৫০০ শক্তি দেওয়া সম্পূর্ণ নিরর্থক, তবে নিতান্ত দুর্ব্বল রোগীর ক্ষেত্রে ঐ সকল নিম্নতর শক্তি লইয়া আরম্ভ করিতে হয়, এবং ক্রমে ক্রমে সহ্য করিবার শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঔষধের শক্তিও বৃদ্ধি করিতে হয়। এ সকল রোগীর আরোগ্যকল্পে ঔষধের শক্তি যেমন উচ্চতম পর্য্যন্ত প্রয়োজন হয়, চিকিৎসার সময়ও তেমনই দুই তিন বৎসর হইতে ছয় সাত বৎসর পর্য্যন্ত আবশ্যক হইয়া থাকে। যাহারা অতি শীঘ্র ফলের আশা করিবে, এ শ্রেণীর রোগী হইলে তাহাদিগকে কোনও আশা দিতে পারা যায় না, এবং তাহাদের চিকিৎসা ভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে মুক্তকণ্ঠে এ কথা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। যদি নিতান্তই তাহারা ধৈর্য্যধারণে অস্বীকার করে, তবে আমরা যে একান্তই অপারক এ কথা বুঝাইয়া দিয়া বিদায় করাই সঙ্গত ও সম্মানার্হ।

(৩) **শারীরিক ও মানসিক অবস্থার** উপর শক্তি নির্ব্বাচন বিশেষভাবে নির্ভর করে। প্রাচীন পীড়ায় রোগী চিকিৎসাকালে অতিশয় দুর্ব্বল ও অসহিষ্ণু রোগীদিগকে লইয়া সঙ্ঘোব্রতী চিকিৎসক ভ্রাতাদিগের অনেক সময় বড়ই বিপন্নাবস্থায় পড়িতে দেখিয়াছি। যে সকল রোগী যত দুর্ব্বল ও অসহিষ্ণু, তাহাদের রোগলক্ষণ সকলও অতিশয় তীব্র কষ্টদায়ক হইয়া থাকে, এবং তাহাদিগকে দ্রুত আরোগ্য করিবার আশা করিতে গিয়া এই বিপদকে আলিঙ্গন করা হয়। এবিষয়ে সাবধানতা একান্ত প্রয়োজনীয়। আমি একটী অতিশয় অসহিষ্ণু রোগীর ৩০ শক্তির প্রয়োগফলে ভীষণ বৃদ্ধি হইতে দেখিয়াছি। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল সেন মহাশয় একটী মাড়োয়ারী বালকের একজিমার ক্ষেত্রে ২০০ শক্তির মেজেরিয়াম প্রয়োগ করায় প্রায় ৬ মাস দারুণ বৃদ্ধি উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি। সুতরাং ৩০ শক্তির উর্দ্ধে এসকল ক্ষেত্রে কখনও আরম্ভ করিতে নাই, তাহার পর ফলাফল বিচার করিয়া চলিতে হয়। এদিকে আবার রোগী সকলদিকেই অসহিষ্ণুতা দেখাইয়া থাকে,—অতি অল্পসময়ের মধ্যেই তাহারা আরোগ্য চাহিয়া বসে, নতুবা "হোমিওপ্যাথি কিছুই নয়,"—একথা বলিবে ও প্রচার করিয়া বেড়াইবে। ফলতঃ তাহাদের নিকট "হোমিওপ্যাথির সম্মান" বজায় বা বৃদ্ধি করিতে যাইবার কখনও ইচ্ছা করিতেই নাই,—একথা মনে রাখিতে হইবে।

(৪) রোগীর বয়স এবং সহিষ্ণুতা হিসাবে শক্তি নির্ণয় অত্যাবশ্যক। বয়সের অত্যন্ত আধিক্য এবং নানাপ্রকার দোষের অবস্থিতি হেতু শরীরের সহিষ্ণুতা কমিয়া যায়। একজন ৭০।৭৫ বৎসর বয়সের বৃদ্ধকে উচ্চতর শক্তি প্রদানের ব্যবস্থা না করাই ভাল, এবং এই প্রকার বয়সের রোগীর যে কোনও দোষজাত পুরাতন পীড়া নির্ম্মূল করিবার আশা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই করিতে পারা যায় না, কেবল "জোড়াতালি" দিয়া রাখাই কর্ত্তব্য। ঐ প্রকার

বৃদ্ধের হৃৎস্পন্দন পীড়া নির্দ্দোষ আরোগ্য করিতে গিয়া আমাদের মধ্যে একজন কৃতবিদ্য চিকিৎসক কিরূপ বিপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা আমি কখনও ভুলিব না। চিকিৎসক মহাশয়ের কোনও দোষ ছিল না,—তিনি রোগীলিপি যথারীতি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, নির্ব্বাচনও অতি সুন্দর করিয়াছিলেন, কেবল শক্তি নির্ব্বাচন করিবার সময় রোগীর বয়সের বিষয়, অর্থাৎ বয়সের আধিক্য হেতু "উচ্চতর শক্তি সহ্য করিবার মত শক্তির অভাব" এটী সম্যক্ চিন্তা না করিয়া একেবারে ১০ এম শক্তি প্রয়োগ করেন, তাঁহার ফলে, হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি দেখা দিয়া বৃদ্ধের জীবন "যায় যায়" হইলে, আমি আহুত হই এবং ঔষধটীকে প্রতিষেধ করিতে বাধ্য হই। অতএব উচ্চতর শক্তি সহ্য করিবার মত অবস্থা আছে কিনা, তাহা না দেখিয়া উহা প্রয়োগ করা কখনও সঙ্গত নয়। একদিকে বয়সের আধিক্য, অন্যদিকে যে কোনও বয়সের রোগীতে সোরাদি দোষের অবস্থিতি হেতু শরীরের দৌর্ব্বল্য, এই দুই ক্ষেত্রেই সহিষ্ণুতার অভাব হইতে পারে, ইহা পূর্ব্ব হইতেই ধরিয়া লইতে হইবে। অবশ্য ২।১টী ক্ষেত্রে যে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া না যায় তাহা বলি না, ফলতঃ যাহা সাধারণ নিয়ম, তাহাই লিখিত হইল। বালকদিগের মধ্যে যথেষ্ট উচ্চশক্তির ঔষধ সহ্য করিবার ক্ষমতা থাকে। যদিও কোনও কোনও বালক বা কিশোরের শরীরে নানাপ্রকার প্রাপ্ত-দোষ থাকে, তাহা হইলেও ঐ ঐ দোষ তখনও বীজাকারে থাকায়, শরীরের অবস্থা তত খারাপ করিতে পারে নাই, সুতরাং তখনও সহিষ্ণুতার হ্রাস হয় নাই।

(৫) তরুণ ও পুরাতন পীড়া হিসাবে, শক্তি প্রয়োগের যথেষ্ট তারতম্য করিতেই হয়। কোনও একটী তরুণ ব্রন্‌কাইটিস্ পীড়ার রোগীতে এন্টিম-টার্ট বা লাইকোপোডিয়াম্—৩০ বা ২০০ শক্তির হইলেই যথেষ্ট হয় এবং তাহাতেই তাহার আরোগ্য কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়, কিন্তু পুরাতন ব্রন্‌কাইটিস্ রোগীকে সর্ব্বপ্রথমে ১০০০ শক্তি দিয়াও অনেক সময় হিত পরিবর্ত্তন আশা

করা যায় না। এইত গেল **পীড়ার** নূতন ও পুরাতন অবস্থার কথা— আবার তরুণ পীড়ার **রোগী** এবং পুরাতন পীড়ার **রোগী** হিসাবে দেখিলে তরুণ পীড়ার রোগীতে কেবলই সোরার তরুণ উচ্ছ্বাসটীর প্রতিকার করিতে ৬।১২।৩০।২০০ শক্তির অধিক আবশ্যক হয় না, কিন্তু পুরাতন বা প্রাচীন পীড়ার রোগীতে প্রথমেই ১,০০০ শক্তি বা ১০,০০০ শক্তি ব্যতীত দোষগুলির মধ্যে গ্রন্থি খুলিয়া রোগীদেহে ঔষধের প্রথম ঝঙ্কারটীও উৎপাদন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। আমার স্মরণ আছে, পাটনা সহরের একটী হাঁপানি রোগীর প্রথম নির্ব্বাচনেই ১০এম প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল,—তাঁহাকে প্রথম ১০০০, পরে ৫এম দিয়া কোনও ফলই পাওয়া যায় নাই; এমন কি, যে চিকিৎসক আমায় লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি ইহা দেখিয়া আমাদের ঔষধ নির্ব্বাচনে ভুল থাকিতে পারে বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করেন; পরন্তু নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আমার নিজের কোনও দ্বিধা না থাকায় আমি ১০এম প্রয়োগের পরামর্শ দিই এবং আশ্চর্য্য কথা, উহার পরেই যে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাতেই প্রায় ৬ মাস ধরিয়া উন্নতি চলিতেছিল। অতএব বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, রোগী শরীরে বিশৃঙ্খলাটী **যতদিন ধরিয়া** অবস্থিতি করে, উহার গভীরতা এবং বিস্তৃতি যেন ততই অধিক হয় এবং সেই অনুপাতে শক্তির তারতম্য করিতে হয়।

(৬) অতঃপর যেখানে রোগীর পীড়া সাধ্যসীমা অতিক্রম করিয়াছে, সেখানে কি প্রকার শক্তি নির্ব্বাচন করিতে হয়, তাহাই পরিচিন্তনীয়।

এস্থলে পূর্ব্বাহ্নেই একটী বিষয় নিবেদন করিতেছি। পূর্ব্বোক্ত এক একটী দফার বিষয় পূর্ণমাত্রায় বিশ্লেষণ করিবার ইচ্ছা করিলে অর্থাৎ উদাহরণাদির দ্বারা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে হইলে এক একখানি গ্রন্থ লিখিতে হয়, কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থের কলেবর অতিশয় ক্ষুদ্র হওয়াই অভিপ্রেত

বলিয়া খুবই সংযতভাবে লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছি। তাহা হইলেও ৬ষ্ঠ দফার অবস্থা কেন আসে অর্থাৎ রোগীর পীড়াটী সাধ্যসীমা অতিক্রম কেন করে, একথা সামান্যতঃ আলোচনা করা যেন আবশ্যক হইয়া পড়িতেছে। ফলতঃ বিষয়টী অতিশয় গভীর, এজন্য অন্যত্র এ বিষয় পৃথকভাবে আলোচিত হইয়াছে (৩য় অধ্যায় অসাধ্য পীড়া দ্রষ্টব্য)। এখানে অতি ক্ষুদ্র আভাষমাত্র দেওয়া হইল।

"রোগীর অবস্থা আরোগ্যের সাধ্যসীমা অতিক্রম করিয়াছে"—একথাটী বলা যত সহজ, ফলতঃ রোগীর ক্ষেত্রে ইহা নিরূপণ করা তত সহজ নয়। যে কোনও পীড়া কঠিন হইলেই বা রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইলেই যে "সাধ্যসীমার বহির্ভূত", একথা বলা যায় না; কেননা, অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হইবার পরেও ঔষধ প্রয়োগে রোগীর প্রাণপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে, ইহা অনেক ক্ষেত্রেই শোনা যায় ও সকলেই শুনিয়া থাকেন। তবে কি দেখিয়া বলা যাইবে যে, রোগীর অবস্থাটী সাধ্যসীমা অতিক্রম করিয়াছে? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, যেখানে রোগের **ফলমাত্র** অবশিষ্ট আছে, রোগের চিত্র অর্থাৎ **লক্ষণ-সমষ্টির** একান্ত অভাব, সেখানেই জানিতে হইবে যে, রোগী "অসাধ্য" হইয়া উঠিয়াছে। কেন এ প্রকার হয়? ইহার উত্তরে জানিতে হইবে যে, রোগীর বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত কেবল **"চাপা দিবার"** ব্যবস্থাই হইয়াছে, **প্রকৃত আরোগ্যের** কোনও চেষ্টাই করা হয় নাই। এই পর্য্যন্তই জানিয়া রাখা ভাল, ইহার অধিক বিশ্লেষণ করিতে হইলে এ বিষয়টী সুদীর্ঘ কলেবর হইবে, সুতরাং এ বিষয়ের ব্যাখ্যা সংক্ষেপে হওয়াই সমীচীন।

যেখানে রোগীর ঐ প্রকার অবস্থা, সেখানে আপনার উদ্দেশ্য কি? আপনার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র যাহাতে রোগীর মৃত্যুটী যন্ত্রণাশূন্য হইতে

পারে। রোগীকে আরোগ্য করিবার আশা নাই, তবে কোন দিন হয়ত আহার্য্য পদার্থ গলাধঃকরণে বড়ই কষ্ট হইতেছে, কোনও দিন হয়ত আদৌ নিদ্রা হইতেছে না, কোনও দিন হয়ত ৪।৫।৬ বার তরল মলভেদ হইল, অথবা কোনও সময় হয়ত ৪।৫ দিন ধরিয়া অতিশয় কোষ্ঠ-বদ্ধ হইল—এই প্রকার ছোট-খাট অসুবিধাগুলি দূর করিয়া দিলে রোগী এ অবস্থাতেও অনেকটা শান্তি পাইতে পারে। সুতরাং কোনও কারণেই ৩।৬ শক্তির অধিক প্রয়োজন হয় না এবং প্রয়োগ করাও সঙ্গত নয়। কেননা উচ্চতর শক্তির ঔষধ প্রয়োগ হইলেই উহা আরোগ্যের জন্যই চেষ্টা করিবে এবং সেজন্য ভিতর হইতে বাহিরের দিকে একটা গতি প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্তর্নিহিত দোষগুলি বাহিরে আনিবার চেষ্টা করিবে। ফলতঃ ইহা সম্ভব নয়, কেননা রোগীর সমলক্ষণে ঔষধটী প্রযুক্ত হয় নাই, সুতরাং রোগীর দেহে অনর্থক একটা অশান্তি বা অস্বচ্ছন্দতার সৃষ্টি করিবে, আসলে কোন উপকার হইবে না, হইতে পারে না। অতএব তাহা না করিয়া, কেবলমাত্র এখানে একটু জোড়া, ওখানে একটু তালি, আরও একস্থানে একটু সেলাই—এইভাবে, কোনও প্রকারে রোগীকে মৃত্যুর দ্বার পর্য্যন্ত আস্তে আস্তে পৌঁছাইয়া দিতে হয় এবং **যতদূর সাধ্য** তাহাকে আরামে বা শান্তিতে রাখা চাই। এখানে অনর্থক বৃদ্ধি লক্ষণ আনিয়া লাভ কি? অনর্থক রোগীর কষ্ট বৃদ্ধি করিয়া কি হইবে?—এই প্রকার চিন্তা আপনার মনোমধ্যে আসা উচিত এবং অতি নিম্ন শক্তি-সকল প্রয়োগ করা বিধেয়।

(৭) সর্ব্বশেষে, "রোগীর **উদ্দেশ্য** লক্ষ্য করিয়া শক্তি নির্ব্বাচন করিতে হইবে",—একথাটী হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। আপনি মনে করিবেন না যে, যত রোগী আপনার নিকট চিকিৎসার্থ আসে, তাহারা সকলেই নির্ম্মল আরোগ্য কামনা করে। উহাদের মধ্যে অনেকেই

তাহার বর্ত্তমান কষ্টটীর উপশম মাত্র আকাঙ্ক্ষা করে। রোগীর অনেক দিন হইতে হয়ত সিফিলিস, গণোরিয়া বিষ শরীরে অন্তর্নিহিত আছে, অনেক প্রকার ইন্‌জেকসনাদির সাহায্যে পীড়াগুলিকে অন্তর্ম্মুখ করিয়া রাখিয়াছে, ফলতঃ সাময়িক কোনও প্রকার উত্তেজক কারণ উপস্থিত হইয়া রোগীর মূত্রত্যাগ বিষয়ে ভয়ানক কষ্ট হইতেছে, অথবা আমাজীর্ণ দেখা দিয়া বড় কষ্ট দিতেছে, অথবা রতিশক্তির একান্ত দৌর্ব্বল্য আনয়ন করিয়াছে। আপনি রীতিমত হ্যানিমানিয়ান্ প্রথায় তাহার লক্ষণলিপি প্রস্তুত করিয়া ঔষধ প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত হইয়া যদি জিজ্ঞাসা করেন—"আপনি কি চান্? আপনি কি নির্ম্মূল ভাবে ব্যাধিমুক্ত হইতে চান?" দেখিবেন, অনেক ক্ষেত্রেই রোগী কহিবে, "না, মহাশয়, অন্য কোনও রোগ আমার নাই, সে সকল আমি অনেক অর্থব্যয় করিয়া সারাইয়াছি, কেবল বর্ত্তমানে আমার প্রস্রাবের কষ্টটী উপশম করিয়া দিন," অথবা, "কেবল যাহাতে আমার রতিশক্তির একটু বৃদ্ধি হয়, তাহাই করুন," ইত্যাদি। এক্ষেত্রে যদি আপনি তাহাকে "যোড়ে ছাইব" এই আশা করিয়া উচ্চশক্তির ঔষধ সমলক্ষণে প্রয়োগ করেন, তবে ভয়ানক অনিষ্ট করা হইবে। কেননা উচ্চশক্তির ক্রিয়ায় অবশ্যই তাহার লুপ্ত লক্ষণ বা পীড়া লক্ষণ পুনঃ প্রকাশ হইবে, তখন সে ব্যক্তি আপনাকে গালি দিবে, যেহেতু জোর করিয়া তাঁহারও উপকার করিবার অধিকার আপনার নাই। এ প্রকার ক্ষেত্রে আপনার কর্ত্তব্য এই যে, আপনি সর্ব্বপ্রথম তাহাকে বুঝাইয়া দিবেন—"দেখ, বাবা, তোমার কেবল স্থানীয় লক্ষণের প্রতিকার করিলে, অনিষ্টই হইবে, কেননা কোনও গাছের ডগকাটি করিলে গাছটী আরও বাড়ে, সুতরাং তোমার পীড়া-বৃক্ষের একটী শাখা নষ্ট করিলে পীড়াবৃক্ষটী আরও বলবান হইয়া উঠিবে, সুতরাং নির্ম্মূল আরোগ্যই অভিপ্রেত। তবে তাহাতে প্রথম ৪।৬ মাস তোমার কষ্ট হইবে, কেননা ভিতরের লক্ষণগুলি যাহা তুমি বহুব্যয় করিয়া কেবলমাত্র

চাপা দিয়াছ তাহারা বাহির হইবে এবং তাহার পর আরোগ্য হইবে। এক্ষণে, তোমার যাহা অভিপ্রায়, তাহাই প্রকাশ করিয়া বল, আমি তাহাই করিব", ইত্যাদি। ইহার পর, তাহার অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করিতে হইবে, এ কথায় কোনও ব্যত্যয় নাই। রোগী যে ভাবের আরোগ্য চাহিবে, আপনি তদনুসারে শক্তি নির্ব্বাচন করিবেন। এস্থলে, ঔষধ নির্ব্বাচন বিধানও পৃথক হইবে, কেবলই যে শক্তি নির্ব্বাচনই পৃথক হইবে, তাহা নয়। কেননা রোগী যদি বর্ত্তমান কষ্টেরই উপশম চায়, তবে স্থানীয় লক্ষণ হিসাবে তরুণ জাতির ঔষধ নিম্নতর শক্তিতে প্রয়োগ করিতে হইবে, আর যদি প্রকৃত আরোগ্য প্রার্থনা করে, তবে পূর্ণভাবে মানসিক, সার্ব্বদৈহিক ইত্যাদি লক্ষণসমষ্টি চিন্তা করিয়া তাহার ব্যক্তিগত অর্থাৎ রোগী হিসাবে ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চশক্তিতে প্রয়োগ করিয়া ক্রমেই উচ্চতর শক্তিতে উঠিতে হইবে,—ইহাই নীতি।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ভ্রাতৃমণ্ডলী, উপরোক্ত আলোচনা পাঠ করিয়া যদি আপনাদের সঙ্গত বলিয়া মনে হয়, তবে আমাদিগকে শক্তি নির্ব্বাচন করিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত নীতিগুলি চিন্তা করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। আমি কোনও কথাই স্বকপোলকল্পিত হিসাবে লিখিতেছি না। সুদীর্ঘকাল তপস্যার ফলে যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহাই সংক্ষেপে লিখিলাম। যদি উহাদের মধ্যে কোনও দফার বর্ণিত তত্ত্ব আপনাদের হৃদয় স্পর্শ না করে, তাহা নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিতে আমি কখনও অনুরোধ করিতেছি না, আপনারা নিজ নিজ রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহারিকভাবে পরীক্ষা করিয়া, উহার সত্যতার প্রমাণ পাইলে তবে গ্রহণ করিবেন। কেননা, হোমিওপ্যাথিতে ব্যক্তিবিশেষের সম্মান নাই, সত্যেরই সম্মান। কেবল আমি লিখিয়াছি বলিয়া, কোনও মতামত গ্রহণ করিবার পরামর্শ তো দিবই না, অধিকন্তু বিনা বিচারে আপনারা গ্রহণ করিলে দুঃখিতই হইব।

প্রত্যেক বিষয়েরই কতকগুলি করিয়া নীতি আছে, তবে হয়ত এ পর্য্যন্ত কোনও নীতিটী আমাদের হৃদয়ে যথারীতি স্ফুরিত হয় নাই, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু সত্যের এমনই মহিমা, সত্যের এমনই প্রভাব যে, তাহা পাঠ করিবামাত্রই প্রত্যেকেরই হৃদয় স্পর্শ করিবেই করিবে। কেন তাহা করে? কেন করে, তাহার কারণ এই যে, প্রত্যেকের হৃদয়ে সত্যের সত্য আত্মদেব বাস করেন,—হৃদয় স্পর্শ করা অর্থে, ঐ আত্মদেবের সম্মতি জ্ঞাপন। যেমনই কোনও সত্যতত্ত্ব আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখনই আমাদের হৃদয়-বিহারী আত্মদেব যেন বলিয়া উঠেন,—হাঁ, ইহা "সত্য" এবং সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের মনোমধ্যে একটী তৃপ্তির ভাব আসে। এই তৃপ্তি বা এই হৃদয় স্পর্শ ই সত্যের একমাত্র পরীক্ষা, অন্য পরীক্ষা নাই।

আমাদের মধ্যে অনেকেই পাশ্চাত্য-শিক্ষার ফলে মনে করেন—কোনও নীতি অনুসারে কার্য্য করিলে যেন তাঁহাদের স্বাধীনতার হানি হয়! ফলতঃ সুদীর্ঘকাল নীতি মানিয়া চলিলে তবেই প্রকৃত স্বাধীনতা কাহাকে বলে, তাহা হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। নতুবা তপস্যাপূত না হইয়া কার্য্য করাকে স্বাধীনতা বলা যায় না—উহার নাম উচ্ছৃঙ্খলতা। উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তির অধীনে কার্য্য করিলে রোগীরও অনিষ্ট হয় এবং নিজেরও জ্ঞানোন্মেষের পথটা রুদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং সর্ব্ববিষয়েই অকল্যাণ হইয়া থাকে।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের "মাত্রা"। (১)

এলোপ্যাথিতে যেমন প্রত্যেক ঔষধের একটী করিয়া "মাত্রা" নির্দ্ধারিত আছে, হোমিওপ্যাথিতে সেরূপ "মাত্রা" বলিয়া কোনও কথা আছে কিনা,

এই লইয়া নানা সময় নানা লোকের নানা মতবাদ শোনা যায়। ইহার মীমাংসা মহামহিম ডাঃ কেণ্ট, ডানহাম, এলেন প্রভৃতি মনিষীগণ অতিশয় স্পষ্টভাষায় করিয়া গিয়াছেন, তবুও আমাদের দেশে অনেকেরই এ সম্বন্ধে ভ্রম আর ঘোচে না। অবশ্য নিতান্ত জড়মস্তিক ব্যক্তি ব্যতীত প্রত্যেকেরই মনে এই সহজ সত্যটী প্রতিভাত হইবে। তবে যাঁহারা বুঝিয়াও বুঝিতে চান না—পাছে তাঁহাদের গৌরবের হানি হয়, তাঁহাদিকে বুঝাইবার শক্তি কাহারও নাই। সত্য স্বয়ং প্রত্যক্ষ,—সত্যকে প্রমাণ করিবার আবশ্যক কখনও হয় না, প্রত্যেকের হৃদয়বিহারী আত্মদেবই কহিয়া দেন,—"ইহা সত্য, উহা মিথ্যা"। তবে এরূপ অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা মাত্রাতত্ত্বটী প্রকৃতই বুঝিতে সক্ষম নহেন, বিশেষতঃ নানা লোকের নানা কথায়, অনেকেরই মতিভ্রমেরও সম্ভাবনা, এজন্য এ বিষয়ে আলোচনা অত্যাবশ্যক মনে করি।

এলোপ্যাথিক ঔষধ সকল **স্থূল** এবং এলোপ্যাথিক ঔষধের যে পরিমাণ প্রয়োগ করিলে রোগীর আরোগ্য কার্য্য হইতে পারিবে, তাহাকেই একটী "মাত্রা" বলা হয়। ঐ মাত্রার অধিক প্রয়োগ করিলে, বিষক্রিয়া হইয়া থাকে এবং তদপেক্ষা কম প্রয়োগ করিলে আদৌ কোনও ক্রিয়াই হইবে না। সুতরাং একদিকে বিষক্রিয়া বা অহিতজনক ক্রিয়া, অন্যদিকে অক্রিয়া বা ক্রিয়ার অভাব,—এই দুইটী বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া এলোপ্যাথিক সুধী চিকিৎসকগণ এক এক প্রকার ঔষধের একটী করিয়া **"মাত্রা"** বা **স্থূল পরিমাণ** নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তদনুসারে চিকিৎসকগণকে প্রত্যেক ঔষধটীকে ব্যবহার করিতে হয়। পক্ষান্তরে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধের, বিশেষতঃ শক্তীকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধের স্থূলত্ব থাকে না, যতক্ষণ অর্থাৎ যে শক্তি পর্য্যন্ত তাহাদের কতকটা স্থূলত্ব থাকে, (যেমন, ১দ [1x] হইতে ৬ষ্ঠ শক্তি পর্য্যন্ত) ততক্ষণ না হয়, "মাত্রা" বলিয়া কোনও কথা প্রয়োগ

করা চলে, কিন্তু একবার যখন উহার স্থূলত্ব নষ্ট হইয়া অতিমাত্র সূক্ষ্ম অর্থাৎ **শক্তিস্তরে** গিয়া উপনীত হইল, তখন হইতে আর "মাত্রা" বলিয়া কোনও ভাষাই প্রয়োগ করিতে পারা যায় না। "শক্তির" আবার স্থূল পরিমাণ কি প্রকারে হইতে পারে? শক্তির পরিমাণ,—চিন্তা করা যায় না,—শক্তির গুণ চিন্তা করা যায়। শক্তির Quantity কি প্রকারে হইবে,—শক্তির Quality অর্থাৎ উচ্চতর শক্তি, নিম্নতর শক্তি, এই প্রকার ভাষা চলিতে পারে।

১ম শক্তি,—এক অংশ মূল আরক ও ৯৯ অংশ সুরাসার, একত্র করিয়া ১০ বার নাড়া (Succussion) দিয়া প্রস্তত হইল। এই ১ম শক্তিতে ঔষধের একশত ভাগের ১ ভাগ মাত্র থাকে। তাহার পর ২য় শক্তি,—১ম শক্তির এক অংশ এবং ৯৯ অংশ সুরাসার একত্র করিয়া পুনরায় ১০ বার নাড়া দিলে প্রস্তুত হয়। ২য় শক্তিতে মূল ঔষধের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র থাকে। সুতরাং ২য় শক্তিতেই ঔষধের মাত্রা এত কম হইয়া যায় যে, উহার পরিমাণ ধারণার মধ্যে আসে না। ঐ ভাবে ৩য় শক্তিতে মূল ঔষধের দশলক্ষ ভাগের এক ভাগ থাকে মাত্র। এই পরিমাণ কাগজে কলমে লেখা সম্ভব হইলেও মনে ধারণা করা প্রায় অসম্ভব। প্রত্যেক শক্তিতে ক্রমেই ঔষধের স্থূল পরিমাণ শতগুণ কমিতে থাকিলে, এ অবস্থায় না হয়, বড় জোর ৬ষ্ঠ শক্তি পর্য্যন্ত ঔষধের অতিসূক্ষ্ম রেণু থাকে বলিলেও আপত্তি হয় না, কিন্তু ৬ষ্ঠ শক্তির উপর উঠিলে আর ঔষধরেণু থাকেই না। এদিকে প্রতি শক্তি প্রস্তুত করিবার সময় নাড়া দেওয়ার ফলে, প্রতিবার অনেকখানি করিয়া **শক্তি সঞ্চার** করা হইতে থাকে। **অতএব একদিকে ঔষধের যত স্থূল পরিমাণ কমিতে থাকে, অন্যদিকে শক্তিসঞ্চার ততই প্রবলভাবে বৃদ্ধি হইতে থাকে** এবং যে শক্তিতে ঔষধের স্থূল পরিমাণটী মানব মনের অনুমাণের বহির্ভূত

হয়, সেই শক্তিতেই শক্তি-পদার্থটী অতিশয় প্রচণ্ডভাবে সঞ্চারিত হইয়া, প্রকৃত প্রস্তাবে উহাকে **শক্তিতত্ত্বে** পরিণত করিয়া ফেলে এবং ক্রমে যতই উচ্চতর শক্তির ঔষধ প্রস্তুত হইতে থাকে, ততই কেবল মাত্র **শক্তিই** পুঞ্জীকৃত হইতে থাকে এবং মূল ঔষধের পরিমাণের একান্ত অভাব করিয়া দিয়া ঔষধের অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্মতম বীর্য্যটীকে বা উহার আত্মপদার্থটীকে বিকাশ করিয়া দিতে থাকে। যখন ২৫ বা ৩০ শক্তিতে উন্নীত হয়, তখন এক একটী ঔষধ এক একটী **শক্তি** হইয়া উঠে এবং উহার মধ্যে স্থূল ঔষধ থাকে না বলিলেই চলে, কেবলই **শক্তিমাত্রে** পর্য্যবসিত হয়। প্রত্যেক ঔষধটী তাহার স্থূলত্ব ত্যাগ করিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত না শক্তিস্তরে উপনীত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার দ্বারা আমাদের কার্য্যসাধন সুচারুরূপে হয় না, কেননা আমাদের পীড়া আরোগ্য করিতে হইলে, অর্থাৎ জীবনীশক্তির বিশৃঙ্খলাটী নষ্ট করিতে হইলে, অর্থাৎ **শক্তির** উপর ক্রিয়া করিতে হইলে আর একটী **শক্তি** আবশ্যক ; **স্থূলের দ্বারা শক্তির উপর ক্রিয়া হয় না, হইতে পারে না।** এক্ষণে উহা শক্তিমাত্রে পরিণত হইবার পর আমাদের কার্য্যসাধনের উপযুক্ত যন্ত্র প্রস্তুত হইল। আমাদের হোমিওপ্যাথিক শক্তীকৃত ঔষধগুলিকে এক একটি স্বতন্ত্র **শক্তিরূপে** জানিতে হয়, যেমন চৌম্বক একটি শক্তি, মাধ্যাকর্ষণ একটি শক্তি, জোয়ার ভাটা হইবার জন্য চন্দ্রের আকর্ষনী-শক্তি, ইত্যাদি। আলোক, বিদ্যুৎ, মধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি যাবতীয় শক্তি, সেই এক আদ্যাশক্তিরই অন্তর্গত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কার্য্য সাধন করিবার উদ্দেশ্যে ভগবানের শক্তিকে কেহবা আদ্যাশক্তি বলেন, কেহবা প্রকৃতি বলেন, ফলতঃ সৃষ্টি স্থিতি লয়াদির অন্তরালে যে শক্তি ক্রিয়াবতী (তাহাকে যে নামেই অভিহিত করা হউক না কেন), জগতের যাবতীয় শক্তি ঐ একই শক্তির অন্তর্গত, কেবল যে যে কার্য্যসাধনের জন্য যে যে শক্তি নিয়োজিত থাকে, তদনুসারে

সেই সেই শক্তির নামকরণ হইয়া থাকে মাত্র। যেমন, মাধ্যাকর্ষণ, চৌম্বক ইত্যাদি। যে শক্তির ক্রিয়ার মানবদেহের যাবতীয় কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে, তাহাকে **জীবনীশক্তি** আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যদি ঐ জীবনীশক্তির কোনও প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায় তাহার ঐ কার্য্য সাধনে ব্যাঘাত হয় (অর্থাৎ মানবদেহ পীড়িত হয়), তাহা হইলে অন্য আর একটী শক্তির সাহায্য ব্যতীত ঐ বিশৃঙ্খলা দূর হয় না,—এক্ষণে যে শক্তির সাহায্যে জীবনীশক্তির বিশৃঙ্খলা দূর হইয়া থাকে, তাহার নাম **ঔষধশক্তি**। সাধারণতঃ যে সকল লতা, পাতা, ধাতু বা জান্তব পদার্থকে আমরা ঔষধ বলিয়া অভিহিত করি, তাহারা স্থূল বলিয়া ঐ বিশৃঙ্খলা দূর করিবার পক্ষে বাধা হয়, কেননা **শক্তি ব্যতীত শক্তির উপর ক্রিয়া করিতে পারে না**,—এজন্য ভেষজ পদার্থের স্থূলত্ব দূর করিয়া তাহাদিগকে অতিমাত্র সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম শক্তিস্তরে আনয়ন করিতে হয়, তবেই সেগুলি ঐ বিশৃঙ্খলা দূর করিবার অর্থাৎ আরোগ্য সংঘটন করিবার উপযুক্ত সহায় বা যোগ্য সাধন হইতে পারে। হোমিওপ্যাথি একেবারে সূক্ষ্মরাজ্যের জিনিস, এখানে **পরিমাণ** বা "**এতটা**" বলিয়া কোনও ভাষা নাই, থাকিতে পারে না।

মহাগুরু হ্যানিম্যান্ অতিশয় **সূক্ষ্ম মাত্রায়** হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সেখানে সূক্ষ্ম মাত্রা, অত্যল্প মাত্রা ইত্যাদির অর্থ "উচ্চশক্তি",—ঔষধের **স্থূল পরিমাণের** কথা সেখানে আদৌ অভিপ্রেত নহে। যখন হোমিওপ্যাথির ঔষধ আঘ্রাণ লইলেও সমানই কার্য্যশীল হইয়া থাকে, তখন আবার স্থূল পরিমাণের কথা আসিতেই পারে না। পরিমাণের কথা আসিবে কিরূপে? ঔষধ যে এক একটী শক্তিবিশেষ, সে অবস্থায় শক্তির আবার স্থূল পরিমাণ কি? ইতিপূর্ব্বেই জানা গিয়াছে যে, ঔষধকে যত উচ্চতর শক্তিতে উন্নীত করা

হয়, উহার স্থূল পরিমাণ ততই কমিতে থাকে—এবং যখন ২৫, ৩০ অথবা ২০০ শক্তিতে উত্তোলিত হয়, তখন আর স্থূল ঔষধ থাকেই না, পূর্ণমাত্রায় **শক্তিতে** পরিণত হইয়া যায়। এ অবস্থায় ৩০ বা ২০০ শক্তির আঘ্রাণ লইলেও যে ক্রিয়া হয়, ৪।৫টী গ্লবিউলে ভিজাইয়া লইয়া মুখে দিলেও সেই কার্য্য হয়, আবার ৫।১০ গণ্ডা ঐ প্রকার অর্থাৎ ঔষধীকৃত গ্লবিউল দিলেও সেই একই ক্রিয়া হয়, আবার ২।১টী ফোঁটা প্রয়োগ করিলেও ফলের বা ক্রিয়ার কোনও ইতরবিশেষ হয় না। তবে যেখানে ক্রিয়ার কোনও তারতম্যই নাই, সেখানে ২।৪টী ঔষধীকৃত গ্লবিউল ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট হয়, অনর্থক খরচ বাড়াইয়া লাভ কি? সচরাচর কেহ কেহ এক ফোঁটা করিয়া প্রতি মাত্রায় ব্যবহার করেন, আবার যাঁহারা ঔষধীকৃত গ্লবিউল ব্যবহার করিতেই ভালবাসেন, তাঁহারা প্রতিবার ৩।৪।৫টী করিয়া গ্লবিউল দিয়া থাকেন। ফলতঃ ঔষধীকৃত স্পিরিট বা গ্লবিউল বা জলের পরিমাণের কম বেশীতে ক্রিয়ার কোন তারতম্যই হয় না,—যতক্ষণ শক্তিটী একই থাকে। কেবল **শক্তির** তারতম্যে ক্রিয়ার তারতম্য হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে মহামনিষী চিকিৎসকদিগের মতামত রাশি রাশি তুলিয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু কোনও আবশ্যক দেখি না। যাঁহাদের সামান্য সাধারণ বুদ্ধি আছে, তাঁহারা এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যটী অতি অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। তবুও মহাত্মা ডাঃ কেন্টের এক স্থলের উক্তিটী তুলিয়া দিলাম, সদাশয় পাঠক পাঠিকাগণ তাহা হইতে আমাদের মতের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

"It never matters whether the remedy is given in water in spoonful doses or given in a few pellets dry on the tongue,—the result is the same. It has been supposed by some, that by giving one or two

small pellets that a milder effect would be secured, but this is a deception. The action or power of one pellet, if it acts at all, is as great as ten. If a few pellets be dissolved in water and the water is given by the tea-spoonful, each tea-spoonful will act as powerfully as the whole of the powder if given at once and the whole quantity of water if drunk at once, will have no greater curative or exaggerative power than one tea-spoonful".—Dr. Kent's Lesser writings. p. p. 389.

উপরোক্ত উক্তির বঙ্গানুবাদ,—"ঔষধ জলে দিয়া, তাহা হইতে এক এক চামচপূর্ণ জলে এক মাত্রা করা হউক, অথবা কতকগুলি অণুবটীকাতে সিক্ত করিয়া জিহ্বাতে ফেলিয়া দেওয়া হউক,—ক্রিয়া একই। কেহ কেহ মনে করেন যে, একটী বা দুইটী করিয়া ছোট অণুবটীকাতে একমাত্রা করিলে, মৃদুতর ক্রিয়া পাওয়া যায়, কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। একটী মাত্র অণুবটীকার যে ক্ষমতা বা যে ক্রিয়া, দশটী ঐ প্রকার অণুবটীকারও সেই ক্ষমতা বা সেই ক্রিয়া, অবশ্য যদি ঔষধটী ক্রিয়া করিবার মত হইয়া থাকে। আবার যদি কতকগুলি (ঔষধীকৃত) অণুবটীকা খানিকটা জলে দেওয়া হয় এবং তাহা হইতে এক এক চামচ জল একমাত্রা করা হয়, তবে ঐ এক চামচ জলে যে ক্রিয়া করিবে, ঐ সমস্ত অণুবটীকাগুলি একেবারে দিলেও সেই ক্রিয়াই করিবে এবং যতখানি জলে ঐ অণুবটীকাগুলি দেওয়া হইয়াছে, সেই সমস্ত জলটুকু একেবারে খাইলে যে ফল হয়, উহা হইতে এক চামচ করিয়া দিলে, আদৌ কিছু কম ফল হয় না।"—ডাঃ কেণ্ট লিখিত লেসার রাইটিংস, ৩৮৯ পৃঃ।

উপরে যাহা কিছু লিখিত হইল, তাহা প্রতিবার ঔষধ প্রয়োগের হিসাবে, ঔষধীকৃত জল, স্পিরিট বা অনুবটীকার পরিমাণ বা সংখ্যা লইয়া লিখিত হইল। কিন্তু যেখানে হ্যানিমানের উপদেশ রহিয়াছে যে, "এক মাত্রার ক্রিয়া যতক্ষণ চলিতে থাকিবে, ততক্ষণ দ্বিতীয় মাত্রা কদাচ দিবে না", সেখানে "একমাত্রা"র অর্থ স্বতন্ত্র। সেখানে "একমাত্রা"র অর্থ, যতবার ঔষধ প্রয়োগ করিবার পর রোগীর হিতপরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়, তাহাই "একমাত্রা" বলিয়া জানিতে হয়। মনে করুন, কোনও একটী টাইফয়েড রোগীকে উত্তমরূপে পরীক্ষা ও লক্ষণাদি জানিয়া লাইকোপডিয়ামের ক্ষেত্র বলিয়া স্থির করিলেন এবং লাইকোপোডিয়াম ৩০ শক্তি বা ২০০ শক্তি, নিত্য প্রাতঃকালে একবার করিয়া দিতে থাকিলেন, তাহা নিত্য ৪।৫টি করিয়া লাইকোপোডিয়ামের ঔষধসিক্ত অনুবটীকাই হউক অথবা এক ফোটা দুগ্ধশর্করায় মিশাইয়াই হউক অথবা খানিকটা জলে লাইকোপোডিয়ামের ২।১টি অনুবটীকা ফেলিয়া, তাহা হইতে এক চামচ করিয়াই হউক। মনে করুন ৪ দিন বা ৫ দিন দিবার পর রোগীর হিতপরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল,—তখনই জানিতে হইবে "একমাত্রা" দেওয়া হইয়াছে, অতএব এক্ষণে ঔষধ বন্ধ করিতে হইল। যতদিন ক্রমিক হিতপরিবর্ত্তনটী চলিতে থাকিবে, ততদিন আর ঔষধ দেওয়া চলিবে না। সুতরাং একদিন একবার মাত্র ঔষধ দেওয়ার পরেই যদি পরিবর্ত্তন পাওয়া যায়, তবে ঐ একবার দেওয়াকেই "একমাত্রা" বলিতে হইবে, আবার যদি ৫ দিন বা ৬ দিন ধরিয়া প্রয়োগের পর— ঐ পরিবর্ত্তন পাওয়া যায়, তবে ঐ ৫ বার বা ৬ বার দেওয়াকেই "একমাত্রা" দেওয়া হইয়াছে বলিতে পারা যাইবে। আসল কথা, যতবার ঔষধ প্রয়োগের পর রোগীর জীবনীশক্তির উপর ঔষধের একটী ঝঙ্কার (impression) উদ্ভূত হয়, ততবার প্রয়োগকেই "একমাত্রা" বলিতে হইবে। আরও এক কথা, কেহ যেন মনে না করেন যে, ৩০ বা ২০০

শক্তি সম্বন্ধেই ঐ কথা ;—না, তাহা নয়, যে কোনও শক্তি, উচ্চতর বা নিম্নতর, তাহার সম্বন্ধেও ঐ একই নীতি অবলম্বনীয়। মনে করুন কোনও একটী পুরাতন পীড়ার রোগীকে আপনি ঔষধের ৫ এম, অথবা ১০ এম শক্তি দেওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন, এই অবস্থায় **শক্তি পরিবর্ত্তিত রীতিতে** হয়ত তিন মাস ধরিয়া ঔষধ দিবার পর প্রথম ঝঙ্কার উৎপাদিত হইলে, জানিতে হইবে যে, "একমাত্রা" দেওয়া হইয়াছে এবং তখন হইতে যতদিন রোগী ক্রমাগত ভাল বোধ করিতে থাকিবে, ততদিন ঔষধ বন্ধ থাকিবে, ইহাই হ্যানিম্যানের উপদেশের মর্ম্মার্থ। অবশ্য কতদিন অন্তর এক একবার প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা প্রত্যেক রোগীর **জীবনীশক্তির** অবস্থা এবং রোগের **প্রাচীনতা**, ইত্যাদি চিন্তা করিয়া তদনুসারে চিকিৎসক ঠিক করিবেন। চিকিৎসক সকল বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে রোগীর অবস্থানুসারে একবার ঔষধ দিবার পর কতদিনের মধ্যে ক্রিয়া আরম্ভ হওয়া সম্ভব এবং তদনুসারে কতদিন অন্তর (interval) দেওয়া সঙ্গত তাহা স্থির করিবেন ও ততদিন অন্তর এক একবার প্রয়োগ করিবেন। **প্রতিবারই শক্তির অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন করিয়া প্রয়োগ করা সঙ্গত** এবং তাহা হইলে একটু শীঘ্র ক্রিয়া প্রকাশের সম্ভাবনা, ইহা ৬ষ্ঠ সংস্করণের অর্গ্যাননে হ্যানিম্যান স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন।

ঔষধের মাত্রা বিচার। (২)

যে সকল তথাকথিত চিকিৎসাপথে স্থূল ঔষধের প্রয়োগ হইয়া থাকে তাহাদের সম্বন্ধে ঔষধের "মাত্রা" বলিয়া কথাটা প্রযোজ্য হইতে পারে কিন্তু

হোমিওপ্যাথিতে যেখানে স্থূল বলিয়া কোন কথাই নাই যাহার প্রত্যেক বিষয়ই সূক্ষ্ম যেখানে মাত্রা বলিয়া কোন কথা একেবারেই অর্থশূন্য ও ও অযৌক্তিক ফলতঃ কতকগুলি স্থূল মস্তিষ্ক চিকিৎসকের হোমিওপ্যাথির মাত্রা সম্বন্ধে স্থূল ধারণা থাকায় এবং তাঁহারা মাত্রার পরিমাণ কম বেশী হইলে ঔষধের ক্রিয়ারও তারতম্য হইবে এই প্রকার মত পোষণ করায় এ সম্বন্ধে পুনরায় সামান্য আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়াই মনে হয়। স্থূল মস্তিষ্ক ব্যক্তিদিগের হোমিওপ্যাথির সূক্ষ্মতত্ত্বে প্রবেশ লাভ হওয়া বড়ই কঠিন। তাহার উপর যাহারা ঐ প্রকার স্থূলভাব পোষণ করেন যদি তাঁহারা অহঙ্কার-শূন্য হইয়া মনে প্রাণে পবিত্রতা অবলম্বন করিয়া বিষয়টী বুঝিবার চেষ্টা করেন তবে কোন গোল থাকে না, কিন্তু তাহারা যেন নিজেদের জেদ রক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি অসার যুক্তির অবতারণা করিয়া নিজেদের মত পোষণ ও সমর্থন করেন। মহামুনি পতঞ্জলি তাঁহার সুপবিত্র পাতঞ্জল দর্শনে বিচার বিতর্ক সম্পর্কে লিখিয়াছেন,—"বাদো নাবলম্বঃ" অর্থাৎ সত্যান্বেষী ব্যক্তি কুতর্ক অবলম্বন করিবেন না, সর্ব্বদাই বিষয়টী বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। সূক্ষ্ম বিষয় বুঝিবার জন্য অনেক সময় নিজের বুদ্ধিতে না কুলাইলে ভগবানের কৃপাপ্রার্থী হইতে হয়, এমতাবস্থায় কুতর্ক অবলম্বন না করিয়া বিষয়টী বুঝিবার চেষ্টা করিতে অনুরোধ করি। এসকল বিষয় যুক্তিতর্ক অপেক্ষা নিরহঙ্কার চিত্তে অনুভব করাই শ্রেয়, নিজে না বুঝিলে কাহাকেও বুঝান যায় না।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ঔষধ প্রয়োগের উদ্দেশ্য,—মানবের শক্তিস্তরে প্রভাব বিস্তার করা। মনুষ্যের জীবনীশক্তিতে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়াই রোগ সুতরাং সেই বিশৃঙ্খলা নিবারণ করিয়া শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে শক্তিস্তরে ক্রিয়া বিস্তার করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। স্থূল ঔষধের দ্বারা স্থূল রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করিতে পারা যায় কিন্তু সূক্ষ্ম ব্যতীত

সূক্ষ্মস্তরে প্রভাব বিস্তার করা অসম্ভব মহাগুরু হ্যানিমান এজন্যই ঔষধসকলকে শক্তিস্তরে উন্নিত করিয়া প্রয়োগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার সময়ে চিকিৎসা বিষয়ে বড়বাদের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত ও প্রচলিত ছিল। অল্পমাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে এই উপদেশের ফলে তাঁহাকে তৎকালে সর্ব্বদাই বিদ্রূপভাজন হইতে হইয়াছিল তথাপি তিনি অতি ধীরে ধীরে উচ্চতর শক্তিতে আরোহণ করিতেছিলেন। তখন তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম শক্তি যথেষ্ট উচ্চ শক্তি বলিয়া বিবেচিত হইত। ফলতঃ তিন, ছয়, নয়, বার ইত্যাদি নিম্নতর শক্তির ঔষধে অনেকটা স্থূলভাব থাকার জন্য হ্যানিম্যানকে তাহাও অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিবার উপদেশ দিতে হইয়াছে। তাঁহার সময়ে নবম বা দ্বাদশ শক্তির ব্যবহার উপদেশ দেওয়া বড় অল্প সৎসাহসের কার্য্য ছিল না তবে তিনি মনে প্রাণে বুঝিতেন যে—এই সকল শক্তির ঔষধ প্রকৃত প্রস্তাবে শক্তিস্তরে পৌঁছে নাই তিনি অনেক সন্তর্পণে বহু বিদ্রূপ এমন কি, গালি বর্ষণ সহ্য করিয়াও ৩০ শক্তি এবং তাহার জীবনের শেষ অংশে ৬০ শক্তি পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলেন, যদিও তাঁহার জীবনে আরও উচ্চতর শক্তির ঔষধ ব্যবহার করা সম্ভব হয় নাই ফলতঃ **তিনি শক্তির সীমারেখা নির্দ্ধারণ করিয়া যান নাই** এবং আরও বহু বহু উচ্চ শক্তির ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারিবে এবং হইবার আবশ্যকও হইবে ইহার আভাষ তিনি নানাস্থানে আঁকিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বকথিত তিন, ছয় বা নয় শক্তি পর্য্যন্ত কি আরও কিঞ্চিৎ উর্দ্ধতর শক্তির ঔষধেও সামান্যভাবে স্থূলতা বর্ত্তমান থাকে বলিয়া তিনি ঐ সকল ঔষধেরও অতি অল্প মাত্রার ব্যবহার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ ত্রিশ হইতে আরম্ভ করিয়া আরও উচ্চতর শক্তির ঔষধে বিশেষতঃ শত বা দুইশত শক্তির স্তরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ঔষধ সকলের স্থূল আবরণ আদৌ থাকে না, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহারা এক একটি শক্তিতে পরিণত হয়। একোনাইট বা

বেলেডোনা বা যে কোন ঔষধ যখন দুইশত শক্তিতে উন্নিত হয় তখন হইতে তাহারা নিজ নিজ প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট সহ এক একটি শক্তিতে পরিণত হয়। দুইশত শক্তির বেলেডোনা অপেক্ষা ৫০০ শক্তি বেলেডোনার শক্তি **প্রচণ্ডতর** কিন্তু সেখানে স্থূলের কোন গন্ধও থাকে না, ২০০ হইতে আরম্ভ করিয়া যতই উচ্চতর শক্তিতে ঔষধগুলিকে উন্নিত করা হয় ততই ঐ ঐ ঔষধগুলির শক্তিই বাড়িতে থাকে অর্থাৎ রোগ আরোগ্য করিবার শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে ফলতঃ সেখানে সবই শক্তির খেলা, স্থূলের খেলা আদৌ থাকে না। শক্তির আবার পরিমাণ কি প্রকারে ধারণা করা যাইতে পারে, স্থূলেরই পরিমাণ হইয়া থাকে সূক্ষ্মের বা শক্তির সম্বন্ধে স্থূল পরিমাণের ধারণা মিথ্যা ও হাস্যোদ্দীপক মাত্র। শক্তির কি স্থূল পরিমাণ হইতে পারে? হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দুগ্ধ শর্করা বা জল বা চিনির বটিকা প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবার প্রথা আছে; সেখানে ঐ ঐ দ্রব্য সংবাহক মাত্র। **সংবাহকের পরিমাণে শক্তির পরিমাপ হয় না।** প্রত্যেক শক্তিকেই স্থূল সংবাহকের সাহায্য লইতেই হয়, তারের সাহায্য না হইলে বিদ্যুৎ শক্তি কার্য্যকরী হয় না। তার মোটা বা পাতলা হইলে বিদ্যুৎ শক্তির তারতম্য হয় না, সংবাহক সংবাহক মাত্রই, কেবল শক্তিকে প্রেরিত, পরিচালিত এবং ক্রিয়াশীল করিবার জন্যই সংবাহকের প্রয়োজন, সংবাহকের পরিমাণের উপর শক্তির পরিমাপ করা নিতান্তই বাতুলতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা এবং তদন্তর্গত ঔষধ প্রয়োগের উদ্দেশ্যের প্রতি মনোনিবেশ করিলে বিষয়টী আরও বুঝিবার পক্ষে সহজ হইবে, ঔষধ প্রয়োগের উদ্দেশ্য,—জীবনীশক্তির উপর ক্রিয়া উৎপাদন করা এবং তাহা করিবার অভিপ্রায় থাকিলে তাহা শক্তির সাহায্যেই সম্পন্ন করিতে হয়; এমন কি জীবনীশক্তির বিশৃঙ্খলার **স্তর** হিসাবে **ঔষধ শক্তির**

তারতম্য করিতে হয়। সুতরাং শক্তি না হইলে শক্তির উপর ক্রিয়া সংঘটন অলীক কথা মাত্র অতএব প্রত্যেক হোমিওপ্যাথিক ঔষধ এক একটি শক্তিবিশেষ; অবশ্য শক্তির তারতম্য থাকিতে পারে,—উচ্চ, উচ্চতর এবং উচ্চতম শক্তি হিসাবে ঔষধের ক্রিয়ার **তীক্ষ্ণতা** বিষয়ে কম বেশী হইতে পারে ফলতঃ তাহারা যে এক একটি শক্তি স্থূলের সহিত আদৌ সম্পর্কবিহীন এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। ব্যবহারিক হিসাবেও দেখা যায় কেহবা ঔষধের মাত্রা হিসাবে একটি বটী কেহবা চারিটি বটী কেহ বা ৮।১০টি বটী কেহবা এক ফোঁটা এমন কি, দুই ফোঁটাও প্রতিমাত্রায় ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং তাহাতে ঔষধের ক্রিয়ার কোন তারতম্য হইতে দেখা যায় না অবশ্য অতি নিম্ন শক্তির ঔষধ অতি অল্পমাত্রায় ব্যবহার করা ভাল কেন না নিম্ন শক্তির ঔষধে স্থূলভাব বর্ত্তমান থাকে এবং তৎসম্পর্কে অবশ্য অল্পমাত্রা অধিকমাত্রা ইত্যাদি ভাষার সার্থকতা আছে। ঐ সকল শক্তির ঔষধ এখনও পূর্ণরূপে শক্তিস্তরে উন্নিত হয় নাই এখনও স্থূল পরমাণুর বিলয়প্রাপ্তি ঘটে নাই, এতৎব্যতীত, দুই শত হইতে আরম্ভ করিয়া তদূর্দ্ধ শক্তির ঔষধের আঘ্রাণ লইলে যেই কাজ হয়, ঐ ঔষধসিক্ত একটি বটিকাতেও সেই কাজ হয় ১০টী বটিকাতেও সেই কাজ হয়, এমন কি ৮০।৯০।১০০টি অণুবটিকাতেও ক্রিয়ার কোন তারতম্য হইতে পারে না। অবশ্য যাঁহারা দুই একটি বটীর অধিক প্রতিমাত্রায় ব্যবহার করেন তাঁহারা তদধিক যতটুকু ব্যবহার করেন তাহাই লোকসান হয় কেননা ক্রিয়া হিসাবে দুই একটি বটী দিলে যথেষ্ট হয় কিন্তু তাই বলিয়া ২।১টী বটীর অধিক দিলে অনিষ্ট হয় বা অধিক মাত্রা দেওয়া হয় এ প্রকার ধারণা স্থূল মস্তিষ্কেরই পরিচায়ক বটে। এ সকল বিষয় সূক্ষ্ম যুক্তি ও দার্শনিক গবেষণার অন্তর্গত,—জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ ইহা বুঝিবেন এ আশা করা যায় না। বেদান্ত বুঝিতে হইলে তৎপূর্ব্বে

মনুষ্যকে তাহার অধিকারী হইতে হয়। সংযম, নিয়ম ধ্যান ধারণাদির সাহায্যে মানব মনকে নির্ম্মল করিয়া হৃদয়ক্ষেত্রকে তদুদ্দেশ্যে প্রস্তুত করিতে হয়, নতুবা অবিশুদ্ধ মনে, অহংকার প্রমত্ত চিত্তে এবং জড়মস্তিষ্ক সহায়ে এ সকল বিষয়ের অধিকার জন্মে না। এজন্যই জগতপূজ্য মনিষী ডাক্তার কেণ্ট কহিয়াছেন,—"যাহারা পরিমাপ ও পরিমাণ ব্যতীত চিন্তা করিতে পারেন না হোমিওপ্যাথি তাহাদের জন্য নয়"।

অবশ্য যতই সুযুক্তি এবং গবেষণা প্রদত্ত হউক না কেন, আমাদের দেশের অনেকেই এ সকল তত্ত্ব কেবল আমাদের কল্পনাপ্রসূত বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিতে যেন অনেকটা অনিচ্ছুক থাকেন। বিদেশের মনিষীগণ যাহা বলেন তাহার উপর অধিক সমাদর প্রদর্শন করা যেন আমাদের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে সুতরাং এস্থলে আরও দুই একজন সর্ব্বজন মান্য মহাপুরুষদিগের 'মাত্রা' সম্বন্ধে উক্তি উদ্ধৃত করিলাম। প্রথমে ঐ সকল উক্তির ইংরাজী নকল তুলিয়া দিয়া সাধারণের অবগতির সুবিধার্থ সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গানুবাদও প্রদত্ত হইল।

Caroll Dunham, A-M, M-D, Says,—

"Question 4,.........and how many, as a general rule, constitute a dose, either dry or taken in water?

Answer,—How many constitute a dose? If properly medicated, one is as good as one hundred. As there is a possibility that in medicating several thousands in one operation, a pellet here and there may fail to get saturated, we usually give about four to six, we use the smallest pellets as most easily and surely medicated".

বঙ্গানুবাদ,—কেরোল ডানহাম্, এ-এম, এম-ডি লিখিতেছেন,—

"৪র্থ প্রশ্ন·········এবং কতগুলি অনুবটীকা, শুষ্কভাবে বা জলে দিয়া, প্রয়োগ করিলে, সাধারণতঃ একমাত্রা ধরা যাইবে?

উত্তর—কয়টী অনুবটীকাতে একমাত্রা? কেন,—যদি ঠিকমত ঔষধীকৃত হইয়া থাকে, তবে একটী অনুবটীকাতে যে কাজ করিবে, একশত অনুবটীকাতেও সেই কাজ করিবে। যেহেতু একসঙ্গে প্রায় হাজার হাজার অনুবটীকা ঔষধীকৃত করা হয়, এজন্য হয়ত দুই একটী অনুবটীকা ঔষধে না ভিজিতেও পারে সুতরাং আমরা চারিটি হইতে ছয়টী অনুবটীকা প্রতি মাত্রায় দিয়া থাকি। অল্পসময়ে ও সহজে ঔষধীকৃত করিবার সুবিধার জন্য আমরা ছোট অনুবটীকাই ব্যবহার করি।"

আমেরিকার একটী সভাতে,—নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণ উপস্থিত ছিলেন,—যথা—ডাঃ গি, ডাঃ ওয়েলস্, ডাঃ ক্যাম্পবেল, ডাঃ ফ্যাস, ডাঃ এলেন, ডাঃ হোম্স্, ডাঃ ব্যালার্ড ও ডাঃ বাটলার। ডোজ অর্থাৎ মাত্রা সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে কথোপকথন হইতে সামান্য অংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। অনাবশ্যকীয় অর্থাৎ এ প্রশ্নের সহিত যে অংশের সম্বন্ধ নাই, তাহা পরিত্যক্ত হইল।

Discussion.

Dr. Wells—There is one point I wish to say a word on. I hear very often, and I read very often, about a large and a small dose. I object to that adjective so used; there is no such thing in Homœopathy as a large or a small dose, you might as well talk of a large or small dose of gravitation. Homœopathy means simply the dynamic in nature, a force, and you cannot talk of a large or small dose

of that force. That force is the agent we use, we are using no such thing as matter. Now you are going to use a small dose and you get a small effect,—is the idea.

Dr. Allen,—Has not a large amount of this matter become pereditary with us? Have we not largely imbibed it, professionally, with our mothers milk? Dose is the ordinary meaning of the word as used in the Allopathic school to refer to quantity of drug, and then when we come to the Homœapathic standpoint to think what we are talking about. It is simply a general term without half the meaning we wish to attach to it. I am glad to Dr. Wells has put in a protest against it, because today it is dividing our school on the question of potency which is nothing more than another term for dose.

Dr. Wells,—My objection is not to the word "dose", but to the "large" and "small", you can keep the word dose.

(From Medical Advance,
vol. xxi, page—317 & 318.
—Editor—H. C. Allen, M. D).

বাদানুবাদ।

বঙ্গানুবাদ—

ডাঃ ওয়েলস্—এক বিষয়ে আমি একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আমি "বৃহৎ মাত্রা" ও "ক্ষুদ্র মাত্রা" সম্বন্ধে প্রায়ই পড়ি ও শুনি। আমি ঐ বিশেষণ ব্যবহারে আপত্তি করিতেছি। হোমিওপ্যাথিকে "বৃহৎ মাত্রা" বা "ক্ষুদ্রমাত্রা" বলিয়া কোনও কথা নাই। তাহা হইলে মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধেও

"বৃহৎ মাত্রা" ও "ক্ষুদ্রমাত্রা" ব্যবহার করিতে পার। হোমিওপ্যাথি অর্থে প্রকৃতির **সূক্ষ্মশক্তি** এবং ঐ শক্তির সম্বন্ধে "বৃহৎ মাত্রা" বা "ক্ষুদ্র মাত্রা" কথা ব্যবহার করিতে পার না। আমরা ঐ "শক্তিই" ব্যবহার করিয়া থাকি, আমরা "জড়" বা "স্থূল" পদার্থ ব্যবহার করি না। তোমাদের ধারণা, ঠিক যেন, "ক্ষুদ্র মাত্রা" ব্যবহার করিলে ক্ষুদ্র ফল পাইবে।

ডাঃ এলেন,—ঐ বিষয়ে অনেক জিনিষ আমরা কি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হই নাই ? আমাদের ব্যবসার প্রথম হইতে ইহা অনুকরণ দ্বারা শিক্ষা করিয়াছি—ঠিক যেন মাতৃস্তন্ হইতে লোকে অনেক জিনিষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এলোপ্যাথিতে ঔষধের পরিমাণকে "মাত্রা" বলিয়া বলা হয় এবং যখন আমরা হোমিওপ্যাথিতে আসি, তখনও পূর্ব্ব ভাষাই ব্যবহার করিতে থাকি, অথচ চিন্তা করি না যে, আমরা কি বিষয়ে কি বলিতেছি। ইহা একটী সর্ব্বদা ব্যবহৃত শব্দ, যদিও ইহার অর্থ বিশেষ কিছু নাই। ডাঃ ওয়েলস্ এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, ইহাতে আমি বড় আনন্দিত, কেননা, "শক্তি" লইয়া আমাদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় গঠিত হইতেছে, যেহেতু "মাত্রা" ও "শক্তি" একার্থবোধক।

ডাঃ ওয়েলস্,—আমার আপত্তি "মাত্রা" কথাটী লইয়া নয়, "বৃহৎ" ও "ক্ষুদ্র" লইয়াই আপত্তি। "Dose" অর্থাৎ "মাত্রা" কথাটী রাখা যাইতে পারে।

মেডিক্যাল এড্ভান্স, ২১ ভলিউম,
৩১৭ ও ৩১৮ পৃঃ।
——সম্পাদক ডাঃ এইচ, সি, এলেন, এম. ডি.।

পঞ্চম অধ্যায়।

অকাল মৃত্যুর কারণ ও তাহার প্রতিকার।

যদি ব্যাপক দৃষ্টিসাহায্যে দেশের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি মনোযোগ করা হয়, তবে প্রধানতঃ যে কয়টী বিষয় আমাদের লক্ষ্যে পতিত হইবে তাহাদের সম্বন্ধে গবেষণা ও সম্ভবতঃ কোনও প্রতিকার থাকিলে, তাহা অবলম্বন করিবার সময় আসিয়াছে,—এমন কি, কোনও কোনও বিষয় প্রতিকারের বহির্ভূত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। অতিশয় পরিতাপের বিষয় এই যে, দেশের মধ্যে মহামনিষী ও জন-নায়কগণ বিষয়ান্তরে বিশেষ ব্যাপৃত থাকায় এদিকে মনোযোগ দিবার মত কাহারও অবসর নাই এবং আমাদের মত লোকের কথা বা উপদেশে লোকের মতিগতি ফিরিবার সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না। যাঁহারা ত্যাগী, হৃদয়বান্ ও ভারতমাতার প্রকৃত সুসন্তান, দেশের লোকে তাঁহাদের মতামত ও পরামর্শ অতীব মূল্যবান্ বলিয়া চিরদিনই গ্রহণ করিয়া থাকে,—আমরা সংসারী ও স্বার্থমুগ্ধ, সুতরাং লোকে আমাদের মত লোকের কথায় ও পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিতে দ্বিধা করিবে, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। তবে আমরা যাহা যাহা দেখিতেছি ও অনুভব করিতেছি, তাহা অকপটে প্রকাশ করায় এবং আমাদের সে বিষয়ে মতামত ও যুক্তি প্রদর্শনে অবহেলা করিবার কোনও কারণ নাই বরং তাহা আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা চিকিৎসক সুতরাং সমাজের মধ্যে কোন্ কোন্ পীড়ার আবির্ভাব হইতেছে, তাহাদের

আবির্ভাবের পশ্চাতে কোন্ কোন্ কারণ রহিয়াছে, সমাজদেহের উপর তাহাদের প্রভাব কতদূর, প্রতিকারই বা কোন্ পথে অবলম্বনীয়,—এ সকল বিষয় চিন্তা, গবেষণা, পর্য্যবেক্ষণ এবং মীমাংসায় উপনীত হইবার সুযোগ সর্ব্বাপেক্ষা আমাদেরই অধিক। অতএব আমাদের ধারণা ও বক্তব্য প্রকাশ করিবার কোন বাধা ত থাকিতেই পারে না, অধিকন্তু সমাজ এ সকল বিষয়ে আমাদেরই মতামতের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। তবে যদি আমাদের বক্তব্য কোনও স্থলে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তবে তাহা সংশোধন করিবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। আমাদের মতামত যে গ্রহণ করিতেই হইবে, এমন কোনও কথা নাই,—সকল সময়েই যুক্তি ও অভিজ্ঞতা আমাদের পরিচালকের কার্য্য করিয়া থাকে এবং এক্ষেত্রেও করিবে।

আমাদের দেশে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, লোকের পরমায়ু ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। পুরাণাদিতে মানবের সহস্র বর্ষ পরমায়ু ছিল, বলিয়া যে উল্লেখ আছে, তাহা যদি মিথ্যা ও অবিশ্বাস্য বলিয়া প্রত্যাখ্যানও করা যায়, তবুও বিগত ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে আমাদিগের যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে এবং আমাদের ন্যায় বয়সের ব্যক্তিগণের যে অভিজ্ঞতা ও প্রতীতি জন্মিয়াছে, তাহা হইতে একথা অকাট্য যে, আমাদের গড় পরমায়ুটী ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। আমরা বাল্য বয়সে অশীতিবর্ষ বা শতবর্ষ বা ততোধিক বর্ষ বয়ঃক্রমের ব্যক্তি অনেক দেখিয়াছি, এক্ষণে সেরূপ বয়ঃক্রমের ব্যক্তি প্রায়ই দৃষ্টি গোচর হয় না এবং ইন্সিওরেন্স আপিসে ও সরকারী বিভাগে আজকাল আমাদের পরমায়ুর একটী গড় তৈয়ার হইয়াছে, তাহাও পূর্ব্বের স্থিরীকৃত গড় অপেক্ষা কম এবং ক্রমেই কম করিয়া আনা হইতেছে। এ সকলের দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে, আমাদের পরমায়ু ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। এ বিষয়ে বোধ হয় আদৌ

কোনও প্রতিবাদের কারণ নাই, কেননা যে কেহ একটু স্থিরভাবে সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা ও পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, তিনিই বলিবেন, আমাদের পরমায়ুটী ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। কেবলই যদি পরমায়ু হ্রাস হইত, তাহাতে ততটা উদ্বিগ্ন হইবার কারণ থাকিত না, পরন্তু ইহা ক্রমেই কম হইতেছে এবং তৎসঙ্গে অকালমৃত্যু এতই বর্দ্ধিত হারে হইতেছে যে, দেশটী জনশূন্য হইতে আর বিলম্ব নাই বলিয়াই মনে হয়। **পরমায়ু হ্রাস, ক্রমগতিতে হ্রাস এবং অকালমৃত্যুর বৃদ্ধি,**—এই ৩টীই সমাজদেহকে আশ্রয় করিয়াছে,—এই ৩টী ব্যতীত আরও অনেক বিষয় আছে, যাহাদের প্রতি এখন হইতেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও মনোযোগ আবশ্যক,—ফলতঃ ঐ ৩টী সর্ব্ব প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, তাহার সন্দেহমাত্র নাই।

নানা পীড়ার আবির্ভাব,—যতই দিন যাইতেছে, ততই নূতন নূতন নামের, নূতন নূতন লক্ষণবিশিষ্ট এবং মানবদেহের নানা যন্ত্র-সংশ্লিষ্ট ব্যাধিসমূহ বৃদ্ধি পাইতেছে। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি এবং আমার মত অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, তখন রাজযক্ষ্মা বা কর্কট পীড়ার কোনও রোগী চিকিৎসক সমীপে চিকিৎসার্থ সমীপবর্ত্তী হইলে, দূরদূরান্তর হইতে কত লোক কেবল কৌতূহলবশে, কত নব্য চিকিৎসক শিক্ষার উদ্দেশ্যে, তাহা দেখিতে আসিত; ক্রমে ঐ সকল সাংঘাতিক পীড়া বৃদ্ধি পাইয়া, এক্ষণে যেন প্রতি ঘরেই আবির্ভূত হইয়াছে। এরূপ চিকিৎসক, সহরে কি মফঃস্বলে নাই, যাঁহার নিকট শতকরা ৫০টী রোগী দুরারোগ্য অবস্থায় না আসে। সকলেই সমস্বরে কহিবেন ও একবাক্যে সাক্ষ্য দিবেন যে, তাঁহাদের আবাসভূমি যাহা ইতঃপূর্ব্বে কত সমৃদ্ধ ও জনাকীর্ণ ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহা সর্ব্ব বিষয়ে হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অনেক বিশিষ্ট পল্লীগ্রাম প্রকৃতই শ্মশানে পরিণত হইয়া বর্ত্তমান সময়ে

ভল্লুক, শৃগালাদি হিংস্র জন্তুর আবাস-স্থলে পরিণত হইয়াছে। হাওড়া হইতে বৰ্দ্ধমান পর্য্যন্ত, ই, আই, আর, মেল লাইনের দুই পার্শ্বের গ্রামগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, কত কত দ্বিতল, ত্রিতল অট্টালিকা একেবারে ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে;—২।১টী যাহা এখনও অবশিষ্ট থাকিয়া গ্রামখানির পূর্ব্ব গৌরব বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, সেগুলিও শ্রীহীন, প্রায় লোকশূন্য, কেবল কঙ্কালমাত্র সার ২।১টী বিধবা জীবিত আছে; গ্রামের অধিবাসী নাই, সৌন্দর্য্য নাই, কোলাহল নাই, কেবল পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠবের চিহ্নমাত্র বক্ষে ধারণ করিয়া একটী মর্ম্মন্তুদ করুণ দৃশ্যের অবতারণা করিয়া রাখিয়াছে। যিনিই দেখিবেন তিনিই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। কোন্ পাপে এরূপ হইল? আজি সোণার বাঙ্গলা কি জন্য শ্মশানে পরিণত হইতেছে?

আমাদের বাঙ্গলা দেশে আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে চিরদিনই কম্পজ্বর দেখা দিত, ৩।৪ অথবা ৮।১০ দিন হইতে ২০।২২ দিন পর্য্যন্ত উপবাস ও কবিরাজী চিকিৎসার গুণে রস পরিপাক ও জ্বরমুক্তি ঘটিত, এবং তাহার পর সম্বৎসর লোকে ভালই থাকিত ও নিজ নিজ ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষিকার্য্য, অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া বারমাসে তের পর্ব্বে দেবদেবীর পূজা আনয়ন করিয়া যেন সমাজকে স্মরণ করাইয়া দিত যে, কেবলমাত্র অন্নবস্ত্রের সংস্থান জন্যই যাহার যেমন সাধ্য পরিশ্রম করিতে হয়, কিন্তু অবসর পাইলেই জগৎপতির নিকট প্রার্থনা ও সেবাপূজাদি একান্তই করণীয় ও জীবনের কর্ত্তব্য। কেহ সামান্য কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইবামাত্রই শান্তি স্বস্ত্যয়নাদির ব্যবস্থা হইত অর্থাৎ ভগবানের কৃপাপ্রার্থী ও ব্যাধিমূলে যে পাপ থাকা অবশ্যম্ভাবী, তজ্জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে সমাজ বেশ মনোযোগী থাকিত। আসন

কথা, প্রত্যেকেই জীবন প্রভাত হইতেই ভগবানই যে মানবের একমাত্র আশ্রয় ও শেষ গতি, সে বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া, তদনুসারে জীবনকে গঠন ও পরিচালিত করিত। লোকে পত্রলেখার প্রারম্ভে এমন কি, হাঁচিতে, কাশিতে, হাইতুলিতেও ভগবানের নামোচ্চারণ না করিয়া পারিত না। এখনও নিভৃত পল্লীতে যাইলে এ সকল ব্যবস্থাই দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবৎভক্তি, তিনিই যে একমাত্র পরাৎপর বন্ধু "গতির্ভর্ত্তা প্রভু সাক্ষী নিরাসং শরণং সুহৃৎ। প্রভব প্রলয়স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ং।" একথা মনে প্রাণে অনুভব করিত, গুরুজন, পিতামাতা, চিকিৎসকের উপদেশবাণী প্রতিপালন, ধৈর্য্য, নির্ভরতা ইত্যাদি সদ্‌গুণরাশি প্রত্যেকেরই ছিল; ক্রূরতা, অসরলতা প্রবঞ্চনাদি একেবারেই ছিল না তাহা নয়, তবে খুবই বিরল ছিল। এখনকার অবস্থা সকলেই একবার মনোনয়নে দর্শন করিবেন, লিখিয়া জানাইবার কোনও প্রয়োজন নাই।

সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশই সর্ব্বপ্রথম সভ্য হইয়াছে অর্থাৎ মেরুদণ্ডবিহীন হইয়া নিজের নিজস্ব হারাইয়াছে, যেহেতু বঙ্গদেশই সর্ব্বপ্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষালোকে আলোকপ্রাপ্ত হইয়াছে। দোষ অবশ্য পাশ্চাত্য শিক্ষার নয়, দোষ,—আমাদের দুর্ব্বলতা, নীচতা পরমুখাপেক্ষিতার। যাহার মেরুদণ্ড আছে, সে নিজের নিজস্ব, নিজের ধর্ম্ম, নিজের শাস্ত্র; কখনও ভুলে না। পাশ্চাত্য শিক্ষাকে বাহ্যভূষণ হিসাবে যাঁহারা রাখিয়াছিলেন, অথবা রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহাদের উপর এ শিক্ষা কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই এবং বর্ত্তমানকালেও যে সকল স্থিরধী, মেধাবী, দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা যতই না পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত হউন না কেন, তাঁহারা মনে, প্রাণে, কার্য্যে, চিন্তায় ব্যবহারে, ধর্ম্মে, নিটুট হিন্দুই থাকিবেন। বাইবেল পড়িলেই কি সর্ব্বনাশ হয়? কোরাণ পড়িলেই কি বিধর্ম্মী হয়? তবে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্তির পূর্ব্ব হইতে যাঁহারা অধোগামী

হইবার মত নিম্নস্তরের মনোবৃত্তিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের পক্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা কেবলমাত্র পীড়ার উত্তেজক কারণের ন্যায় ধ্বংসপথে সাহায্যমাত্র করিয়াছে ও করিতেছে। সর্ব্ববিষয়ে দোষ আমাদেরই, আমরা অগ্রেই ধর্ম্মহীন, ভীরু ও কাপুরুষ হইয়াছি, তবেই অন্যের অনুকরণপ্রিয়তা ও নিজের ধর্ম্ম ও জাতীয়তার উপর ঘৃণা পোষণ করিতে শিখিয়াছি ও শিখিতেছি। নিজেদের দিকে না চাহিয়া অন্যের দোষ দেওয়া নিরর্থক এবং অনিষ্টজনক।

চারিদিকে এই যে নানা নামের ও নানা লক্ষণের পীড়াসকলের আবির্ভাব হইতেছে, ইহার সর্ব্বপ্রধান কারণ নিজেদের ভাব ও ধারার পরিবর্ত্তন এবং পরানুকরণ। হিন্দুর দেশে, প্রত্যেকেই বাল্যকাল হইতেই একমাত্র ধর্ম্ম ও সংযমকেই জীবনের ভিত্তি বলিয়া জানিত, পিতামাতাও তদনুসারে শিক্ষা দিতেন এবং তৎপথেই অভ্যস্ত করিতেন। এক্ষণে ধর্ম্মের ত নাম নাই, সংযমের পরিবর্ত্তে উচ্ছৃঙ্খলতাই পরিদৃশ্যমান। সমাজের যে অবস্থা আসিয়াছে, তাহাতে সংযমাদির নাম পর্য্যন্ত মুখে আনিবার উপায় নাই, কেননা তাহা হইলে আজকাল যুবক ও যুবতিগণ তাঁহাদের স্বাধীনতার হানি হইবে, এই আশঙ্কায় অস্থির হইয়া উঠিবে। যাহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই অবাধে সম্পন্ন করিতে পারাই এক্ষণে স্বাধীনতা আখ্যা পাইয়াছে। দেশে একশ্রেণীর কবি ও উপন্যাস লেখক এবং তাঁহাদের "দেখাদেখি" অনেক সাহিত্যিক ঐ প্রকার স্বাধীনতার প্রশ্রয় দান করিতেছেন; পিতামাতাও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া মেসে বোর্ডিএ থাকিয়া পুত্রকন্যা যাহাতে মানুষ হইয়া উঠিতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন, ফলতঃ ঐ প্রকার স্বাধীনতায় স্বাধীন এবং বাহিরের সৌন্দর্য্যে সুন্দর এবং পরের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, তাঁহাদের পুত্রকন্যা যে কিরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা বুঝেন না। বিলাস অহঙ্কার উচ্ছৃঙ্খলতার পথে কিছুদিন চলিবার পরই রিপুসকল মস্তক উত্তোলন করে, এমন কি, যৌবনের সূচনা

আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতেই অবৈধ উপায়ে শুক্রনষ্ট করিতে থাকা একটা সাধারণ অভ্যাসের মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছে। বড় বড় সহরে এমন কি, ক্ষুদ্র সহরের মধ্যেও চাহিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন, চা ও টোষ্ট করা পাঁউরুটী এবং মাংসাদি বিক্রয়ের দোকান যাহাকে রেস্তোরাঁ (Restaurant) বলে, সেই প্রকার দোকানই অতিশয় সমৃদ্ধিযুক্ত ও সংখ্যায় রাশি রাশি হইয়া উঠিয়াছে। আজকাল আর জননী বা ভগিনীদিগকে বাড়ীতে খাবার করিবার ঝঞ্ঝাট ভোগ করিতে হয় না এবং অনেক জননী ও ভগিনী রন্ধন বা খাবার প্রস্তুত করা নিতান্ত অসভ্য কার্য্য বলিয়া ঐ সকল কার্য্য পাচক হস্তে দিয়া নিজেরা বেশ বিন্যাসে ও নভেল নাটকাদি অধ্যয়নেই বিব্রত থাকেন। ঐ সকল রেস্তোঁরাতে অখাদ্য বলিয়া কোনও কিছু থাকে না, যত প্রকারের জঘন্য, দূষিত ও পচা মাংস এবং ডিম্বাদির খাবার সেখানে প্রস্তুত থাকে, তবে দিবার সময় খুব গরম গরম এবং পরিষ্কার ডিসে ও প্লেটে সাজান হইলেই "বাবুরা" আহ্লাদে "আটখানা" হইয়া অনায়াসে বিড়াল কুক্কুরের মাংস পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যে সকল ত্রিকালজ্ঞ মুনী ঋষির বংশে তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও ধন্য করিয়া থাকেন! যদি ধর্ম্ম ও সাত্ত্বিকতার সম্বন্ধে কোনও বালাই নাই বলিয়া ধরা যায়, কিন্তু এই প্রকার আহারের ফলে যে নানা রোগ, এমন কি, সেই একই ডিস্ ও প্লেটে সরবরাহ জন্য কত কত যক্ষ্মাদি দুরারোগ্য ব্যক্তির দেহস্ত বিষ অনায়াসে ও অবাধে শরীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে, ইহা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই! হিন্দুর দেশে কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন,—ধ্বংশের কি প্রশস্ত পথ! যাঁহারা ঐ রেস্তোঁরাতে খাওয়া পছন্দ করেন না (অবশ্য সে প্রকার লোক অতি বিরল হইয়া উঠিয়াছে), তাঁহারাও নিজের নিজের বাড়ীতে পেঁয়াজ, রসুন, ডিম্বাদি খাদ্য অবাধে খাইয়া থাকেন, এমন কি, মুরগীর ডিম্ব ও মুরগীর

মাংসও সভ্যশ্রেণীর গৃহস্থের অতি সাধারণ খাদ্যে পরিণত হইয়াছে। আমরা চিকিৎসক হিসাবে, বিধি নিষেধের ব্যবস্থায়, ঐ ঐ তামসিক দ্রব্যগুলি নিষেধ করিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিফলকামী হইয়াছি। লোকের ধারণা—এ সকল পুষ্টিকর খাদ্য না হইলে কি জীবন রক্ষা হয়?

যে প্রকার আহার, মনোবৃত্তিও সেই প্রকার হইবেই হইবে। "আহারশুদ্ধৌ চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতি",—সুতরাং যদিই রেস্তোরাঁদি হইতে বিষ না হয় শরীরে সংক্রমিত হইল না, কিন্তু ঐ সকল খাদ্য ভোজনের ফলে যে মানসিক উত্তেজনা অবশ্যম্ভাবী, তাহার সন্দেহ নাই। আসল কথা, অবৈধ উপায়ে শুক্রনাশের প্রবৃত্তি, অসংযম ও মানসিক উত্তেজনার ফলে কুকার্য্যাদিতে লিপ্ত হওয়া এবং তাহাদের ফলে নানাপ্রকার শুক্রজ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হওয়া অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে **শুক্রাদি ধাতুক্ষয়,** অন্য দিকে **নানা ব্যাধিজনিত ক্ষয়,** তাহার উপর **চাপা দেওয়া চিকিৎসার ফলে, শরীরস্থ রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্রধাতুর উত্তেজনা ও ক্ষয়,**—সুতরাং আর পরিত্রাণ কোথায়?—অকাল মৃত্যু ব্যতীত কি প্রকার ফল আশা করিতে পারা যায়? অসংযত পিতামাতার গর্ভে ঔরসে জন্ম, বাল্যকাল হইতে অসংযমের উর্ব্বর ক্ষেত্রে শিক্ষালাভ, তামসখাদ্যে রুচি এবং পরানুকরণে বিলাস ব্যসনাদি চরিতার্থ করিবার পথে চলিবার "স্বাধীনতা" অর্জ্জন, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কুৎসিত সংস্কারাদি সংশোধনের পরিবর্ত্তে দুষ্ট জাতিয় নভেল, নাটক, সিনেমাদি হইতে কামাদি রিপুর উত্তেজনা প্রজ্জলন ও ইন্ধনসংযোজন, ক্রমে কুকার্য্যে রত হওয়া, জঘন্যজাতির পীড়ার্জ্জন, এবং লোকলোচনের অন্তরালে সেগুলিকে চাপা দেওয়া,—এ সকলের ফল কি আশা করা যায়? মনের পবিত্রতা, স্থৈর্য্য, সৎচিন্তা, ভগবৎপথে রুচি, সমাজের প্রত্যেকের প্রতি করুণ ব্যবহার, সন্তোষাদি পরমায়ু-

বর্দ্ধক বিষয়গুলির যে একান্ত আবশ্যক, তাহা হিন্দু হইয়া আর মনেও করি না।

গোলক ধাঁধার ঘরে সবই গোলমাল,—দেশের চিকিৎসক সম্প্রদায়ের মধ্যে তীক্ষ্ণ-মস্তিষ্ক চিকিৎসকগণ একত্র হইয়া নানা পীড়ার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং গভীর গবেষণার ফলে কতকগুলি নানা রং বেরঙ্গের পোকা'ই যত সর্ব্বনাশের কারণ ঠিক করিলেন, তাহার উপর ছোট ছোট ঘরে বাস, অপর্য্যাপ্ত আহার, আলোক, বাতাস ও ব্যায়ামের অভাব ইত্যাদি দুই চারিটী কারণ ও তাহার প্রতিকার বিষয়ে উপায় উদ্ভাবন হইয়া থাকে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিগত বহু বৎসর ধরিয়া এই প্রকারই চলিতেছে ও চলিবে। ফলতঃ আসল কারণে এ পর্য্যন্ত কেহই হস্তস্পর্শও করেন না, এবং এমনই কালমহিমা যে যদি দুই একজন কেহবা সত্য ও প্রকৃত কারণের বিষয় আলোচনা করেন, তবে তাঁহার কথায় কেহই কর্ণপাত করেন না। আসল কারণ সমূহের প্রতিকার না করিলে অকালমৃত্যুর স্রোতটী কদাচই বন্ধ হইবে না, হইতে পারে না, একথা আমার দেশবাসীর মনে এ পর্য্যন্ত প্রতিভাত হয় নাই, হইতেছেও না। দুই একজন বিশুদ্ধ প্রাণ নেতা দুই চারি জন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী মধ্যে মধ্যে ক্ষীণস্বরে অবশ্য দেশবাসীগণকে উপদেশ দিয়া থাকেন যে, প্রকৃত হিন্দু হও, আহারে ব্যবহারে, সাজসজ্জায়, চিন্তায়, কার্য্যে হিন্দু হও, ধর্ম্মচর্চ্চা কর, কৃষিকার্য্যে মন দাও, বিলাসের পথ ত্যাগ কর,—কিন্তু হায়! কেহই তাঁহাদের কথায় কর্ণপাতও করে না। আমরা সংসারী ও চিকিৎসাব্যবসায়ী, সুতরাং আমাদের কথায় শ্রদ্ধা না হওয়ারই কথা, বিশেষতঃ আমাদের নামের পর ২।১০টী অক্ষর দেওয়া লম্বা উপাধি নাই, সুতরাং আমাদের উপদেশ, উপদেশ বলিয়াই লোকে মনে করেন না। যাহা হউক, আসলে আঘাত না পড়িলে, যতই হাঁসপাতাল হউক, যতই কলেজ ও স্কুল সংস্থাপিত হউক না কেন,

"তুমি যে তিমিরে, তুমি সেই তিমিরেই" থাকিবে, একটী দুঃখেরও অবসান হইবে না। যক্ষ্মা চিকিৎসা বা উন্মাদ চিকিৎসার বা কালাজ্বর চিকিৎসার উদ্দেশ্যে রাশি রাশি হাঁসপাতাল হইলে তাহার ফলে, ঐ ঐ পীড়ার আবির্ভাব বন্ধ হইবে না, উদ্দেশ্যও তাহা নয়,—এমন কি, ঐ ঐ পীড়ার আরোগ্য সম্পাদনও হয় না, অন্য উপকার ত দূরের কথা। ইহার ফল, কেবল চিকিৎসাপ্রদর্শনী, নানা জাতির ঔষধ ও যন্ত্রপাতির আমদানি, "বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া", এই পর্য্যন্ত। যক্ষ্মা বা উন্মাদ রোগীদের হাঁসপাতাল হইতে রোগী আরোগ্য হইয়া স্ত্রীপুত্রের নিকট ফিরিয়া আসিল, এরূপ ত কই বড় দেখিলাম না। সুতরাং প্রতিষেধ ত হইলই না, আরোগ্যও নাই, তবে ঐ সকল বড় বড় নামের প্রতিষ্ঠানের মূল্যই বা কি, আবশ্যকতাই বা কোথায়?

অকাল মৃত্যুর ক্রমগতি বন্ধ করিতে হইলে, যে যে উপায় অবলম্বন সমীচীন বলিয়া আমাদের মনে হয়, তাহা একে একে আলোচনা করিতেছি। অবশ্য আমরা ত্রিকালজ্ঞ ঋষি নহি, অথবা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীও নহি, বহুদিন ধরিয়া চিকিৎসা কার্য্যব্যপদেশে যতদূর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি এবং ধীর পর্য্যবেক্ষণের ফলে আমাদের মনস্তরে যতটুকু ক্ষুদ্র জ্ঞানের উন্মেষ হইয়াছে, তাহারই ফল আমরা আমাদের পরম প্রিয় দেশবাসীদিগের একমাত্র কল্যাণকামনায় প্রকাশ করিতেছি মাত্র। যদি কোনও স্থানে আমাদের ভ্রান্তি থাকে, তবে সহৃদয়তার সহিত সংশোধন করিয়া তদনুসারে কার্য্যানুবর্ত্তী হওয়া খুবই সঙ্গত বলিয়া মনে করিব; সত্যই একমাত্র গ্রহণীয়, ব্যক্তিগত মত কখনও আদরণীয় হয় না। সত্য পদার্থ একেবারে হৃদয়ের অন্তস্থলে আঘাত করে এবং তাহাই সত্যের একমাত্র পরীক্ষা। সুতরাং আমাদের মন্তব্য ও উপদেশ যদি কাহারও অন্তঃস্থলে আঘাত না করে, তবে তাহা পরিত্যক্ত হইলে কিছুমাত্র দুঃখিত হইব না,—কেননা ব্যক্তিত্বের সমাদর

আমরা আদৌ চাহি না, সত্য সমাদৃত হউক এবং জয়যুক্ত হউক, ইহাই আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

সর্ব্বাদৌ যে যে প্রথাগুলি স্বাস্থ্যসম্পাদক ও পরমায়ুবর্দ্ধক বলিয়া সাধারণতঃ লোকসমাজে বিদিত আছে, সেগুলির সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথমেই আলোচনা আবশ্যক। প্রথমতঃ **ব্যায়াম,**—অনেকেই বালক ও যুবকদিগকে ব্যায়াম করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সংলগ্ন ব্যায়ামচর্চ্চার ব্যবস্থাও নির্দ্দিষ্ট আছে। ফলতঃ ব্যায়াম যে উদ্দেশ্যে উপদিষ্ট হয়, তাহা সকলে করিতে সক্ষম ত নয়ই, অধিকন্তু ইহা ক্ষতিজনক, একথাও বলা চলে। তবে ব্যায়ামটা যে ক্ষেত্রে উপকারী, সে ক্ষেত্রেও পূর্ণমাত্রায় উপকার করিতে ইহার ক্ষমতা নাই। এ সকল কথা শুনিয়াই অনেকেই আমার সহিত একমত হইবেন না, আমি তাহা যেন জানিয়াও, কেবল সত্যের জন্য লিখিতে বাধ্য হইতেছি। এ সম্বন্ধে সামান্য চিন্তা ও আমাদের বিচার ও গবেষণাটী অবধান করিলে, প্রকৃত সত্যটী প্রতিভাত হইবে।

শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁহারা সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই অবশ্য হৃদয়ঙ্গম করিবেন যে **মনুষ্যের বাহ্যদেহ মনেরই স্থূলাবস্থা,** মন হইতে ঠিক যেন প্রবাহবশে বাহ্যশরীরের উপাদানগুলি প্রবাহাকারে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে পরিণত হইয়া মনুষ্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেহটীকে তৈয়ার করে। ঠিক যেন মনটী দেহের সূক্ষ্মাবস্থা এবং দেহটী সূক্ষ্ম মনের স্থূল প্রতিকৃতি, এই অবস্থায় মন সুস্থ হইলে দেহ সুস্থ হইবে, ইহাই আশা করা যায়; **অসুস্থ মন কখনও সুস্থ দেহ গঠন করিতে পারে না** সুতরাং সুস্থদেহ গঠন করিতে ইচ্ছা করিলে সর্ব্বাগ্রেই মূলতঃ, এমন কি ভিত্তিস্বরূপ মনের নির্ম্মলতা সম্পাদন করিতেই হয়। যেখানে মন নির্ম্মল নয়, সেখানে ব্যায়ামাদি চর্চ্চায় কি ফল ফলিবে? বীজভাব হইতে

বিকাশ যেখানে যাহা কিছু হইয়া থাকে, দ্রুতভাবেই হউক অথবা বিলম্বিত গতিতেই হউক, **বীজের ধর্ম্ম বিকাশে থাকিবেই।** মন যখন শরীরের **বীজাবস্থা,** তখন **বিকাশপথে** মনের অবস্থাই বিকাশ পাইবে তদব্যন্তরে মলিনতা বা নির্ম্মলতা উভয়ই সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ পাইয়া থাকে; **সুতরাং মন যেখানে দোষযুক্ত সেখানে ব্যায়ামের ফলে ঐ দোষগুলিও বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া উঠে** এবং শরীরকে ধ্বংশ পথেই লইয়া যায়। অবশ্য বাহ্য ব্যায়ামের ফলে শরীরটীকে পুষ্ট ও সুগঠিত করিতে পারে এবং দৃশ্যতঃ বেশ সুস্থ বলিয়া মনে হয় কিন্তু অবিলম্বেই পীড়া দেখা দেয় এবং বাহ্যদৃশ্যমান তথাকথিত সুস্থদেহটীকে অতি শীঘ্রই ধ্বংশমুখী করে। স্কুল কলেজে অধ্যয়নকারী অনেক ছাত্র দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের পিতা বা মাতা ক্ষয়কাশিতে মারা পড়িয়াছেন এবং ঐ সকল ছাত্র ক্ষয়কাশের **বীজ** লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া উপরোক্ত কারণে তাহাদের শরীরস্থ ক্ষয়বীজ বাহ্যব্যায়ামের ফলে, আরও শীঘ্রতর উপ্ত হইয়া এবং দ্রুততর সর্ব্বসম্পূর্ণ লক্ষণ হইয়া ক্ষয়পীড়ায় পরিণত হইতে দেখা যায়; এই প্রকার ক্ষেত্রে ব্যায়ামের ফল বড়ই ভীষণ। **সাইকোটিক** পিতামাতার গর্ভ ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন্ বালক এযাবৎ সুস্থ মন লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে; দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে হস্তমৈথুন করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের মনে দেখা দিয়া থাকে ইহা সকলেই জানেন। এরূপক্ষেত্রে ব্যায়াম সুফলের পরিবর্ত্তে কুফলই প্রসব করিয়া থাকে, যেহেতু তাহাদের পক্ষে একদিকে শুক্রের অপরিণতাবস্থায় ক্ষয়নিবন্ধন সর্ব্বশরীরের ক্ষয়ই অবশ্যম্ভাবী এবং সেই ক্ষয়ের পথ ব্যায়ামের ফলে অতিমাত্র প্রশস্ত হয়, এ পর্য্যন্ত। ব্যায়াম হইতে সুফল প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিলে সর্ব্বাগ্রে নির্ম্মল মন আবশ্যক। যেখানে পিতামাতা নির্ম্মল সেখানে তাহাদের পুত্রকন্যা অনেকটা নির্ম্মলই থাকে আশা করিতে হইবে;

কিন্তু সেখানেও ঐ সকল পুত্র কন্যার পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মফল সঞ্জাত মানসিক মলিনতা থাকা খুবই সম্ভব এরূপক্ষেত্রেও অর্থাৎ অতি নির্ম্মল পিতামাতার গর্ভওরসজাত পুত্রকন্যাদিগের ক্ষেত্রেও তাহাদের জীবন-প্রভাত হইতে মনের নির্ম্মলতা সম্পাদন জন্য নিত্য সদভ্যাস, সত্যভাষণ, সৎগ্রন্থাদি অধ্যয়ন, সুখে দুঃখে একমাত্র ভগবানই মনুষ্যের আশ্রয়স্থল এবং মনুষ্যের চরম লক্ষ্য ভগবৎ প্রাপ্তি, এই প্রকার শিক্ষাদান দ্বারা তাহাদের **মনস্তত্ব** নির্ম্মল করিবার অনুষ্ঠান একান্ত অবলম্বনীয়। এরূপ ক্ষেত্রে বাহ্য ব্যায়াম সামান্য মাত্র ইষ্ট করিতে পারে বটে তবে প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাও আবশ্যক হয় না। যেখানে বাহ্য ব্যায়াম ইষ্ট করিতে সমর্থ হয় সেখানেও সে সামর্থ্য কতটুকু? কেবলমাত্র মাংসপেশীগুলিকে দৃঢ় করিতে পারে, এ পর্য্যন্ত। কিন্তু সেই মাংসপেশীর পশ্চাতে তাহাদের চালকস্বরূপ যে স্নায়ুকেন্দ্র ও স্নায়ুগুচ্ছ রহিয়াছে, তাহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না। এ সম্বন্ধে একটী কথা মনে রাখিলেই যথেষ্ট হইবে, তাহা এই যে, যাবতীয় শান্তি ও সম্পদ প্রাপ্ত হইতে হইলে একমাত্র প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতেই আশা করিতে হইবে এবং প্রকৃতির ভাণ্ডার তাহার পক্ষেই মুক্ত থাকে, যে ব্যক্তি প্রকৃতির পথে বিচরণ করে অর্থাৎ সরল পবিত্র ও ত্যাগের পথে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে।

আরও একটী উপায় বা প্রথা পরমায়ু বর্দ্ধক ও স্বাস্থ্যসম্পাদক বলিয়া সাধারণে বিদিত আছে, সেটী,—**পুষ্টিকর আহার গ্রহণ** এবং **প্রশস্ত অট্টালিকায় বাস**। এই প্রথাটী বা উপায়টী অতি অবশ্যই স্বাস্থ্য সম্পাদন ও পরমায়ুবর্দ্ধনের একটী প্রকৃষ্ট বিধান, একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই উপায়ও সার্থক অথবা নিরর্থক হইবার জন্য অন্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ যদি অন্য একটী বিষয় থাকে, তবেই সার্থক, নতুবা নিরর্থক। সেই বিষয়টী কি? সেটী **আভ্যন্তর**

শক্তি। যাহার আভ্যন্তর শক্তি না থাকে তাহার পুষ্টিকর আহারে বল প্রাপ্তি বা উপকার প্রাপ্তি তো দূরের কথা, বরং তৎপরিবর্ত্তে অপকার প্রাপ্তিই আশা করিতে হয়। যাহার আভ্যন্তর শক্তি না থাকে, মুক্ত বায়ু ও প্রশস্ত গৃহ তাহার পক্ষে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই করিয়া থাকে। পুষ্টিকর খাদ্যের দ্বারা স্বাস্থ্য আনয়ন আশা করিতে হইলে সেই খাদ্যকে সুজীর্ণ করিতে হইবে এবং সুজীর্ণ করিবার জন্য শরীর-যন্ত্রের যথেষ্ট বল, পরিপাক যন্ত্রের যথেষ্ট সামর্থ্য আবশ্যক; উন্মুক্ত বায়ু হইতে উপকার প্রাপ্ত হইতে হইলে বক্ষোযন্ত্র বা ফুসফুস্ যুগলের পূর্ণ ও অবাধিত কার্য্যক্ষমতা অত্যাবশ্যক নতুবা তৎপরিবর্ত্তে ঐ ঐ যন্ত্রের দৌর্ব্বল্য থাকিলে উদরাময় এবং "ঠাণ্ডা লাগা" অর্থাৎ সর্দ্দি, হাঁপানি ইত্যাদি পীড়ার আবির্ভাব ঘটে। সুতরাং ঐ সকল দ্রব্য স্বাধীনভাবে আমাদের কোনও উপকারে আসে না, অর্থাৎ উহাদিগকে "আপনার করিয়া" লইবার মত শরীর যন্ত্রের সামর্থ্য চাই, নতুবা বরং অনর্থের কারণ হইয়া থাকে। যে দুগ্ধ সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে একান্ত অমৃত-স্বরূপ, তাহাই গ্রহণীরোগীর পক্ষে গরলসদৃশ। যে উন্মুক্ত বায়ু সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে একান্ত হিতকারী এবং মনের প্রফুল্লতাজনক, সেই মুক্ত বায়ুই দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে ভয় ও সঙ্কোচের কারণ, কেননা হঠাৎ বক্ষোযন্ত্র পীড়িত হইয়া পড়ে। প্রত্যেক দ্রব্যই আপেক্ষিক হিতকারী, কোনওটী নিরপেক্ষভাবে উপকার সাধন করিতে পারে না,—প্রত্যেকটীই অন্য একটী স্বতন্ত্র বর্ণের জিনিষের উপর তাহার উপকারীত্ব বা অনুপকারীত্ব নির্ভর করিয়া থাকে। আসল কথা সেই স্বতন্ত্র বর্ণের জিনিষটী অর্থাৎ নিজস্ব শক্তি লইয়া। প্রত্যেক পদার্থ হইতে কল্যাণ আশা করিতে হইলে, সেই কল্যাণটী নিজের শক্তির সাহায্যে অর্জ্জন করিতে হইবে, সেই পদার্থটীকে "আপনার করিয়া" লইতে হইবে এবং তৎপশ্চাতে নিজের শক্তি আবশ্যক, নতুবা কোনও পদার্থ কোনও উপায়েই সার্থক ও হিতকারী হইতে পারে

না। দুগ্ধ, মাংস, ঘৃত উপকারী কখন? যখন উহাকে বা উহাদিগকে সুজীর্ণ করিয়া নিজের ভিতর "আপনার করিয়া" লইবার সামর্থ্য থাকে, নতুবা উপকারী তো নয়ই বরং অপকারী হইয়া থাকে। যদি বিশুদ্ধ বায়ু হইতে অক্সিজেন বাষ্পটী গ্রহণ করিবার শক্তি না থাকে, তবে বিশুদ্ধ বায়ু লইয়া কি হইবে?

প্রত্যেক দেশেই তিন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়,—বিশিষ্ট ধনী, মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র। আমাদের দেশেও ঐ তিন শ্রেণীর লোক বাস করেন। যদি উত্তম আহার ও প্রশস্ত গৃহে বাসই স্বাস্থ্যসম্পদ এবং দীর্ঘপরমায়ু প্রাপ্তির পথ হইত, তবে মধ্যবিত্ত, বিশেষতঃ দরিদ্র শ্রেণীর লোকের মধ্যেই পীড়া এবং স্বল্প-পরমায়ু অর্থাৎ অকাল মৃত্যু অধিক দেখা যাইত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যাপারটী ঠিক বিপরীত। কেননা পীড়ার, নানা নামের ও নানা লক্ষণযুক্ত পীড়ার আবির্ভাব ধনীদিগের মধ্যেই অধিক, এমন কি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, অন্য দুই শ্রেণী অপেক্ষা অনেক অধিক; তৎব্যতীত দরিদ্রগণই অধিকতর সুস্থ ও দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ঐ দুইটী জিনিষের সহিত স্বাস্থ্য ও পরমায়ুর সম্বন্ধ, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ তো নাই বরং কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়াই মনে হয়। দেশের মধ্যে বড় বড় চিকিৎসক মহাশয়গণ যে সময়ে সময়ে তারস্বরে ঘোষণা করিয়া থাকেন যে, আজকাল নানা পীড়া বিশেষতঃ রাজযক্ষা, ক্ষয়কাস ইত্যাদির এত প্রাদুর্ভাব, তাহার একমাত্র বা প্রধান কারণ,—লোকের দারিদ্র্য এ ঘোষণার প্রতি শ্রদ্ধাস্থাপন করা চলে না।

স্বাস্থ্যসম্পদ ও পরমায়ু প্রাপ্তির আর একটী পথ বা উপায় সম্বন্ধে সকলেই বিদিত এবং চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃকও উপদিষ্ট,—সুচিকিৎসা। অন্ততঃ সুচিকিৎসার দ্বারা পীড়াদির আগমন রহিত এবং আগমন হইলে তাহাদের নিরাকরণ দ্বারা মনুষ্যের শরীর নিরাময় করিয়া তাহাকে দীর্ঘ-

জীবন লাভ করিবার পক্ষে সাহায্য করা হয়, ইহাই সকলের ধারণা সুচিকিৎসা, অবশ্য প্রকৃত সুচিকিৎসা হইলে ঐ উদ্দেশ্য লাভের পক্ষে মুখ্য উপায় না হইলেও গৌণ উপায় মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। শরীর যাহাতে নিরোগ থাকে তাহার উপায় প্রদর্শন ও সেই অবস্থাটী লাভ করাই পুরুষার্থ, এমন কি পরম পুরুষার্থ বলা যাইতে পারে, কেননা "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং" অর্থাৎ শরীর নীরোগ না থাকিলে ধর্ম্মলাভ হয় না, কেননা শরীরই ধর্ম্মলাভ করিবার সোপান ও উপায়। এ অবস্থায় পীড়া হইলে তাহার নিরাকরণ ও আরোগ্য লাভের উপায়স্বরূপ চিকিৎসা-পথটী অবশ্য অন্ততঃ গৌণভাবেও হিতকারী বটে, কিন্তু চিকিৎসা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা তো চিকিৎসা-পদবাচ্য নয়, বরং প্রকৃত প্রস্তাবে নানাভাবে পীড়া বর্দ্ধক ও পরমায়ু হ্রাসকারক, তাহার সন্দেহ নাই। প্রকৃত চিকিৎসা কাহাকে বলে তাহা এই গ্রন্থেই স্থানান্তরে আলোচিত হইয়াছে; সুতরাং বিস্তারিত ভাবে তাহা লিখিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি না করাই ভাল। সংক্ষেপে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, "চাপা দেওয়া" চিকিৎসাই আজকাল সুচিকিৎসা বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, ফলতঃ তাহার ফল অতি ভীষণ এবং ফলে সকল অনিষ্টের মূল, তাহার সন্দেহ নাই। সামান্য কথায় এ বিষয় হৃদয়ঙ্গম করাইবার চেষ্টা করিব।

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়াদি কার্য্যকারিণী প্রকৃতি নাম্নী যে ভগবৎশক্তি ক্রিয়াশীলা, তিনিই আমাদের মধ্যে জীবনীশক্তি নামে বিরাজিতা থাকিয়া দেহের পুষ্টি বর্দ্ধন, পীড়াদির হাত হইতে রক্ষা, পীড়িত দেহের নিরাময় করণ, ইত্যাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতায় কহিয়াছেন,—

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥

অর্থাৎ দেহের মধ্যে প্রাণাপানাদি সাহায্যে চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করিবার জন্ম ক্ষুধারূপী আমিই অধিষ্ঠিত থাকি। ভগবান্ যখন ক্রিয়াশীল, তখনই তাঁহাকে আমরা প্রকৃতি বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি, ফলতঃ "শক্তি-শক্তিম্-তোরভেদঃ" অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। সুতরাং একমাত্র প্রকৃতিই জীবনীশক্তি নামে মানবশরীরের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। মনুষ্যের পীড়াদি ঘটিলে, (তাঁহার নীতিভঙ্গের ফলস্বরূপ) তিনিই একমাত্র আরোগ্যকারিণী; তবে যেখানে তিনি অপারক হয়েন, কেবল সেখানেই অন্য একটী শক্তির সাহায্য আবশ্যক হইয়া থাকে, অর্থাৎ ঔষধকে শক্তিকৃত করিয়া,—জড় ভেষজকে শক্তি-রাজ্যে উন্নীত করিয়া, সেই শক্তির দ্বারা জীবনীশক্তিকে সাহায্য করিলে, তিনি আরোগ্যকার্য্যটী সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়েন।

এই সাহায্য করিবার ক্ষেত্রটী পাওয়া যায়, যখন জীবনীশক্তি প্রকৃতই আরোগ্যকার্য্যে অপারক হয়েন। কি প্রকারে তাহা বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি অপারক হইলেন? যতক্ষণ তিনি অপারক হয়েন, ততক্ষণ রোগীর মনে ও দেহে, ঔষধ নির্ব্বাচন করিবার মত, লক্ষণসমষ্টি প্রস্ফুটিত হয় না, অর্থাৎ সাহায্য করিবার ক্ষেত্রটী তখনও উপস্থিত হয় নাই, ইহাই জানিতে হয়। ফলতঃ যে মুহূর্ত্তে তিনি অপারক হন, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি যেন লক্ষণসমষ্টি প্রকাশ করিয়া দিয়া তদ্দ্বারা ঘোষণা করেন যে, তিনি অপারক, এক্ষণে ঔষধ শক্তির সাহায্য আবশ্যক, এবং তখন চিকিৎসক ঐ লক্ষণসমষ্টির সাদৃশ্যে নানা ভেষজের মধ্যে যেটীর লক্ষণসমষ্টির সহিত রোগীর লক্ষণসমষ্টির সাদৃশ্য থাকে, সেই ঔষধটী শক্তিকৃত করিয়া প্রয়োগ করেন এবং তাহার ফলে রোগী আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহাই প্রকৃত আরোগ্যপথ,—বাকি যাহা কিছু চিকিৎসা বলিয়া অভিহিত আছে, তাহা আরোগ্যপথ ত নয়ই, বিপরীত পক্ষে পীড়াজনক, রোগবর্দ্ধক, জটীলতা

সম্পাদক এবং মরণপথের সাহায্য ব্যতীত আর কিছু নয়। একথা আমাদের মতবাদ নয়, অথবা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রণোদিত নয়,—ইহা প্রাকৃতিক নীতি, প্রকৃতির ইঙ্গিত প্রদত্ত আরোগ্যতত্ত্ব,—হানিম্যান কেবলমাত্র আবিষ্কার করিয়া জগতের কল্যাণ করিয়াছেন।

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, উহা যে আরোগ্যনীতি তদ্বিষয়ের কোনও যুক্তি বা প্রমাণ আছে কি? যাহা সত্য তাহার একমাত্র প্রমাণ ফল পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা হইয়া থাকে, অন্য প্রমাণ কিরূপে দেওয়া যাইতে পারে। দশ সংখ্যাকে পনের সংখ্যা দিয়া গুণন করিলে এক শত পঞ্চাশ সংখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই সত্যের প্রমাণ চাহিলে দশ সংখ্যাটীকে পনের বার রাখিয়া তাহার পর গণিয়া দেখিলেই জানা যে, শেষোক্ত সংখ্যা হইল কিনা? তবে যুক্তিহিসাবে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, এ জগতের যাবতীয় **বিকাশ,** তাহার গতিটী **ভিতর হইতে বাহিরের দিকে,** পরন্তু বিপরীত পথে বিকাশপ্রাপ্তি ঘটে না, বিপরীত পথে অর্থাৎ বাহির হইতে ভিতরের দিকে যে গতি দেখা যায়, তাহা **বিকাশের গতি নয়, তাহা দমনের গতি,** তাহা চাপা দেওয়ার গতি, সুতরাং তাহার ফলটী ধ্বংসমুখী। সামান্য উদাহরণের দ্বারা বিষয়টী হৃদয়ঙ্গম হইবে। যে ছেলেটীর ৫।৬ দিন ভীষণ জ্বরতাপ, পিপাসা, কোষ্ঠবদ্ধ, পেটফাঁপা ইত্যাদি হইতে কষ্ট হইতেছিল, তাহার দেহে যদি কতকগুলি হামজাতীয় উদ্ভেদ বাহির হয়, (ঐ বাহির হইবার পশ্চাতে জীবনীশক্তির স্বাধীন ক্রিয়াই থাকুক, অথবা কোনও ঔষধশক্তির সাহায্যই থাকুক), তবে ছেলেটীর ঐ সকল কষ্টের অবসান হয়, ইহা সকলেই দেখিয়াছেন; কিন্তু আবার যদি ঠাণ্ডা লাগা বা অন্য কোনও কারণে সেই উদ্ভেদগুলি বাহির হইতে ভিতরের দিকে গতিপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ "বসিয়া যায় বা লাট খাইয়া" যায়, তবে হয়ত ছেলেটীর জীবননাশ পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে, অন্ততঃ

পীড়াটী আরও গুরুতর হয়, নিউমোনিয়া, মস্তিষ্ক বিকারাদি নানা দুষ্ট উপসর্গ আসিয়া রোগীটিকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, **আরোগ্য গতিটী** ভিতর হইতে বাহিরের দিকে এবং তৎবিপরীত গতিটী পীড়াবৃদ্ধিরই পরিচায়ক। এই নিত্য ঘটনার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেই আরোগ্যনীতিটীর, বিশেষতঃ আরোগ্যগতি ও পীড়ার গতিটী কোন্ দিকে, তাহা বুঝিতে বাকি থাকিবে না। যদি এই উদাহরণের বর্ণিত ঘটনা সত্য হয়, তবে আপনি কি চর্ম্মরোগের উপর বাহ্যপ্রলেপ আরোগ্যজনক বলিবেন বা পীড়াবর্দ্ধক ও ভীষণ অনিষ্টদায়ক বলিবেন? অথবা, চিকিৎসকগণ সেই শিক্ষাই আপনাকে দিয়া থাকেন যে, চর্ম্মের পীড়া হইলে তাহার উপর কোনও বাহ্য প্রলেপ প্রদান করাই চিকিৎসা এবং আপনিও সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ঐ প্রথাকেই চিকিৎসা বলিয়া মনে করেন! ঐ প্রকার তথাকথিত চিকিৎসাপথে আরোগ্যনীতি বলিয়া ত কিছু নাই, কেননা নীতি থাকিলে কি দশজন চিকিৎসকের অন্ততঃ বিংশতি প্রকার প্রেস্‌ক্রিপসন হয়? ফলতঃ ঐ প্রকার চিকিৎসায় আরোগ্য পথের গতি ঠিক বিপরীত, ইহা বুঝিতে বাকি থাকিবে না। এক্ষণে চিন্তা করিয়া দেখিবেন, সামান্য হাম নামক একটী উদ্ভেদ, বাহির হইতে ভিতরের দিকে গতি প্রাপ্ত হইলে (তাহা কোনও অজ্ঞ চিকিৎসকের ঔষধের দ্বারাই হউক অথবা রোগীর আভ্যন্তর সোরাদোষের জন্যই হউক), যদি ঐ প্রকার ভীষণ লক্ষণ সকল উপস্থিত হইয়া রোগীর জীবন বিপন্ন করিতে পারে, তবে নিত্য নিত্য ঐ প্রথায় চিকিৎসা অবলম্বন করিবার ফলে, রোগীর কি প্রকার সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে? এক্ষণে, সামান্য চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, রোগীর ম্যালেরিয়া জ্বরের বিকাশটী জোর করিয়া বন্ধ করা চিকিৎসাপদবাচ্য কি ধ্বংসপদপাচ্য। এক্ষণে অনায়াসেই আপনি বুঝিতে পারিবেন, গণোরিয়া স্রাবটী জোর করিয়া ইঞ্জেক্‌সন দ্বারা

রোধ করা চিকিৎসা অথবা মৃত্যুপথে প্রেরণ জন্য ধ্বংসশক্তিকে সাদরে আবাহন?

অতএব, যে কোনও প্রথাকে চিকিৎসাপ্রথা বলিতে পারা যায় না, পরন্তু যে চিকিৎসা উপরে বর্ণিত প্রকৃতির প্রদত্ত ইঙ্গিত অনুসারে সমলক্ষণ-সূত্রে নির্ব্বাচিত ঔষধের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহাই চিকিৎসা; বাকি যে কোনও প্রথা, চিকিৎসাপ্রথার নামে অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহা বা সেগুলি চিকিৎসাপ্রথা ত নয়ই, বরং ধ্বংসপথেরই সহায়তাকারক, সুতরাং অকালমৃত্যুর একটী প্রকৃষ্ট কারণ বলিয়া জানিতে হইবে।

ব্যাধি দুঃখ নিবারণের উপায়।

দুঃখ এ জগতে কেহই চায় না, ব্যাধি অর্থাৎ শারীরিক বা মানসিক ক্লেশ কেহই ইচ্ছা করে না,—অথচ ব্যাধি ও দুঃখের শেষ নাই, নিত্য নূতন নূতন ব্যাধিকষ্টে আমাদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। একেই ত দেশের মধ্যে সকলেরই অন্ন বিস্তর অভাবের তাড়না, তাহার উপর নানা জাতির, নানা নামের, ব্যাধি আসিয়া মনুষ্যকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। আমরা চাহি না, অথচ আসে,—ইহার প্রতিকার কোন্ পথে?

প্রতিকারের কথা যাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করা হউক না কেন, তিনিই কহিবেন,—"কেন মহাশয়, প্রতিকার ত যথেষ্টই রহিয়াছে; এত বড় বড় ডাক্তারখানা, এত দাতব্য চিকিৎসালয়, এত উচ্চ উচ্চ উপাধিমণ্ডিত চিকিৎসক সম্প্রদায়, কত ভাল ভাল ঔষধসম্ভার, নানা প্রকারের যন্ত্রাদি, এ সকল সর্ব্বদাই

আমাদের ব্যাধি প্রশমনার্থ প্রস্তুত, অতএব প্রতিকারের অভাব কোথায়?" বাস্তবিক কথা, অনুষ্ঠানের কোনও ত্রুটী বা অভাব নাই, তবুও আমাদের দুর্দ্দশার অন্ত নাই। প্রতিকারার্থ অনুষ্ঠান যথেষ্টই রহিয়াছে, এ কথা যেমন সত্য, অন্যদিকে আমাদের ব্যাধি দুঃখ প্রশমিত না হইয়া নিরন্তর বৃদ্ধির পথেই চলিয়াছে,—এ কথাও তেমনই সত্য। বিগত ৪০।৪৫ বৎসরের মধ্যে কত কত নূতন নূতন নামের ও লক্ষণের পীড়া যে আমাদের দেশে আবির্ভূত হইয়াছে এবং নিত্যই হইতেছে, তাহা ভাবিলে মনে হয়, আমাদের দেশ, বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশটী অচিরাৎ শ্মশানে পরিণত হইবে! একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, যাহাকে আমরা প্রতিকার বলিয়া মনে করি, তাহা আপাত মধুর কিন্তু **বাস্তবিক পক্ষে নানা নূতন পীড়ার কারণ।** এ কথা শুনিতে অবশ্য শ্রুতিকটু এবং অনেকের পক্ষেই অপ্রীতিকর হইবে, তবে সত্য কদাচিৎ প্রীতিজনক হইয়া থাকে।

এরূপ কেন হয়? ব্যাধি দুঃখের প্রতিকার করিবার উদ্দেশ্যেই ঔষধ, কিন্তু তাহার ফলে, প্রতিকার না হইয়া বৃদ্ধি হইবে কেন? আমার দেশবাসীর মধ্যে অধিকাংশই অশিক্ষিত, সুতরাং এ সম্বন্ধে সুগভীর দর্শনতত্ত্বের অবতারণা করিলে, আমার ব্যক্তিগত পাণ্ডিত্য ও গবেষণা প্রদর্শন হইবে মাত্র, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আমার লেখা, সে উদ্দেশ্য সফল হইবার আশা থাকিবে না। এজন্য যতদূর সাধ্য অতি সহজ ভাষায় এবং সাধারণ উদাহরণের সাহায্যে, বিষয়টীর আলোচনা করিবার চেষ্টা করিতেছি।

মোটামুটী সকলেই জানেন যে, প্রকৃতির নিয়মভঙ্গেই পীড়া হয়। কি ব্যক্তিগত, কি গার্হস্থ, কি সামাজিক, প্রত্যেক নীতি প্রতিপালন করিয়া যিনি চলেন, তাহাকে কেবলই ব্যাধি দুঃখ কেন,—কোনও প্রকার দুঃখই ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু আমরা সকলেই সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়াধীন জীব,—নিজ নিজ প্রবৃত্তিবশেই কার্য্য করিয়া থাকি। শাস্ত্রোপদেশ মানিয়া, কোনও

প্রকার নীতিভঙ্গ না করিয়া, আমরা সংসার পথে চলিতে পারক হই না। সুতরাং ব্যাধিদুঃখ আসিয়াই থাকে। যাহা হউক, ব্যাধিদুঃখ আসিলে কোন্ পথে তাহার প্রতিকার করিতে হয়, তাহা সকলেরই জানা একান্ত কর্ত্তব্য। যদি কেহ জগতের অন্যান্য সকল বিষয়ের তথ্য অবগত থাকেন, অথচ সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম ও নিকটবর্ত্তী বস্তু, অর্থাৎ নিজের শরীর, তাহার বিকলতা বা পীড়া জন্মিলে কি করা কর্ত্তব্য, কোন্ পথে প্রতিকার অন্বেষণ করা উচিত, তাহাই জানেন না, সেরূপ ব্যক্তিকে প্রকৃত সংসারী বলা চলে না।

সকলেই জানেন ও সর্ব্বদাই কহিয়া থাকেন,—"প্রকৃতিকে সাহায্য করাই চিকিৎসা"। এক্ষণে যে চিকিৎসায় প্রকৃতিকে সাহায্য করা হয়, তাহাই চিকিৎসা পদবাচ্য, অন্যথায় উহা চিকিৎসা নয়, বরং তাহাতে পীড়া বৃদ্ধিই করে বা জটীলতা আনয়ন করে। প্রকৃতির পথে সাহায্য করাই চিকিৎসা এবং তাহার বিপরীত প্রচেষ্টা চিকিৎসা ত নয়ই, বরং পীড়াজনক এবং পীড়া-বর্দ্ধক বা জটীলতার কারণ,—ইহাই জানিতে হইবে। এক্ষণে, কোন্ নীতি অনুসারে কার্য্য করিলে প্রকৃতিকে সাহায্য করা হয়, বা প্রকৃত চিকিৎসা হয়, তাহা কে বলিয়া দিবে? প্রকৃতিই উহা বলিয়া দেয়,—প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রকৃতিই সে বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে, আমরা সর্ব্বদাই তাহা দেখিতে পাই। ঐ ইঙ্গিত অনুসারে কার্য্য করিলেই প্রকৃতিকে সাহায্য করা হয় এবং প্রকৃত চিকিৎসা হয়।

মনে করুন, একটী শিশুর প্রবল জ্বর হইয়াছে, গাত্র তাপ ১০৪ বা ১০৫ ডিগ্রি, ঘুম ঘুম ভাব, কিন্তু সামান্য নিদ্রা আসিবা মাত্রই শিশুটী চম্‌কাইয়া উঠে, চক্ষু ও মুখমণ্ডল লাল, জিহ্বা শুষ্ক, লোকে বলিতেছে—"ওঃ, ছেলেটীর এত জ্বর, যে গায়ে ধান দিলে খই হয়,"—ইত্যাদি। নানা প্রকারে জ্বরটীকে কমাইবার জন্য ঔষধ দেওয়া হইতেছে, কিছুই হইতেছে না, এই ভাবে ২।৩ দিন জ্বর চলিতে থাকার পর শিশুটীর মধ্যে মধ্যে

আক্ষেপ বা খিচুনী হইতে থাকিল, তখন এলোপ্যাথিক ডাক্তার বাবুগণ, যাঁহারা ছেলেটীকে চিকিৎসা করিতেছিলেন, তাঁহারা সন্দেহ করিলেন যেন, কোনও প্রকার উদ্ভেদ বাহির হইবে এবং কোনও হোমিওপ্যাথিকে ডাকিবার জন্য পরামর্শ দিলেন, কেন না তাঁহারা এ সকল ক্ষেত্রে তাঁহাদের চিকিৎসার ফল ভাল হয় না, বলিয়া জানেন, এমন কি ঘোরতর অনিষ্টই হয়, দেখিয়াছেন। তদনুসারে নিকটের একজন বিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে ডাকা হইল,—এবং তিনি আসিয়া যাবতীয় লক্ষণগুলি লিখিয়া লইলেন এবং কয়দিন হইতে পীড়ার সূত্রপাত ইত্যাদি বিষয় জানিয়া লইয়া **বেলেডোনা** নামক একটী ঔষধ ২০০ শক্তিতে প্রয়োগ করিলেন। তাঁহাকে গৃহস্থ যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—"ডাক্তারবাবু, আপনি কি মনে করেন, ছেলেটীর গায়ে কিছু বাহির হইবে ?" তিনি উত্তর দিলেন, "হইতে পারে, ঠিক বলিতে পারি না এবং সে কথা আমার জানিবার কোনও প্রয়োজন নাই,—আমি লক্ষণ-সমষ্টি অনুসারে ঔষধ দিলাম, প্রকৃতির যে পথে সুবিধা হইবে, সেই পথেই রোগী আরোগ্য হইবে।" বলাই বাহুল্য, সেই দিনই রাত্রে ছেলেটীর সর্ব্বাঙ্গে অতিশয় ঘনভাবে হাম বাহির হইল এবং তৎসঙ্গেই জ্বরটী ত্যাগ হইয়া গেল। এ প্রকার ঘটনা লোকে চক্ষের উপর সদাসর্ব্বদাই দেখেন, তবুও তাঁহারা প্রকৃতির আরোগ্য নীতিটী ধরিতে পারেন না। প্রকৃতির আরোগ্য **নীতিটী, সমলক্ষণ তত্ত্ব** এবং আরোগ্যের **গতিটী,—ভিতর হইতে বাহিরে।**

রোগের **গতিটী** যে ভিতর হইতে বাহিরে, তাহা ত সকলেই বুঝিতে পারিলেন, কেন না, যতক্ষণ না উদ্ভেদ অর্থাৎ হামগুলি ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারিতেছিল অর্থাৎ যতক্ষণ প্রকৃতি **এরূপ সাহায্য পাইতেছিল না,** যাহার ফলে উদ্ভেদগুলি ভিতর হইতে বাহিরে প্রকাশ হইতে পারে, ততক্ষণ ছেলেটীর জ্বরের কোনও বিরাম

হইতেছিল না, বরং উত্তরোত্তর নানা উপসর্গ বৃদ্ধি প্রাপ্তই হইতেছিল। এক্ষণে, যখন প্রকৃতি **প্রকৃত সাহায্য** পাইল, তখনই দ্রুতবেগে হামগুলি প্রকাশ পাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্বরটীও ত্যাগ হইয়া গেল। এই সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিবেন যে, উপরোক্ত বেলেডোনা ঔষধটীও প্রকৃতিকে প্রকৃত সাহায্য করিয়াছিল, ফলতঃ কোন্ নীতি অনুসারে? নীতিটী **সমলক্ষণ সূত্র** ব্যতীত আর কিছুই নয়; অর্থাৎ রোগীর যে যে লক্ষণ ছিল, বেলেডোনা নামক ঔষধেও সেই সেই লক্ষণ বর্ত্তমান। অতএব **সেই ঔষধই** প্রকৃতিকে সাহায্য করিতে সমর্থ, যাহার লক্ষণসমষ্টি রোগীর যাবতীয় লক্ষণসমষ্টির সহিত **সমসূত্রে** অবস্থিত।

অতএব প্রকৃতিকে **প্রকৃত সাহায্য** করিতে হইলে দুইটী বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ রোগীর শরীরে যে যে কষ্টকর লক্ষণ রহিয়াছে, তাহার সমষ্টি লইয়া, এরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহার মধ্যে ঐ প্রকার লক্ষণসমষ্টি বর্ত্তমান রহিয়াছে—অর্থাৎ **সমলক্ষণসূত্রে ঔষধ নির্ব্বাচন**; দ্বিতীয়তঃ,—ঐ প্রকার ঔষধ প্রয়োগ ফলে, রোগের আরোগ্য গতিটী **ভিতর হইতে বাহিরে** হইবে, অর্থাৎ বাহির হইতে ভিতরে **চাপা দিয়া** নয়, ভিতর হইতে বাহিরে **বিকাশ করিয়া**। সুতরাং যেখানেই সত্য সত্য আরোগ্য, সেখানেই ঐ দুইটী জিনিষ থাকাই চাই,—নতুবা আরোগ্য ত হয়ই না, বিপরীত পক্ষে নানা বিভ্রাট আসিয়া জোটে। এক্ষণে, যদি লোকে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে, যাহাকে আরোগ্য বলিয়া মনে করে, সেখানেই যদি ঐ কষ্টিপাথরে বাচাই করিয়া লয়, অর্থাৎ ঐ দুইটী আছে কিনা, তবেই বুঝিতে আদৌ বিলম্ব হয় না যে, উহা প্রকৃত আরোগ্য অথবা আরোগ্যের একটী মিথ্যা ভাণরূপী আপাতমধুর, কিন্তু ভবিষ্যতের ভয়ানক অনিষ্ট উৎপাদনকারী, প্রক্রিয়া মাত্র। সুতরাং রোগলক্ষণের কোনও প্রকার তিরোধান করিতে পারাই আরোগ্য নয়,—

প্রকৃত আরোগ্যের ক্ষেত্রে উপরোক্ত **দুইটী নিদর্শন** নিতান্ত আবশ্যক।

যদি আপনারা উপরোক্ত নিদর্শন দুইটী আছে কিনা, ইহা দেখিয়া লয়েন, তবে দেখিবেন যে, এলোপ্যাথিক চিকিৎসাটী আদৌ চিকিৎসা-পদবাচ্যই নয়,—এলোপ্যাথিক যাবতীয় ব্যবস্থা, সকলই **বাহির হইতে ভিতরের দিকে চাপা দেওয়া** মাত্র। একজনের **একজিমা** হইয়াছে, এলোপ্যাথগণ তাহাকে বাহ্যপ্রলেপ লইবার জন্য ঔষধ লিখিয়া দিলেন। ঐ ঔষধটী অর্থাৎ বাহ্য মলমটী লইবার ফলে একজিমার বাহ্য লক্ষণগুলি, যথা চুলকানি, রসকাটা, জ্বালা ইত্যাদি লুকাইয়া যায় বটে; কিন্তু ফলে আরও উৎকট ব্যাধির সৃষ্টি হয়। আপনারা মিলাইয়া দেখিবেন,—ঐ মলম প্রয়োগের উপদেশের মধ্যে আপনার উপরোক্ত দুইটী নিদর্শন পাইবেন না, সুতরাং এরূপ চিকিৎসার ফলে **অন্য পীড়ার আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী।** আপনারা দেখিতে পাইবেন, কত কত রোগীর **শূল, অম্ল, অজীর্ণ, এমন কি উন্মাদ পীড়ার পর্য্যন্ত চিকিৎসায় আহুত হইয়া আমরা যথারীতি ঔষধ দেওয়ার পর ঐ ঐ পীড়া আরোগ্য হইয়াছে এবং আরোগ্যের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ের চাপা-পড়া চর্ম্মপীড়া বিকাশ পাইয়া উঠিয়াছে।** ইহার দ্বারা কি প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয় যে, পূর্ব্বে চর্ম্মপীড়াগুলি মাত্র **চাপা দেওয়া** হইয়াছিল, এবং **তাহারই ফলে** এক একটী উৎকট পীড়া দেখা দিয়াছিল। **চাপা দেওয়া চিকিৎসার কুফলেই নানা পীড়ার সৃষ্টি হয়।** একটী তরুণ পীড়ার ক্ষেত্রে হাম মিল-মিলে বা বসন্ত ইত্যাদির বিকাশ পাইবামাত্রই মূল পীড়াটী আরোগ্য হইয়া যায়, ইহা আপনারা নিত্য দেখিতেছেন বলিয়া বিশ্বাস করেন, কিন্তু

পুরাতন হিসাবেও ঐ একই নীতি। তরুণ বা পুরাতন পীড়ার আরোগ্য নীতি একই, তবে তরুণ পীড়ার চাপা দেওয়া চিকিৎসার কুফলটা দুই চার দিনের মধ্যে ধরা পড়ে, কিন্তু পুরাতনের ক্ষেত্রে দুই তিন বৎসর লাগিতে পারে,—ফলতঃ আরোগ্যতত্ত্বটী একই এবং চাপা দেওয়ার জন্য অনিষ্টও একই বর্গের, ইহা জানিতে হইবে।

উপরে যাহা যাহা আলোচিত হইল, তাহা হইতে আপনারা সকলেই বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, কোন্ পথে রোগীর পীড়া প্রকৃত আরোগ্য হয়? তাহার নীতি কি? প্রকৃত আরোগ্য নীতির বিপরীতে যে কোনও চিকিৎসা-নামের প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয়, তাহা চিকিৎসা ত নয়ই,—**প্রকৃত প্রস্তাবে নানা পীড়ার কারণ।** আমাদের দেশে এই যে নানা নামের নানা লক্ষণের ব্যাধির আবির্ভাব হইতেছে, যাহাদের নাম আপনারা কখনও ইতিপূর্ব্বে শোনেন নাই,—আপনারা হয়ত মনে করেন, এগুলি আমাদের অদৃষ্টের দোষে আসিতেছে কিন্তু তাহা নয়,—অদৃষ্ট দোষে নয়, প্রকৃত দোষী আমরা। প্রথম কথা, আমরা একান্ত অসংযমী, প্রকৃতির নীতি প্রতিপালন না করিয়া উচ্ছৃঙ্খল ভাবে জীবনপথে চলিয়া থাকি, দ্বিতীয়তঃ পীড়া দুঃখের আগমনে এরূপ চিকিৎসা অবলম্বন করি, যাহা প্রকৃতিকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, বাধাই দিয়া থাকে। একেই ত আমাদের প্রাকৃতিক নীতি লঙ্ঘনের ফলে নিজেদিকে **ব্যাধিপ্রবণ** করিয়া ফেলিয়াছি, তাহার উপর ঐ প্রকার চিকিৎসার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। একথা আমরা জানিয়াও জানিনা, গড্ডলিকা প্রবাহের বশে যে পথে চলিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, সেই পথেই চলিয়া থাকি,—ভবিষ্যতের ফলাফল, ইষ্টানিষ্ট বিষয়ে আদৌ চিন্তা করি না। আমাদের মস্তিষ্কের জড়তা এরূপ হইয়াছে যে, আমাদের বাড়ীতে কেহ পীড়িত হইলে, কোন্ পথে চিকিৎসা অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা নিজে

চিন্তার দ্বারা ঠিক করিতে পারি না, বাড়ীর অশিক্ষিত স্ত্রীলোকে বা পল্লীর মূর্খ প্রতিবেশী আমাদিগকে যে পরামর্শ দিয়া থাকে, আমরা তাহাই অবলম্বন করিতে আদৌ দ্বিধা করি না। একবার চিন্তাও করি না যে, নিতান্ত অশিক্ষিত জনের বা স্ত্রীলোকের এই গুরুতর বিষয়ে পরামর্শ দিবার কি শক্তি থাকিতে পারে? যে চিকিৎসাটী অনেক ঘটা ও বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ তাহাই মূর্খ লোকের মনোনীত হয়, চিকিৎসার **নীতি** বা **ভিতরের তত্ত্ব** বুঝিবার শক্তি তাহাদের পক্ষে থাকে না, থাকিবার আশাও করিতে পারা যায় না,—অথবা এ বিষয়ে যে যত মূর্খ সে ততই উপদেশ দিবার জন্য ব্যস্ত এবং আমরাও তাহাদের উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য ব্যগ্র।

অনেকেই বিজ্ঞের ন্যায় বলিয়া থাকেন, "মহাশয় ইংরাজের ন্যায় সুসভ্য ও সকল বিষয়ে উন্নতিশীল জাতি যখন এলোপ্যাথিকেই শ্রেষ্ঠ পন্থা ও অগ্রণী ব্যবস্থা বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তখন আমরা আর কি বিচার করিতে পারি?" ইহার উত্তরে বলিবার কথা এই যে ইংরাজ ত আপনাকে মাথার দিব্য দিয়া বিনা বিচারে এলোপ্যাথিই গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন নাই। আপনি নিজের ইষ্ট অনিষ্ট আপনি নিজে বিচার না করিয়া অন্যের উপর ভার দেন কেন? আপনি তবে বিলাতী, জার্ম্মানী, জাপানি ও স্বদেশীয় জিনিষের মধ্যে পার্থক্য বিচার করিয়া ক্রয় করেন কেন? আপনি নিজের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া সকল কার্য্য করিবেন, ইহাই ত আপনার কর্ত্তব্য। আপনি কি কখনও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, (Prince of Wales) প্রিন্স অভ ওয়েলস অর্থাৎ **যুবরাজের** হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক নিযুক্ত কেন? দেশে দশ প্রকার চিকিৎসাপ্রথা প্রচলিত থাকিতে পারে,—ব্যবসার খাতিরে নানা শ্রেণীর চিকিৎসা, নানা পেটেণ্ট ঔষধ ইত্যাদি বাহির হইতে পারে, কিন্তু আপনি নিজের দিক হইতে সকল

প্রকার ফলাফল বিচার করিয়া যেটী অবলম্বনীয়, তাহা অবলম্বন করিবার পথে কে বাধা দিবে।

মনস্তরের মলিনতা সংশোধন,—বাহ্যাভ্যন্তর ব্যায়াম।

স্কুল কলেজের শিক্ষক ও অধ্যাপক হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর চিকিৎসক পর্য্যন্ত সকলেই একবাক্যে ব্যায়াম করিবার জন্ত আমাদের যুবক সম্প্রদায়কে উপদেশ দিয়া থাকেন,—প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য এই যে ইহাতে শরীর সুস্থ হইবে। বাস্তবিকই যাহারা রীতিমত ব্যায়াম অভ্যাস করিয়া থাকে, তাহাদের শরীর সুদৃঢ় এবং পরিপুষ্ট হইতে দেখা যায়। শরীর দৃঢ় না হইলে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার আশা যেমন একদিকে সহজ নয়, অন্তদিকে তেমনই দেহের স্বাচ্ছন্দ্য লাভ না হওয়াতে চিরদিন যেন "মরি মরি" করিয়াই কাটাইতে হয়।

আমরাও যে ব্যায়ামের পক্ষপাতী নহি, তাহা নয়, তবে আমরা আমাদের এবং অন্য সাধারণের অভিজ্ঞতা হইতে জানিতে পারিয়াছি যে, ব্যায়ামের উপকারিতা **গৌণ**,—মুখ্য নহে। অর্থাৎ ব্যায়ামের পূর্ণ উপকারিতা লাভ করিতে হইলে কেবলমাত্র ব্যায়ামের উপরেই নির্ভর করিলে চলিবে না। আমরা জানি যে, মানব দেহের প্রত্যেক অংশই মনের অধীন। বাহিরের পুষ্টি ও সৌন্দর্য্য লাভ করিতে হইলে মনস্তরের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হয়। "বলং বলং ব্রহ্মবলং",—মনস্তরের যাবতীয় কিছু, তাহাই বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইয়া দেহে আসিয়া থাকে। **প্রকৃত**

প্রস্তাবে মনই বাহ্যদেহটীকে গঠন করে। যদি মনের মধ্যে সৌন্দর্য্য থাকে, তবে বাহিরের দেহে সৌন্দর্য্য অবশ্যম্ভাবী। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের দেহের নিরতিশয় সৌন্দর্য্যের গুহ্য কারণ তাহাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং কহিয়াছেন—"সাধনাদি শেষ হইলে আমার এমন সুন্দর রূপ ও জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল যে, লোকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া উঠিত, এমন কি, আমি নিজেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উঠিতাম। আমি জানিতাম যে ইহা মায়েরই রূপ এবং মনে মনে কহিতাম—'মা ঢুকে যা, ঢুকে যা', তাহার পর বাহিরের রূপ ভিতরে প্রবেশ করিল এবং তখন হইতেই এই হীনদেহ, নতুবা তখনকার রূপ থাকিলে, লোকের ভিড় লাগিয়া থাকিত,—এখন এই হীনদেহ দেখিলে, আগাছাগুলো পালায়, যারা খাঁটি ভক্ত তারাই থাকে।

রূপ ও সৌন্দর্য্য কাহাকে কহে? "Beauty is full and symmetrical development of Nature", অর্থাৎ সৌন্দর্য্য অর্থে, প্রাকৃতিক পূর্ণ এবং সামঞ্জস্যযুক্ত গঠন। এই সৌন্দর্য্য বা পূর্ণ এবং সামঞ্জস্যযুক্ত গঠন প্রাপ্ত হইতে হইলে, **ভিতরের** অর্থাৎ **মনের** সৌন্দর্য্য একান্ত আবশ্যক। কেবলমাত্র **ব্যায়ামে শরীরকে পুষ্ট করিতে পারে কিন্তু সুন্দর করিতে পারে না।** যদি ব্যায়ামের সঙ্গে মনন্তরের সৌন্দর্য্য বা পবিত্রতা রক্ষিত হয়, তবে ঐ মনের সৌন্দর্য্য বা পবিত্রতা বাহিরের পুষ্টিকে একটী অপূর্ব্ব কমনীয়তা, একটী মনোজ্ঞ জ্যোতিঃ প্রদান করিয়া থাকে,—তাহার ফলে দেহটীকে একদিকে সুগঠিত এবং অন্যদিকে সুন্দর করিয়া থাকে। মনের রূপই রূপ এবং মনের সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্য। সেখানে রূপ ও সৌন্দর্য্য থাকিলে উহা বাহিরে প্রতিফলিত হইতে কয়দিন লাগে? অন্যদিকে, যতই ব্যায়াম হউক না কেন, যতই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকুক না কেন, যতই বেশভূষা ও

পারিপাট্যের দ্বারা সুসজ্জিত হউক না কেন,—সৌষ্ঠব, কমনীয়তা বা পবিত্র জ্যোতিঃর অভাবে, একটী অযথা, সামঞ্জস্যহীন, লাবণ্যহীন বা কদর্য্য পুষ্টি লাভ হইলেও, দেহের মনোজ্ঞতা অথবা কান্তি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। মনের মধ্যে প্রকৃত সৌন্দর্য্য থাকিলে বাহ্য কদাকার দেহেও উহা যেন ফুটিয়া উঠে এবং লোকে আপনা হইতেই অনুভব করে;—"Nothing ill can dwell in that temple", অর্থাৎ এপ্রকার পবিত্র দেহমন্দিরে কোনও প্রকার দুষ্ট জিনিষ থাকিতে পারে না। যদি কেহ সাধু নাগমহাশয়কে দেখিয়া থাকেন, তবে আমাদের এই কথার যথার্থ্য উপলব্ধি করিবেন। নাগমহাশয়ের তুল্য কুৎসিৎ ও কদর্য্য দেহ প্রায় ছিল না, কিন্তু যিনি একবার তাঁহার সান্নিধ্যে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিতেন, তিনিই তাঁহার অন্তরের রূপ বাহিরে প্রকটিত দেখিয়া স্তম্ভিত হইতেন এবং বুঝিতেন যে মনের বা ভিতরের সৌন্দর্য্য কাহাকে বলে। তাঁহার সেই কদর্য্যদেহের অন্তরালে কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ, কি এক অসামান্য কান্তি, কি এক অত্যদ্ভুত্ তেজঃ এবং মহিমা লুকাইত থাকিত যে, তাহা বুঝাইবার শক্তি আমাদের নাই। তাঁহার সেই নিরতিশয় কদর্য্য দেহও প্রত্যেকের হৃদয়েই একটী তৃপ্তি আনয়ন করিত এবং তাঁহার সঙ্গ ও সান্নিধ্য সহসা ত্যাগ করিয়া আসিবার ইচ্ছা হইত না।

আমাদের দেশের পূতপ্রাণ ঋষি ও তপস্বীগণ এজন্যই এত কমনীয় হইতেন। ভিতরের পবিত্রতার ফলে তাঁহারা বাহিরে অনিন্দ্যসুন্দর দেখাইতেন। এক্ষণে, মনের সৌন্দর্য্য বা মনের রূপ কাহাকে কহে, তাহা জানা চাই। শ্রীমৎ ভগবদ্গীতোক্ত দৈবীসম্পৎ নামে ষোড়শোধ্যায়ে প্রথম তিনটী মাত্র শ্লোক এ বিষয়ে বড়ই আবশ্যক। এই শ্লোক ৩টী এখানে উদ্ধৃত করিয়া ও বঙ্গানুবাদ না দিলে বিষয়টী সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইবে বলিয়া মনে হয় না। অর্জ্জুনের প্রতি ভগবদুপদেশ, যথা—

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্ ॥১॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥২॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ—হে ভারত, ভয়শূন্যতা, চিত্তপ্রসন্নতা, আত্মজ্ঞানের উপায়ে নিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, যজ্ঞ, আত্মধ্যান, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, খলতাহীনতা, সর্ব্বভূতে দয়া, লোভশূন্যতা, অহঙ্কাররাহিত্য, কুকর্ম্ম প্রবৃত্তিতে লজ্জা, চাপল্যশূন্যতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধি, হিংসাহীনতা, নিজেকে অতিপূজ্য মনে না করা,—এইগুলি দৈবীসম্পদাভিমুখে জাত ব্যক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এ সংসারে সকলেই যে দৈবীসম্পদগুলি লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে, এরূপ আশা কথনই করিতে পারা যায় না। জন্মজন্মান্তরের কৃতকর্ম্মরাশির দ্বারা অর্জ্জিত ফলানুসারে মনস্তরের গঠন হইয়া থাকে এবং তদনুসারেই তাহার প্রকৃতি ও চরিত্রের বিকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং মনের অবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই নির্ম্মল করিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করিবেন, তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু মনস্তরের নির্ম্মলতা সম্পাদন বড় সহজ কথা নয়,—সুদীর্ঘকাল অতি সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাহচর্য্যে নিত্য অভ্যাস প্রয়োজনীয়, অল্পায়াসে ফললাভ সুদূরপরাহত।

আমাদের মন স্বভাবতঃই অতিশয় বহির্ম্মুখী ও চঞ্চল। যাহাতে তাহার এই বহির্ম্মুখিনতা ও চাঞ্চল্য নিবারিত হইতে পারে, তৎপথে নিত্য অভ্যাস অবলম্বন করিলে মনের ব্যায়াম সাধিত হইয়া থাকে। এই প্রকার ব্যায়ামের সাহায্যে যখন মন যথেষ্ট সংযত, স্থির এবং অন্তর্ম্মুখী হয়, তখন

মনের এই অবস্থাটী ঠিক যেন প্রবাহের বশে বাহিরে নীত হইয়া শারীরিক দৃঢ়তা এবং সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহাই প্রকৃত সৌন্দর্য্য। নতুবা মনের অবস্থার প্রতি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন থাকিয়া কেবল বাহ্যদেহের ব্যায়ামে কোনও প্রকার স্থায়ীফললাভ করিবার আশা করা যায় না। মানসিক ব্যায়াম কি প্রকারে করিতে হয়, তাহা আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে বহু প্রসঙ্গে উপদিষ্ট হইয়াছে। এ সম্বন্ধে শ্রীমৎ ভগবদ্‌গীতার উপদেশ অতীব মহান্, পবিত্র এবং অত্যাবশ্যক। করুণাময় ভগবান্ অর্জ্জুনকে যোগাদি সমস্ত বিষয়ের উপদেশ দিবার পর, অর্জ্জুন যখন কহিলেন যে,—

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥" ৬।৩৪

অর্থাৎ মন অতিশয় চঞ্চল, মদমত্ত এবং বলবান্। অতএব চঞ্চল বায়ুকে, যেমন বশে আনয়ন করা দুষ্কর, তেমনই চঞ্চল মনকে সংযত করা অতিশয় কঠিন। শ্রীভগবান্ তদুত্তরে কহিলেন,—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥

অর্থাৎ মন বাস্তবিকই অতিশয় চঞ্চল ও দুর্নিগ্রহ, তবে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা তাহাকে বশে আনিবে। শ্রীভগবানের এই উপদেশের মধ্যে "দুর্নিগ্রহ" ও "গৃহ্যতে" এই দুইটী পদ হইতে তাঁহার উপদেশের গূঢ়ত্ব বিশেষভাবে অনুমিত হইবে। এই দুইটী পদই "গ্রহ্" ধাতু হইতে উৎপন্ন। "গ্রহ" অর্থে অশ্বের বল্গা বা "লাগাম"। সকলেই জানেন যে, অশ্বের "লাগাম"টী যে দিকে টানা হয়, অশ্ব সেই দিকে ধাবিত হয়, কিন্তু দুইটী "লাগাম"কে যুগপৎ টানিলে, অশ্বটী স্থির হইয়া যায়। শ্রীভগবানের বাণীতে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে যে, মনরূপ অশ্বকে স্থির করিতে হইলে "অভ্যাস ও বৈরাগ্য"রূপী "লাগাম" দুইটীকে অবলম্বন করিতে

হইবে, তাহা হইলেই মন বশতাপন্ন হইবে। এই অমোঘ উপদেশানুসারে মনের ব্যায়াম প্রতিনিয়ত অভ্যাস করিলে, মনের উন্নতিসাধন হইবে ও মনুষ্যের প্রকৃত কল্যানলাভ হইবে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-তত্ত্বের সহিত উপরোক্ত বর্ণনার সম্বন্ধ কি এবং সার্থকতাই বা কি?

ব্যাধি নিরাকরণার্থ উচ্চ উচ্চতর শক্তির ঔষধ সেবনের ফলে আমাদের মনস্তরের মলিনতা ও পীড়া কতদূর দূরীকৃত হইতে পারে, তাহা যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। নতুবা, রোগীর ও চিকিৎসকের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নৈরাশ্যই একমাত্রই ফল হইয়া থাকে। উভয়পক্ষেই জানা আবশ্যক যে, কতটুকু সাহায্য ঔষধ হইতে প্রাপ্তব্য এবং বাকি কি উপায়ে সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

মানব দেহের অসুস্থতা সাধারণতঃ ৩টী **স্তরে** অবস্থিত। প্রথম স্তরটী নিতান্ত **বাহ্য**, দ্বিতীয় স্তরটী **মনস্তর**, এবং তৃতীয়টী,—নিতান্ত সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম স্তর, তাহাকে **কারণস্তর** বলা যায়। পীড়ার আশ্রয় ঐ তিনটী স্তরেই থাকিতে পারে। যে স্তরে পীড়াটীর অভিব্যক্তি বা বিকাশ, সেই স্তরেই উহার আশ্রয় নির্ণীত হয় এবং তদনুসারে নির্ব্বাচিত ঔষধের শক্তি নির্ব্বাচন করিতে হয়। সকলেই জানেন যে, **স্তরটী যত সূক্ষ্ম হইবে, ঔষধের শক্তিও তত উচ্চ হওয়া আবশ্যক।** পীড়া **বাহ্যস্তরে** বিকাশ পাইলে, নিম্নতর শক্তি হইতে ৩০ বা ২০০ শক্তি প্রায় যথেষ্ট; আবার **মনস্তরে** হইলে তদূর্দ্ধ শক্তি প্রয়োজন হইয়া থাকে, কিন্তু সূক্ষ্মতমসূক্ষ্মস্তরে হইলে উচ্চতম শক্তির সাহায্য একান্তই আবশ্যক হইয়া থাকে। যৎসামান্য আলোচনার সাহায্যে বিষয়টী পরিস্ফুট না করিলে সকলের পক্ষে সহজে বোধগম্য হইতে পারে না।

কোন একটী রোগীর সরলান্ত্রে বা গুহ্যদ্বারে ক্ষত হইয়াছে তাহা হইতে সামান্য পুঁয ও রক্ত নির্গত হয় এবং অতিশয় কুন্থন সহকারে মলত্যাগ করিতে হয়। রোগীর অতিরিক্ত ঘর্ম্ম, বাম পার্শ্বে ব্যতীত শয়নে অক্ষমতা, জিহ্বাটী ক্লেদাবৃত থাকা এবং তাহা হইতে দুর্গন্ধ লালাস্রাব ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্টে **মার্ক-সল** নির্ব্বাচিত হইল এবং সর্ব্ব প্রথমে ৬ষ্ঠ শক্তি, তাহার পর ৩০ শক্তির সাহায্যে ৮।১০ দিনের মধ্যে রোগী আরোগ্য লাভ করিল। পীড়াটী **বাহ্যস্তরে** বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

একটী স্ত্রীলোক, বয়স ২১।২২ বৎসর, ১৯২১ সালে অক্টোবর মাসে আমার চিকিৎসাধীনে আসেন। তাঁহার স্বামী ২য় বার বিবাহ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। (এই রোগিণীর বৃত্তান্ত "হ্যানিম্যান" পত্রিকায় ঐ সময়ে প্রকাশ করিয়াছিলাম)। রোগিনীর পিতা এজন্য ব্যাকুল হইয়া আমার নিকট আসেন ও এই মানসিক পীড়ার চিকিৎসা আমার হাতে করান সঙ্গত বলিয়া তিনি মনে করেন। স্ত্রীলোকটী বাড়ীর ঝি চাকরদের সহিত প্রায়ই বিবাদ করিতেন, স্বামী একটী বড় আফিসের বড় কর্ম্মচারী, যথেষ্ট উপার্জ্জন ও সম্মানের অধিকারী, কিন্তু স্বামীর সহিত কথাবার্ত্তাও কহিতে ইচ্ছা করিতেন না,—সর্ব্বদাই নির্জ্জনে বসিয়া অনর্থক অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বা কোনও প্রকার সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলে ক্রোধান্ধ হইয়া যে স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে ইতিপূর্ব্বে পূজা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে নিরতিশয় কর্কশভাষা, এমন কি গালিবর্ষণ করিতেও দ্বিধা করিতেন না। নিত্য ২।৩ বার করিয়া স্নান করিতেন ইত্যাদি লক্ষণ পাইয়া **নেট্রাম্-মিউরিএটিকাম্**—৩০০০ শক্তি, শক্তি-পরিবর্ত্তন রীতিমত ৪।৫টী মাত্রা প্রয়োগ করিবার পর প্রায় অর্দ্ধেক আরোগ্য দেখা দিল; কিছুদিন পরে ১০,০০০ শক্তি একমাত্রার অধিক আর আবশ্যক হইল না। এখানে পীড়াটী **মনস্তরে** বিকাশ পাইয়াছিল।

একটী দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, বয়স ২১।২২ বৎসর, ১৯১৭ সালে আমার চিকিৎসাধীনে আসেন। তিনি নিজের শত চেষ্টাতেও সংযম অবলম্বন করিতে পারিতেন না, এজন্য ক্রন্দনের সহিত আমার নিকট চিকিৎসার্থ আত্ম-সমর্পণ করেন। তিনি "কিছুতেই হস্তমৈথুন-রাক্ষসের হস্ত হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেছেন না এবং সদাসর্ব্বদাই মৈথুনচিন্তা, রাত্রে তদ্বিষয়ে স্বপ্ন এবং নিদ্রার মধ্যে রেতস্খলন" ইত্যাদি জন্য জীবনমৃত হইয়াছিলেন। লক্ষণ-সাদৃশ্যে তাঁহাকে **ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া** নির্ব্বাচনান্তর ১০০০ হইতে আরম্ভ করিয়া ১০,০০০ শক্তি প্রয়োগেও বিশেষ ফল প্রাপ্ত হই নাই,—শেষে সি-এম, শক্তি প্রয়োগের পর আরোগ্য হইয়াছিল। এই চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে **আরও একটী বিষয়ের** সাহায্য লইতে হইয়াছিল, সে বিষয় পরে লিখিত হইতেছে। এ ক্ষেত্রে পীড়াটী **কারণস্তরে** অবস্থিত ছিল।

উপরোক্ত উদাহরণ হইতে **ব্যাধি-স্তরের** সম্বন্ধে একটী ধারণা আসিবে, আশা করি। বাহ্য ও মনস্তরের পীড়া সকল কেবলমাত্র ঔষধের সাহায্যে আরোগ্য লাভ হইতে পারে; কিন্তু কোনও পীড়া যদি মনুষ্যের **স্বভাবজাত** হয়, তবে কেবলমাত্র ঔষধশক্তিতে আরোগ্য কার্য্য সমাধা না হওয়াই বিশেষ সম্ভাবনা। ইহার কারণ কি? এক্ষণে তাহাই লিখিত হইতেছে।

"স্বভাব" কাহাকে বলে? জন্মজন্মান্তরের কার্য্যাভ্যাসের ফলে মনুষ্যের **প্রকৃতি** বা **স্বভাব** গঠিত হইয়া থাকে। ঐ স্বভাবের বশে কার্য্য করিতে লোকে বাধ্য হয়, যেন অবশভাবেই কার্য্য করিয়া থাকে। ঐ স্বভাব বা প্রকৃতি তাহাকে যে কার্য্য করিতে প্রেরণা দেয় তাহা সে না করিয়া পারে না,—স্বভাব বা প্রকৃতির এতই শক্তি। উপরোক্ত তৃতীয় উদাহরণে, যুবকটী যেন তাহার স্বভাবের বশেই দুষ্ট কার্য্য করিতে বাধ্য

হইয়াছিল। এস্থলে ঔষধ যতই উচ্চ শক্তির দেওয়া হউক না কেন, স্বভাব বা প্রকৃতির শক্তির সমকক্ষ হইতে পারে না বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য জানিনা যে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আরও উচ্চতর শক্তিতে উন্নীত হইলে, মনুষ্যের স্বভাব পরিবর্ত্তনে সমর্থ হইবে কিনা, কিন্তু এ পর্য্যন্ত যে সকল শক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা যে এ কার্য্য হয় না, তাহা আমরা বেশ জানি এবং যাঁহারই ইচ্ছা হইবে, তিনিই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। তবে সম্পূর্ণভাবে এ কার্য্য করিতে না পারিলেও যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক্ষণে পূর্ণভাবে স্বভাব বা প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তন করিয়া নির্ম্মল স্বভাব বা নির্ম্মল প্রকৃতি আনিবার উপায় কি? ঔষধ ব্যতীত আর **কোন্ শক্তির** সাহায্য লওয়া আবশ্যক হয়?

এ স্থলেই মানসিক ব্যায়ামের অদ্ভুত উপকারিতা উপলব্ধি হইবে। মানসিক ব্যায়ামের দ্বারা নিজ নিজ স্বভাব বা প্রকৃতির উৎকর্ষ সাধনে তৎপর হইতে হইবে। প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তরে একটী স্বাধীন **আত্মা** বাস করেন,—ঐ আত্মার শক্তি অনন্ত, ঐ আত্মার শক্তির সাহায্য গ্রহণ না করিলে এখানে উপায়ান্তর নাই। মনুষ্য তাহার জন্মজন্মান্তরীন কর্ম্মরাশির দ্বারা নিজের সু বা কু প্রকৃতি গঠন করিয়াছে,—এক্ষণে নিতান্ত কদভ্যাস জনিত যে, কু-স্বভাব গঠিত হইয়াছে, তাহাকে সংশোধন করিতে হইলে ঠিক বিপরীত গতিতে সদভ্যাস অবলম্বন ব্যতীত গত্যন্তর নাই,— অবশ্য ঔষধে সাহায্য দিবে ও সর্ব্বদাই দিয়া থাকে, ফলতঃ ঐ সাহায্যের সঙ্গে বার বার প্রতিজ্ঞা এবং মানসিক ব্যায়াম অবলম্বন করিলে অভীষ্টফল প্রাপ্তি ঘটিবে ও ঘটিয়া থাকে। "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ"— ভগবদুপদেশের মর্ম্মার্থ তাহাই, অর্থাৎ "আপনাকে আপনিই উদ্ধার করিবে, আত্মার অবসাদ ঘটাইবে না"। ইহার ফলিতার্থ এই যে সর্ব্বদাই সদভ্যাস

করিতে থাকিবে, নীচ কার্য্য করিয়া আত্মার অর্থাৎ নিজের অধোগতির পথে যাইবে না।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে **মানসিক ব্যায়ামই** প্রকৃত প্রয়োজনীয়। মনের নির্ম্মলতা সম্পাদন করিলে বাহ্য সৌন্দর্য্য ও বল আপনিই আসিবে। সকলেই জানেন যে, **আমাদের মনস্তরের অবস্থাটীই বাহ্যে প্রতিফলিত হইয়া দেহটীকে গঠন করে**; অতএব, মনের ব্যায়ামই আসল ব্যায়াম, কেননা মনের ব্যায়াম অর্থাৎ মনের পবিত্রতাসাধনের জন্য নিত্য অভ্যাস অবলম্বন করিলে একেই উভয় কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে, নতুবা কেবল বাহ্যদেহের ব্যায়ামের উপকারিতা অত্যন্ত গৌণ। বাহ্যদেহটীর **কারণস্তরে** পরিবর্ত্তন সাধন করিলে, সেই পরিবর্ত্তনটী অবশ্যম্ভাবী হিসাবে বাহ্যদেশে পৌছিয়া থাকে। নতুবা গোড়ার সংবাদ না লইয়া শেষের উপর যতই কারুকার্য্য করা হউক না কেন, ফল বিশেষ কিছু আশা করা যায় না।

আজকালের শিক্ষা, পাশ্চাত্যানুকরণের প্রভাবে ঠিক বিপরীত হইয়াছে। ভিতরের খবর কেহই লয় না, বাহিরটী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইলেই হইল, ভিতরে যাহাই থাকুক না কেন। ইহাতে অন্যকে ঠকাইতে গিয়া নিজে যে চিরদিনের জন্য প্রবঞ্চিত হইয়া থাকে, লোকে তাহা বুঝে না। বাহ্যিক চাকচিক্য লোক-চক্ষুকে ভিতরের সারপদার্থ সম্বন্ধে প্রতারণা করিতে পারে, কিন্তু উহাতে নিজের মনস্তরের মলিনতা বৃদ্ধি হইবার ফলে ভবিষ্যতে নিজেকে বড়ই দুঃখভোগ করিতে হয়,—লোকে আপাত দৃষ্টিতে তাহা বুঝে না। অবশ্য যাঁহারা নিজের কল্যাণ চান না, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু অনেকেই ইহার কুফল বিষয়ে অবগত না থাকিয়াই একটী মোহের দ্বারা পরিচালিত হইয়া এবং সরলতার পরিবর্ত্তে বাহিরের ও ভিতরের মধ্যে

কি সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা না জানিয়া বাহিরে একটা "নেপাকা দুরস্ত" ভাব রাখেন, কিন্তু ভিতরের নির্ম্মলতা সম্পাদনই যে একমাত্র প্রয়োজনীয় তাহা অনুভব করেন না। ফলতঃ একথা ভুলিলে চলিবে না যে প্রত্যেক শাস্ত্রই নীতি অনুসারে চলিতে উপদেশ দিয়া থাকে,—সমাজ, ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য অথবা সাধারণ শিক্ষা,—ইহাদের মধ্যে কোনটাই নীতি লঙ্ঘন দ্বারা বজায় থাকে না। ইহকাল বা সংসার রক্ষার জন্য নীতিনিষ্ঠা যেমন প্রয়োজনীয়, পরকালের জন্য ঠিক তেমনি প্রয়োজনীয়। আবার নিজের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যও নীতিপালন একান্তই আবশ্যক। ভগবানের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিলে নিজের চক্ষুই অন্ধ হইয়া যায়।

যাঁহারা আমাদের উপদেশের তাৎপর্য্য যথার্থ্য উপলব্ধি করিবেন এবং তদনুসারে কার্য্যতৎপর হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বয়োপ্রাপ্তির জন্য অভ্যাসাবলম্বন করিতে অনেকটা অসুবিধা অনুভব করিবেন, সন্দেহ নাই। বাস্তবিকই বাল্যকাল হইতে মনোব্যায়াম অভ্যাস হওয়া সঙ্গত। এজন্য নিজ নিজ গৃহস্থের বালকবালিকাগণের মধ্যে মনোব্যায়াম অতি অল্পবয়স হইতে আরম্ভ করাই বিশেষ অভিপ্রেত। অবশ্য অধিক বয়স হইলে যে নিতান্তই অসম্ভব, তাহা নয়, মনের যথেষ্ট বল থাকিলে, কোনও বয়সেই ইহা অসম্ভব নয়, তবে অল্পবয়স হইতে যেমন শারীরিক ব্যায়াম আরম্ভ করা হয়, মনোব্যায়ামও ঠিক সেই সময় হইতে আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। বাল্যবয়সই এ কার্য্যে প্রশস্ত এবং নূতনভাবে যে কোনও অভ্যাস আরম্ভ করা হয়, তাহাই বয়োপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় হইয়া থাকে। আরও এক কথা,—সদভ্যাস এবং সাত্ত্বিক গতি অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিলে, অন্য বিষয়েরও সাহায্য লওয়া সঙ্গত। বিশেষতঃ **আহার ও সঙ্গ। সঙ্গ-বিষয়ে** যদি সুসঙ্গ না পাওয়া যায়, তবে বরং নিঃসঙ্গ ভাল, তবুও কুসঙ্গ অবলম্বন করা কখনই কর্ত্তব্য নয়। সঙ্গের প্রভাব অনেক প্রকারে মানব-চরিত্রের উপর প্রতিফলিত হইয়া

থাকে। সঙ্গদোষে অনেকের সর্ব্বনাশ ঘটিতে শুনা যায় এবং সঙ্গের গুণে চরিত্রের নানাদিকে উৎকর্ষলাভ হইতে শুনা গিয়াছে। সঙ্গের পরেই **আহারের** উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। "আহার-শুদ্ধৌ চিত্তশুদ্ধি," এবং "চিত্তশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতি,"—ইহা শাস্ত্রোপদেশ। ভগবদ্গীতাতে আহারের তিন প্রকার শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে, যথা,—সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক। ইহাদের মধ্যে তামসিক খাদ্য চিরতরে বর্জ্জন করা একান্ত আবশ্যক। প্রধানতঃ সাত্ত্বিক খাদ্য এবং বিশেষ পরিশ্রমী ব্যক্তিদিগের জন্য রাজসিক খাদ্যই প্রশস্ত। আজকাল সকল বিষয়েই "স্বাধীনতা"র নামে দেশে ভয়ানক উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়াছে। অনেকেরই ধারণা,—আহার বিষয়ে নিজের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হইতে হয়,—কিন্তু একথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা মনুষ্যের প্রবৃত্তি অনুসারে আহারে রুচি হইয়া থাকে। সুতরাং যাহা ইচ্ছা হইবে, তাহাই খাওয়া চলে না। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রবিধি অনুসারে চলাই একান্ত সঙ্গত। মনোব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে সাত্ত্বিক ও রাজসিক আহারের ব্যবস্থা করিলে, বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাইবে।

এ সম্বন্ধে একটী বিশেষ কথা মনে রাখিতে হইবে। **সঙ্গ ও আহার** এই দুইটী জিনিষ, মনুষ্য তাহার ভিতরের প্রবৃত্তি ও প্রেরণা অনুসারে নির্ব্বাচন করিয়া থাকে। সুতরাং যেরূপ সঙ্গ ও যেরূপ খাদ্য সে নিজে পছন্দ করে, তাহা যে শুদ্ধ হইবেই, এমন কোনও কথা নাই। অতএব যে সঙ্গ ও যে খাদ্য প্রকৃত নির্ম্মল ও পবিত্র, তাহাই নির্ব্বাচন করিতে হইবে। গুরুজনের আদেশ এবং শাস্ত্রশাসন মান্য করিয়া চলিলে কোনও বিপদের সম্ভাবনা আদৌ থাকে না। কেহ ইচ্ছা করিলেই "স্বাধীন" হয় না,—স্বাধীনতা বড় সহজ কথা নয়; সুদীর্ঘকাল সকল বিষয়ে সংযম অভ্যাস করিবার পর হৃদয় ও মন নির্ম্মল হইলে, তবে চিত্তশুদ্ধি ঘটে এবং চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে পর শুদ্ধচিত্তের প্রেরণাবশে যে কার্য্য করা যায়, সে কার্য্য নির্ম্মল

হইয়া থাকে, তখনই স্বাধীনভাবে কার্য্য করা সম্ভব হয়, নতুবা অসংযত মনে যে কোনও প্রেরণা উদয় হইবে, তাহার বশে কার্য্য করিলে তাহা কেবল উচ্ছৃঙ্খলতাই হইবে,—অবশ্য মনে মনে তাহাকে যতই "স্বাধীনতা" বলিয়া সাব্যস্ত করা হউক না কেন।

জন্মান্তরীণ ব্যাধি-প্রবাহ ও তৎপথে প্রতীকার।

সুদূর অতীতে কোন্ অপরিজ্ঞাত ও অপরিজ্ঞেয় মুহূর্ত্তে আমাদের নিত্য শাশ্বত অতএব একান্ত অচঞ্চল "শান্তং শিবমদ্বৈতং" অবস্থাকে চঞ্চল করিয়া অহংতত্ত্বটী ভাসমান্ হইয়াছিল, তাহা কে জানে? কিন্তু জানিতে বা বলিতে না পারিলেও তদবধি যে আমাদের কর্ম্ম, কর্ম্মফল এবং সুখদুঃখের আরম্ভ হইয়াছে, সে বিষয়ে কোনও মতদ্বৈধ নাই। একবার যে সুখদুঃখের প্রবাহ প্রবহমান হইয়াছে, পুনরায় অহংতত্ত্বের নাশ ও সমাধি ঘটাইতে না পারিলে সে প্রবাহ চিরতরে নিবৃত্তি পাইবার কোনও উপায় নাই। তৎপথে অন্য যাহাই করা হউক না কেন, তাহা ক্ষণিক,—তাহা চিরন্তন ও স্থায়ী অন্য কোনও প্রকারেই হইতে পারে না। সুখদুঃখের নিবৃত্তি, অর্থাৎ আত্যন্তিক নিবৃত্তি, অন্য কোনও পথে হয় না, হইতে পারে না, ইহাই আমাদের শাস্ত্রোপদেশ।

মানব মন ও মানবদেহের ব্যাধিও ঐ সময় হইতেই আরম্ভ,—প্রত্যুত, ব্যাধি একটী দুঃখমাত্র এবং প্রত্যেক দুঃখই আমাদের কৃতকর্ম্মের ফল।

সুতরাং কর্ম্মস্রোত ও ব্যাধিস্রোত একই সময়ে আরম্ভ হইয়াছে, একথা অবশ্যই বলিতে পারা যায়। প্রত্যেক দুঃখ বা ব্যাধির পশ্চাতে নিয়মভঙ্গ প্রতিনিয়তই বর্ত্তমান। ব্যাধির আত্যন্তিক নিরাশ করিতে হইলে মনোনাশের প্রয়োজন হইয়া থাকে। পার্থিব চিকিৎসাদির ফলে ব্যাধির আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না,—কেননা যতদিন মন ও অহঙ্কার থাকিবে, ততদিন নূতন নূতন নিয়মভঙ্গ এবং তৎফলে নব নব ব্যাধিসৃষ্টি হইতেই থাকিবে, তবে মনটী যতদিন নির্ম্মল থাকে, ততদিন ব্যাধি দুঃখ আসিতে পারে না। মনকে নির্ম্মল করা ও দেহকে তৎফলে সুস্থ রাখাই চিকিৎসাদিকার্য্যের লক্ষ্য। মনোনাশ বা অহং তত্ত্বের নিরাকরণাদি ব্যাপার অধ্যাত্ম শাস্ত্রের অন্তর্গত, তাহার সহিত আমাদের কোনও সংস্রব নাই।

ব্যাধি প্রবাহটী আমাদের কর্ম্ম ও তাহার ফল প্রবাহের সঙ্গেই চলিতে থাকে। অনেকের মুখে শুনিয়াছি এবং তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা যে, প্রত্যেক মানব অতিশয় পবিত্র ও নির্ম্মল চিত্ত লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং জন্মের পর হইতে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সদসৎসঙ্গের প্রভাবে তাহার যাবতীয় পরিবর্ত্তন ঘটে। সে দিন একটী উচ্চপদস্থ এবং সুশিক্ষিত রাজকর্ম্মচারীর নিকট হইতেও জানিতে পারিলাম, তাঁহারও ঐ ধারণা বদ্ধমূল। প্রধানতঃ সেজন্যই বর্ত্তমান বিষয়ের অবতারণা। উক্ত রাজকর্ম্মচারি এক্ষণে গত চারি বৎসর হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তৎপূর্ব্বে তিনি একবিংশতি বৎসর ধরিয়া উচ্চশ্রেণীর বিচারকের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তাঁহার পীড়িতা পুত্রবধুর চিকিৎসাব্যপদেশে আমাদের নিকট আসিয়াছিলেন এবং প্রসঙ্গ ক্রমে তাঁহার ঐ ধারণাটী প্রকাশ করিলেন। অবশ্য যুক্তি ও শাস্ত্রোপদেশাদির দ্বারা তাঁহার ভ্রান্তি অপনোদন করিতে পারিলেও অনেকেই এই প্রকার ধারণা পোষণ করিতে পারেন, সুতরাং এই বিষয়টী আলোচিত হওয়া সঙ্গত, মনে করিয়াছি।

মানব যখন ও যতদিন **অজ্ঞান** ভূমিতে বিচরণ করে, তখন ও ততদিন জগতের প্রত্যেক ঘটনার এক একটী স্বতন্ত্র কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে,—জ্ঞানের উচ্চস্তরে আরোহণ করিবার সঙ্গেই তাহার এই ভ্রান্তি অপনোদিত হইয়া যায়। জাগতিক যাবতীয় ঘটনার মধ্যে একটী যোগসূত্র আছে তাহা অনুভব করিতে হইলে জ্ঞানের উচ্চ শিখরে উপনীত হইতে হয়,—অথবা, জ্ঞানী অর্থে, যে ব্যক্তি ঐ যোগসূত্র অনুভব করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন, তাঁহাকেই প্রকৃত জ্ঞানী আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটী বিষয় উল্লেখ করিলে তবেই তত্ত্বটী হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। বহুপূর্ব্বে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই ধারণা পোষণ করিতেন যে, এক একটী বিষয়ের একটী করিয়া অধিষ্ঠাতা দেবতা আছেন এবং ঐ ঐ বিষয়ের জন্য ঐ ঐ দেবতার আনুকূল্য প্রয়োজন হইয়া থাকে। যেমন বিসূচিকাদি বহুব্যাপী মড়কের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ৺মা শীতলা, বসন্ত পীড়ায় দেবী ৺বসন্তচণ্ডী, উন্মাদের দেবী ভৈরবী ও উগ্রচণ্ডা কালী ইত্যাদি। লোকের ধারণা ছিল, এমন কি, এখনও অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ ঐ পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইলে ঐ ঐ অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণকে পূজাদির দ্বারা সন্তুষ্ট করিবার জন্য লোকে বিশেষ ব্যগ্র হয়। কেহ বা আত্মীয় জনের কোনও পীড়াদি বার বার হইতে থাকিলে গ্রহ বিশেষ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে করে এবং দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণের দ্বারা গ্রহ পূজার ফলে শান্তি আনয়নের চেষ্টা করিয়া থাকে। যাঁহারা স্থিরধী, তাঁহারা এই সকল ব্যাপারের মধ্যে একটী **যোগসূত্রের** সন্ধান পান এবং প্রত্যেকটীই একই নিয়মাধীনে সংঘটিত হইয়া থাকে জানিয়া নিজ নিজ অন্তঃকরণে শান্তি অনুভব করেন। বর্ত্তমানকালে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ দেবোপম **মহাত্মা গান্ধীই** প্রথম শিক্ষা প্রচার করিলেন যে, **ব্যক্তিগত** মুক্তিকামীর পক্ষে যে পথ, **রাজনৈতিক** স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্যও সেই **একই** পথ,—অর্থাৎ **প্রেম** ও **ত্যাগ**—ঐ উভয়

পথেরই অবলম্বন। তাঁহার এই শিক্ষা প্রচারেব পূর্ব্বে সকলেই জানিতেন যে, **পারলৌকিক** মুক্তির জন্যই প্রেম ও ত্যাগ প্রয়োজনীয়, কিন্তু **রাজনৈতিক** মুক্তির জন্য হিংসা ও পশুবলের একান্ত আবশ্যক। অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, তথাকথিত সভ্য পাশ্চাত্যজাতিগণ যাঁহারা জ্ঞানের ও বিজ্ঞানের এত দর্প করিয়া থাকেন, তাঁহারা মানবদেহের ব্যাধিসমূহের মধ্যে এই যোগসূত্রের সন্ধান না পাইয়া প্রত্যেক যন্ত্রের নানা পীড়ার নানা নামকরণ করিয়াছেন ও এক একটী স্বতন্ত্র পীড়া বলিয়া তাহাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক চিকিৎসা ও প্রতীকার কল্পনা করিয়াছেন,—এমন কি, এক একটী পীড়ার কারণ হিসাবে এক এক প্রকার কীটাণু বা জীবাণু আবিষ্কার করিয়া আনন্দে অধীর হইয়া কতই কৃতিত্ব দেখাইতেছেন! মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিসঙ্ঘ, যাঁহারা জ্ঞানের উচ্চতম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এবং বর্ত্তমান জগতের ইতিহাসে **মহাত্মা হ্যানিম্যানই** সর্ব্ব প্রথম ঐ যোগসূত্রের সন্ধান পাইয়া উহা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন।

বহুর মধ্যে একের সন্ধান ও অনুভূতি প্রকৃতি জ্ঞান-সাপেক্ষ। জাগতিক সকল তত্ত্বের মধ্যে একটী মধ্যসূত্র, একটী সামঞ্জস্য আছে, অজ্ঞান ভূমিতে থাকাকালে আমাদের উহা প্রতীয়মান হয় না,—এই পর্য্যন্ত। সদসৎ বিচার ও অধ্যাত্মচিন্তার সাহায্যে আমরা যতই জ্ঞানের উচ্চ হইতে উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিতে থাকি, আমাদের অজ্ঞানকোষ বা অজ্ঞানের স্থূল আবরণগুলি ক্রমেই খসিতে থাকে এবং আমরা ততই নানাত্ব ভেদ করিয়া একত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইতে থাকি। শেষে একমাত্র জগৎকারণকেই **মহাকারণ** বা **প্রকৃত কারণ** জানিয়া ধন্য হইয়া থাকি। ভীষণাদপি ভীষণ, দুর্জ্জয় ও সুবিশাল পর্ব্বত শৃঙ্গের অকস্মাৎ পতন, যাহার ফলে কতকত জনপদ ধ্বংস হইয়া যায় এবং লক্ষ লক্ষ প্রাণীর মনে ভীতির সঞ্চার হয়, সেই পতনের মূলে যে মাধ্যাকর্ষণ, আবার বিরহবিধূরা

পতিপ্রাণা সাধ্বী সতীর, বহুদিন পরে সমাগত স্বামীর সন্দর্শন জনিত নয়ন-বিগলিত আনন্দাশ্রু পতন, যাহার ফলে স্বর্গীয় আনন্দ ও পরিতৃপ্তির উৎপাদন হইয়া থাকে, সেই পতনের মূলেও সেই মাধ্যাকর্ষণ; আবার নায়েগ্রার ভীষণ জলপ্রপাত হইতে আরম্ভ করিয়া কৌমুদীপ্রফুল্ল রজনীতে মৃদুসমীরণসঞ্চালিত সুগন্ধ ও সুকোমল সেফালিকা পুষ্পের বৃন্তচ্যুতি ও পতন পর্য্যন্ত ঐ একই শক্তির অধীনে সম্পাদিত হইয়া থাকে। এ অবস্থায়, মানবের কর্ম্ম ও কর্ম্মফলপ্রবাহ এবং তাহার মানসিক ও শারীরিক ব্যাধি-প্রবাহ, পৃথক পৃথক নিয়মাধীনে কেন থাকিবে, ইহার কোনও কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। পরন্তু, মনুষ্যের চিন্তাশক্তি যতদূর পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিতে পারে, ততদূর পর্য্যন্ত গবেষণা, পর্য্যবেক্ষণ, ইত্যাদির সাহায্যে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ঐ উভয় স্রোতই চির প্রবাহমান এবং একই শক্তির অধীনে ব্যবস্থিত। আরও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, **ব্যাধিপ্রবাহ প্রকৃত প্রস্তাবে মানবের কর্ম্মপ্রবাহের সহিত একীভূত** অর্থাৎ কর্ম্মপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাধি প্রবাহটী উদ্ভূত হইয়াছে এবং তাহার নিবৃত্তিতে উহারও নিবৃত্তি। এ তত্ত্ব বিশেষ প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা প্রকৃত প্রস্তাবে আরোগ্যপথ কোন্‌টী,—তাহা স্থির করিতে না পারিয়া এটী ওটী সেটী অবলম্বন করিয়া বৃথা কালক্ষেপণ এবং শরীর ও মনের কলুষ এবং বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি করা ব্যতীত আর কোনও ফলপ্রাপ্তি ঘটে না। মনে করুন, কাহারও ১২।১৪ বৎসর পূর্ব্বে **দুষ্ট গনোরিয়া** পীড়া হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি দুরারোগ্য **বাতরোগে** আক্রান্ত হইয়াছেন এবং সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধচিত্ততা, বিমর্ষভাব ও ব্যাকুলতা ইত্যাদি অবস্থায় অতিকষ্টে কালাতিপাত করিতেছেন। এই ব্যক্তির চিকিৎসা করিতে হইলে, বর্ত্তমান সময়ে কষ্টদায়ক বাত রোগের জন্য দুই চারটী

ইঞ্জেক্‌সন দিলে, তাহার ফলে ব্যাধি আরোগ্য হওয়া ত দূরের কথা, তাঁহার নিম্নাঙ্গের **পক্ষাঘাত** অথবা দারুণ **হৃদ্‌রোগ** অথবা **উন্মাদ পীড়া** দেখা দিবে,—কাজেই এ অবস্থাকে আরোগ্য কহিবেন না পীড়ার জটীলতাবৃদ্ধি বলিবেন? এই ব্যক্তির প্রকৃত চিকিৎসা করিতে হইলে **মানসিক লক্ষণাদির** সাহায্যে তাঁহার **আভ্যন্তর** দেশে প্রবেশ করিতে হইবে এবং তদনুসারে নির্ব্বাচিত উচ্চতর শক্তির ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা সর্ব্বাদৌ তাঁহার **প্রাথমিক স্রাব** ফিরাইয়া আনিতে হইবে,—ঐ স্রাব কিছুদিন প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অন্তর্হিত হইলে, তখন তাঁহার বাতাদি বেদনা হইতে আরম্ভ করিয়া মানসিক অবস্থা পর্য্যন্ত নির্ম্মল হইবে ও হইয়া থাকে। ঐ গনোরিয়ার পশ্চাতে কুক্রিয়া, তৎপশ্চাতে কদভিলাষ এবং কদভিলাষের পশ্চাতে **সোরাদোষ** বর্ত্তমান,—সুতরাং কেবল বাহ্য প্রদেশে বিকশিত ব্যাধিদুঃখের বিনাশে আরোগ্য কার্য্য হয় না, হইতে পারে না,—তাঁহার কর্ম্মফলস্রোত প্রবহমান থাকিতে পীড়ার তিরোধান আদৌ সম্ভব নয়। ঐ স্রোতের নিবৃত্তি আবশ্যক, নতুবা আরোগ্য আসে না, কেবল জটীলতাই বৃদ্ধি হয় ও ফল আরও শোচনীয় হইয়া উঠে।

ঐ স্থলে আমাদের আর্য্য ঋষিদিগের দ্বারা আদিষ্ট রোগানুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত বিধানের সার্থকতা উপলব্ধি হইবে। রোগের প্রশমনকারী চিকিৎসা সত্ত্বেও যে যেমন রোগ, তৎপশ্চাতে তেমনই **মানসিক পাপ** আছে,—ইহাই অনুভব করিয়া তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন,—প্রায়শ্চিত্ত শব্দের অর্থ কি? দণ্ডভোগ, অনুতাপ এবং তৎসঙ্গে ভগবচ্চরণে ক্ষমাভিক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই অনুতাপ এবং ক্ষমাভিক্ষার দ্বারা মনকে নির্ম্মল করার উদ্দেশ্য অতিশয় সুস্পষ্ট,—ইহা প্রত্যেকেই লক্ষ্য করিতে পারিবেন। শাস্ত্রোপদেশ অতি মূল্যবান ও সারগর্ভ কিন্তু শাস্ত্রাদির প্রতি আমাদের দৃষ্টি ও মনোযোগ ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে।

ঋষিকল্প মহাত্মা হ্যানিম্যানও তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা ও গভীর গবেষণা সাহায্যে স্থির করিয়া গিয়াছেন যে, **সোরার ধ্বংশ ব্যতিরেকে নির্ম্মল নিরাময় হওয়া কখনও সম্ভবপর নহে। সোরার ধ্বংশ ও মনস্তরের নির্ম্মলতা সম্পাদন,—একই কথা। যতদিন মনের পঙ্কিলতা থাকিবে, ততদিন ব্যাধিপ্রবাহ চলিতেই থাকিবে,—এবং মনের শুদ্ধি সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধি-প্রবাহ নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইবে।**

আমরা প্রতিনিয়তই দেখিতে পাই যে, **একই** পিতামাতার ঔরস-গর্ভজাত সন্তানসন্ততি পরস্পর **বিভিন্ন** মতি, **বিভিন্ন রোগ-প্রবণতা, বিভিন্ন পরমায়ু লইয়া বিভিন্ন প্রকৃতিতে** জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। উহাদের মধ্যে কেহ বা স্থূলবুদ্ধি, কেহ বা মেধাবী হয়, কেহ ক্রূরপ্রকৃতি কেহ বা অতিমাত্র সরল হইয়া থাকে। এই প্রকার বিভিন্নতার মূলে কর্ম্মস্রোত ও তৎসঙ্গে ব্যাধিস্রোত বিজড়িত থাকে এবং উক্ত প্রকার তারতম্যের সৃষ্টি করে। জন্মগ্রহণের পর পারিপার্শ্বিক ব্যাপারে যে পরিবর্ত্তন আনয়ন করে, তাহাও জন্মের পূর্ব্বতন কর্ম্ম ও কর্ম্মফল-প্রবাহের অধীনেই হইয়া থাকে, নতুবা দুইজন সহোদর ভ্রাতা একই প্রকারের সঙ্গী নির্ব্বাচন না করিয়া বিভিন্ন প্রকারের সঙ্গী ও বিভিন্ন পথ নির্ব্বাচন করিয়া লয় কেন? নিজ নিজ কর্ম্ম, কর্ম্মফল ইত্যাদি হইতে সঞ্জাত ও সৃষ্টমতি ও প্রবৃত্তিবশেই সঙ্গী নির্ব্বাচিত হয়,—সঙ্গী বা পারিপার্শ্বিক ব্যাপারে পরিবর্ত্তন ঘটায় না, কেননা প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ প্রবৃত্তির বশে সঙ্গী ও পারিপার্শ্বিক ব্যাপার পছন্দ করিয়া লয়। নতুবা নরেন্দ্রনাথ দত্ত কেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বাছিয়া লইলেন, কৈ নরেন্দ্রের ভ্রাতা ভূপেন্দ্র নাথ ত তাঁহাকে বাছিলেন না। নরেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে

বাছিয়াছিলেন বলিয়াই ত তিনি বিবেকানন্দ হইয়াছিলেন। **অতএব মানব নিজ কর্ম্ম ও কর্ম্মফল দ্বারা গঠিত প্রবৃত্তির বশে নিজ নিজ আদর্শ বাছিয়া লয়,** নতুবা আদর্শ তাহাদের কিছুই করিতে পারেন না। **পীড়িত ব্যক্তির চিকিৎসক নির্ব্বাচনও ঠিক তদ্রূপ ও একই নিয়মের অধীনে হইয়া থাকে।** যাহার ব্যাধি শেষ হইয়া আসিয়াছে, সে ব্যক্তি সুচিকিৎসকের সমীপবর্ত্তী হইতে বাধ্য হয় এবং তৎফলে তাহার আরোগ্য কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। নতুবা, সুচিকিৎসক থাকিতেও এত রোগী অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে কেন? ইহার কারণ, তাহাদের কর্ম্ম-স্রোত ও ব্যাধিস্রোত এখনও প্রবহমান্। সুতরাং সুচিকিৎসকের নিকটে তাহাদের যাওয়া ঘটিবে না এবং নিরাময় হইয়াও হইবে না। ঠিক যেন কর্ম্মফলস্রোতের অধীনে নিতান্ত অবশভাবেই প্রত্যেকের নিজ নিজ সঙ্গী ও আদর্শ নির্ব্বাচিত হয়, আবার সেইরূপ ব্যাধিস্রোতের অধীনে নিতান্ত অবশ-ভাবেই রোগীও নিজ নিজ চিকিৎসক নির্ব্বাচন করিয়া থাকে। ইহাই আসল তত্ত্ব, ইহাই প্রকৃত সত্য, যেহেতু শাস্ত্রনির্দ্দেশ, দর্শনশাস্ত্রের উপদেশ এবং মহাত্মা হ্যানিম্যান প্রবর্ত্তিত ব্যাধি নিরাকরণের উপায়,—এ সকলের মধ্যে **সামঞ্জস্যবিধান** কেবল ঐ তত্ত্বের দ্বারাই সম্ভব।

যদি উপরোক্ত তত্ত্ব ও সত্য হৃদয়ঙ্গম হয় এবং উহাই প্রকৃত তত্ত্ব ও সত্য বলিয়া ধারণা হয়, তবে ব্যাধি নিরাময় কোনপথে সম্ভব ও অনুকূল, তাহা স্থির করা আদৌ কঠিন হইবে না। প্রত্যেক প্রকার আলোচনাতে সামান্য হইতে বিশেষে পৌছানই সঙ্গত, অতএব তরুণ পীড়া হইতে পুরাতন পীড়ায় নিরাকরণ প্রথার আলোচনা করাই বিধেয় বলিয়া মনে হয়। মনে করুন, আপনার তরুণ জ্বরপীড়া হইয়াছে। দেখা যায় যে, এই তরুণ পীড়ার উত্তেজক কারণ হিসাবে নিয়ম লঙ্ঘন অবশ্যই বর্ত্তমান থাকে।

আহার, বিহার, নিদ্রাদির সম্বন্ধে স্বাভাবিক নিয়ম ভঙ্গ না করিলে তরুণ পীড়া হয় না। ঐ নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য শরীরস্থ আমরস সঞ্চয় এবং তাহার ফলে অক্ষুধা, বমন, জ্বরতাপ, আলস্য, পিপাসা, অঙ্গমর্দ্দ ইত্যাদি লক্ষণ সকল সমুপস্থিত হইয়া আপনাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। এই পীড়ার ও এই অবস্থার প্রতীকার করিতে হইলে সর্ব্বাদৌ **নিদানত্যাগ** করিতে হইবে,—অর্থাৎ যে নিয়ম ভঙ্গ করিয়া এই ব্যাধি দুঃখ ঘটিয়াছে,—সে নিয়মকে আর ভঙ্গ না করিয়া তদধীনে কার্য্য করিতে হয়। কিন্তু নিদান ত্যাগ করিলেই যথেষ্ট হয় না,—নিদান ত্যাগ ত অত্যাবশ্যক, তৎব্যতীত **প্রায়শ্চিত্ত** প্রয়োজনীয়। উপবাসাদি কৃচ্ছতাসাধন, ঔষধাদি সেবন এবং পুনরায় আর কখনও নিয়মভঙ্গ না করিবার জন্য মানসিক অঙ্গীকার বা প্রতিজ্ঞা আবশ্যক হইয়া থাকে। এই সামান্য তরুণ পীড়ার পশ্চাতে মানসিক পাপ বড় অধিক থাকে না। কেবল সামান্য অনবধানতা ব্যতীত অন্য কোনও গুরুতর পাপ না থাকায়, যৎসামান্য প্রায়শ্চিত্ত বিধানের সাহায্যেই নিরাময়ত্ব প্রাপ্তি সম্ভব হয়। কিন্তু যেখানে পুরাতন পীড়া, অর্থাৎ **সোরা, সাইকোসিস ও সিফিলিস দোষজাত পীড়া,** সেখানে পাপের মাত্রাও যত বেশী, সুতরাং প্রায়শ্চিত্তাদির বিধানও ততই কঠোর; এবং সে স্থলে নিরাময় হইতে হইলে অনেক কিছু করিতে হয়। যেরূপ পাপ, তাহার প্রায়শ্চিত্তও সেইরূপ হইতে হইবে,—সে বিষয়ে সন্দেহ কি? সামান্য তরুণ পীড়ার পশ্চাতে সামান্য নিয়ম লঙ্ঘন, যথা—অতিরিক্ত স্নান, অসময়ে ভোজন, রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি থাকে, কিন্তু **সোরাদি দোষ,** যাহা হইতে গুরুতর জাতির পুরাতন পীড়ার আবির্ভাব ঘটে, সেই সোরাদি দোষের পশ্চাতে সামাজিক, নৈতিক এবং পারমার্থিক নীতি সকলের লঙ্ঘন ও নিতান্ত ব্যভীচার বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং ঐ ঐ দোষের নিরাকরণ ও তাহার ফলে তত্তৎদোষজাত পীড়া নিরাকরণ

আশা করিতে হইলে, কতদূর সংযম, নির্ম্মলতা, অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্তাদির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। এ অবস্থায় যাহারা মনে করে, দুই একটী ইঞ্জেকসন দিয়া একটী পীড়িত মানবকে নির্ম্মল করিতে পারা যায়, তাহারা যে কি প্রকার ভ্রান্ত তাহা বলিয়া প্রকাশ করা সম্ভব নহে। যে জিনিসের যে মূল্য, তাহা দিতেই হয়, নতুবা জিনিসটীর প্রাপ্তি আশা অন্যায়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই, এজন্য, প্রাপ্তির পূর্ব্বে বিনিময় দিতে হয়। আপনি সামাজিক নীতি, ঐহিক ও পারমার্থিক নীতিগুলির উপর পদাঘাত করিয়া নানাপ্রকার ব্যভীচার অবলম্বন করিলেন, এবং ইহার ফলে নানাপ্রকার কুৎসিত ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইলেন,—আর এই সকল মহাপাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া কোনও প্রকার কষ্টভোগ না করিয়া, কেবল দু'চারটী ইঞ্জেকসনের সাহায্যে নিরাময় হইবেন? ইহা কি কখনও সম্ভব? যে ব্যক্তি আপনাকে সেই আশায় মোহিত করে, সে প্রতারক অথবা অতিমূর্খ, আর আপনাকে কি আখ্যা দিব, তাহা আমরা ঠিক করিতে পারিতেছি না। কেননা আপনার কোনও প্রকার জ্ঞান থাকা সম্ভব নহে। যেহেতু একেই ত উক্ত প্রকার দুরন্ত পাপার্জ্জনের ফলে আপনার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে। আবার অন্যদিকে আপনার এখনও প্রবল ইচ্ছা আছে, যদি কোনও প্রকারে পূর্ব্বকৃত পাপের ফল স্বরূপে যে যে ব্যাধিগুলি আসিয়াছে, তাহাদিগকে চাপা দিয়া পাপের পথে অবাধে চলিতে পারি ও ঘৃণিত হুঙ্কারজনক পাশবিক আনন্দ এখনও উপভোগ করিতে পারি, আপনি এখনও সেই আশায়, যাহাতে অনায়াসে "তালি" দিয়া "চাপা" দিয়া জীবনের বাকি কয়টা দিন আনন্দোপভোগে কোনও প্রকার বাধা না ঘটে, তাহার জন্য এত লালায়িত হইয়াছেন। আপনার—আর উপায় নাই,—আপনি মোহান্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে নীচতার সুগভীর গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হইতেছেন,—ক্রমে মনুষ্যত্তর হইতে নামিয়া পশুস্তরে পৌছিবেন, আর বিলম্ব নাই।

মনে করিয়াছিলেন, প্রত্যেক পাপী তাহাই মনে করে যে, এই প্রকার দিনই চলিতে থাকিবে, কিন্তু হায়! বিশ্বরাজ্যে তাহা হয় না, একই প্রকারে দিন যায় না,—ইহার নাম "জগৎ" অর্থাৎ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। পাপপথে বিচরণ করিতে করিতে হঠাৎ একদিন মৃত্যু আসিয়া দেখা দিল ও আপনার এ জন্মের শেষ যবনিকা পতন হইল। অথবা যদি আপনি পাপপথ হইতে সম্প্রতি প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন অথচ দেহ ও মনকে, প্রকৃত আরোগ্যপথ অবলম্বন করিয়া, নির্ম্মল করেন নাই বা নির্ম্মল করিবার অবসর পান নাই, তবে না হয় কেবল অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছেন, এরূপ অবস্থায় শেষ যবনিকা পতন হইল। মনে করিবেন না যে, এই খানেই শেষ হইল। তাহা কি হয়? স্রোত কি কখনও বিলুপ্ত হয়? নিক্ষিপ্ত বাণ কি কখনও লক্ষ্যে না পৌঁছিয়াই প্রতিনিবৃত্ত হয় বা স্থিরতা অবলম্বন করে? না, তাহা হয় না। আপনি দেখিতে পান না, এই পর্য্যন্ত। বিধাতার নিয়মাধীনে বা **স্বভাবের নীতিবশে,** আপনার জন্ম হইবেই,—কেবলই যে জন্ম হইবে তাহা নয়, **এরূপ পিতামাতার নিকট বা এরূপ যোনিতে আপনার জন্ম হইবে, যেখানে আপনার পূর্ব্ব প্রবাহিত স্রোতটী প্রবহমান থাকিবার সুবিধা ঘটে। তৎ-ব্যতীরেকে, আপনার মন ও প্রবৃত্তি, মৃত্যুর পূর্ব্বে যে স্তরে ছিল, ঠিক সেই প্রকার মন ও প্রবৃত্তি লইয়াই জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন।** মৃত্যুতে কেবল জীর্ণ শরীরটী ত্যাগ হইয়াছে মাত্র। আবার নূতন দেহপ্রাপ্তি ঘটিল বটে, কিন্তু **আপনি মৃত্যুর পূর্ব্বে যাহা ছিলেন, তাহাই থাকিবেন।** সেই ব্যাধি স্রোত, সেই কর্ম্মফলস্রোত একই ভাবে প্রবাহমান থাকিল ও থাকিবে,—আপনি যেমন বাসনা বরাবর

করিয়াছিলেন, সেই বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য, সকল সুবিধা প্রাপ্ত হইবেন। অতএব পিতামাতা নির্ব্বাচন করিবার, সঙ্গী ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা নির্ব্বাচন করিবার এবং ব্যাধিপ্রবাহাদি প্রবাহমান রাখিবার, কর্ত্তা একমাত্র আপনি। পুনরায় জন্মের পর হইতে পূর্ব্ব জীবনের প্রত্যেকটী, আপনার কর্ম্মানুসারে চলিতে থাকিবে, তাহার কোনও সন্দেহ নাই।

যতদূর আলোচনা করা হইল, ইহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, মনুষ্য পূর্ব্বজীবন হইতেই কর্ম্মস্রোত এবং ব্যাধিস্রোত লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এ জীবনেরও যাবতীয় ব্যাপার, যথা সঙ্গী, গুরু, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি সকলই তদনুসারে অর্থাৎ নিজ নিজ **প্রবৃত্তিবশেই** নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। আসল কথা, দায়িত্ব অন্য কাহারও নাই, সবই **নিজের** দায়িত্ব।

যাহা হউক, এক্ষণে প্রতীকার কি উপায়ে হইতে পারে, তাহারই সামান্য আভাস দিয়া এই বিষয়ের উপসংহার করিতে হইবে। প্রতীকার—"কায়েণ মনসা বাচা"—নিজেকে নির্ম্মল করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। অর্থাৎ **শরীর, বাক্য ও মন**—এই ৩টী স্তরে নির্ম্মলতা আনয়ন না করিতে পারিলে ব্যাধিপ্রবাহ হইতে রক্ষার উপায় নাই। সর্ব্বাদৌ নির্ম্মল করিবার প্রধান অবলম্বন—**চিকিৎসা**। চিকিৎসামাত্রই কখনও সুপথ নয়,—কেননা যে চিকিৎসাপথে মনকে **বিশুদ্ধ** করিবার ব্যবস্থা নাই, তাহা চিকিৎসা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সর্ব্বপ্রথম বিশৃঙ্খলা যখন মনেই উপস্থিত হইয়া থাকে এবং তথা হইতে ঠিক যেন প্রবাহরূপে বাহ্যদেশে প্রতিবিম্বিত বা প্রকাশিত হয়,—তখন মনকে নির্ম্মল করাই প্রধান সাধনা। **রোগের গতি বাহির হইতে ভিতরে** এবং **আরোগ্যের গতি ঠিক তৎবিপরীত অর্থাৎ ভিতর হইতে বাহিরে,**— একথা অনেকেই জানেন। সুতরাং যে চিকিৎসাপথে বাহ্যতঃ প্রতীকার

অবলম্বিত হয়, অর্থাৎ বাহ্যদেহে প্রতীকার প্রয়োগ দ্বারা রোগের বিকশিত অবস্থাটীর লোপসাধন করা হয়, তাহাতে পীড়া আরোগ্য ত দূরের কথা, তাহাতে রোগ বৃদ্ধিই হয়, জটীলতা আনয়ন করে এবং মনকে আরও কলুষিত করিয়া ফেলে। কেহ হয়ত কহিবেন,—"কেন? মহাশয়, বাহ্য প্রলেপে বা কুইনাইন প্রয়োগ দ্বারা রোগ প্রশমন হইতে আমরা নিত্য দেখিতেছি, তবে সেটী কি?" তদুত্তরে বলিতে হয় যে এবং সামান্য প্রণিধান করিলে স্বতঃই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, সে প্রশমনটী দৃশ্যতঃ প্রশমন মাত্র, ফলতঃ উহা বৃদ্ধি বা জটীলতার পূর্ব্বরূপ মাত্র। বাহ্য প্রয়োগ করিয়া একটী চর্ম্মপীড়া দৃশ্যতঃ অপনোদিত হইল বটে, কিন্তু কিছুদিন পরেই হয়ত শূলবেদনা দেখা দিল,—কুইনাইন দ্বারা জরটী দৃশ্যতঃ রোধ হইল বটে, কিন্তু যন্ত্রাদির বিবৃদ্ধি, অক্ষুধা, অজীর্ণ, নিত্য স্বল্প-জর ইত্যাদি আসিয়া দেখা দেয়। কেন, এ সকল হয়? ইহার কারণ এই যে, প্রতীকারটী প্রকৃত প্রতীকার নয়। প্রতীকার করিতে হইলে **মনস্তরের** সংবাদ লইয়া, **মনোলক্ষণের সাহায্যে ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হয়,** তাহার ফলে মনস্তরটী নির্ম্মল হয় এবং তাহারই ফল স্বরূপে বাহ্যবিকশিত পীড়া লক্ষণও প্রকৃত আরোগ্য হইয়া চিরতরে অপসারিত হইয়া থাকে। যে চিকিৎসায় মানুষকে কতকগুলি যন্ত্রসমষ্টি বলিয়া ধরা হয় এবং পীড়াটী কোনও একটি যন্ত্রমাত্রেরই পীড়া,—তৎসঙ্গে মানুষটি বা তাহার মনের সহিত কোনও সংশ্রব নাই বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা চিকিৎসাপদবাচ্য নহে,—একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। একটি এঞ্জিনের সহিত মানুষের কোনও পার্থক্য যে চিকিৎসায় পরিকল্পিত হয় না, তাহাকে চিকিৎসা শাস্ত্র কি প্রকারে বলা হইবে? মন নীরোগ না হইলে দেহ নীরোগ হয় না,—হইতে পারে না,—এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই।

একটি শিশু, তাহার জন্মের পর হইতেই, রাত্রে নিদ্রা যাইতে পারে না,

সর্ব্বদাই অস্থিরভাবাপন্ন, কেবলই ক্রন্দন করে, খাইবার জন্য ব্যাকুল হয়, অথচ জীর্ণ করিতে পারে না, অতি দুর্গন্ধ মলত্যাগ করে; কেন এরূপ হইল? সেই বাড়ীতে আর একটি শিশু আদৌ অস্থির নয় এবং খাইতেও চায় না, আবার খাওয়াইবার পর তখনই বা স্বল্পক্ষণ পরে অম্লগন্ধ জমাট বাঁধা বমন করিয়া ফেলে, অম্লগন্ধ মলত্যাগ করে, অথচ ক্রমেই থপ্‌থপে মোটা হইতে থাকে, যথাসময়ে দন্তোদ্গম হয় না, যথাসময়ে চলিতে বলিতে শিখে না, মাথার জোড়গুলি অনেক বিলম্বে জোড় খায়, ইত্যাদি। একই ঘরে ২টি শিশুর ধাতু, প্রকৃতি, মেজাজ ইত্যাদি এত বিভিন্ন কেন? এই দুইটি শিশু একই গাভীর দুগ্ধ পান করে, একই বাড়ীতে থাকে, একই ভাবে লালিত পালিত হয়,—তবুও এ বিভিন্নতা কেন? ইহার কারণ অন্য কিছুই নয়। শিশুদিগের পূর্ব্ব জন্মজ বিশৃঙ্খলা স্রোতটি প্রবহমান রহিয়াছে, যাহা সাধারণ ভাবে "**অর্জ্জিত দোষ**" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ফলতঃ উহাদের পিতামাতার শরীরস্থ দোষ কেবল "নিমিত্ত মাত্র"। ঐ শিশুগণ দোষদুষ্ট পিতামাতার ঔরসগর্ভে জন্মিয়াছে বলিয়া তাহারা পীড়িত হইয়াছে, একথা প্রকৃত কথা নয়; প্রকৃত কথা এই যে, উহারা পূর্ব্ব জীবন হইতে পীড়িত বলিয়াই ঐ প্রকার **দোষদুষ্ট** পিতামাতার ঔরসগর্ভ আশ্রয় করিয়াছে। এক্ষণে যদি প্রকৃত প্রতীকার এই শৈশবে অবলম্বিত হয়, তবে উত্তরকালে আর পীড়াবীজটী অঙ্কুরিত, পল্লবিত এবং পরিশেষে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া ব্যাধিবৃক্ষে পরিণত হইয়া ঐ শিশুগুলির অপরিণত বয়সে বা যৌবনের প্রারম্ভে বা যৌবন শেষে, অকাল মৃত্যু ঘটাইতে পারে না, এখনই ক্ষীণস্রোতটী পরিশুদ্ধ করিতে পারিলে আর প্রবাহাকারে পরিণত হইতে পারে না; কিন্তু হায়! কয়টী ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব হয়! হয়ত প্রতীকারই অবলম্বিত হয় না, যদিই বা হয়, তবে সে প্রতীকার প্রতীকারই নয়। কেননা সে প্রকার প্রতীকারে ইষ্টের পরিবর্ত্তে অনিষ্টই হইয়া

থাকে। পুস্তকের কলেবর অতিমাত্র বৃদ্ধির ভয়ে এস্থলে একটার অধিক উদাহরণ সন্নিবেশিত করিতে পারিতেছি না। এই একটী হইতেই সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, সাধারণতঃ কি প্রকার প্রতীকার অবলম্বিত হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে সমাজের কি ভয়ানক অনিষ্ট হইতেছে।

নীরদবরণ রায় নামে একটী অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক যক্ষ্মাপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া আমাদের চিকিৎসাধীনে আসে। ১৯২৫ সালের অক্টোবর মাসে ঐ যুবক ও তাহার মাতা আমার ডিস্পেন্সারীতে সমুপস্থিত হইলেন। জননীর একমাত্র পুত্র, এজন্ত তিনি আমার বাড়ীর মধ্যে গিয়া মেয়েছেলে-দিগকে বিশেষ অনুরোধ উপরোধ করিতে থাকেন এবং অতিশয় কাতর হইয়া পরিশেষে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা ও আশ্বাসবাণীর দ্বারা তুষ্ট করিয়া লক্ষণ লিপি তৈয়ার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সংক্ষেপে নিম্নে তাহা বর্ণনা করিলাম।

"অতি শৈশবে নীরদের প্রায়ই **কাণে অতি দুর্গন্ধ পুঁয** হইত, প্রথমে বোধ হয় ডান কাণে, পরে দুই কাণেই পুঁয গড়াইতে থাকে, নিকটের ডাক্তার দেখান হয়। তিনি কেবল পিচকারী করিয়া ধোয়াইবার ব্যবস্থা দেন। ১৩ মাস বয়সে, তাহার দুইটী পায়ে অতি ভয়ানক **কাউরের ঘা** হয়। ঐ ঘায়ের জন্ত ছেলে দিবারাত্রি কান্দিত, উহাতে এত চুলকাণি ছিল যে, ঐ ছোট ছেলে খাটের খুড়োতে পা দুইটী ভীষণ জোরে রগড়াইত,—তার পরেই অতি দুর্গন্ধ আঠাল রস কাটিত, তাহা দেখিয়া আমরা স্থির থাকিতে না পারিয়া আদ্রার রেলওয়ে সিভিল সার্জ্জেন মিষ্টার —কে দেখাই। তিনি বলেন—Tar is the only help, —put a tar cap on each of lege, and that is all. অর্থাৎ আলকাতরাই একমাত্র ভরসা, প্রত্যেক পায়ে আলকাতরার টুপি দাও। এই বলিয়া তিনি হাঁসপাতাল হইতে দুইটী মোজার মত অতি নরম দুইটী

থলি দিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, এই দুইটী টুপি খুলিবে না। কাউর ঘা ভিতরে ভাল হইলে উহা আপনি খুলিয়া পড়িবে। তখন বালকের পিতৃদেব বাঁচিয়াছিলেন, তিনি আনন্দিত হইয়া বালককে ফিরাইয়া আনিলেন এবং ১৫।২০ দিনের মধ্যেই ঘা ভাল হইল, তবে একটি সাদা দাগ বরাবর ছিল,—এখনও কতকটা আছে। এক্ষণে কেবল কাণের পূঁয রহিল, উক্ত সাহেবও কেবল ধোয়াইবার উপদেশ দেন, কোনও ঔষধ দেন নাই। দুই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কখনও কখনও তরল ও দুর্গন্ধ উদরাময় ব্যতীত অন্য কোনও বিশেষ পীড়া হয় নাই। তাহার পর দেখা গেল, ছেলেটির সর্দ্দি কাসি প্রায় হইতে লাগিল এবং কাসির জন্য রাত্রে ঘুমাইত না। বলিতে ভুল হইয়াছে,—ছেলেটীর মেজাজ ক্রমে এত খারাপ হইয়া উঠিল যে, কোলেও থাকে না, বিছানাতেও শোবে না, সর্ব্বদাই অস্থির। আমরা আরও লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে, ছেলেটীকে স্নান করাইলেই জ্বর ও সর্দ্দিকাসি হইত। এমনিই জ্বরাদি মধ্যে মধ্যে হইত, কিন্তু স্নানে বা সামান্য ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হইত। পুরুলিয়ার সিভিল-সার্জ্জেনকে দেখাইবার জন্য যাওয়া হইল। তিনি কি একটী ট্যাব্‌লেড্‌ ঔষধ লিখিয়া দিলেন ও কড্‌লিভার অয়েল খাইতে দিলেন। তাঁহার উপদেশানুযায়ী ঔষধ ও কড লিভার অয়েল চলিতে লাগিল এবং ছেলে যেন কতকটা ভালই থাকিল। সর্দ্দিকাসি জ্বর ইত্যাদি মধ্যে মধ্যে হইতে থাকিলেও ততটা বেশী হইত না, ফলতঃ স্নানটী প্রায় বন্ধই হইয়া গেল। এই ভাবে ৯।১০ বৎসর কাটিয়া গেল, ইহার ভিতর আর গুরুতর কোনও অসুখ হয় নাই। প্রায় ১১।১২ বৎসর বয়সের সময় প্রথম দেখা গেল যে, ছেলের গলায় **টন্সিল** বাড়িয়াছে এবং শুষ্ককাসি অতি প্রবল হইয়া উঠিল। এদিকে ছেলে নিতান্ত যে খায় না, তাহা নয়, কিন্তু যে দুর্ব্বল সেই দুর্ব্বল, মেজাজ বড় খিট্‌খিটে, অতি বিষণ্ণ ও গুরুগম্ভীর প্রকৃতি হইয়া উঠিল। যাহা হউক, স্থানীয় ডাক্তারেরা

সকলেই পরামর্শ দিলেন যে, অস্ত্রোপচার ব্যতীত ইহার চিকিৎসা নাই, অতএব যতশীঘ্র পারেন টনসিল কাটিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। ছেলেটীর পিতা সেই সময় পীড়িত হইয়া পড়েন এবং সেই পীড়াতেই তিনি মারা যান, তখন ছেলের বয়স মাত্র ১৩ বৎসর। ঐ ভাবেই চলিতে থাকে এবং নানা কারণে কাটানর জন্য কোনও ব্যবস্থা করা হয় নাই। স্থানীয় ডাক্তারদের দ্বারা কখনও ২।১ শিশি ঔষধ, কখনও ২।১টি প্রলেপ,—এই ভাবে দিন কাটিতে থাকে। এইভাবে চলিতে থাকে, কিন্তু আরোগ্যের দিকে কোনও প্রকারেই যাইতেছে না দেখিয়া রাণীগঞ্জে একজন কৃতবিদ্য কবিরাজের নিকট চিকিৎসার ব্যবস্থা করান হয়। তাঁহার সুচিকিৎসার গুণে ছেলে অনেকটা সুস্থতা লাভ করে। তিনি ৩।৪ বৎসর কাল ধরিয়া চিকিৎসার পরামর্শ দেন। আমরা তাহাই করিতে প্রস্তুত ছিলাম, ইতিমধ্যে ১৯২৩ সালের জানুয়ারী মাসে ছেলের একটী উপসর্গ দেখা দিল, তাহাতে সকলেই শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। রাত্রে নিদ্রার মধ্যে নিশ্বাস আটক হইয়া যাইতে থাকিল এবং ছেলেটী তখনই উঠিয়া বসিতে বাধ্য হইত, এইরূপ প্রতিরাত্রে ৩।৪ বার করিয়া হইত, তৎসঙ্গে শুষ্ক কাসি, দুর্ব্বলতা ইত্যাদি জন্য ছেলেকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া টনসিল না কাটাইলেই নয়,—ইহাই স্থির হইল। উক্ত কবিরাজ মহাশয় আমাদিগকে বহুবার এ কাজ করিতে নিষেধ করেন, ফলতঃ আমরা তাঁহার কথা না শুনিয়া ২২শে ফেব্রুয়ারী মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালে একটী ছোট ঘর ভাড়া লইয়া একমাস দশদিন থাকিয়া ছেলেকে ভাল করিয়া আনি। **টনসিল কাটা** হইবার পর ৬।৭ মাস বিশেষ কোনও রোগ ছিল না তাহার পর ১৯২৪ সালের শীতকালে ছেলের **কাশি ও জ্বর দেখা** দিল, আহার করিয়া কাশির চোটে সমস্ত ভুক্তপদার্থ বমি হইয়া যাইত। এ সকল কারণে অগত্যা নিকটের এলোপ্যাথি ডাক্তার দুইজনকে দেখাইতে বাধ্য হইয়া পড়ি, তবে তাঁহাদের

ঔষধে বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই নাই। কিছুদিন জরটা বন্ধ ছিল, কিন্তু আজ ২ মাস হইল নিতাই সন্ধ্যার দিকে স্বল্পজ্বর হইতেছে, অরুচি, কাসি, ইত্যাদিতে ছেলে একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তারেরা কহিতেছেন, নীরদের যক্ষ্মা হইয়াছে,—এক্ষণে আপনার নিকট আনিয়াছি, যাহা কর্ত্তব্য করুন।”

বক্ষোপরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, কোনও স্থলে ক্ষতাদি হয় নাই, তবে অন্যদিকে লক্ষণ ও অবস্থা, বিশেষতঃ ক্রমেই ক্ষীণতা প্রাপ্তি,—এবং অন্যান্য অবস্থা হইতে, ক্ষয়পীড়া সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ রহিল না। এই রোগীর চিকিৎসা বর্ণনা করিবার বিশেষ কোনও প্রয়োজন এখানে নাই। কেবল এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, **প্রায় দেড় বৎসরের উপর চিকিৎসা করিয়া আমি এই যুবককে আরাম করি,** ও তাহার শারীরিক এবং মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন আনিতে সক্ষম হই। এই রোগীর প্রধান লক্ষণ—**বিমর্ষতা ও নৈরাশ্য**।

মনস্তরের প্রধান লক্ষণ—নৈরাশ্য ও বিমর্ষতা, তৎব্যতীত স্নানে বৃদ্ধি, দুর্গন্ধ স্রাব, ইত্যাদির সাহায্যে আমি **সোরিণাম্**—২০০ হইতে আরম্ভ করিয়া, ১০,০০০ শক্তিতে আরোহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত লক্ষণগুলি একে একে পুনর্বিকাশ ঘটাইয়া রোগীকে সুস্থ করিয়াছিলাম। এক্ষণে, চিকিৎসা কোন্‌টীকে কহিবেন? যাহাতে একে একে জটীলতা আনয়ন করে, একের পর একটা করিয়া নূতন, নূতন ব্যধি সৃজন করে এবং রোগীকে ক্রমে **মৃত্যুর দিকে** অগ্রসর করাইয়া দেয়, সেই প্রথাকে চিকিৎসা কহিবেন, অথবা যে চিকিৎসায় **গ্রন্থিগুলিকে** খুলিয়া ক্রমে লুপ্ত লক্ষণগুলিকে বাহির করিয়া রোগীকে মনে ও শরীরে নির্ম্মল করে, সেই প্রথাটীকে চিকিৎসা বলিবেন? যে প্রথায় **মনস্তরের বিশৃঙ্খলার** প্রতীকার করিতে সমর্থ না হয়, তাহাকে চিকিৎসা বলা যায় না। একথা

বিস্মৃত হইলে চলিবে না। মনন্তরকে নির্ম্মল করার পক্ষে সুচিকিৎসা একটী প্রধান উপায়। ইহাই প্রথম উপায়। বলা বাহুল্য যে এই শিশুর বাল্যকালে ২।১ মাত্রা সোরিণাম প্রয়োগ হইলে তখনই শিশুটী নির্ম্মল হইত এবং এতদূর বিভ্রাট আদৌ ঘটিত না।

এই পক্ষে, ২য় উপায়,—মনকে ভগবৎমুখী করা এবং জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তাহা সদাসর্ব্বদা চিন্তা পথে আনিয়া সকল কার্য্য, সকল চিন্তা প্রভৃতি মঙ্গলময়ের চরণে অর্পণ করা। এটী বলা যত সহজ, কার্য্যতঃ করা তত সহজ নয়। সদসৎ বিচার, ভগবচ্চিন্তন ও নিত্য একটী নির্দ্দিষ্ট সময় ধ্যান ধারণাদির জন্য স্বতন্ত্র রাখিয়া তৎপথে অভ্যাস করা অতি সহজ অথচ শ্রেষ্ঠতম উপায়। ভগবান্‌কে একমাত্র সুহৃৎ ও শরণ বলিয়া দৃঢ়চিত্তে উক্ত প্রকার অভ্যাস যোগ অবলম্বন করিলে ক্রমে ঐ সদভ্যাস প্রভাবে মনের একটী অসাধারণ শক্তি সঞ্চয় হয়, তাহার ফলে—কোনও প্রকার মন্দ চিন্তা আপনার মনে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এই প্রকার অভ্যাস যোগে রত ও তৎপর হইলে দেখিবেন, ক্রমে ক্রমে সাত্ত্বিক আহার, সাত্ত্বিক চিন্তা, সাত্ত্বিক কার্য্য ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার দ্রব্যে আপনার রুচি পর্য্যন্ত থাকিবে না। অবশ্য আমরা সম্পূর্ণ গৃহী ও সংসারী, এ সম্বন্ধে কোনও প্রকার উপদেশ দান আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা, কিন্তু নিজের জীবনে যাহাতে নিজে কল্যাণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা জনসমাজে ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্য এই যে, অন্য দশজনেও সেই পথ অবলম্বন করিয়া নিজেকে নির্ম্মল করিতে পারেন। তাহার পর তিনিই প্রত্যেক জীবকে পথ দেখাইয়া লইয়া যান, অন্যের সাহায্য বড় আবশ্যক হয় না। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও সরলতার সহিত ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণের ন্যায় চিত্তনির্ম্মলকারী কিছুই নাই।

সমাপ্ত।

THE CALCUTTA HOMOEOPATHIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL
LIBRARY